রবীন্দ্রকথা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

বঙ্গাব্দ ১৩৪৮

জয়শ্রী পুস্তকালয়

১৬৫, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত]

জয়শ্রী পাবলিসিটির পক্ষে ২৯।৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপশুপতি কুণ্ড কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
৪৫ বি, গ্রে ষ্ট্রীট, অন্নদা প্রেস হইতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

"Life is a continual developement and unfoldment of Being, under circumstances that tend to press it down."

Swami Vivekananda.

দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তরুণদের হস্তে
সাদরে অর্পণ করিলাম।

— সংকলন কর্ত্তা —

উপরের সীল মোহরটি পূজনীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি-লিট, সি, আই, ই, শিল্পাচার্য্য মহাশয়ের পরিকল্পিত ও তাঁহার স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ গ্রন্থকারকে প্রদত্ত।

সমগ্র পৃথিবীর মহামানব

রবীন্দ্রনাথের

একমাত্র প্রামাণ্য বৃহত্তম জীবনচরিতকথা

রবীন্দ্র কথার

পরিশিষ্ট

শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে

[কবিগুরুর বিভিন্ন বয়সের অপ্রকাশিত বহু চিত্র ও কবির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে]

পরিশিষ্টের সূচীপত্র

ক। রবীন্দ্রনাথের জন্ম-পত্রিকার বিচার

খ। সাময়িক পত্রিকা ও [illegible]

([illegible])

গ। [illegible]

[illegible]

ঘ। ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী

ঙ। "ভাই হাততালি" [illegible]

চ। রাজা ও রাণীর [illegible]

ছ। নোবেল প্রাইজ কি ?

জ। চট্টগ্রাম ও হিজলী

ঝ। রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী

ঞ। ঠাকুরপরিবারে ইং ১৮৬৭ সাল

ট। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্র-প্রশস্তি

ভূমিকা

'রত্নাবলী'-নাটিকা-কার শ্রীহর্ষ প্রস্তাবনায় সূত্রধারের মুখে এইরূপ আত্ম-গরিমা করিয়াছেন :—

'শ্রীহর্ষো নিপুণঃ কবিঃ পরিষদ্ অপেষা গুণগ্রাহিণী
লোকে হারি চ বৎস্য-রাজ চরিতং নাট্যে চ দক্ষাবয়ম্।'

'রবীন্দ্র কথা'র গ্রন্থকার ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রের কথা সকল লোকেরই মনোহারী—বিশেষতঃ সম্প্রতি তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর দেশবাসী তাঁহার প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছে—গ্রন্থকারও (নিজ মুখে না বলুন, আমার মুখে বলিতে পারেন) নিপুণ লেখক ও উৎকৃষ্ট বোদ্ধা এবং গ্রন্থের সাজ-সরঞ্জাম যাঁহারা সজ্জিত করিয়াছেন তাঁহারাও 'দক্ষ' ব্যক্তি। এ সকল উক্তি বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নহে, তথাপি এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে হয় কেন,—চিহ্নিত ব্রাহ্মণের উপবীত দরকার কেন? মহাকবি কালিদাস ১৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে ইহার উত্তর দিয়াছেন—'বলবদ্ অপি শিক্ষিতানাম্ আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ'—গুণী হইলে কি হয়? যোগ্যতা থাকিলে কি হয়? আত্মপ্রত্যয় (Self-confidence) এ জগতে দুর্লভ। কয়জন ভবভূতির মত দম্ভ করিয়া বলিতে পারেন—

'উৎপৎস্যতেঽস্তি কোপি মম সমানধর্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'—

'এ বিপুল বিশ্বে অনন্ত কালের গতিতে হয়ত' আমার সমান কেহ কোথাও আছে বা হইবে'। আমাদের গ্রন্থকারের কিন্তু সে জাতীয় স্পর্দ্ধা নাই। তিনি বিনয়ের অবতার—নইলে আমার মত প্রায় অপরিচিত ব্যক্তিকে এ ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করিবেন কেন, —এবং 'নিবেদনে' আমার এই ক্ষুদ্র কার্যকে 'অবদান' বলিয়া বিশেষিত করিয়া উহাকে প্রীতির 'মহাদান' বলিয়া শিরোধার্য করিবেন কেন? যাহা হ'ক, বন্ধুর উপরোধ—অতএব আমি অযোগ্য হইলেও ঐ ভার বহনে স্বীকৃত হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ—যাঁহার কথা বলিতে গ্রন্থকার এই বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (পাঠক লক্ষ্য করিবেন গ্রন্থে ১৮টি পরিচ্ছেদ এবং ১২টি পরিশিষ্ট আছে)—সেই রবীন্দ্রনাথকে, আমি 'অতিমানব' বলিতে চাই না,—কিন্তু তিনি যে 'মহামানব' এ বিষয়ে বোধ

সর্বতোমুখী ও সর্বব্যাপী ছিল। তিনি একাধারে কবি, গীতরচক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক ত' ছিলেনই (এই গ্রন্থের ছ পরিশিষ্টে সঙ্কলিত রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পঞ্জির প্রতি দৃষ্টি করিবেন)—অধিকন্তু তিনি রসিক, ভাবুক, শিল্পী, কলাবিৎ, চিত্রকর, ধর্মবেত্তা, লোকশিক্ষক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, স্বাদেশিক, ধ্যানী, মিষ্টিক্ (mystic) এবং জ্ঞানী ও কর্মী ছিলেন। একা প্রতিভায় এরূপ অলৌকিক সার্বভৌম সমাবেশ কদাচ দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া রবীন্দ্র-জীবনও একটি 'প্রণিধানযোগ্য মহাকাব্য'। সুখের বিষয় রবীন্দ্র স্বয়ং নিজ জীবনের প্রকাশযোগ্য প্রায় সকল ঘটনার সহিতই দেশবাসীকে নানাভাবে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে ঐ মহাকাব্যের মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার আমাদের সুযোগ হইয়াছে। তাঁহার জীবদ্দশাতে নানা জনে নানা ছন্দে তাঁহার প্রতিভার বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত সমবেত প্রয়াস রবীন্দ্র-সমুদ্রে যেন গোষ্পদ মাত্র। তাঁহার সম্বন্ধে এখনও অনেক কথাই বলিতে বাকি আছে এবং বোধ হয় আগামী পঞ্চাশ বৎসরে আমরা সে কথা বলিয়া নিঃশেষ করিতে পারিব না। কেন? গ্রন্থকার খগেন্দ্র বাবুর সহিত সুর মিলাইয়া বলি—"বিশ্বমানবের বিস্তৃত ভূমিতে তিনি অপূর্ব দেশাত্মবোধের বিলাস ফুটাইতে পারিয়াছিলেন, দেশের শিল্প, সঙ্গীত, ভাষা, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, বেশভূষা, আচার ব্যবহারের পারিপাট্য আনয়নে তিনি সর্বদা যত্নবান ছিলেন ও পরিপূর্ণ করিয়া গড়িয়া গিয়াছেন— অথচ নদী যেমন সংসারের বিচিত্র প্রয়োজন সারিয়া সাগরাভিমুখে গমন করে, তাঁহারও সেই ব্রহ্মসমুদ্রের প্রতি অন্তরের টান তাঁহার নিমগ্ন নিবিষ্টতার অঙ্গস্বরূপ ছিল।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কমনীয় রমণীয় প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি—উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ, সৌষ্ঠব মণ্ডিত অবয়ব ও প্রভা-সমুজ্জ্বল বদন—জনতার মধ্যেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—চক্ষু সহজে ফিরিতে চাহিত না—নয়ন ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইত। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন—'তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য হইলেই তাঁহার নয়নে বদনে ভাবের বৈচিত্র্য, তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর, তাঁহার বাক্যে নানা রসের অবতারণা, কৌতুকপ্রিয়তা ও তৎসহ স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা ও সৌজন্যের সমাবেশ—সর্বশুদ্ধ হৃদয়ের একটা তরুণোচিত সরসতা শ্রোতার উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার কণ্ঠস্বরের ব্যাপকতা ও ক্রীড়ানৈপুণ্য অনন্যসাধারণ ছিল।" তাঁহার অনেক আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ ও নাটক-অভিনয় আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে যুগে ঐ সকল আমাদের একটা পরম উপভোগের সামগ্রী ছিল, কিন্তু 'তেহি নো দিবসা গতাঃ'।

রবীন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা মাত্র ৭ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাহার উপর আমি

ছিলাম তরুণ অবস্থাতেই অকাল-পক্ক। অতএব কৈশোর হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা-জ্যোতির বিস্ফুরণ আমার প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে আমি অনেক কথা জানি এবং তাঁহার সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা দিয়াছি ও প্রবন্ধ লিখিয়াছি। ঐ সকল কথা এখানে সন্নিবিষ্ট করিয়া এ ভূমিকাকে ভারাক্রান্ত করিব না—বিশেষতঃ যখন গ্রন্থকার এ বৃহৎ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কর্মবহুল জীবনের নানাদিক পাঠকের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

ফলতঃ বিশ্বকবির সাহিত্য-সাধনা ব্যতীত সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানে, সঙ্গীত আলোচনায়, আচারে ও ধর্মে, শিক্ষাক্ষেত্রে ও পল্লিগঠনে, সাহিত্যিকদিগের সাহায্য দানে, স্বদেশ ও স্বজাতির ঐকান্তিক সেবায় ও দেশে স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ কৃতিত্ব গ্রন্থকার মনোজ্ঞভাবে বিবৃত করিতে ত্রুটি করেন নাই—এমন কি জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই;—তা ছাড়া তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের একটি মনোরম চিত্র এবং তাঁহার বিদেশে অভিযান ও জয়যাত্রার একটি চিত্তহারী বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই বিদেশ জয়যাত্রা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। গ্রন্থকার অনেক কথাই লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু বিদেশ-প্রয়াণে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গী ও সহচর ছিলেন, তাঁহাদের মুখে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কাহিনী শুনা যায়। গ্রন্থকার একটু চেষ্টা করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে যেন ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া দেন। আর এক কথা। কবির রচনাবলীর বিবৃতি করিতে তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ বিবরণ আরো একটু বিস্তৃত হইলে ভাল হইত মনে হয়।

গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয়। তাঁহার মাতৃদেবী রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী এবং তাঁহার প্রপিতামহ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহোদরা ভগ্নি রাসবিলাসী দেবীর পুত্র। কিন্তু রক্তসম্বন্ধ ছাড়া রবীন্দ্রের সহিত গ্রন্থকারের প্রতিবেশী-সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। যাহাকে 'এক চালায় ঘর করা' বলে—অনেক বৎসর উভয়ের মধ্যে সে সম্বন্ধ ছিল। গ্রন্থকারের প্রপিতামহ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ির ঠিক দক্ষিণে পাঁচি ধোপানির গলিতে নিজ বাটি নির্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেন। গ্রন্থকারের উহাই পৈতামহিক বাসভবন। ঐ সূত্রেও তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যজাত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তা ছাড়া তিনি বাল্যকাল হইতে আত্মীয় আত্মীয়াদিগের মুখে—বিশেষতঃ তাঁহার পিতা, পিতৃব্য, খুল্লপিতামহের

প্রমুখাত ঠাকুর পরিবারের অনেক ঘনিষ্ঠ কথা শুনিয়াছিলেন। এ গ্রন্থ প্রণয়নে ঐ সকল কাহিনী তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে এবং সাধারণের যে সকল কথা অজ্ঞাত, তিনি তাহা বলিতে পারিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের উল্লেখ করিতে পারি। ১৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রথম পরিচ্ছেদে, রবীন্দ্রনাথ কি আবেষ্টনীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঐ আবেষ্টনী তাঁহার প্রতিভা বিকাশের কিরূপ সহায়তা করিয়াছিল—তাহার নিপুণ বিবৃতি আছে। চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদেও ঐ আবেষ্টনী সম্পর্কে অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথার উল্লেখ আছে। ঐ অধ্যায়গুলি পাঠক সযত্নে পাঠ করিলে কয়েকটি প্রচলিত ভ্রম প্রমাদের নিরসন হইবে। একটি উদাহরণ দিই। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ২৩শে শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কবীন্দ্রকে যে সম্মানসূচক 'ডাক্তার' উপাধি প্রদত্ত হয় তদুপলক্ষে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন—"His grandfather, the member of a new religious faith and a new fraternity, was one of the first of his countrymen to cross the estranging sea."

ঐ একটি ছত্রের মধ্যে দুইটি ভুল রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব হয় নাই। তা ছাড়া দ্বারকানাথ আজীবন লক্ষ্মীজনার্দন জীউর সেবক ও দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মাতৃমূর্তির পূজক ছিলেন। তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কালাপানি পার হইয়া বিলাত যান বটে, কিন্তু তাহার ১২ বৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পুত্রের সহিত ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন।

ঐ প্রথম পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে যদি পূর্বোক্ত তিন অধ্যায়ের সমস্ত বিবরণ একত্র সংকলিত করিয়া তিনটি উপ-অধ্যায়ে—সামাজিক আবেষ্টনী, সাহিত্যিক আবেষ্টনী ও আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীকে তিন স্তরে সজ্জিত করেন, তবে আমার মনোমত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, যাহাকে আমরা 'শিক্ষা' বলি রবীন্দ্রনাথের সে শিক্ষা অত্যল্পই হইয়াছিল। আমরা জানি তিনি কোনদিন প্রবেশিকা পার হইতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসরে হাতে-খড়ি হওয়ার পর তখনকার প্রথামত পারিবারিক পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন। পরে কিছুদিন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে সময় ক্ষয় করিয়া নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি হন এবং ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বেঙ্গল একাডেমি নামক একটি ফিরিঙ্গিপ্রধান স্কুলে ভর্তি হন।

কিন্তু প্রকৃতি যাঁহার শিক্ষয়িত্রী—এই ফৈরঙ্গশিক্ষা তাঁহার ভাল লাগিবে কেন? রবীন্দ্রনাথ স্কুল হইতে নিয়মিত পলায়ন আরম্ভ করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া অভিভাবকেরা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সেণ্ট্‌জেভিয়ার্স কলিজিয়েট স্কুলে পাঠাইলেন। নূতন স্কুলে যাইয়াও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আচরণের কোন 'উন্নতি' হইল না। আর কি করিবেন, কর্তৃপক্ষ তাঁহার স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহার লৌকিক শিক্ষার শেষ হইল। ইহার পর যে শিক্ষা, সে তাঁহার স্বয়ংকৃত শিক্ষা। সে শিক্ষার ফলে তাঁহার নানা বিদ্যায় পারদর্শিতার কথা আমরা সকলেই জানি। তবে এ কথা লক্ষ্য করিতে হয়, স্কুল ছাড়িবার পূর্বেই তিনি মাতৃভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং সঙ্গীত ও পদ্য রচনায় ভাবী কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছিলেন।

গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন—'কেবল পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীই একজন রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়। উহা ভগবৎ কৃপা ও অলৌকিক প্রতিভার অপেক্ষা রাখে।' প্রচলিত মত এই যে, Nature বড় কিছু নয়, Nurture-ই প্রধান। আমি ঠিক উল্টা মত পোষণ করি। আমার মতে শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সমস্ত বিগ্রহ ও নিগ্রহ এড়াইয়া 'স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে'—অর্থাৎ প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি। যাহার মধ্যে যে প্রতিভা প্রচ্ছন্ন আছে—সে প্রতিভা ফুটিবেই ফুটিবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি—'কবিত্ব ও ল্যাজ ভিতরে না থাকিলে টানাটানি করিয়া তাহাদের বাহির করা যায় না'। আমি আরও বলিতে চাই প্রতিভার বিকাশ উডুম্বর পুষ্পের ন্যায় একটা অতর্কিত ঘটনা। উহা নিজের স্বয়ংসিদ্ধ নিয়মে আসে যায়—প্রকৃতপক্ষে আবেষ্টনীর অপেক্ষা রাখেনা। অবশ্য কার্য-কারণের দাস আমরা, প্রতিভার উদ্ভবের হেতুনির্দেশে ব্যস্ত হই, যদিও সে নির্দেশ প্রায়ই বিফল ও বিকৃত হয়। আমি বিশ্বাস করি—রবীন্দ্রনাথ যে বংশেই জন্মগ্রহণ করিতেন—যে আবেষ্টনীর মধ্যেই বর্ধিত হইতেন—যে দেশ বা যে কালেই আবির্ভূত হইতেন—তাঁহার জ্যোতিষ্মান প্রতিভা সেই দেশ কালকেই সমুজ্জ্বল করিত—সেই বংশকেই গৌরবিত করিত।

এবার গ্রন্থকার খগেন্দ্র বাবুর কিছু পরিচয় দিই। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? আমিও ত এটর্নি এবং খগেন বাবুর অপেক্ষা সমর্থ ও সিনিয়র এটর্নি। উহা কিছু নয়। তবে খগেন্দ্র বাবু সুকৃতি বশে এমন পরিবেশের মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন যে কৈশোর হইতেই তাঁহার সাহিত্যপ্রীতি, বিশেষতঃ বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ প্রস্ফুট হইয়াছিল। তাহার ফলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি দেশের প্রধান সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পাঁচ বৎসর সহকারী সম্পাদক ও

চার বৎসর সম্পাদক-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সে যুগে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামে এক মাসিক পত্র ছিল। ঐ পত্রে আমার বাংলা লেখার হাতে-খড়ি। খগেন্দ্র বাবুও ঐ পত্রিকায় স্বনামে ও বেনামে গদ্য পদ্য লিখিতেন। পরে তিনি পিরালী সম্প্রদায়ভুক্ত সমস্ত পরিবারের বংশলতা ও বিশিষ্টব্যক্তিবর্গের জীবনবৃত্ত সম্বলিত একটি বৃহৎ সামাজিক ইতিহাস রচনা করেন। আমার বন্ধু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র পিরালি কাণ্ডের সঙ্কলনে খগেন্দ্র বাবুর সংগৃহীত ঐ সকল উপাদান বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছিলেন। উহাতে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সোমেন্দ্র নাথের বিবরণ পর্যন্ত আছে। পাঠক এই গ্রন্থের 'খ' পরিশিষ্টে তাহার কতক আভাস পাইবেন। গ্রন্থকার মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের একখানি নাতিবৃহত জীবনবৃত্তও সঙ্কলন করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের 'নিবেদনে' এ গ্রন্থের জন্মকথার পাঠক পরিচয় পাইবেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে বিশ্বকবির সপ্ততি বৎসরের জয়ন্তী উপলক্ষে এ গ্রন্থের সূচনা হয় এবং অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রন্থকার 'মানুষ রবীন্দ্রনাথে'র পরিচয় দিয়া এক উৎসব সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধ নানা পাঠক গোষ্ঠীতে পঠিত হইয়া সমাদর লাভ করে। উহাই 'রবীন্দ্র কথা'র শ্রুতি স্মৃতি সাহায্যে লিখিত খসড়া। পরে ঐ খসড়া পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া এই গ্রন্থের আকারে আকারিত হইয়াছে এবং 'জয়শ্রী পাবলিসিটি কোম্পানী'র সৌজন্যে প্রকাশিত হইতেছে।

অবস্থা-বিপর্যয়ে খগেন্দ্রবাবু কলিকাতার বাস উঠাইয়া কিছুদিন হইতে চন্দননগরে বসতি করিতেছেন। একে কলিকাতা হইতে দূরাবস্থান তাহার উপর চক্ষের ছানি জন্য প্রায় দৃষ্টিহীনতা—পাঠক গ্রন্থমধ্যে যে অনেক মুদ্রাকর-প্রমাদ লক্ষ্য করিবেন, তজ্জন্য ইহারাই দায়ী। এ সম্পর্কে গ্রন্থকার 'নিবেদনে' পাঠকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন।

এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি অনেক নূতন কথা জানিয়াছি এবং যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আমি এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি এবং আশা করি, ইহার শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণ হইবে—যে সংস্করণে বর্তমান সংস্করণের ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষালিত হইবে। আমি আরও আশা করি, কোন প্রকাশকের সৌজন্যে বা ধনী ব্যক্তির সাহায্যে তাঁহার অপ্রকাশিত 'রমানাথ ঠাকুরের জীবনবৃত্ত' ও 'পিরালী সম্প্রদায়ের বংশলতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের বৃত্তান্ত' অচিরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

শ্রীশ্রীগোপালো জয়তি

নিবেদন

যখন ১৩৩৮ সালে বিশ্বকবির সত্তর বৎসরের 'জয়ন্তী' কলিকাতার নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখন সেইরূপ এক জনসভায় পাঠের জন্য এই গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের সূচনা হয়। আমি তখন জোড়াসাঁকো মদনমোহন চ্যাটার্জ্জি লেনস্থিত আমার পৈত্রিক বাস্তু ত্যাগ করিয়া রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে বাস করিতেছি। ঐ পল্লিস্থিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' নামক সমিতি তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কবি-জয়ন্তী-উৎসবে 'মানুষ রবীন্দ্রনাথের' পরিচয় দিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমিও কবির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা নিবেদনের এ সুযোগ উপেক্ষা করিলাম না। ফলে, রবীন্দ্রনাথের জীবনীর একটি খসড়া প্রবন্ধাকারে শ্রুতি-স্মৃতি সাহায্যে লিখিত হয়। লেখার পর আমার শ্রদ্ধেয় আত্মীয় ও সুহৃদ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি-এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করি ও প্রবন্ধটি দেখাই। তাঁহার নিকট যে সকল কথা পাই, তাহাও প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবিষ্ট করি। আজ তিনি পরলোকে. তাঁহার ঋণ ও আমার শ্রদ্ধা এইখানে প্রকাশ করিলাম।

শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলের গৃহে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবার্থ আহুত সভায় ঐ প্রবন্ধের বহুলাংশ পঠিত হয় এবং সময়াভাবে বাকী অংশও পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। ঐ উৎসবে পৌরোহিত্য করেন, আমার বাল্যবন্ধু প্রসিদ্ধ এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম, এল, এ, মহাশয়। উক্ত সঙ্ঘের সদস্যরা ঐ প্রবন্ধটি যে তাঁহাদের নিজ ব্যয়ে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত, প্রকাশিত ও বিতরিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, সেজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের এ উদার প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হই, কারণ তৎকালে আমি সমগ্র ঠাকুরগোষ্ঠীর একটি সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন ও প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলাম, এবং তাহারই একটি অধ্যায়স্বরূপ এ প্রবন্ধ ব্যবহার করা আমার সঙ্কল্প ছিল।

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে এই বৃহত্তর সামাজিক ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এবং ঠিক সেই কারণেই চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে কতগুলি পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহাদের শাখার বৈশিষ্ট্যে, ধর্ম্মে, আচারে ও তৎপশ্চাতে অন্তর্নিহিত

মনোভাবে যে পরিবর্ত্তন কবিগুরু সাধন করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা কিছু কিছু বলিতে বাধ্য হইয়াছি। সাধারণের ইহার সহিত কোন সংস্রব বা কৌতূহল থাকা সম্ভব নয়, বা বর্ণিত বস্তুর বিশেষত্বও কিছুই নাই। তবে একথাও এখানে বলিয়া রাখি যে, যে সংসারে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং আত্মীয়পরিজন তাঁহার অনুগত, আর যতদূর জানি, পারিবারিক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সে সকল সংস্কার আনয়নের কোনরূপ তাগিদ, প্রয়োজন বা তাঁহার কাব্যে উপন্যাসে সজ্জিত (motif) হেতুর অস্তিত্বও ছিল না, সে ক্ষেত্রে সেগুলির প্রবর্ত্তন, কেবল কবির স্বমত জ্ঞাপনের জন্য সঙ্ঘটিত হয়। ঐ সকল অনুষ্ঠানে তাঁহাদের মণ্ডলীমধ্যে কোন ক্ষোভ বা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু, বাহির সমাজের নূতন কুটুম্বদের তাহার ফলে স্ব স্ব সমাজ পরিত্যাগ করিতে হয়। কাজেই ব্রাহ্মণ সমাজের বৃহৎ ইতিহাসে এ সকল ঘটনা উহ্য রাখা চলে না। কবির আচরণে কটাক্ষ করার অপরাধ, আশা করি, পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও স্মরণ করিবেন যে, স্বীয় মত পোষণের জন্য তাঁহার জন্ম-বৎসরে তাঁহার পিতৃদেবকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ও নির্য্যাতন সহিতে হইয়াছিল, কবিকে তাহার কিছুই বা কিঞ্চিন্মাত্রও অসুবিধা বা অপমান সহ্য করিতে হয় নাই।

আমি যে সমাজে পুষ্ট হইয়াছি তাহাতে আধুনিকতার দাবী আমি করিতে পারি না, এবং এই কবির জীবন-বৃত্তান্ত কথনে রক্ষণশীল সমাজের মনোভাব হইতে তাঁহার রচনা ও কার্য্যকলাপ কিছু কিছু বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। খৃঃ ১৮৬৩ সালে 'কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের' আচার্য্য হইয়া একটি অসবর্ণ বিবাহে পৃষ্ঠপোষকতা করায়, 'ব্রহ্মানন্দ' কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষির বিরাগভাজন হন। এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত বর্ণাশ্রমবাধবর্জ্জিত ব্রাহ্মবিবাহ আইনের খসড়ার যে প্রতিবাদ মহর্ষি করেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কল্পনায় আনিতে পারিবেন না যে, দেশপূজ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের কিশোরকালে কিরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে তাহার সহিত মিলিত ছিলেন, ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' নিয়মিত লেখক ও প্রবন্ধ পরীক্ষক রূপে কার্য্য করেন। ঐ পত্রিকায় তাঁহার একটি বিধবাবিবাহসমর্থক প্রস্তাব বাহির হওয়ায়, মহর্ষি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তদবধি বিদ্যাসাগর মহাশয় আর 'তত্ত্ববোধিনী'তে লিখিতেন না ও উহার সংস্রবও ত্যাগ করেন; মহর্ষির কখনও মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। বিদ্যাসাগর বা কেশবচন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথকে সমাজ সংস্কারক বলা চলে না। সমাজে ঐ সকল বিধি প্রচলনের জন্য তিনি তাঁহাদের ন্যায় অগ্রণী হইয়া কোন আন্দোলন করেন নাই, এবং স্বমতে কার্য্য করার জন্য তাঁহাকে যেরূপ

আন্দোলনকারী ধরিলে তাঁহাকে ভুল বোঝা হইবে। তিনি অন্য হিসাবে, ও প্রকারান্তরে সমাজসংস্কার সাধনে আজীবন ব্রতী ছিলেন। তাঁহার অনুমোদিত, প্রবর্ত্তিত বা উপস্থিতির দ্বারা সমর্থিত, প্রচলিত-বিধি-বহির্ভূত কার্য্যগুলিতে সংস্কারকের কোনরূপ glamour, heroism, sacrifice বা martyrdom ছিল না। সে সকলই তাঁহার Individualism-প্রসূত, ধরিতে হইবে।

নানা দুর্দ্দৈববশতঃ এ দীর্ঘ দশ বৎসরেও ঐ গোষ্ঠী-বিবরণ প্রকাশিত করিবার সুযোগ পাইলাম না। দেখিয়া যাইতে পারিব কি না শ্রীভগবানই জানেন! ঠাকুরগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বংশাবলী ও বিবরণ, যাহা নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আরম্ভ করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ করিবার জন্য আমার পরম আত্মীয় প্রফুল্লনাথ ঠাকুর (পরে রাজা ও এক্ষণে পরলোকে) বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমাকে অশেষ ভাবে আমার দুর্দিনের দুর্যোগের দিনে তিনি উৎসাহিত ও সাহায্য করেন। তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়। আমার অত্যন্ত আক্ষেপ যে, শারীরিক অসুস্থতা ও দীর্ঘ প্রবাসের ফলে তাঁহার বিশেষ অনুরাগের এই কবিকুল-চূড়ামণির জীবন-কথা শ্রবণ করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহাকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হয়। তাঁহার পত্নী কল্যাণীয়া অমিয়াবালা (পরে রাণী) কবির জীবনের কিছু কিছু কথা শুনিয়া আমায় তৃপ্তি দান করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারও সম্পূর্ণ গ্রন্থ বা ছাপার অক্ষরে পুস্তকাকারে ইহা দেখিবার সুযোগ হইল না, ইহা কম পরিতাপের বিষয় নয়। অমিয়াবালা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্যালিকা হইতেন ও তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। উভয়ের দীর্ঘকালব্যাপী পীড়া ও অকাল বিয়োগ এ পুস্তক প্রকাশের একটি প্রধান বাধা।

[illegible] অধ্যায়টি একাধিক রসজ্ঞের আগ্রহে কলিকাতায় ও [illegible] ও [illegible]প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক- [illegible] অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়া [illegible] তাঁহাদের তৃপ্তিলাভে আমার পরম সন্তোষ তো হাতে হাতে [illegible] জন্য আমি যে কৃতজ্ঞ, এ কথাটাও এক্ষেত্রে [illegible]।

[illegible] শ্রীমান [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহাদের জনকয়েক বন্ধু, ১৩৩৮ সনে কবিবরের [illegible] "[illegible]"-উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা, সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবী, কল্যাণীয় শ্রীমান অমল হোমের কলিকাতাস্থ গৃহে আহুত এক সান্ধ্যবৈঠকে আগ্রহ ও ধৈর্য্য

সহকারে এই জীবন-কথার কতকাংশ শ্রবণ করিয়া, প্রকাশের জন্য যে অনুরোধ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমি তাঁহাদের সকলের নিকট এবং অন্যান্য শ্রোতাদের নিকট কৃতজ্ঞ। আমার লেখায় তখন অনেকেই নূতন কথা পাইয়াছিলেন। তাহার পরে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নিজ জীবনের প্রকাশযোগ্য সকল কথাই একে একে নানা প্রকারে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। তবে অনেক জিনিষ তাঁহার দৃষ্টি-ভঙ্গীতে প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এখানে সকলেই তাঁর সহিত একমত হইবেন না। সে কারণে, আমার গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ প্রকাশের অবকাশ ও প্রয়োজন যে আজও আছে এ আমি মনে করি। পাঠকবর্গের সকল প্রকার অনুসন্ধিৎসার উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। যেখানে স্নিগ্ধ অন্ধকারেই শ্রী, সেখানে প্রচণ্ড সার্চ্চলাইটের তীব্র আলো শ্রী ও হ্রী উভয়কেই নষ্ট করে।

গত বৎসরে আমার ভাগিনেয় পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান মাধবলাল ঘোষাল ও জয়শ্রী পাবলিসিটির কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজন মত পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে রবীন্দ্রনাথের জীবনী-অংশটি প্রকাশ করিবার জন্য অনুপেক্ষণীয় অনুরোধ জানাইলেন। তখন আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। ছানির জন্য অস্ত্রোপচারের পর, ও লেখাপড়ার দীর্ঘ অনভ্যাস আমাকে নিতান্ত পরমুখাপেক্ষী করিয়াছে। তখন আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান গুরুদাস এ বিষয়ে উৎসাহী হইয়া আমার সহিত ইহা পুনরালোচনা করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার একনিষ্ঠ অধ্যবসায়, ভগ্নস্বাস্থ্যে অমানুষিক পরিশ্রম, সর্ব্বোপরি সাহিত্যিক পারদর্শিতা এবং মুদ্রাঙ্কনের আরম্ভ হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত অকুণ্ঠিত ভাবে সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এ বইখানিকে বর্ত্তমান রূপে প্রকাশকের হাতে সমর্পণ করা আদৌ সম্ভবপর হইত না। সে হিসাবে, তাঁহাকে এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

আমার পৌত্রীপতি স্নেহভাজন শ্রীমান করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিশেখর [illegible] কতকগুলি উদ্ধৃতির পাঠ মিলাইয়া এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার কোন কোন অংশের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমার শ্রমভার লাঘব করিয়াছেন। পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান শীতলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও স্নেহপাত্রী ভ্রাতুষ্পুত্রী [illegible] শ্রীমতী সরস্বতী দাসগুপ্তা লিখিত অংশ পাঠ করিয়া শুনাইয়া ও বক্তব্য অংশের শ্রুতিলিখন দ্বারা আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহাও সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। আমার গৃহদেবতা শ্রীশ্রীগোপাল জীউর নিকট প্রার্থনা করি যেন তাঁহার কৃপায় ইহাদের সকলের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়।

সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন ব্যাপারে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়া, আমার আত্মীয় শ্রীমান নিরঞ্জন রায়চৌধুরী, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, বি, এ, কবিভূষণ, স্নেহভাজন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চির অনুরক্ত সুহৃদ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (অধুনা পরলোকগত) যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া এই অবসরে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলাম।

যে সকল পুস্তকাদির সাহায্য লইয়াছি তাহার উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে সাধ্যমত করিয়াছি। যদি কিছু অনুল্লিখিত থাকে ত সেটা বিস্মৃতির ফল। ঐ সকল উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত গ্রন্থকর্ত্তা ও প্রবন্ধকারদের নিকট আমার ঋণ অকপটে স্বীকার করিতেছি ও তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। এ ছাড়া, 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'ভারতবর্ষ' ও অধুনালুপ্ত 'তত্ত্ববোধিনী', 'ভারতী', 'গৃহস্থ' ও 'বিচিত্রা' প্রভৃতি সাময়িক পত্র ও পত্রিকা হইতে যে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। উক্ত পত্রিকাগুলির কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আশা করি, উদ্ধৃতিগুলি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। কবিবরের পুস্তক ও রচনা ও বক্তৃতাবলী এক্ষণে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, সুতরাং উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট Formal অনুমতি লওয়ার সময় না থাকায়, এবং সর্ব্বোপরি কবি-জীবনের তাহা অংশবিশেষ মনে করিয়া বহুল পরিমাণে এ পুস্তকে অসঙ্কোচে ব্যবহার করিয়াছি। ইহা বিবেচনা করিয়া আশা করি যে, তাঁহারা অপহরণের অপরাধ লইবেন না।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গুরুব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য বি, এ, জ্যোতিষার্ণব মহাশয় আমার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের কোষ্ঠী-বিচার লিখিয়া এবং চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফটিকলাল দাশ মহাশয় বি, এ, রাজারাণীতে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকা করিয়া ও কতকগুলি সংস্কৃত উদ্ধৃতি মিলাইয়া দিয়া আমাকে ঋণ-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পরম স্নেহভাজন আত্মীয় শ্রীমান প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর ও কল্যাণাস্পদ শ্রীমান অমল হোম এ পুস্তক প্রকাশে আমাকে বিবিধ সাহায্য করায় তাঁহাদের জন্য আমার সর্ব্বান্তঃকরণের শুভকামনা জানাইতেছি।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি যে, শ্রীমান অমল হোম সম্পাদিত, "ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট"এর অপূর্ব্ব 'রবীন্দ্র-জন্মদিন-সংখ্যা' (১৭ই মে, ১৯৪১) এবং 'রবীন্দ্র-স্মৃতি-সংখ্যা' (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) হইতে এই পুস্তকের বিবিধ তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহে অপরিসীম সাহায্যলাভ ব্যতিরেকে এই জীবন-কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া

যাইত। বিচিত্র রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ "ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট"-এর এই দুই সংখ্যা প্রত্যেক রবীন্দ্র-অনুরাগীর অবশ্য পাঠ্য। বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের তাড়নায় কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা সকলেই অনুভব করিতেছে। এই সঙ্কট-কালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ কাগজ-ব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত বিভূতি ভূষণ দত্ত নবীন প্রকাশককে এই পুস্তকের কাগজ সরবরাহ করিয়াছেন। এজন্য আমরা উভয়েই কৃতজ্ঞ।

যাঁহারা এই পুস্তককে সুশোভিত করিতে ছবি ও ব্লক দানে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সৌজন্যের নিমিত্ত চিরবাধিত রহিলাম। ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম, আমার পরম স্নেহের নাতি মহারাজকুমার প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর। তাঁহাদের রক্ষিত বিখ্যাত চিত্রাবলীর মধ্য হইতে প্রথম বাঙালী ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহনের ছবিখানি পুস্তকোপযোগী আকারে আনিয়া আমায় উপহার দেন। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার, পূজনীয়া শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী ও সোদরপ্রতিম শ্রীমান অমল হোম কবিবরের কয়েকখানি চিত্র দিয়া আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত।

পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণের পর প্রকাশকদের তাগিদ আসিয়া পড়ে, তাহাতে পুনরালোচনার অবসর বা অবকাশ আমার ছিল না। কাজেই, সকল ভার, এমন কি কাগজের দুর্মূল্যতা বশত সংক্ষেপ করিবার অধিকার পর্য্যন্ত, আমি তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত করি। আমার চোখের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রুফসংশোধন অসম্ভব। যদিও অনেক সুহৃদ এ কার্য্যের ভার সহৃদয়তার সহিত লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কাজের ত্বরা ও তাঁহাদের কাজের মধ্যে অযথা চাপ পড়িবে ভাবিয়া, আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ফলে ভ্রম প্রমাদ কিছু কিছু রহিয়া গেল, ছাপা নির্ভুল হইল না। কতকগুলির জন্য একটি সংশোধিনা দিলাম; বাহুল্য ভয়ে, যেখানে অর্থ অনায়াসে বুঝা যায়, সে সকল শব্দের বানান সংশোধনে হস্তক্ষেপ করিলাম না; সহৃদয় পাঠকপাঠিকাদের উহা করিয়া লইতে হইবে। তাঁহারা সকল ত্রুটি মার্জনা করিবেন ভরসা করি।

কলিকাতার 'অন্নদা প্রেসে'র সুযোগ্য পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীমান প্রভাতচন্দ্র বসুর বিশেষ চেষ্টা ব্যতিরেকে আজ আপনাদের সমক্ষে এই পুস্তক কিছুতেই উপস্থিত করিতে পারিতাম না। আমার দৃষ্টিহীনতা ও দূরে অবস্থানের প্রতি তিনি দয়াপরবশ হইয়া কাপিমেলান ও প্রুফদেখার কাজটা নিজেই বহন করিয়া আমার ও আমার ভ্রাতার কষ্ট

মনোমত মুদ্রাঙ্কন ও ভ্রমশূন্য ছাপা বাহির করিতে বাধাপ্রাপ্ত হন। তিনি এজন্য কতকটা মনঃক্ষোভ পাইলেন, আর 'পরাপরাধে পরাপমান' তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল, যেমন সীতাহরণে সিন্ধুর বন্ধন। শুধু শ্রম নয়, আমার জন্য কিঞ্চিত অপযশেরও তিনি ভাগী হইয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে আমি তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করি—ভগবান যেন তাঁহাকে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি দান করেন।

একটা কথা বলিয়া রাখি যে, পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়স্ক উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জন্য আমার এ উদ্যম নয়, তাঁহাদের নিকট ইহার অনেক কিছুই পুনরুক্তি মাত্র। রবীন্দ্র-সাহিত্য বিপুল ও বিস্তৃত, তাহা অভিনিবেশ সহকারে যাঁহারা পাঠে অভিলাষী তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে রবীন্দ্র-জীবন চরিতও একটি প্রণিধানযোগ্য মহাকাব্য। সে মহাকাব্য পাঠে, বিশ্বমানবের বিস্তৃত ভূমিতে যিনি অপূর্ব্ব দেশাত্মবোধের বিলাস ফুটাইতে পারিয়াছিলেন,—দেশের শিল্প, সঙ্গীত, ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, বেশভূষা, আচার ব্যবহারের পারিপাট্য আনয়নে যিনি সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন ও পরিপূর্ণ করিয়া গড়িয়া গিয়াছেন, অথচ নদী যেমন সংসারের বিচিত্র প্রয়োজন সারিয়া সাগরাভিমুখী গমন করে, তাঁহারও সেই ব্রহ্মসমুদ্রের প্রতি অন্তরের টান ও পথ-যাত্রার ইতিহাস যাহা তাঁহার নিমগ্ন নির্বিষ্টতার অঙ্গস্বরূপ ছিল, যদি কিঞ্চিন্মাত্রও দেশের আশাভরসাস্থল তরুণদের মনে এ অঙ্কন প্রয়াসে জাগাইতে পারি বা তাঁহারা স্ব স্ব জীবনগঠনের পাথেয় কিছু আলোচিত আদর্শ জীবনী হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন তো আমার এ প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

আর একটা কথা এখানে আমার জানাইয়া রাখা আবশ্যক। আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকেই আশা করেন, কবির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত যতটা না হউক আমার প্রতি স্নেহবশতঃ যে, যদি আমার কোন পুস্তক ছাপাখানার কল্যাণে সুখপাঠ্য অবস্থায় বাহিরালোকে প্রকাশমান হয় ত তাঁহারা যেন নমুনা স্বরূপ একখণ্ড 'কম্প্লিমেণ্টারী' কাপি উপহার পান। তাঁহাদের আশাটা নিতান্ত অসঙ্গত নয়, এবং পারিলে পূরণ করা আমারও সুখের কর্ত্তব্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তা করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়, [illegible] আমি দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করি। তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, বিশ্বের বর্ত্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থা ও সংগ্রাম-নিরত সভ্যতার ফলে দারুণ অনটনের কথা। বর্ত্তমানে কাগজ ও ছাপাখানার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতায়, প্রকাশককে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। বিনামূল্যে পুস্তক লাভের আশা যাঁরা করেন, তাঁহারা যেন নিজ গুণে আমার অপারগতা ক্ষমা করেন। যাঁহারা এক খণ্ড পুস্তক ক্রয় করিয়া

প্রকাশকের ক্ষতি লাঘব করিবেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা আমারই পরমোপকারী বন্ধুর কার্য্য করিবেন। তজ্জন্য আমি পূর্ব্বাহ্ণেই তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি ও আজীবন সে উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ বোধ করিব।

পরিশেষে এই নিবেদন যে, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্‌বর পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস্ মহোদয় ভগ্নস্বাস্থ্য ও স্বল্পাবসর হইয়াও এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া অপরিশোধ্য ঋণে আমাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই অবদান আমি প্রীতির মহাদান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। দাতা শতং জীবতু। ইতি—

চ্যাটার্জ্জি হাউস্। চক্ (নসিরাবাদ)
ফরাসডাঙ্গা চন্দননগর
২৫শে ভাদ্র ১৩৪৮

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ—	
জন্ম ও আবেষ্টনী	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—	
রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল, শিক্ষা ও প্রতিভার বিকাশ ...	১৬১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—	
যুবক রবীন্দ্রনাথ	১৮৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ—	
সঙ্গীতালোচনা	২১২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—	
গার্হস্থ্য জীবন	২৫৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—	
শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ	২৭৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ	
জমিদার রবীন্দ্রনাথ	২৮৪
অষ্টম পরিচ্ছেদ—	
ব্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথ	২৯৫
নবম পরিচ্ছেদ—	
সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ	৩০০
দশম পরিচ্ছেদ—	
বিদেশে রবীন্দ্রনাথ	৩১৫
একাদশ পরিচ্ছেদ—	
কবির রচনা	৩২২
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—	
বিবিধ প্রসঙ্গ	৩৪৫

বিষয়				পৃষ্ঠা
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—				
দেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ	…	…	…	৩৫৮
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—				
আচার ও ধর্ম্মে রবীন্দ্রনাথ	…	…	…	৩৭২
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—				
রবীন্দ্র জয়ন্তী	…	…	…	৩৯৮
ষোড়শ পরিচ্ছেদ—				
সাহিত্যব্রতীদের সেবায় রবীন্দ্রনাথ		…	…	৪০৩
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—				
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব	…	…	…	৪২৫
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—				
সমাবর্ত্তন ও দীপাচ্ছাদন	…	..	…	৪৩০

রবীন্দ্র কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথের জন্ম

ও

আবেষ্টনী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অষ্টম। সন ১২৪০ সালের ফাল্গুন (ইং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী) মাসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যশোহরের অধুনা খুলনা জেলার অন্তর্গত দক্ষিণডিহি গ্রামের রামনারায়ণ রায়চৌধুরীর কন্যা শাকম্ভরী বা সারদাদেবীকে বিবাহ করেন। এই সারদা দেবী রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার ভ্রাতাভগিনীগণের জননী। ১১৮১ সালে ইনি কালগ্রাসে পতিত হন। আট বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় এবং মাত্র বার বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম সন্তান একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহার দশটি পুত্র ও সৌদামিনী দেবী প্রভৃতি ছয়টি কন্যা হয়, তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের চতুর্দ্দশ সন্তান। তিনি ১২৬৮ সালে ২৫শে বৈশাখ সোমবার ইং ৭ই মে ১৮৬১ খৃঃ মঙ্গলবার কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম সাধারণতঃ ৬ই মে সোমবার ধরা হয়। কিন্তু তাঁহার জন্ম হয় রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, সুতরাং ৭ই মে মঙ্গলবার

হইবে। যাঁহারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী তাঁহাদের স্বাভাবতঃ কৌতূহল হইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের মত একজন বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি বাঙ্গালী সম্বন্ধে ফলিত জ্যোতিষ কি বলে। কবি নিজেও একদিন উৎসাহী হইয়া এই বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহিত্যপথে অগ্রগামী ৺বঙ্কিমচন্দ্র কতকটা আলোচনার ফলে ঐ শাস্ত্রে আস্থাবান হইয়াছিলেন। অতএব আমরা সেই কুতূহলী পাঠকদের জন্য কবির জন্মকুণ্ডলী সংগ্রহ করিয়া বিচারসহ ('ক') পরিশিষ্টে দিলাম।

এই বংশের সূত্রপাত হইতে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথের বিবরণ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস পরলোকগত প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ও ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক প্রণীত বঙ্গের 'জাতীয় ইতিহাস' তৃতীয় ভাগ ব্রাহ্মণ কাণ্ডের ষষ্ঠ অংশে ১ম ভাগ ১১শ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন বোধে রবীন্দ্রনাথের অর্থাৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের খ্যাতনামা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের বিবরণ হইতে এই গ্রন্থারম্ভ করিলাম।

সে হিসাবে এই পুস্তক উক্ত বসু মহাশয়ের সর্ব্বজন-বিদিত গ্রন্থের পরবর্ত্তী খণ্ড বলিয়া পাঠকগণ গ্রহণ করিবেন, তবে পাঠকবর্গের সুবিধার্থে ঠাকুর পরিবারের একটি সংক্ষিপ্ত কুলপরিচয় ও বংশলতা (খ) পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখিতে আমরা কবির নিজের রচনাই প্রধানতঃ অবলম্বনরূপে ব্যবহার করিয়াছি। ইংরাজি ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাদি ও তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদেশীয় ও দেশীয় গ্রন্থাদি ও সাময়িক পত্রের মতামত এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সামাজিক কথার অনুপযোগী বিধায় তাহা হইতে কোন সাহায্য বা আলোচনা আমরা পরিহার করিয়াছি।

এইখানে একটি কথা উল্লেখ করা বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন চরিত' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ,

১১৩ পৃষ্ঠায় এই পারিবারিক প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে মহর্ষি তাঁহার পত্নীবিয়োগ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, তাঁহার বিবাহকালে নব বধূর বয়স ছয় বৎসর ছিল। অল্প বয়সে পরিণয় হইলেও বয়স সম্বন্ধে কিছু ভুল আছে। আমাদের বাল্যকালে মহর্ষির পিসতুত ভগ্নী ৺কালিদাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহার সমবয়সী ছিলেন এবং তাঁহার নিজের বিবাহ মহর্ষির বিবাহের এক বৎসর পরে হয়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর। বিবাহ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার মাতামহ ৺রামমণি ঠাকুরের পরিবারভুক্ত হইয়া মহর্ষির সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতেন। সুতরাং রবীন্দ্র-জননীর বিবাহ-কালীন বয়স আট বৎসর ধরিতে হইবে। মহর্ষির বয়স তখন সতের। তিনি আরও বলিতেন, সেকালে নিয়ম ছিল যে, প্রায় সকল বধূই যশোহর হইতে আনীত হইতেন এবং যশোহরস্থ কুটুম্বেরা গৌরীদানের ফললাভ আকাঙ্খায় সমধিক ব্যস্ত থাকিতেন; কন্যাকে গৃহস্থালী ভালরূপ শিখান হইবে বলিয়া কলিকাতাস্থ বাবুরাও অল্প বয়সের মেয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। সাড়ে নয় বৎসরও তাঁহাদের বেশী বোধ হইত।

শাস্ত্রের বচন :—

"অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী, নববর্ষেচ রোহিনী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা, তদূর্দ্ধ্বন্তু রজস্বলা॥"

রজস্বলা প্রকৃত প্রস্তাবে হউক বা না হউক, সে কন্যা গ্রহণে শ্বশুর-কুল পতিত হয় এরূপ ধারণাও বলবতী ছিল। সুতরাং দশ উত্তীর্ণ হইলেই তখনকার দিনে কন্যা অরক্ষণীয়া বলিয়া গণ্য হইত ও পিতামাতা বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন। সামাজিক অনুশাসনে কোন অভিভাবকই দশের অধিকবয়স্কা কন্যাকে অনূঢ়া রাখিতে সাহসী হইতেন না। যৎপরোনাস্তি উদ্যোগ করিয়া তৎপূর্ব্বেই শুভকার্য্য সমাধা করিতেন। এবং প্রায়ই অষ্টম বর্ষ হইতেই কন্যার বিবাহের জন্য সচেষ্ট হইতেন। মহর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ৺ত্রিপুরা-

সুন্দরী দেবী বহুকাল জীবিত ছিলেন ও তাঁহাদের সকলেরই প্রায় আট বৎসর বয়সে যশোহর হইতে বিবাহার্থে কলিকাতায় আগমনের কথা তিনি বলিতেন।

তিনি শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার বড় জা-এর আট হইতে নয় বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়াছিল। আমাদের প্রপিতামহ ৺মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের খরচের খাতা-ও ইহার পোষকতা করে। তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ 'মহর্ষির আত্মজীবনীতে' আছে। মদনমোহন তাঁহার মেজ পিসির জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তাঁহার অপেক্ষা বার বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; ইনি মাতামহ ৺রামমণি ঠাকুরের পরিবারভুক্ত হইয়া ঐ বাটিতে বাস করিতেন। পরে স্বোপার্জ্জনে মাতুলালয়ের নিকট স্বতন্ত্র বাটি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। তিনি নিজের উপার্জ্জনের যে স্বতন্ত্র হিসাব রাখিতেন তাহাতে দেখা যায় লৌকিকতা হিসাবে মাতাঠাকুরাণীকে দেবেন্দ্রের বধুকে আশীর্ব্বাদের যৌতুক দেন (২৪ শে ফাল্গুন ১২৪০ ইং ১৮৩৪) ও পরে ৫ই আষাঢ় ১২৪২ (ইং ১৮৩৫ ২৯শে জুন) দেবেন্দ্রের বধূর গর্ভাধান উৎসবে আশীর্ব্বাদী দেওয়া হয় এবং তাহার পরে ৫ই আশ্বিন ১২৪৫ (ইং ১৮৩৮ সেপ্টেম্বর) দেবেন্দ্রের বধূর সাধের জন্য মিঠাই খরিদ হয়। নয়মাসে সাধ দেওয়া ঠাকুরবংশের কুলপ্রথা। ইহার দুই মাসের মধ্যে সারদাদেবীর প্রথম সন্তানের (কন্যার) জন্ম হয়। তাহার পরেই ২৭শে চৈত্র ১২৪৬ (ইং ৮ই এপ্রিল ১৮৪০) বুধবারে সারদাদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

যদি মহর্ষির পত্নীর পরিণয়কালীন বয়স আট ধরা যায়, এই ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, নতুবা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উক্তির ফলে অষ্টমবর্ষের পূর্ব্বেই সারদাদেবীর যৌবন বিকাশ ও একাদশের পূর্ব্বেই সন্তানলাভ ধরিতে হয়—যাহা ধাত্রীবিদ্যানুসারে সম্ভবপর নয়। কিশোরবয়সে যখন স্ত্রীকে বাল্যখেলার সাথীরূপে পাওয়া যাইত, যৌবন-উষারাগে রঞ্জিত প্রেয়সীরূপে নয়, তাহারই আনন্দস্মৃতি মৃতদার ব্যক্তির

বার্দ্ধক্যে কি অপূর্ব্ব কারুণ্যমিশ্রিত হইয়া দেখা দেয় মহর্ষিদেবের এই উক্তি তাহার নিদর্শন। তাহাতে সেই অনাবিল শৈশবের দুই বৎসরের প্রভেদ তাঁহার হয়তো লক্ষ্য হয় নাই এবং এই কারণে তাঁহার এই উক্তিকে নির্ভুল ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং পূজনীয়া সারদাদেবীর ৩৫ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়, তখন মহর্ষির বয়স ৪৪ বৎসর। তাঁহাদের প্রথম পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে মাতার বয়স ১৪ ও পিতার বয়স ২৩ মাত্র। যাঁহারা অবসর পাইলেই বাল্যবিবাহ প্রভৃতি হিন্দুপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন তাঁহারা দেখিবেন যে মহর্ষির পুত্রকন্যাগণ কি দৈহিক স্বাস্থ্যে ও কি মানসিক প্রতিভায় তাঁহাদের মতবাদের মূর্ত্ত প্রতিবাদরূপে আজীবন বর্ত্তমান ছিলেন।

১৮৫৬ হইতে ১৮৬৫ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসর একটা যুগসন্ধি বলিলে অন্যায় হয় না। নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশে, হিন্দু-সমাজে এবং বাংলাসাহিত্যে যে সকল পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, ঠাকুর-পরিবারের চিন্তাধারার ও জীবনযাত্রার উপরেও তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মাব্দ ইং ১৮৬১ সাল বাংলাদেশে, বাংলাসাহিত্যে ও ঠাকুরপরিবারে একটি স্মরণীয় বৎসর। এ বৎসর বাংলা-সাহিত্যে নবযুগের অবতারণাকে বাংলার গুণিসম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে বরণ করিয়া লন। জোড়াসাঁকোতে ঠাকুরবাবুদের বাটির পার্শ্ববর্ত্তী সিংহবাবুদের বাটিতে বিদ্যোৎসাহিনী সভার উদ্যোগে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বঙ্গভারতীর পূজারিবৃন্দ বঙ্গসাহিত্যে ভিক্টোরিয়ান যুগের অভ্যুদয়ের অগ্রদূত মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা কাব্যে নবধারা অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রকরণ আনয়নের জন্য প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেন। পূর্ব্ব বৎসর ১৮৬০ খৃঃ 'নিলকর-বিষধর-দংশন-ক্লাতর প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিত পথিকের' হৃদয়ক্রন্দন সুকুমার সাহিত্যের মধ্য দিয়া ঢাকায় রামচন্দ্র ভৌমিকের দ্বারা প্রকাশিত হইল। 'রচয়িতার

নাম না থাকিলেও নীলদর্পণখানির সাহিত্যিক মূল্য ব্যতীত আর একটা বিশেষ মূল্য আছে। নীলকরের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ইহা সহায়তা করিয়াছিল এবং সে হিসাবে ইহা ইংরাজি সাহিত্যে দাসপ্রথার বিরোধী আন্দোলনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'টমকাকার কুটির' (Uncle Tom's Cabin) এর সহিত সর্ব্বথা তুলনীয়। পরে প্রকাশ পায় পোষ্টাল বিভাগের পরিদর্শক বঙ্কিমচন্দ্রের 'অভিন্ন সুহৃদ'—সুকবি দীনবন্ধু মিত্র, যিনি পরে একজন সুদক্ষ নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হন, এই পুস্তকের জনক। কিন্তু ইহার অনুবাদ করিয়া পাদরি লং সাহেব স্বজাতির বিরাগভাজন হন ও তাহার ফলস্বরূপ ইংরাজের উচ্চতম আদালত-কর্ত্তৃক ইংরাজ-সম্প্রদায়ের কুৎসা প্রচারের জন্য হাজার টাকা অর্থদণ্ডে ও একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মহাপ্রাণ কালীপ্রসন্ন সিংহ তদ্দণ্ডেই আদালতে ঐ টাকা দাখিল করিয়া দিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেন। কেহ কেহ বলেন যে লং সাহেবের নাম থাকিলেও ঐ গ্রন্থের প্রকৃত অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কিন্তু লং সাহেব সে কথা অপ্রকাশ রাখিয়া নিজ স্কন্ধে উহার দায়িত্ব বহন করেন।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার মরড্যাণ্ট ওয়েল্স বিচারাসন হইতে বাঙ্গালী জাতির প্রতি যে সকল কটূক্তি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন, বাঙ্গালী তাহা নতমস্তকে সহ্য করিয়া লয় নাই। বিচারকের এই সকল কটূক্তির প্রতিবাদের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে মহর্ষি), যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর (পরে মহারাজা বাহাদুর), বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কলিকাতার নেতৃবৃন্দ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে অগ্রণী করিয়া শোভাবাজারের রাজবাটির প্রাঙ্গনে এক বিরাট জনসভা করেন। এই জনসভায় বাঙ্গালীর সচেতন আত্মসম্মানবোধের প্রমাণ পাইয়া, আমরা হুতুমী ভাষায় বলি, "নাটমন্দিরস্থ পাথরের গরুড়েরাও ডানা মেলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।" ফলে, টেকচাঁদের পিসির মুষ্টিযোগ "নারকেল মুড়ি ও ঠন্ঠনের নিমকির" প্রয়োগ না করিয়াও ওয়েল্সের

মুখরোগ সারিয়া গেল। "ওয়েল্‌স্‌ ব্রেক হইলেন।" ইহার কিছু পরে (১৮৬২ খৃঃ) জোড়াসাঁকোর সিংহবাবুদের বাটিতে হুতুম প্যাঁচা-র আবির্ভাব হয়। বস্তুত কালীপ্রসন্ন সিংহ এই নামে "বেওয়ারিস লুচির ময়দা" বাংলা ভাষায় ঘরোয়া কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে তদানীন্তন কলিকাতার সমাজের কতকগুলি নক্সা আঁকিয়া **এই এক নতুন** বলিয়া বাংলার রস-পিপাসুদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা যেমন অভূতপূর্ব্ব তেমনই আজ পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অতুলনীয় হইয়া আছে।

বাঙালী এই সময়ে আর একটি ঘটনায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রচার করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ভারতের সিপাহী-বিদ্রোহের ঘোর দুর্দ্দিনে কলিকাতার ইংরাজেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কলিকাতায় মার্শ্যাল ল' প্রচারের জন্য বড়লাট ক্যানিং-এর নিকট বারংবার জেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু লর্ড ক্যানিং, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্‌ এসোসিয়েসনের নেতৃবৃন্দের পরামর্শে ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বে কিছুতেই মার্শ্যাল ল' প্রচারের সম্মতি দিলেন না। ইংরাজসম্প্রদায় বিদ্রূপ করিয়া লর্ড ক্যানিং-এর নাম দিলেন 'দয়ার অবতার' (Clemency Canning) এবং তাঁহার বিদায়কালে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে অসম্মত হইলেন। বাঙ্গালী-নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ১৮৬২ সালে একটি সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন, এবং তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৮৬১ খৃঃ লেডী ক্যানিং-এর মৃত্যু হওয়ায় বাঙালী জাতির প্রতি তাঁহার সহৃদয়তা ও সহানুভূতির কথা চিরদিন জাগরূক রাখিবার জন্য বাঙালী তাহার দৈনন্দিন গৃহস্থালীর মধ্যে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিল। চিরপ্রচলিত ছানাবড়া পরিবর্ত্তিত আকারে লেডীক্যানিং নামে মিষ্টান্ন সমাজে স্থান পাইল। এবং তাহাই অধুনা লেডীকেনি নামে বাংলার সহরে ও পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্র পরিচিত।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হইল, ভারতবর্ষ কুইন-ভিক্টোরিয়ার খাস রাজত্বের অংশীভূত হইল। বড়লাটসাহেব সেই হইতে বড়লাট (Governor General) ও রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) হইয়া সমগ্র ভারতের শাসন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাজধানী কলিকাতায় বসিয়া করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় এবং রেলপথের ও টেলীগ্রাফের বিস্তারে, কারণ ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় মোটে আসানসোল পর্য্যন্ত রেলপথ হইয়াছিল, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রকৃষ্ট যোগ হওয়ায় দূরত্ব-ব্যবধান, বহুসময়ক্ষেপ এবং গমনাগমনের ঘোরতর বাধা অপসারিত হওয়ায় প্রদেশগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধের সঞ্চার হয়। তখন কলিকাতা হইতে হাওড়ায় নৌকায় পারাপার হইত। বহু বৎসর পরে ১৮৭৩ খৃঃ স্যার ব্রাড্‌ফোর্ড লেসলী ভাসমান হাওড়াপোল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যোগসাধন করেন। এই বৎসর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্যের জন্য কলিকাতার নেতৃবৃন্দ টাউনহলে সভা করিয়া অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সাহায্যদানে সফলকাম হইলেন।

১৮৫৪ সালে লর্ড ড্যালহাউসীর প্রস্তাবে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা (Lieutenant Governor) নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাকে ছোটলাট বলা হইত এবং গবর্ণর জেনারাল সেই সময় হইতে বড়লাট হইলেন। স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাংলার প্রথম ছোটলাট। ইহার পূর্ব্বে বাংলা বিহার উড়িষ্যা সংক্রান্ত সমস্ত রাজকীয় কার্য্য গবর্ণর জেনারালের তত্ত্বাবধানে নিজস্ব বিভাগে সম্পাদিত হইত; একজন ডেপুটিগবর্ণর তাঁহার উপদেশ মত তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতেন। লর্ড ড্যালহাউসী দেখিলেন যে এই প্রদেশে সর্ব্ববিধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে না। একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা যে ভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশের শাসন সংরক্ষণের শৃঙ্খলা ও সর্ব্ববিধ উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন তাহা অল্প-অবসর গবর্ণর জেনারালের

পক্ষে সম্ভবপর নহে। তিনি বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এ বিষয়ে সমস্ত অবস্থা বিশদ ভাবে জানাইলেন। তাহার ফলে ১৮৫৩ সালে চার্টার রিনিউ-এর সময় তাঁহার প্রস্তাবিত ছোটলাট নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইল এবং স্থির হইল যে তিনি স্বতন্ত্রভাবে নিজের দায়িত্বে কার্য্য করিতে পারিবেন, কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয় বড় লাটের অনুমোদন-সাপেক্ষ রহিল।

১৮২৯ সালে সদ্য-বিধবার মৃত্যুনিবারণের জন্য রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারিকানাথ ঠাকুরের আপ্রাণ চেষ্টায় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক আইন করিয়া সতীদাহপ্রথা রহিত করেন। প্রায় ২০।২২ বৎসর পরে বিধবার দুঃখময় জীবন, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিশেষ ব্যথিত করে। তিনি বিধবার পুনর্বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ করিলেন ও ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না ইহা শাস্ত্রীয় বচনে প্রমাণ করিলেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ কয়েকজন দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষকতা করেন। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট বিধবাবিবাহ আইন প্রচারে ঘোষণা করিলেন যে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ করিলে সে বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে কিন্তু তাহার পূর্ব্ব স্বামীর সম্পত্তিতে কোনরূপ দাবীদাওয়া থাকিবে না। ১৮৫৬ সালে (Hindu Widow Remarriage Act) আইন প্রচারিত হইলেও ইহা সমাজে তাদৃশ প্রসার লাভ করে নাই। আজিও ইহা নিয়ম না হইয়া ব্যতিক্রম মাত্র হইয়া আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত দ্বিতীয় সমাজসংস্কারের আন্দোলন বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে কোনরূপ আইন করা গবর্ণমেণ্ট আবশ্যক বোধ করিলেন না। সামাজিকদের মনঃপূত হওয়ায় এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও অর্থের অসচ্ছলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহা আপনা হইতে রহিত হইয়া গিয়াছে।

এই সময়ে কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি পড়ে।

সেই উদ্দেশ্যে একটি কলিকাতা-মিউনিসিপ্যাল-আইন প্রস্তুত হয় এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের (তখন নাম ছিল Justice of the Peace) সহরের সীমান্তর্গত ভূসম্পত্তির উপরে অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইবার ও সেই অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যয় করিয়া কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি, ড্রেনেজ, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও আলোক প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিবার অধিকার দেওয়া হইল। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য ছোটলাটের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিল এবং ১৮৫৬ সালে কতিপয় আইনের দ্বারা তিনজন বেতনভোগী কমিশনার ও একজন চেয়ারম্যান্ লইয়া একটি মিউনিসি-প্যালবোর্ড গঠিত হয়। তাঁহাদের কর্পোরেশন আখ্যা দিয়া তাঁহাদের হাতে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সকল টাকা ও নগর সংক্রান্ত সর্ব্ব-বিধ কার্য্যের ভার গবর্ণমেণ্ট হস্তান্তরিত করেন। ১৮৫৯ সালে কলিকাতায় খোলা নর্দ্দামার পরিবর্ত্তে ভূগর্ভস্থ পাইপের দ্বারা ড্রেন প্রস্তুত আরম্ভ হয় এবং তাহা সম্পূর্ণ করিতে ১৬ বৎসর লাগিয়াছিল। বহু বৎসর পরে নিরাপদে লোকচলাচলের জন্য ফুট্‌পাত নির্ম্মিত হয় এবং ইহারও ব্যবস্থার সূত্রপাত এই সময়েই হয়।

১৮৬০ সালে বাংলাদেশের নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ ঘটায় নীল সম্বন্ধে সর্ব্ববিষয়ে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন বসান। ঐ কমিশন তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট দেন তাহা গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়া আইনের দ্বারা নীলকরদের সংযত করিবার চেষ্টা করেন। চাষীপ্রজার অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য বিলাত হইতে ভারতীয় সেক্রেটারী সার চার্লস উড্ উপদেশ ও বিধিব্যবস্থা সম্বলিত এক ডেসপ্যাচ্ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেন, ইহাকে চাষী প্রজার অধিকার-পত্র বা Charter বলা হইত। এই অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল। এই প্রজাস্বত্ববিধি জমিদারদের অনেক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া দিল। এই বৎসরেই ইউনিভারসিটির উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের জনসাধারণের জন্য নিম্নশিক্ষার বিস্তারের ভার গবর্ণমেণ্ট হাতে

লইলেন। এই সম্বন্ধের ডেসপ্যাচকে লোকে শিক্ষাবিষয়ে Charter বা অধিকার-পত্র বলিত। এই ডেসপ্যাচ অনুসারে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে দেশে নিম্নপ্রাইমারী শিক্ষার জন্য নরম্যাল স্কুল স্থাপিত হইল এবং বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীর জন্য ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষা ও পরীক্ষান্তে সার্টিফিকেট্ দিবার ব্যবস্থা হইল। ইহার অল্পদিন পরেই উচ্চপ্রাইমারী বা মাইনর পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। এই সময়েই ডাক-ব্যবস্থার সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ডাক-বিভাগ স্থাপিত হইয়া সুলভ মূল্যে ডাকটিকিটের ও পোষ্টকার্ডের প্রচলন আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে বিভিন্ন প্রদেশের দূরত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ডাকখরচা সরকারে জমা দিলে চিঠিপত্র সরকারী ডাকে প্রেরিত হইত। এখন নিয়ম হইল যে বিলাতের পেনিপোষ্টেজের ন্যায় একই মূল্যের ডাকটিকিটে ভারতে সর্ব্বত্র পত্রাদি প্রেরিত হইবে। প্রেরিত দ্রব্যের ওজনের উপরে ডাকটিকিটের মূল্যের তারতম্যের ব্যবস্থা হইল। দূরত্ব তখন আর গণ্যের মধ্যে থাকিল না। এই ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জমিদারদের উপর ডাক-ট্যাক্স (Cess) বসান হইল।

১৮৬০ সালে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল প্রজাকে একই দণ্ডবিধির অধীন করিবার জন্য অপরাধের শ্রেণীবিভাগ ও দণ্ডের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি-আইন (Indian Penal Code) বিধিবদ্ধ হইল।

একদিকে দণ্ডবিধির দ্বারা যেমন প্রজার শাস্তিবিধান হইল, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় প্রজাকে সম্মানের দ্বারা পুরস্কৃত করিবার জন্য বিলাত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার লেটারস্-পেটেণ্ট (Letters Patent) দ্বারা ভারতনক্ষত্র (Star of India) উপাধির সৃষ্টি হইল। মহারাণী রাজ্যভার গ্রহণের পর এই ভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের ব্যবস্থা করিলেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে একাধিক ভারতীয় এই উপাধি-ভূষণে বিভূষিত হইলেন।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ প্রদেশসমূহে স্থানীয় কার্য্য সুনির্ব্বাহের

জন্য নানাবিধ আইন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইল। অথচ সেই সকল আইনের সহিত সেই সেই প্রদেশবাসীর সম্বন্ধ ও অন্য প্রদেশের সহিত তাহার সম্বন্ধ অল্পই ছিল বা একেবারেই ছিল না। এই সকল আইন বড়লাটের কাউন্সিলের মধ্য দিয়া বিধিবদ্ধ করিতে হইলে কাজ অসম্ভবরূপ বাড়িয়া যায়, সেই কারণে বিলাত হইতে বিভিন্ন প্রদেশে লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরকে সাহায্য করিবার জন্য সেই সেই প্রদেশের স্বতন্ত্র আইন-পরিষদ গঠন করিবার অধিকার বড়লাটের উপর ১৮৬১ সালে অর্পিত হয়। তদনুসারে প্রথম বাংলা আইন-পরিষদ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ১৮ই জানুয়ারী ১৮৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজনকে উক্ত কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করা হয়। C. S. I. (Companion বা সাধারণ সভ্য) উপাধিতে যাঁহারা প্রথম ভূষিত হইয়াছিলেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

কলিকাতায় লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত পানীয় জলের অভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। পুষ্করিণী ও কূপের অস্বাস্থ্যকর জল সাধারণ লোকে পানাদি সকল কার্য্যেই ব্যবহার করিত। বিত্তশালী সম্প্রদায় প্রতি বৎসর মাঘ মাসে গঙ্গাজল সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মাল্যাদির দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া এক বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। দ্বারিকানাথের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের বাটিতে এই ব্যবস্থাই ছিল। কলিকাতা সহরে শোধিত জল (Filtered Water) যাহাতে সহজপ্রাপ্য হয় তাহার জন্য ১৮৬১ সালে আন্দোলন আরম্ভ হয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৬৩ সালে ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তাঁহাদের ইঞ্জিনিয়র কাশীপুরের সম্মুখস্থ গঙ্গা হইতে নলদ্বারা কলিকাতায় জল আনাইবার প্রস্তাব করিলেন। গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে ইহাতে আপত্তি হইল। তাঁহারা বলেন যে কলিকাতার সন্নিকটস্থ প্রদেশের জল পরীক্ষায় অত্যন্ত দূষণীয় দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের মতে ব্যারাকপুরের দক্ষিণে

গঙ্গাতীরস্থ কোন স্থান হইতে জল লওয়া উচিত হইবে না। তখন ব্যারাকপুর-এর একক্রোশ উত্তরে পলতায় গঙ্গাজল সঞ্চয় করিয়া শোধন করিবার জন্য কয়েকটি শোধন-পুষ্করিণী (Filters and Reservoirs) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেইখান হইতে পাইপের দ্বারা কলিকাতায় জল সরবরাহের প্রস্তাব হয়। এই পলতার অপর পারে গঙ্গার পশ্চিমকূলে পলতা ঘাট, গোরুটি গ্রামের অন্তর্গত। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ভ্রমণ-কালীন এই প্রদেশে অবস্থান জন্য এই স্থানটি গৌরহাটি প্রাচীন আখ্যা পায়, অপভ্রংশে গোরুটি বলিয়া পরিচিত। ইহার সন্নিকটে চাঁপদানীতে (এক্ষণে বৈদ্যবাটি ই, আই, রেলষ্টেশন ও মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায়) ভাগীরথীতীরে একটি স্নানের ঘাট আছে। তাহা ৺তারকেশ্বর তীর্থযাত্রীদের নিকট নিমাইতীর্থের ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ ও তথায় স্নানার্থ বৈষ্ণব তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হয়। এই ঘাটের উত্তরে কিয়দ্দূরে আম্রকানন ঘেরা একটি সুন্দর বাগানবাড়ী ১৯০২ সাল অবধি ছিল। ইহাকে বিবির-বাগান বা পলতার-বাগান বলিত, এক্ষণে ড্যালহাউসী ও এ্যাঙ্গাস জুট-মিলে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বে ঠাকুরবাবুদের গোরুটি বা পলতার-বাগান বলিয়া তাঁহাদের পরিবারে উল্লিখিত হইত। 'মহর্ষির আত্মজীবনীতে' এখানে ২।৩ বার নবগঠিত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের উদ্যান-মিলনের প্রসঙ্গে, বাগানবাড়ীটি উল্লিখিত। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' সে তাঁহার খুড়তুতভাই খোলাপ্রাণ হাস্যোজ্জ্বল সৌখীন 'গুনুদাদার' (গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) উল্লেখ আছে, তাঁহার অকাল মৃত্যু (১৮৮১ সালে) তাঁহার এই সাধের বাগানে হইয়াছিল। সেই শোকস্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে তাঁহার পুত্রেরা ইহা বেচিয়া ফেলেন। ইহার কতকাংশ ব্রিটিশ এলাকার চাঁপদানিতে ও কতকটা ফরাসী অধিকৃত গোরুটিতে অবস্থিত। ১৮৬৫ সালে ছোটলাট সাহেব পলতা হইতে পানীয় জল সরবরাহের প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ১৮৬৬ সালে কলিকাতার অন্যান্য বাটির ন্যায় দেবেন্দ্রনাথের পরিবারবর্গ তাঁহাদের বাটির দোতলায় ও তেতলায়

কলের জলের অবাধ ব্যবহারে আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। স্বাভাবিক পরিবেশ অনুসারে রবীন্দ্রনাথ সৌধমালামণ্ডিত, উদ্যান ও রাজপথ শোভিত কলিকাতা রাজধানীর কলের জলে ধৌত নাগরিক কবি। জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষে পল্লীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত। এই নদী-মাতৃক দেশে নৌকায় ভ্রমণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সহিত যে পরিমাণ অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, সাধারণ দীন দরিদ্র গ্রামবাসীর গৃহস্থালী ও দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সুস্পষ্ট পরিচয় লাভের সুযোগ তাঁহার সেই পরিমাণে ঘটে নাই। ভুস্বামী, ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে যথেষ্ট বাধা ছিল। পরবর্ত্তী কালে, গ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় হইতে উত্থিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নব্য সাহিত্যিকদের পক্ষে গ্রাম্যজীবন হইতে ঘনিষ্ঠভাবে অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যরচনার উপাদান আহরণ করা সহজ হইয়াছে।

১৮৬১ সালে এই সময়েই ভারতের মধ্যে একতাসূত্র আর একটি ব্যাপারে দৃঢ়তর হয়। সরকার বাহাদুর বিচারপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করেন। এতদিন বিচার-কার্য্য দুই প্রকার স্বতন্ত্র প্রণালীতে নিষ্পন্ন হইতেছিল, সমগ্রদেশে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের কার্য্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ কর্ম্মচারীর দ্বারা নিষ্পন্ন হইত এবং তাহার শেষ নিষ্পত্তির জন্য (আপিলে) কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল আদালতের ভাষা প্রথমে উর্দ্দু, পরে বাংলা হইয়াছিল। এই দুই আদালতের বিচারকপদে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত হইতেন।

এই দুই আদালতের বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলে আপিল হইত। মুসলমান আমল হইতে কোম্পানী বাহাদুরের আমল পর্য্যন্ত এদেশে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল, বিচারকার্য্যে তাহাই গ্রহণ করা

হইত। কেবল কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ—এই তিনটি প্রেসিডেন্সি সহরের জন্য তিনটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার বিচারক বিলাত হইতে কেবল ব্যারিষ্টারেরাই নিযুক্ত হইয়া আসিতেন এবং তাঁহারা বিলাতি একুইটি (Epuity) এবং কমন ল' (Common Law) ও ইংরাজের অনুমোদিত হিন্দু ও মুসলমান ল' অনুসারে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। ১৮৬১ সালে স্থির হইল যে ভারতবর্ষে এই দুই প্রকার বিচারালয় রহিত করিয়া একমাত্র হাইকোর্ট উচ্চতম আদালত-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে একটি আদিম-বিভাগ (Original Jurisdiction) এবং আপিল-আদালত (Appellate Jurisdiction) থাকিবে এবং তাহাতেই কলিকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী সহরে ও প্রদেশ-গুলির সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্য্য একই আইনের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইবে। হাইকোর্টে বিচারক-পদে বিলাতি ব্যারিষ্টার, সিভিলিয়ন এবং ভারতীয় ব্যবহারজীবী বিলাত হইতে নিযুক্ত হইবেন ও হাইকোর্ট-গুলি ভারত গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। তদনুসারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার লেটার্স পেটেন্টের দ্বারা কলিকাতা হাইকোর্ট ১৮৬১ সালে গঠিত হয় এবং রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, সদর দেওয়ানী আদালতের গবর্ণমেন্ট প্লিডার, বাবু রমাপ্রসাদ রায় প্রথম ভারতীয় বিচারক মনোনীত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হাইকোর্টে যখন ১৮৬২ সালে কাজ আরম্ভ হইল তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। তাঁহার মৃত্যুর পরে কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম প্রধান উকিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁহার স্থানে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রথম ভারতীয় বিচারক বা পিউনি জজ নিযুক্ত হইলেন। ইনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ হইলেও বাংলাদেশ-বাসী হইয়াছিলেন। ইহার পুত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত সরস্বতীও বঙ্গসাহিত্যে পরিচিত এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। ইনিও পিতার ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন।

হাইকোর্টের ভাষা ইংরাজী নির্দ্দিষ্ট হইল। পাঞ্জাব হইতে বাঙ্গালা

উত্তর ভারতের জন্য একটি সর্ব্বোচ্চ আদালত কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং গমনাগমনের সুযোগ বর্দ্ধিত হওয়ায় কলিকাতায় সকল প্রদেশ হইতে অধিকতর সংখ্যক লোকের সমাগম হইতে লাগিল ও সকল প্রদেশবাসীর সহিত বাঙ্গালীর হৃদ্যতা বৃদ্ধির সুযোগ হইল। একতাবদ্ধ হইয়া কাজ করিবারও বীজ বপন হইল এবং কালে ইহাতেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে কোম্পানী কি নিয়মে ভারতে ব্যবসা ও শাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন তাহা বিলাতে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় বাদানুবাদের পর স্থির হইত এবং অনুমতিপত্র প্রদত্ত হইত। এই অনুমতি-পত্রের নাম ছিল চার্টার (Charter), প্রতি কুড়ি বৎসর অন্তর নূতন চার্টার দেওয়া হইত অর্থাৎ চার্টার রিনিউ (Renew) হইত। এই চার্টার রিনিউ করিবার সময়েই ইংরাজজাতির পক্ষ হইতে পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক ভারতীয়ের জ্ঞানচর্চ্চার সুযোগ ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনিয়োগের প্রসার বৃদ্ধিকল্পে নানারূপ ব্যবস্থা চার্টারের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইত। ভারতবর্ষকে কেবল অর্থশোষণের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে তখনকার ইংরাজজাতির প্রধান-গণের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইত। তাঁহারা বলিতেন তাঁহাদের মত সুসভ্যজাতীর সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয়দিগের জ্ঞান ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও জাগতিক ব্যবহারের সুশৃঙ্খলা যদি সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের ঘোরতর লজ্জার কথা। ১৮৫৩ সালের চার্টার রিনিউ-এর সময় স্থির হয় যে অবিলম্বে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ১৮৪৩ সাল হইতে ইহার জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল, তাহা কার্য্যে পরিণত হইল ১৮৫৭ সালে লর্ড ক্যানিং-এর নেতৃত্বাধীনে। ঐ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ও যদুনাথ বসু এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে হুগলি কলেজ হইতে সিনিয়র বৃত্তি পান। তিনি সংবাদ-প্রভাকরের একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৫৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ কলিকাতা ইউনি-

ভারসিটির প্রথম গ্র্যাজুয়েট হন। তাহাতে দেশ শুদ্ধ এমন সাড়া পড়িয়া গেল যে সবাই বলিত **বি এ বঙ্কিম**। ইহার পরে তিনি ১৮৬০ সালের ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের ল' ক্লাসে আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৬০ সালে তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া যশোহর যান এবং নভেম্বর মাসে খুলনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রথম ইংরাজি উপন্যাস "Rajmohon's Wife" ও প্রথম বাঙ্গালা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' খুলনায় লিখিত হয়। আমরা C. E. Buckland কৃত 'Bengal under the Lieutenant Governors' গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'While in charge of the Khulna Subdivision (now a district) he helped very largely in suppressing river dacoities and establishing peace and order in the eastern canals……

While at Khulna Bamkim Chandra began a serial story named **Raj mohon's wife** in the Indian Field newspaper, then edited by Kisory Chand Mitra. This was his first public literary effort.' এই বৎসরে এইখানেই তাঁহার আজীবনের 'অভিন্ন' সুহৃদ দীনবন্ধু মিত্রের সহিত প্রথম মিলন হয়। দেখা যাইতেছে যে ১৮৬১ সালেই বঙ্গসাহিত্যে **বঙ্কিমযুগের** সূত্রপাত হয়।

এই চার্টারেই ব্যবস্থা হয় যে ভারতীয়েরা বিলাতে গিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহারা ভারতের বিচারবিভাগে ও প্রাদেশিক শাসনবিভাগে ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সহিত সমভাবে নিযুক্ত হইবেন। এই সময়েই 'Inn'গুলি অর্থাৎ আইনের কর্ত্তৃমণ্ডলী ভারতীয়দিগকে বিলাতে আইন অধ্যয়ন করিয়া বিলাতের ব্যারিষ্টার হইবার অধিকার ঘোষণা করেন। ইহার ফলে বাংলার প্রথম ব্যারিষ্টার হইলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। তিনি হিন্দু কলেজ

হইতে ১৮৪১ সালে সিনিয়র পরীক্ষায় বর্দ্ধমান রাজবৃত্তি ৪০৲ টাকা পাইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেখানে থাকেন নাই। প্রথমে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিলাত যান ও ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীকে বিবাহ করিয়া পুনরায় বিলাত যান। তথায় তিনি আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং পরে লণ্ডন ইউনিভারসিটির হিন্দু ল-এর প্রফেসর হইয়াছিলেন। বিলাতে 'বৈঠকখানা' নামীয় নিজের বাটিতে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাস করেন। লাড্‌লিমোহন ঠাকুরের পৌত্র হরলাল ঠাকুরের পুত্র ত্রৈলোক্যমোহন ঠাকুরও ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন কিন্তু ১৮৫৯ সালে দৈবদুর্ঘটনায় তাঁহার ব্যারিষ্টার হওয়া ঘটে নাই। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বাঙালীদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কৃষ্ণনগরের দেওয়ান রামলোচন ঘোষের পুত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৫৭ সালে বর্দ্ধমান রাজপরিবারের জুনিয়র বৃত্তি ১০৲ টাকা পাইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

১৮৬০ সালে রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস অধ্যয়নার্থ বিলাত যাত্রা করেন। উচ্চ রাজকর্ম্মপ্রাপ্তির উদ্দেশে বিলাতে শিক্ষা করিতে যাওয়ার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। তাঁহারা বিলাতে গিয়া জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। দুই বৎসর পরেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দুই বৎসর ভ্রমণ করিয়া ১৮৬৪ সালে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ানরূপে যশের মুকুট পরিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তখন বিলাতে। তিনি নিম্নলিখিত চতুর্দ্দশপদী কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিলেন। বাংলা কবিতায় সনেটের প্রবর্ত্তন এবং সনেটের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষকে অভিনন্দন এই উভয়ই মাইকেল মধুসূদনের অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্থরপুরে সশরীরে, শূরকুলপতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্যবলে
ফিরিলা কাননবাসে ; তুমি হে তেমতি
যাও স্থখে ফিরি এবে ভারত মণ্ডলে,
মনোত্থানে আশা-লতা তব ফলবতী !—
ধন্য ভাগ্য, হে স্থভগ, তব ভব-তলে !
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস নয়নের জলে
(স্নেহাসার !) যবে রঙ্গে বায়ুরূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা। যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে !
অদৃশ্য রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন স্থন্দরী
বঙ্গলক্ষ্মী ! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে !—

মনোমোহন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন এবং নির্দ্দিষ্ট বয়স উত্তীর্ণ হওয়ায় ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিলেন। প্রথম বিলাত-ফেরত বাঙালী যুবক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষ বিলাতি পোষাক গ্রহণ করেন নাই, ভারতীয় চোগা-চাপকান বজায় রাখিয়াছিলেন।

১৮৬১ সালে মাইকেলের 'আত্মবিলাপ' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বদান্যতায় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য তিনি বিলাত যান ও তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী কার্য্য আরম্ভ করেন। এই বৎসরেই ১৮৬১ সালে বাংলার আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের উদ্‌গাতা ও বহু তথ্যবস্তুর আবিষ্কর্ত্তা আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম হয়। ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিধি (Constitution) কি ভাবে হওয়া উচিত তাহার খসড়া প্রস্তুত করিয়া দেশে ও বিদেশে মনীষি-

বৃন্দের নিকট যিনি যশস্বী ও বরণীয় হইয়াছিলেন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় পার্কসার্কাসের অধিবেশনের সভাপতি, এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুরও ১৮৬১ সালে জন্ম হয়। সুতরাং দেখা যায় একই বৎসরে ভারতের ভাগ্যবিধাতা কাব্যে, বিজ্ঞানে ও রাজনীতিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য তিনটি প্রতিভাশালী পুরুষের সৃষ্টি করেন। ভারতগগনে যুগপৎ Three Stars of the first magnitude on the ascendant এর সমাবেশ। আমাদের ধর্ম্মজগতে নবপ্রাণ সঞ্চারকল্পে কিছুকাল পূর্ব্বে সাধকপ্রবর পরম ভট্টারক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব হয়। বঙ্গাব্দ ১২৬৮ সালের (ইং১৮৬১) ভাগ্যে দেখা ঘটিল তিনি লোকহিতার্থে বাঙলার পঞ্চবটীমূলে 'পরমহংসদেব' রূপে প্রকট হইয়াছেন। ক্রমে তাঁর রশ্মিছটা সাগরপারের পশ্চিমাকাশ প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোকিত করিল।

দেবেন্দ্রপরিবারেও এই বৎসরটি কিরূপে বিশেষ স্মরণীয় তাহার কথা এইবার কিছু বলিব। ইং ১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে লণ্ডনে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তখনকার দিনে এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিতে দু'তিন মাস সময় অতীত হইয়াছিল। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ লইয়া গোল বাধিল।* পণ্ডিতবর্গ দুইদলে বিভক্ত হইয়া দুই প্রকার ব্যবস্থা দিলেন। একদল বলিলেন যখন দেহ লণ্ডনে প্রোথিত আছে জানা যায়, তখন তাহা কলিকাতায় লইয়া আসা উচিত ও যথারীতি দাহ করিয়া শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা উচিত। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের জ্ঞাতিভ্রাতা পাথুরিয়াঘাটার শাস্ত্রদর্শী হরকুমার ঠাকুর এই মতের পোষকতা করিলেন। অপর দল বলিলেন যখন দেহ সমুদ্রপারে রহিয়াছে এবং কলিকাতায় আনিতে আরও ৬।৭ মাস বিলম্ব হইবে এবং দেহ একেবারে গলিত হইয়া আসিবে তখন দেহ দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য হইলে শাস্ত্রে যাহা বিধি আছে, অর্থাৎ কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া শ্রাদ্ধের

* বিশেষ বিবরণ খ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। দ্বারিকানাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জোড়াসাঁকো কয়লাহাটা নিবাসী রমানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় ব্যবস্থা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে সেই ভাবে কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন। পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ রমানাথ ঠাকুরকে সমর্থন করিলেন। দ্বারিকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ তখন বিলাতে। মহর্ষি কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুসারে না করিয়া মাত্র কয়েকটি বৈদিক মন্ত্রের দ্বারাই দান উৎসর্গ করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার মধ্যমভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ প্রচলিত নিয়মানুসারে গৃহদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনের সম্মুখে দানসাগর ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে অবশিষ্ট কার্য্য করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে নিয়মভঙ্গের পূর্ব্বে গিরীন্দ্রনাথ কৃত শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ বহন করিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার সময়ে প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর প্রমুখ জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাদের শোভাযাত্রায় যোগ দিবার জন্য কিছুদূর তাঁহাদের অনুগমন করিতে দেবেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার আত্মবিবেকে আঘাত লাগিবে বলিয়া অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করিলেন। বয়সে ও সম্বন্ধে কনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের এই উত্তরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ পাথুরিয়াঘাটার জ্ঞাতিবর্গ নিজেদের অপমানিত বোধ করিলেন এবং বৃষকাষ্ঠ ভাগীরথীতীরে পৌঁছাইয়া দিয়া [illegible] করিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেলেন। দ্বারিকানাথের গৃহে নিয়মভঙ্গের ভোজে যোগদান করিবার জন্য কেহই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন নাই। এই আত্মবিবেক ও আত্মসম্মানের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে দেবেন্দ্র-নাথ পাথুরিয়াঘাটার জ্ঞাতিবর্গের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। মহর্ষি আত্মজীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন "কেবল আমার কাকা এবং চার পিসি আমাদের ত্যাগ করেন নাই" (অর্থাৎ রমানাথ ঠাকুর ও তাঁহার ভগিনী জাহ্নবী দেবী, রাসবিলাসী দেবী, [illegible] দেবী ও [illegible] দেবী)। মহর্ষির [illegible]

নিবাসী মথুরানাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে পাথুরিয়াঘাটার প্রাচীন বাস্তু হইতে নীলমণি ঠাকুর ইং ১৭৮৪ সালে ভ্রাতা দর্পনারায়ণের সহিত পৃথক হইয়া জোড়াসাঁকোয় বাস্তু পত্তন করিয়াছিলেন এবং বাটিতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহাদের অপর জ্ঞাতি কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর চোরবাগানে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। কিন্তু সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানেই তাঁহাদের বংশধরেরা একত্র মিলিত হইয়া আহারাদি করিতেন।

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধের ব্যাপারের পর পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর মধ্যে নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেন কিন্তু হরকুমার ঠাকুর কোন দলেই রহিলেন না। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধে মহর্ষির অবলম্বিত পন্থা সম্বন্ধে আমাদের খুল্লপিতামহ পূজনীয় গোকুলনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতামহী, মহর্ষির মধ্যমা পিসি রাসবিলাসী দেবীর মুখে যে প্রসঙ্গ শুনিয়াছিলেন তাহা আমাদের নিকট নিম্নলিখিতরূপে বলেন। মহর্ষির ছোটপিসি দ্রবময়ী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কালিদাসী দেবীও তাঁহার মাতার নিকট এই প্রসঙ্গ এইভাবে শুনিয়াছিলেন বলিয়া খুল্লপিতামহ মহাশয়ের কথিত বিবরণের সমর্থন করেন।

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের প্রথমে একটি কন্যা সন্তান হয়। অল্পদিনের মধ্যেই সেই কন্যার মৃত্যু হয়। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা তাঁহার কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলেন যে তাঁহার সন্তান স্থান অতীব অশুভ। তিনি কোনরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে ভবিষ্যতে তাঁহার সন্তান হওয়া বা সন্তান রক্ষা পাওয়া দুইয়েরই সম্ভাবনা অল্প। দ্বারিকানাথ একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শাস্ত্র-বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন। তিনি ৩৪।৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত শুদ্ধাচারে নিজে প্রত্যহ নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। যখন ইংরাজদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ফলে তাঁহার পান ভোজনে আচারভ্রষ্টতা দোষ সংক্রামিত

হইল, তখন শাস্ত্রানুসারে তাঁহার দেহ অপবিত্র বলিয়া নিজের দৈনিক অনুষ্ঠানগুলি সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ১৮ জন শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে এক একটি কার্য্যের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কেবলমাত্র গায়ত্রীজপ, ইষ্টমন্ত্রজপ ও হরিনাম জপ নিজে সকল অবস্থাতেই আজীবন করিয়া গিয়াছেন। যখন সন্তানলাভের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রস্তাব উঠিল তখন তিনি সে বিষয়ে সচেষ্ট হইলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সাহায্যে রংপুর হইতে একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ক্রিয়াবান পণ্ডিতকে আনাইলেন। এই পণ্ডিত তাঁহার কোষ্ঠী বিচার করিয়া তাঁহার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার প্রধান নিয়ম হইল তিনি যেন অবাধে গভীর নিশীথে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারেন এবং কেহ যেন তাঁহাকে কোন প্রশ্ন না করে। তাঁহার নির্দ্দেশমত বাটির বাহিরে গোয়ালঘরে সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া দেওয়া হইল। প্রাতে কার্য্যসমাপনান্তে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানায় আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তাঁহার একটি দীর্ঘজীবী ও ধর্ম্মপ্রাণ পুত্র হইবে, বিশুদ্ধ বৈদিকধর্ম্মে আস্থাবান থাকিবে কিন্তু প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার শ্রদ্ধা থাকিবে না। এই যজ্ঞের ফলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বৃহস্পতিবার অমাবস্যার সূর্য্যগ্রহণের সময় (ইং ১৬ই মে ১৮১৭ খৃঃ) ভূমিষ্ঠ হন। দ্বারিকানাথের সন্তানগণের মধ্যে কেবলমাত্র দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে দ্বারিকানাথের যে চারিটি পুত্র হয় তাঁহারা সকলেই স্বল্পায়ু ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র নরেন্দ্রনাথ প্রায় ৩ বৎসরে ও চতুর্থ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ ১৩ বৎসরে গতায়ু হন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথ মাত্র ৩৪ বৎসর এবং পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ মাত্র ২৯ বৎসর জীবিত ছিলেন। মহর্ষি তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে প্রচলিত নিয়ম পালন না করায় তাঁহার পিসিরা বলেন যে এতদিনে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

১৮৬১ সালে পারিবারিক ব্যাপারে গোলযোগের সৃষ্টি হইল। মহর্ষি

বহুপূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নিরাকার স্বগুণ ঈশ্বরের উপাসনা আপনার সাধনার বিষয়ীভূত করেন। রাজা রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তে এতদিন নিজের ব্যক্তিগত সাধনা এইভাবে করিয়া আসিতেছিলেন, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের কন্যা চন্দ্রজ্যোতি দেবীর বিবাহ এবং তাঁহার পরিবারে সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান হিন্দুকুলপ্রথানুসারে সুসম্পন্ন হইতে দিয়াছিলেন। কেবল তিনি নিজে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন না। আমরা মহর্ষির আত্মজীবনীতে দেখিতে পাই যে একবার তাঁহার পিতামহ রামমণি ঠাকুরের দুর্গোৎসবে বালক দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিলে রাজা বলেন "আমায় নিমন্ত্রণ কেন? আমি তো এই সব অনুষ্ঠানে যোগদান করিনা", তিনি তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদকে নিমন্ত্রণ জানাইতে বলেন। দ্বারিকানাথের মৃত্যুর পর তাঁহাদের বাটির জগদ্ধাত্রী-পূজা বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৮৫৮ সাল) দুর্গোৎসব সমভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রতি বৎসর শ্যামাপূজা ও সরস্বতী-পূজার ব্যবস্থা ছিল। সেকালের সংবাদপত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে একবার শ্যামাপূজায় বিশেষ ধূমধাম হইয়াছিল। আমার প্রপিতামহ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের খাতায় পাই যে দেবেন্দ্রনাথের সরস্বতী-পূজার জন্য তিনি ২৫্ টাকা দেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে দ্বারিকানাথের নিয়মিত ব্যবস্থার মধ্যে সরস্বতী-পূজায় সমারোহের ব্যবস্থা ছিলনা, দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে ও বাড়ীর ছেলেদের কতক চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উৎসবের আনন্দ বর্দ্ধন হইত। পিতামহের মুখে শুনিয়াছি যে একবার দেবেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে গঠিত খুব প্রকাণ্ডকায় সরস্বতীমূর্ত্তি সুসজ্জিত অবস্থায় নিরঞ্জনের সময় সকলে বিপন্ন হইয়া পড়েন। এই উপলক্ষে বাইনাচ প্রভৃতি হইত এবং তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং লইতেন। পরবর্ত্তী-

কালে মহর্ষি প্রায়ই পূজার সময় বাহিরে থাকিতেন। গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দনের সেবার সহিত মহর্ষি প্রত্যক্ষ সংস্রব না রাখিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা সেবাদির ব্যয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার প্রথম দুই পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ এবং কন্যা সৌদামিনী দেবীর বিবাহ প্রচলিত কুলপ্রথানুসারে মহর্ষির অনুপস্থিতিতে রমানাথ ঠাকুরের কর্ত্তৃত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

মহর্ষির দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারী দেবীর বিবাহকাল উপস্থিত হওয়ায় মহর্ষি পারিবারিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিলেন। পৌত্তলিকতা রহিত করিবার অভিপ্রায়ে তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, কুশ, ৺শালগ্রাম শিলা, গঙ্গাজল ও হোমাগ্নি বর্জ্জিত করিয়া বিবাহের এক অনুষ্ঠান পদ্ধতির সঙ্কলন করিলেন। প্রচলিত অনুষ্ঠান হইতে নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে দেবপক্ষে পিতৃপক্ষে মাতৃপক্ষে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পিতৃপুরুষদের অর্চ্চনার জন্য কয়েকটি মন্ত্রমাত্র নূতন বিবাহ পদ্ধতিতে রক্ষা করিলেন। সকল মন্ত্রেই নিজের অভিপ্রায় মত কতক অংশ বাদ দিয়া এবং কোথাও কোথাও নূতন নূতন শব্দযোজনা করিয়া নূতন মন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। বিবাহের প্রধান অংশ কুশণ্ডিকাহোম পরিত্যক্ত হইল। কেবল সপ্তপদীগমন রক্ষিত হইল। আলপনায় অঙ্কিত সপ্তপদের পরিবর্ত্তে সাতখানি স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইল এবং কুশণ্ডিকায় দম্পতির প্রতিজ্ঞার বাক্যগুলিমাত্র এক একখানি আসনে দাঁড়াইয়া পঠিত হইবার ব্যবস্থা হইল। স্ত্রী-আচারও সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া এই অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত রহিল। বরবধূর গ্রন্থিবন্ধনের ভার ও অধিকার হইতে পুর-মহিলারা বঞ্চিত হইলেন। পুরোহিতের উপরে তাহা যথামন্ত্রে সম্পাদন করিবার ভার অর্পিত হইল এবং সে সময় বাটিস্থ পুরুষদের তাহাতে যোগ দিবার ব্যবস্থা রহিল। এই সময়েই গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দনের সেবা রহিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিজেদের বাটি হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইলেন। পিতৃব্য রমানাথের নিকট

সুকুমারী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে এই সকল পরিবর্ত্তনের অনুমোদন প্রস্তাব করিলে রমানাথ অসম্মতি জানাইয়া এ কার্য্য করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন এবং অপর দুই পুত্র ও কন্যার বিবাহের ন্যায় এই বিবাহ সম্পন্ন করিবার ভারও তাঁহাকে দিতে অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রের ও কুলাচারের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তনের অধিকার যে কাহারও আছে, রমানাথ তাহা স্বীকার করিলেন না এবং বলিলেন ইহাতে স্বেচ্ছাচারের বা স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে ও তাহা সমষ্টিবদ্ধ সমাজের পক্ষে আদৌ হিতকর হইবে না। তিনি যখন দেখিলেন যে দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না, তখন দেবেন্দ্রনাথের সহিত সকল সামাজিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই স্থির করিলেন। যাঁহারা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ হইতে পনেরো বৎসর দেবেন্দ্রনাথের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই রমানাথের নেতৃত্ব অবলম্বন করিলেন। মহর্ষি ও রমানাথ এবং তদনুবর্ত্তিগণের ব্যবহারগুণে ঠাকুরগোষ্ঠীর এই ফাটলের কথা কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে ততটা প্রচার লাভ করে নাই। তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব ও কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই কেবল ইহা জানিতেন। এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহারাজা রমানাথ ঠাকুর ইং ১৮৭৭ সালে যখন পরলোকে গমন করেন, তখন মহর্ষি পাহাড়-অঞ্চলে ছিলেন। ধর্ম্মমত লইয়া তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন তাঁহার এই কাকার মৃত্যুতে মহর্ষি অশৌচগ্রহণ করিবেন কিনা তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে কাহারও কাহারও এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে এই সংবাদ দিয়া এই ব্যাপারে তাঁহার পরিবারবর্গের কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করা হয়। মহর্ষি উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার পরিবারস্থ সকলে পাঁচবৎসরের বালক পর্য্যন্ত, বিনামা ত্যাগ করিয়া যথাবিধি পূর্ণভাবে অশৌচ পালন করিবে। সেই ব্যবস্থা অনুসারে সকলে কার্য্য করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী যখন শুনিলেন যে গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে বাটি হইতে স্থানান্তরিত করা স্থির হইয়াছে,

তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেবেন্দ্রনাথকে জানাইলেন যে গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দনশিলা তাঁহাকে দেওয়া হউক, তিনি যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহার ফলে তিনি সপরিবারে দেবেন্দ্রনাথের গৃহ ত্যাগ করিলেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের উইলে তাঁহার স্বামীকে প্রদত্ত নূতন বৈঠকখানা বাটিতে দুই পুত্র ও পুত্রবধূ, দুই কন্যা ও জামাতা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী সহ গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অন্দরমহলের জন্য বৈঠকখানা বাটির তেতালার আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন হইল। নূতন ঘর প্রস্তুত না হইলে বাটিতে ঠাকুর রাখা সম্ভব হইবে না বলিয়া মহর্ষির সেজ পিসির পুত্র নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটবর্ত্তী বাটিতে ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে রাখিয়া সেবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পরে বাটির সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাঁচী ধোবানীর গলির উপরে জমি খরিদ করিয়া নূতন ঠাকুরবাটি প্রস্তুত হয়। ছয়মাস পরে ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রসিদ্ধ শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার ভ্রাতাভগিনীদের জন্ম এই বৈঠকখানা বাটিতে হয়। সুখের বিষয় ঠাকুর লইয়া মতান্তর ও গৃহান্তর হইলেও পুরুষদের মধ্যে মনান্তর হয় নাই। মহর্ষি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথকে চিরদিন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। বাটির যুবকেরা একই বৈঠকখানায় ওঠা-বসা করিতেন এবং দেবেন্দ্রনাথের বাটির কাছারি ঘরে উভয় পরিবারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জমিদারীর কার্য্যাদি একত্রে বসিয়া সুসম্পন্নের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু পরস্পরের বাটির মেয়েদের দেখা সাক্ষাৎ গতিবিধি বন্ধ হইয়া গেল। এক চত্বরে অবস্থিত দুইটি পৃথক বাটি এক বাটিরই দুইটি মহল বলিয়া পরিগণিত হইত। সকল কার্য্যে পরিবারস্থ যুবকেরা পরস্পরের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিতেন এবং নিজেদের সর্ব্বদাই এক-পরিবার বলিয়া গণ্য করিতেন। এই কারণে 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ কবির পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—

"ভাতে যেথা সত্য হেম, মাতে যেথা বীর,
গুণজ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির
নব শোভা ধরে যেথা সোম আর রবি
সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি।"

সহোদর সত্যেন্দ্র, হেমেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, সোমেন্দ্র, রবীন্দ্রের সঙ্গে পিতৃব্যপুত্র গুণেন্দ্রনাথের নাম করিতে জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ বিস্মৃত হন নাই।

মহর্ষি অবাধে নিজের সঙ্কলিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সাহায্যে কন্যা সুকুমারীর বিবাহ দিলেন (১২ই শ্রাবণ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ বা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই)। জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষষ্ঠ পুত্র লাড্‌লিমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র। বিবাহের ফলে পাত্র ও পাত্রের পিতা রাজারাম মুখোপাধ্যায় সমাজচ্যুত হইলেন। এই বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতির একটি ইংরাজি অনুবাদ Charles Dickens সম্পাদিত "All The Year Round," April 5, 1862 পত্রিকায় জগদ্দলনিবাসী রাখালদাস হালদার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ৩০১ পৃষ্ঠায় ঐ ইংরাজি অনুবাদ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়। রাখালদাস ১৮৬১ সালে বিলাতে ছিলেন। রাখালদাস জগদ্দলনিবাসী প্রথম বাঙ্গালী Executive Engineer বেচারাম হালদারের পুত্র। এই রাখালদাস হালদারের জীবনী রাঁচী নিবাসী তাঁহার স্বনামপ্রসিদ্ধ পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট "A Mid-Victorian Hindu" গ্রন্থে ও "The Diary of an Indian Student" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রহ্ম-উপাসনায় সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে বাংলা ভাষা প্রয়োগ সম্বন্ধে রাখালদাসের সহিত মহর্ষির যে সকল আলোচনা হইয়াছিল তাহার উল্লেখও ব্রাহ্মদের উপবীত-ত্যাগের মতভেদের কথা মহর্ষির আত্মজীবনীতে ও পত্রাবলীতে পাওয়া যায়। মহর্ষি তাঁহার মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নাই। দেবভাষার গাম্ভীর্য্য

ও মাধুর্য্য চিরদিন এদেশের লোককে আকৃষ্ট করিয়াছে ও চিরদিনই জনপ্রিয় থাকিবে, ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়া মন্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় রাখিয়া তাহার সহিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সংযোজন করিলেন। এই ব্রাহ্ম-বিবাহের ফলে মহর্ষির পরিবারবর্গ সমস্ত আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ হইলেন। নব নব শিষ্য-দলের সংযোগে দেবেন্দ্রনাথের সামাজিক গণ্ডী একটু একটু করিয়া প্রসার লাভ করিল। পৌত্তলিকতাপন্থী পর্ব্বাদি উপলক্ষে এবং সামাজিক কার্য্যাদিতে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের ও অন্যান্য ঠাকুরদের চিরদিন কলিকাতা সম্ভ্রান্ত সমাজে নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকাশ্য ব্রাহ্ম-আচার গ্রহণের পর মহর্ষিদেব ও তৎপুত্রগণ সেই সকল নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলেন। সুতরাং তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত সাধারণ হিন্দুসমাজের আমন্ত্রণাদি রহিত হইয়া যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু যতটা সম্ভব ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান-পদ্ধতির ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের একটি শাখা স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিতে মহর্ষি চিরদিন সচেষ্ট ছিলেন। আমরা এ সম্বন্ধে All The Year Round (5th April 1862) পত্র হইতে নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

The Brahmas form a religious sect in Bengal resembling the "Theophilanthropists" of France. In theory, the Brahmas have repudiated the Hindoo idolatry ; but they have as yet done little towards the reformation of social institutions. This is the first occasion on which a marriage in Bengal has been conducted according to the religion of the Brahmas. Among the Hindoos, marriages are celebrated with various idle ceremonies—none of these barbarous accompaniments marked the recent Brahma marriage celebrated in Calcutta on 26th July

1861, when the daughter of Babu Devendra Nath Tagore was wedded quietly and with solemnity. The priests took their seats on a high stool in front of the father of the bride, the bridegroom with the bride seated on his right.

Divine service began by the chanting of a hymn.

The sound of the good name of God only was heard--

—"Om ! That is truth !" meaning God.

—"Om ! God is true, wise and infinite.

—He is the blissful, the immortal, the manifest."

—"All good, all peace, and without a second,

Who pervadeth all the world & &"

Om (pronounced Om with a long drawn sound) is the mystical Sanskrit word as signifying the Creator, Preserver and Destroyer of the Universe.

"Om ! peace. Peace be to all, Blessed be God, Om !"

The above are extracted from the Vedas, the sacred writings of the Hindoos, and constitute the usual formula of worship in the Brahmic congregations. The language used in the Hindoo religious services and rites must be "the language divine." The Brahmas follow the custom. So some parts of the pamphlet we have received, are in Sanskrit and the rest printed in Bengalee.

The Brahma marriage, however, retained much of its Hindu character ; we think, wisely, because if it were made too European, there would be no possibility of

rendering the improvement popular, and a powerful opposition would be aroused among the gentle sex."

মহর্ষির চিরদিন বিশ্বাস ছিল যে ভগবানের নাম করিয়া বেদোক্ত মন্ত্র-দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিবাহসংস্কার বলিয়া প্রচলিত হিন্দুবিবাহের তুল্য বলবৎ ও সিদ্ধ হইবে। এ সম্বন্ধে মহর্ষির আত্মজীবনীর ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায়, ২১ পৃষ্ঠায়, ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি দেখিতে পাই—"The legality of the modified ceremonial was moreover not altogether free from doubt"; তাই বোধ হয় মহর্ষি তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিবাহ-প্রথা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কতদূর বৈধ তাহা জানিবার জন্য ঐ অনুষ্ঠান অনুযায়ী কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের নিকট ব্যবস্থা লইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সমর্থনসূচক তৈলবটগুলি তাঁহার দলিলের পেটিকায় (Deed boxএ) সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, সত্যেন্দ্রবাবু বলেন—"This innovation may justly be said to have ushered a new era into the History of Brahma Samaj. These reformed practices, however, were confined to one or two Brahmo families, and it was necessary to do something to bring them into use among the general Brahmo community. Accordingly my father set to work to prepare a complete Ritual embodying all the Hindu domestic ceremonies in the original Vedic, non-idolatrous form. With the increase in the number of worshippers, the want of a text-book for their guidance was keenly felt. In order to supply that want my father compiled and published the 'Brahma Dharma Grantha' and the "Brahma Dharma Vyakhyan," and the book of

Brahmic Rituals. At the present day (1908), all sections of the Brahmo Samaj, with the exception of the Adi Samaj, avail themselves of the Act by getting their marriages registered, after making the negative declaration as to religion required by the Act, while the Adi Samaj follows a ritual of its own, without registration. My father was strongly opposed to registration as required by the Act."

উত্তরকালে যখন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনেক যুবকই নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতে লাগিলেন, মহর্ষির উৎসাহে রাজনারায়ণ বসু "Are the Brahmas Hindoos?" নামক প্রবন্ধ একটি সভায় পাঠ করেন এবং পুস্তিকাকারে প্রচার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মেরই একটি শাখা তাহা প্রতিপন্ন করেন। মহর্ষি ও আদি সমাজ-ভুক্ত ব্রাহ্মগণ সেই কারণে, ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ, ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়ন ও উপবীত রক্ষা, বিবাহে স্বগোত্রাদি ও শোণিত-নৈকট্যাদি নিষিদ্ধ সম্পর্ক পরিত্যাগ প্রভৃতি নিয়ম সর্ব্বথা পালনীয় বলিয়া স্বীকার করিতেন। উত্তরকালে যখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহর্ষির পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ আইনতঃ সুসিদ্ধ হইবে কিনা সন্দিহান হইয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন মহর্ষি আদিব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রিয় জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদা-প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে ও ৺নবগোপাল মিত্রকে সিমলার পাহাড়ে পাঠাইয়া প্রস্তাবিত আইনের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলিলেন যে, বিবাহকে চুক্তিমূলক করিলে তাহা আইনের চক্ষে সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত সংস্কার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যে বিবাহে ভগবানের নাম ও বেদমন্ত্রের প্রয়োগ থাকিবে না, সে বিবাহকে কিছুতেই ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। এই উপলক্ষে

তদানীন্তন আইন-সচিব Sir James Fitz-James Stephen সারদাপ্রসাদের সহিত মহর্ষির সঙ্কলিত বিবাহপদ্ধতির আলোচনা করিয়া ঐ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহকে সম্পূর্ণ বলবৎ বলিয়া মনে করেন এবং আইনের নাম ব্রহ্মবিবাহ-আইনের পরিবর্ত্তে Native Marriage Act (Act III of 1872) দেওয়া স্থির হয়। হিন্দুর সপ্তপদী গমন ও দম্পতির প্রতিজ্ঞাবাক্যগুলি সাহেবের নিকট এত সুন্দর বোধ হইয়াছিল যে তিনি খৃষ্টানবিবাহ-পদ্ধতির মধ্যে ঐগুলি সন্নিবিষ্ট দেখিলে সুখী হইতেন এবং ঐরূপ সন্নিবেশ যে তথায় বেশ সুসঙ্গত হইত এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গৃহদেবতা স্থানান্তরিত হইবার পর মহর্ষি নিজ পরিবারের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলেন। তাঁহার পরিবারকে একটি পৌত্তলিক অনুষ্ঠানবর্জ্জিত ব্রহ্মনিষ্ঠ আদর্শ পরিবারে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। গৃহে দৈনিক ব্রাহ্ম উপাসনার জন্য পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপকে নিরাকার-স্বগুণ-ঈশ্বরের উপাসনা-মন্দিরে পরিণত করিতে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। ভিতরদালানের মধ্যস্থলে যেখানে দুর্গা প্রতিমাদির স্থান হইত, সেখানে বেদী নির্ম্মিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞাগুলি এবং ঈশ্বরের মহিমাব্যঞ্জক উপনিষদের অনেক শ্লোক শ্বেত প্রস্তরে উৎকীর্ণ হইয়া ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত হইল। বঙ্গদেশে বেদের যথেষ্ট প্রচার অভিপ্রায়ে মহর্ষি ইতিপূর্ব্বেই আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রমুখ চারিজন ব্রাহ্মণকে কাশীধামে পাঠাইয়া চারি বেদে কৃতবিদ্য করিয়া আনেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও পুরোহিত পদে বৃত হন। মহর্ষি উপাসনায় বেদগান ও ব্রহ্মসঙ্গীত অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে পিয়ানো এবং দেশীয় সঙ্গীতযন্ত্রের সাহায্যে উপাসনাকালে বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীর গান হইত। মহর্ষি নিজগৃহে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সময়নিষ্ঠা প্রবর্ত্তনের জন্য পেটাঘড়ির দ্বারা সময় জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিলেন। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনার জন্য পরিবারবর্গকে ঘড়ি বাজাইয়া

প্রত্যূষে জাগরিত করা হইত। পরিবারের সমস্ত পুরুষ ও মহিলা স্নাত ও পট্টবস্ত্রপরিহিত হইয়া দালানে একত্র হইতেন। মহর্ষি পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বেদীতে বসিতেন এবং পুরুষেরা তাঁহার একপার্শ্বে ও মহিলারা অপর পার্শ্বে বসিয়া উপাসনায় যোগদান করিতেন। দৈনিক ব্রহ্ম-উপাসনায় মহর্ষির বৈদিকমন্ত্র প্রধান অবলম্বন ছিল। তাহার সহিত বাংলা অনুবাদ করিয়া সরল বাংলা বক্তৃতার দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের উপদেশ দিতেন। বেদ ও ব্রহ্মসঙ্গীতগানে দৈনিক উপাসনায় যোগ দিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করিতেন। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা তিনি নিজে তো করিতেনই, দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথকেও গান লিখিতে উৎসাহ দিতেন। এমন কি তিনি গানের এক ছত্র আরম্ভ করিয়া সত্যেন্দ্রনাথকে পাদপূরণ করিয়া সম্পূর্ণ করিতে বলিতেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে তাঁহার জেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ 'পদ্যে ব্রহ্মধর্ম্ম' রচনা করেন, এবং ব্রহ্মসঙ্গীতে হারমোনিয়মের সঙ্গত প্রচলন করিবার চেষ্টা করেন, কথঞ্চিৎ সফলকামও হন। পরে সুপ্রসিদ্ধ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রমোদকুমার ঠাকুরের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে বাংলা গানে হারমোনিয়ম যন্ত্রের ব্যবহার বহুল প্রচার লাভ করে ও সাধারণে প্রচলিত হয়। পূর্ব্বে পুরাতনপন্থী হিন্দু ও মুসলমান ওস্তাদেরা কিন্তু হারমোনিয়মকে সুনজরে দেখিতেন না। আজকাল ওস্তাদেরাও হারমোনিয়মকে সঙ্গীত-শিক্ষার মধ্যে স্থানদান অনিবার্য্য করিয়াছেন। হারমোনিয়মের এখন অবাধ গতি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষায় তখন গায়ত্রীমন্ত্রের প্রয়োগ হইত এবং একমনে জপ ও ধ্যানধারণার সাহায্যে ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়া সাধনা করিতে মহর্ষি উপদেশ দিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্রে, 'অভুক্ত অবস্থায় প্রত্যহ অন্ততঃ দশবার গায়ত্রী জপ করিব' বলিয়া দীক্ষিতগণকে অঙ্গীকার করিতে হইত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ২য় কল্প ১ম ভাগের শিরোদেশে লেখা ছিল 'অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো-

ব্যাকরণং। নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া যখন তাহার বীজ চতুষ্টয় আবিষ্কৃত হইল, তখন হইতে উপরোক্ত শিরোনামার পরিবর্ত্তে ঐ পত্রিকায় ঐ বীজ চারিটি শিরোভূষণরূপে ব্যবহৃত হইল এবং গায়ত্রী-দীক্ষার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র দ্বারাই দীক্ষাপ্রথা চলিল। গায়ত্রী সাধনা সহজ নয় বলিয়া মহর্ষি উহা উঠাইয়া দিলেন। প্রতিজ্ঞাপত্রে তৎস্থলে 'প্রত্যহ সংযতভাবে ব্রহ্মে আত্মসমাধান করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা স্থির হইল। সমাজে উপাসনার সময়ে যে বেদপাঠ হইত, এখন তাহার স্থানে ঐ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠ আরম্ভ হইল এবং যে উপনিষদ পাঠ হইত, তাহার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের অন্য অধ্যায় পঠিত হইত। ঐতরেয় উপনিষদের শান্তিপাঠ 'আবিরাবীর্ম এধি' বৃহদারণ্যকের ১।৩।২৮ শ্লোক 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়' এবং শ্বেতাশ্বতরের ৪।২১ শ্লোক 'রুদ্রং যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যং' মন্ত্র লইয়া কেহবা মূল সংস্কৃত শব্দে, কেহবা তাহার ভাষান্তর বঙ্গানুবাদে ব্রহ্ম উপাসনার সময়ে প্রার্থনা স্বরূপ পড়িতে লাগিলেন ও সকলের শেষে 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ' বলিয়া উপাসনা সমাপ্ত হইত। উপরোক্ত শ্লোকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের ১০৯ম সংখ্যক বচনের অন্তর্গত। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসের, ৫৯-৬৩ শ্লোক পঞ্চরত্ন স্তোত্র যাহা ব্রহ্মময়ী বিশ্বজননী কালিকামাতার উদ্দেশে কৌল ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গলবারে পঠিতব্য, তাহা রাজা রামমোহন রায় তাঁহার 'ব্রহ্মোপাসনা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ইহা দেবেন্দ্রনাথের জানা ছিল না। একটি হৃদয়গ্রাহী ব্রহ্মস্তোত্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি তাঁহাদের সভাপণ্ডিত কমলাকান্ত চূড়ামণির পুত্র শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের (পরে তত্ত্ববাগীশ) নিকট ইহা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহা অদ্বৈতবাদদুষ্ট হওয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী করিয়া সংশোধন করিলেন :

"নমস্তে সতে তে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥'

"ব্রাহ্মধর্ম্মমতে ঈশ্বর বিশ্বস্রষ্টা। তিনি বিশ্বরূপ নহেন এবং সগুণ, নির্গুণ নহেন",—দেবেন্দ্রনাথ ইহা বার বার বলিয়াছেন, তাই 'ত্বমেকং জগতকারণং বিশ্বরূপং' এবং 'তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম'ও পরিবর্ত্তিত হইল ও "নির্গুণায়" স্থলে তিনি 'নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায় জগত-পালকং স্বপ্রকাশং' করিলেন। নব কলেবরে ইহার প্রথম চরণ "নমস্তে সতে তে জগতকারণায়, নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়" হইয়া ব্রহ্মো-পাসনা প্রণালীতে "সপর্য্যগাদ" আদি তিনটি মন্ত্রের পর সন্নিবেশিত হয় ও স্তোত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। পরে ১৮৮৪ সালে ঐ গ্রন্থে এই শ্লোকটিও ষোড়শ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততং—" এই শ্লোকটি ঋগ্বেদ সংহিতার ১ম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ২০ ঋক, নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনি উপনিষদের ৫ অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইটি সামবেদীয় সন্ধ্যাবন্দনায় আচমনের জন্য ব্যবহৃত হয় ও 'প্রণব' যুক্ত না হইয়া 'নম' শব্দ দিয়া সর্ব্বসাধারণের পূজার প্রথম মন্ত্র বলিয়া ব্রাহ্মণদের নিকট ইহা সুপরিচিত। প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে ওঁকার উচ্চারণে স্ত্রীলোকের ও শূদ্রের অধিকার নাই, মহর্ষি কিন্তু এ নিষেধ স্বীকার করেন নাই। পবিত্রচিত্তে গায়ত্রী সাধনা করিলে আত্মবিবেকের সাহায্যে ভগবানের বাণী সকলে স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং জীবনযাত্রার পথে ভগবানের আদেশ পালনে কোনরূপ ভ্রান্তি আসিবে না, ইহাই ছিল মহর্ষির স্থির বিশ্বাস। মহর্ষির ধর্ম্মমতে ও বিশ্বাসে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে চিরন্তন পার্থক্য ও ঈশ্বরের সহিত মানবের পিতাপুত্র নিত্যসম্বন্ধ ও তাহা মনে রাখিয়া উপাসনার দ্বারা সর্ব্ব সময়ে মানবকে

চিন্তার ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত যোগ স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইবে। একদিকে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ এবং তান্ত্রিকের মাতৃবাদ যেমন পরিত্যক্ত হইয়াছিল, অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কীর্ত্তন নৃত্যাদির সাহায্যে ভাব-বিহ্বলতা ও পঞ্চরসভেদে উপাসকের বিভিন্ন সাধনপন্থা অবলম্বনও বর্জ্জিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের সাধনায় এক শান্তরস ভিন্ন চারিটি রসের (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর) কোন স্থান নাই, যেহেতু তাহাতে শ্রীভগবানের মনুষ্যত্বের আরোপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাও পৌত্তলিক-তার রূপান্তর। "Divine Principle" প্রবন্ধকারকে মহর্ষি একপত্রে লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মধর্ম্মের যিনি ব্রহ্ম, তিনি 'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাষং, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।' তিনি সকল বেদ্য বস্তুকে জানেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না। 'স নো বন্ধুজনিতা স বিধাতা' শুদ্ধ, মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্ মহান পুরুষই পরমাত্মা, তিনি জীবাত্মাকে পরিমিতরূপে জ্ঞান, প্রেম, কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন—এইজন্যই জীবাত্মা পুরুষ। পুরুষে পুরুষে যে সম্বন্ধ জীবাত্মা পরমাত্মাতে সেই সম্বন্ধ। যদি জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি ব্রহ্মের গুণ-সকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে কেবল বস্তুমাত্র বল, তবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব শব্দে Abstract entity বুঝায়। এ-প্রকার Abstract entity সৎ নয়, অসৎ নয় কেবল শূন্য ideal মাত্র। পৌত্তলিকেরা যখন ব্রহ্মত্বে মনুষ্যত্ব আরোপ করে, বৈদান্তিকেরা তেমনি ঈশ্বরকে শূন্য করিয়া ফেলে, যেমন তুমি 'পঞ্চদশী' হইতে দেখাইয়াছ। আমি তোমাকে পূর্ব্বে লিখিয়া-ছিলাম যে, ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি আমরা যদি শব্দের অভাবে তাঁহার জ্ঞান-শক্তি আছে বলি, তবে জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মের নামও মুখে আনা উচিত হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় পরস্পরের সখা, যেহেতু উভয়েতেই জ্ঞানপ্রেম মঙ্গলভাব আছে। কিন্তু ঈশ্বরের যে জ্ঞান-প্রেম মঙ্গলভাব তাহা অকৃত, তাহা কাহারও দ্বারা কৃত নহে। জীবাত্মার যে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গলভাব তাহা তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিতেছে। সেই পূর্ণ অবিকৃত, গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরকে

ছাড়িয়া এই সৃষ্টির অতীত আদর্শ আর কোথায় পাইব ? তিনি সৎও নন, অসৎও নন,—এইরূপ শূন্য বর্ণনা হইতে তাঁহার হীন বর্ণনা ভাল, যেমন নাস্তিক হইতে পৌত্তলিক ভাল। Our God is not an abstract God but an intelligent free person who consequently has a consciousness of himself. তিনি 'সর্ব্বস্যপ্রভুমীশানং সর্ব্বস্য-স্মরণং সুহৃৎ' সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয়, সকলের সুহৃৎ। It is the consciousness of ourselves as being at once and as being limited, that elevates us directly to the conception of Being who is the principle of our being and is himself without bounds—"Victor Cousin."

ব্রাহ্মধর্ম্মে যে পিতাপুত্র সম্বন্ধের কথা আছে তাহা বৈষ্ণবের বাৎসল্য-রসের বিপরীত। বৈষ্ণব শ্রীভগবানকে পুত্রকন্যারূপে পাইয়া আনন্দলাভ করেন ও তন্ময় হইয়া তাঁহার হিতার্থে, তাঁহার মঙ্গলচিন্তা ও তাঁহাকে শাসন করিবার অধিকার রাখেন। সে প্রেম অন্যরূপ। ব্রহ্মবিদের প্রেম, যথা "ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি আমাদের অপেক্ষা কেবল অধিক নহে, প্রকারে ভিন্ন। একদিকে যেমন জীবাত্মা ও পরমাত্মায় পরস্পর পৃথক তেমনি আর একদিকে পিতাপুত্রের ন্যায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। যে পর্য্যন্ত সেই পরমপুরুষের জ্ঞান, পবিত্রতা, মঙ্গলভাব, স্বতন্ত্রতা, নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বভাব, উপলব্ধি না করি সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে জীবন্ত ঈশ্বররূপে দেখি না। তাঁহাকে জীবন্তরূপে দেখাই আমাদের কার্য্য। তাহাতেই আমাদের সকল যত্ন, সকল চেষ্টা, সকল অধ্যবসায় নিঃশেষ করিতে হইবে। আমরা অনন্ত উন্নতিশীল জীব তাঁহারই সেই জ্ঞান প্রেমের আদর্শ না করিয়া কেমন করিয়া জ্ঞানে ও প্রেমে চিরউন্নত হইব ?" ইহাও মহর্ষিদেবের ভাবনা। কিন্তু ইহা ত্রিভাবের উপাসক খ্রীষ্টীয়দের একাত্মজ পিতাপুত্রের সম্বন্ধসূচক ভাব নহে। তাঁহাদের Sacramentএ রক্তমাংসের কল্পনাও আছে ; God the

father, God the son, God the Holy Ghost এবং ত্রয়ের সংযোগে পুত্রের মধ্যস্থতায় শাস্তা পিতার নিকট উপাসকের ক্ষমা এবং পরিত্রাণলাভ এদেশের পরিচিত বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তি নয়। পিতা দাতা ও ভয়ত্রাতা, পুত্র গ্রহীতা ও প্রসাদযাচী ভাবে বৈষ্ণবের দাস্যভাবও ক্ষুণ্ণ হয়। বরং তান্ত্রিকের অভয়া অম্বিকার সহিত কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সেখানেও কিন্তু নাড়ীর টানে শক্তিসঞ্চার, অহংতত্ত্বে কলুষিত। কিন্তু উপাসকের মমত্ব বোধই তাহার রক্ষাকবচ। বিশ্বজননী জগতমঙ্গল কার্য্যে যতই ব্যাপৃত থাকুন না কেন আমার তিনি ভিন্ন কেহ নাই।

"দদাসি দুঃখম্ যদি কালী নিত্যম্
ত্যজামি নাহং তব পাদপদ্মম্।
সন্তাড়িতাশ্চেচ্ছিশবো জনন্যা,
অঙ্কং জনন্যা হি সমাশ্রেয়ন্তি॥"

—মহারাজা বাহাদুর ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—

সর্ব্বশক্তিময়ী মায়ের কাছে যা তা চাওয়া যায় ও পাওয়া যায়। উপাসনায় সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্য্যরক্ষাই মহর্ষির মূলকথা। সেখানে আবদারের স্থান নাই কেবল কৃতজ্ঞতাভরে প্রেমে আপ্লুত হইতে হইবে। যে সাবিত্রী গায়ত্রীতে দেবেন্দ্রনাথ দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা আজীবন রাখিয়াছিলেন, তাহার শেষ চরণ উচ্চারণ করিয়া "ধীয়োয়ো নঃ প্রচোদয়াৎ" বলিয়া পরমপিতার নিকট নিত্য ও সতত শুভবুদ্ধি ও ধর্ম্মবল, প্রার্থনাযোগে লাভ করিতে হইবে। নিজের বিবেকে কার্য্যনির্ণয়ের দিক ঠিক হইলেই বুঝিবে তাঁহার প্রসাদলাভ করিয়া সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। মহর্ষি মুসৌরি পর্ব্বত হইতে 'হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ'কে লিখিতেছেন—"ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন—সে ভার আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই

হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। 'অত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা' সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান—উঁচু নীচুর কোন খিরকিচ্ নাই। ইতি ২শ্রাবণ ৫৩ ব্রাঃ সং।"

সদ্‌গুণাবলীর জন্য কেবল আমরা ধরিব—"God made man out of his own image" কিন্তু অপকর্ষতার জন্য কাহাকে দায়ী করা যায়, সে বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম নীরব। পিতাপুত্র সম্বন্ধে কেবল নিম্নগামী সন্তান-বাৎসল্যে আমাদের সৃজন, রক্ষণ ও পালনে মহান পরম পুরুষ নিরত, আমাদের নির্ভরশীলতাপ্রসূত ঊর্দ্ধগামী শ্রদ্ধাভক্তির দ্বারা তাঁহার জয় ঘোষণা করিয়া সে বাৎসল্যের উপলব্ধির সাড়া দিতে হইবে। মহর্ষি সঙ্গীতাদিতে ঈশ্বরের ভাবে বিভোর হইয়াও সংযম রক্ষায় সচেষ্ট থাকিতেন। তবে এক এক সময় তাঁহার ভাবাবেগ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া চলিত, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আমরা প্রাচীনাদের মুখে শুনিয়াছি সারদাদেবী স্বামীর কথায় নূতন ধর্ম্মানুষ্ঠান অনুশীলনে একটু দোদুল্যমান অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চিরদিনের অভ্যস্ত বাহ্যিক পূজা অনুষ্ঠানে ৩৫ বৎসর বয়সে স্বামীর মতানু-বর্ত্তিনী হইয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। বেদীতে বসিয়া কিন্তু নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ ও হরিনাম জপ করিতেন এবং স্বামীর ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতেন। আবার চিরদিনের অভ্যাসের ফলে কখন কখন রমানাথ ঠাকুরের বাটির দুর্গোৎসবের পূজক কেনারাম শিরোমণির হস্তে, স্বামীর অজ্ঞাতে, কালীঘাটে ও তারকেশ্বরে পূজা প্রেরণ করিতেন।

পূজনীয়া সারদাসুন্দরী তাঁহার অন্তরঙ্গ আত্মীয়াদের নিকট সরলভাবে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়। আমরা চিরদিন শুনিয়া আসিয়াছি যে, সেকালে যশোহরাগত বধূরা শ্বশুরকুলের ধর্ম্মাচরণ ও আচারনিষ্ঠা অল্পবয়স হইতে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেন এবং জীবনে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব তদ্দ্বারা প্রকাশিত হইত।

অন্তঃপুরিকাদের এই রক্ষণশীলতা পুরুষদের সংযমবিধান করিত এবং তাঁহারাও সম্মান করিয়া চলিতেন। অনেক সময় গৃহস্বামীর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মতও প্রচলিত রীতির সহিত আপোষ মানিয়া লইত। সেই জন্যই কুলপ্রথা ও স্ত্রী-আচারের এত বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। সারদাসুন্দরীকে উহার ব্যাতিক্রম মনে করিবার কোনও কারণ নাই,—বিশেষতঃ যখন আর্থিক, সামাজিক ও সাংসারিক সকল ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়া তাঁহাকে পতিপার্শ্বচারিণী হইয়া চলিতে হইয়াছে। অন্তরে যে সংস্কারের প্রেরণা ও দার্শনিক দৃষ্টি ও বিচার তাঁহার স্বামীকে দ্বাদশ বৎসর স্থির থাকিতে দেয় নাই, তাহার কিছুরও যে তিনি অধিকারী বা অংশীদার ছিলেন এমন আভাষ তাঁহার স্বামী, পুত্রদের বা কন্যাদের লেখায় বা কথোপকথনে প্রকাশ পায় নাই। তিনি মধ্যবয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার আত্মীয়েরা সকলেই তখন বয়ঃপ্রাপ্ত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। পতি-অনুগামিনী ও একান্ত পতিপরায়ণা হইলেও তাঁহার 'দুর্ব্বলের বল শ্রান্তির আসন' ইষ্টদেবকে যে বাহিরের ঘূর্ণাবর্ত্তে মনের নিভৃত কোণ হইতে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বা তাঁহার চিন্তার অভ্যাস একদিনে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, এমত মনে করিলে এই রত্নগর্ভাকে নিতান্ত সংস্কারবিহীনা স্রোতের ফুল বলিয়া ভাবিতে হয়। ব্রাহ্মপরিবারের ধর্ম্ম-আন্দোলনের মধ্যে মহিলাদের মানসিক অবস্থার কথা আমরা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনীতে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর বর্ণনায় কতকটা আভাষ পাই। সারদা দেবী যে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহা ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্যকথায়' আমরা জানিতে পারি। তিনি বলিতেছেন "বৌকে নিয়ে মেমেদের মত গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবি নাকি ?" এমন কি তৎকালে বোম্বাই যাওয়ার জন্য তাঁহার স্ত্রীকে পালকি করিয়া জাহাজে পৌছাইয়া দেওয়া হয়, কারণ তখনও রেলপথ ও মেয়েদের ঘোড়ার গাড়ী চড়া হয় নাই। স্বশ্রেণী ও স্বপর্য্যায়ের আত্মীয়দের নিকট হইতে বিছিন্ন হইয়া তিনি যে ১৮৬২ সালে সপত্নীক কেশবচন্দ্র সেনকে

আশ্রয় দিয়া পরিবারভুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ঔদার্য্য ও অমায়িকতার পরিচায়ক। শিশু রবীন্দ্রনাথের লালন-পালনে তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা সৌদামিনী দেবীর সহিত কেশবপত্নীরও যে সাহচর্য্য ছিল, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তিনটি সন্তানের জননী হইয়া তেজস্বিনী শাশুড়ীর অবর্ত্তমানে যে সারদাদেবীকে দেবদ্বিজ-সমন্বিত নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য ও উৎসবমুখরিত বৃহৎ সংসারের লোকলৌকিকতা, সামাজিকতা ও যাবতীয় ভার কর্ত্রীরূপে বহন করিতে হয় ও অনতিকালপরেই দিক্‌পালসম শ্বশুরের তিরোভাবে বিপ্লবের ঝটিকায় নানাবিধ উদ্বেগ সহিতে হয়, সেই পূজনীয়াকে Heroic Lady বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পরেও প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া স্বামীর প্রব্রজ্যা ও শৈল-ভ্রমণের মধ্যে অপূর্ব্ব ধীরতার সহিত, কথঞ্চিৎ ভগ্নশরীর লইয়া, এই রমণীকে অতগুলি সন্তানসন্ততির শিক্ষা ও পোষণ এবং তাঁহাদের বিবাহাদি ও শিশুপালন প্রভৃতি সকল কার্য্যেই কল্যাণসাধনে নিরত থাকিতে হয়। যথাসাধ্য নিয়মে, শান্তিতে ও প্রফুল্লতায় যে গৃহটিকে পূর্ণ রাখিয়াছিলেন ইহা তাঁহার কম কৃতিত্ব নয়। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও আধ্যাত্মিক বলও যে যথেষ্ট ছিল, ইহা হইতে অনুমান করিতে পারি। যেমন দুটি ভাষা না জানিলে প্রত্যেক ভাষার প্রয়োগশক্তির বোধ জন্মায় না এবং সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না, তেমনি আমাদের মনে হয় যুগসন্ধিকালে অবস্থিত থাকিয়া রবীন্দ্র-জননীর জীবনের পূর্ব্বার্দ্ধে অর্জ্জিত সংস্কার, পরার্দ্ধে অর্জ্জিত জ্ঞান ও শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টাকে পরিপুষ্ট করে। হিন্দুনারীর আদর্শ শুধু স্বামীর সুখ দুঃখের সঙ্গিনী হইলেই হয় না, সহধর্ম্মিণী হওয়া যে বাঞ্ছনীয় এ সংস্কার তাঁহার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল ছিল বলিয়াই সকল পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া তিনি মনের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া স্বামীর উপদিষ্ট ধর্ম্মপথে যথাসম্ভব নিজেকে চালিত করিয়া ভিতরের শান্তি ও বাহিরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

মহর্ষি চিরদিনই শালীনতা ও সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন। পিতৃস্থানীয় শ্বশুর ভাসুরের সম্মুখে এবং পুত্রস্থানীয় জামাতাদের নিকটে পুরমহিলারা আবক্ষলম্বিত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বস্ত্রের পুঁটলির মধ্যে নির্ব্বাকভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকেন, এই প্রথা মহর্ষির মনঃপূত হইল না। তাঁহার অন্তঃপুরিকাদের অবগুণ্ঠন শিরোদেশ পর্য্যন্ত থাকিলে বা তাঁহারা পরিবারস্থ পুরুষ আত্মীয়স্বজনের সহিত সংযতভাবে কথাবার্ত্তাদি কহিলে ও ব্রহ্মসঙ্গীতে যোগ দিলে কোন দোষ হইবে না ও শালীনতার মর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এইরূপ তিনি নির্দ্দেশ করিলেন। শ্বশুর ভাসুর ও বধূগণের মধ্যে প্রাচীন প্রথার কঠোরতা অনেকাংশে শিথিল করিয়া দিলেন। উপাসনা-মন্দিরে অসংকোচে মিলিবার ফলে মহর্ষি পরিবারে ভবিষ্যৎ-স্ত্রীস্বাধীনতার বীজ ধীরে ধীরে বপন হইল। উপাসনায় স্ত্রীপুরুষের একত্র সহযোগিতা উভয় পক্ষেই হিতকর এবং বাঞ্ছনীয় বলিয়া স্থির হইল। চিৎপুর রোডস্থিত উপাসনা-মন্দিরে যাহাতে উপাসনায় অন্তঃপুরিকা মহিলারা যোগদান করিতে পারেন, মহর্ষি তাহার ব্যবস্থাও করিলেন। উপাসনা-গৃহের এক অংশ পর্দ্দার দ্বারা আবৃত হইয়া মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। উপাসনা-মন্দিরেরও পরিবর্ত্তন করিলেন। উপাসনা-মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে পাচী ধোপানীর গলিতে একটি দরজা দরজা হইতে উপাসনা-গৃহ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র সিঁড়ি প্রস্তুত হইল। তখনও মেয়েদের ঘেরাটোপ প্রথার প্রচলন হয় নাই। অন্তঃপুরিকারা পশ্চাৎ দিকের ঐ দরজায় পাল্কি করিয়া যাইতেন এবং নূতন সিঁড়ি দ্বারা উপাসনা-গৃহে গিয়া আসন গ্রহণ করিতেন। সমবেত উপাসনার পক্ষে ৺দেবেন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা "জন্মতিথি উৎসবে" ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে প্রদত্ত এবং মহিলাদিগকে তত্ত্বসভার অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য কোন আগ্রহ বা আহ্বান তৎকালে ছিল না। "যদিচ ঈশ্বরারাধনা গুপ্ত এবং প্রকাশ্য উভয় স্থানেই উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, যদিও যাহার ঈশ্বর-ভক্তি আছে, কি সজনে কি নির্জ্জনে, তাহার ঈশ্বর-ভক্তিরূপ

দীপশিখা কখনও নির্ব্বাণ হয় না, প্রকাশ্যে ভজনা করিলে আপনার ও অন্যের একেবারে উপকার হয়। নির্জ্জনে তাঁহার দৃষ্টান্ত কেহ গ্রহণ করিতে পারে না এবং তাঁহার নিকটে ঈশ্বরজ্ঞানোপযোগী বাক্য শুনিয়া কেহ তৃপ্ত হইতে পারে না। সভাতে সকলের সহিত ঈশ্বরারাধনা করিলে ঈশ্বর-ভক্তির দৃঢ়তা হয়, পরস্পর জ্ঞানালোচনায় জ্ঞানের প্রকাশ অধিক হয়। স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের একস্থানে মিলন জন্য আত্মীয়তা এবং প্রণয়ের বৃদ্ধি হয়; আত্মীয়তা এবং প্রণয়ের বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তিদিগকে জ্ঞান দিবার অনেক উপায় করিতে পারি, অথচ এই প্রকাশ্য ভজনা নির্জ্জন ভজনার প্রতিবন্ধক নহে বরং সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্তিদায়ক। ঈশ্বরজ্ঞান না হইলে ঈশ্বরারাধনা হয় না, এবং একাকী নির্জ্জনে জ্ঞানালোচনার উপায়বিরহেও জ্ঞানোপার্জ্জন হয় না, অতএব এই সভা যে উপকারিণী ইহা বিশেষ বোধ হইতেছে। ঈশ্বরারাধনা নিমিত্তে এই তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিতা হইয়াছে।" এই তত্ত্ববোধিনী সভাই সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের নির্ম্মিত মন্দিরে তাহার স্থায়ী কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে।

বিবাহের ন্যায় দশবিধ সংস্কারের অন্যান্যগুলির জন্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি ক্রমশঃ প্রস্তুত হইল এবং নূতন অনুষ্ঠান অনুসারে সম্পাদিত ক্রিয়াকর্ম্ম-গুলির সংবাদ সাধারণে প্রচারের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার ব্যবস্থা হইল। যেখানে নূতন পদ্ধতি অনুসারে ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত, সেখানে মহর্ষির নির্দ্দেশ মত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পুরোহিতগণ পূর্ব্বদিনে উপস্থিত হইতেন এবং গৃহস্বামীর সাহায্যে বেদীসজ্জা হইতে সমস্ত আয়োজন ও যাহাতে কার্য্যটি সুশৃঙ্খলে ও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় তাহার উপদেশ দিতেন ও ব্যবস্থা করিতেন।

প্রতিবর্ষে মহর্ষি মাঘমাসে একাদশ দিবসে একটি উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন ও আজীবন নিজের পত্রাদিতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করিয়া ব্রহ্ম সংবৎ ব্যবহার করিয়া বৎসরটিকে স্মরণীয় করিয়াছেন। বাটিতে

পৌত্তলিক অনুষ্ঠান রহিত হইবার পর, তথায় মাঘোৎসব প্রধান উৎসব বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সেই উপলক্ষে পরিবারস্থ সকলকে ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাঁহাদের সহানুভূতি ছিল এবং দলস্থ দীক্ষিত ব্রহ্মবাদীদের সকলকে মিলিত করা হইত, তজ্জন্য রীতিমত নিমন্ত্রণও করা হইত। মাঘ মাসের এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া রবির দীপ্তিও ক্রমশঃ যে বর্দ্ধমান হয়, তাহা তাঁহার জীবনী আলোচনায় বুঝিতে পারিবেন। ১৭৬১ শকে আশ্বিন মাসে ইংরাজী ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করেন এবং তাহার সাম্বৎসরিক উৎসব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন করিতেন। তখন ইহা ৩০শে ভাদ্র তারিখে হইত এবং ইহার নাম ছিল 'জন্মতিথি উৎসব'। ইহা সুকিয়া ষ্ট্রীটে ভাড়া বাড়ীতে হইত, পরে রাজা রামমোহন রায়ের স্থাপিত ভজনালয়ে মাঘোৎসব রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ক্রমে লোকসমাগম বৃদ্ধি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে ভদ্রাসন বাটিতে ঐ উৎসবের সান্ধ্য বৈঠক হইতে আরম্ভ হয়। তদবধি ইহা ইহাদের একটি পরিবারের স্থায়ী অনুষ্ঠান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রাতঃকালে উপাসনা মন্দিরে অদ্যাবধি স্বাধ্যায় পাঠ ও উপাসনাদি এবং প্রাচীন রীতির নির্দ্দিষ্ট সময়োপযোগী রাগরাগিনী ব্যবহারে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই উপলক্ষে কতকগুলি নূতন গান রচিত হইত। ক্রমে আমরা কবির কথায় পাইলাম,—

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তুলে সে কার পানে॥
আঁধারের তারা যত অবাক হয়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল

উঠ্‌ল ফুটে স্বর্ণ-কমল,
আগুনের কী গুণ আছে কে জানে॥

ব্রাহ্ম-উপাসনা-সমাজের সহিত মিশিয়া যাইয়া ক্রমে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার অস্তিত্ব লোপ হইল। তবে উহার উদ্যোগে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাখানি জন্মাইয়া ছিল, তাহা আজও জীবিত আছে এবং ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ও পত্রিকা ছাপাইবার জন্য ঐ সমাজগৃহের একতলায় দেবেন্দ্রনাথ যে মুদ্রাযন্ত্রটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা আজও তত্ত্ববোধিনী প্রেস নামে পরিচিত। এ প্রতিষ্ঠান দুটীই রবীন্দ্রনাথের লেখনীর বিস্তর সাহায্য করিয়াছে।

মহর্ষি-পরিবারে দুর্গোৎসবের সময় যেরূপ উৎসবাদি হইত, মাঘোৎসবে মহর্ষি তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন। এমন কি এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় হইত। বাটিস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা ও দাসদাসীর জন্য পরবীর ব্যবস্থা ছিল ও নূতন বস্ত্র ক্রীত হইত। পুরমহিলাদের জন্য নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। মাঘোৎসবের দিন প্রাতে পরিবারস্থ সকলেই সাধ্যমত অন্নবস্ত্র ও অর্থাদি কাঙালীদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। সকল ব্রাহ্মপরিবার মহিলাবৃন্দের সহিত একত্রিত হইতেন। মধ্যাহ্নে মহর্ষির বাটিতে অন্নভোজে যোগদান করিতেন। মহর্ষির বাটিতে সান্ধ্য উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য আত্মীয়বর্গ, ইংরাজ, পার্শী, মুসলমান বন্ধুবর্গকে ও সহরের সম্ভ্রান্ত সমাজের সকলকে আহ্বান করা হইত। মহর্ষির সহিত ধর্ম্মমতে একমত না হইলেও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত শ্রবণের স্পৃহায় অনেকেই মহর্ষির বাটিতে এই উপাসনায় যোগ দিতেন। এই উপলক্ষে বাটিতে ভিয়ান বসাইয়া নানারূপ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আকণ্ঠ পান-ভোজন করান হইত। এই দিনে প্রস্তুত মিষ্টান্নের এবং মহর্ষি পরিবারের সৌজন্য ও আতিথেয়তার কথা সহরময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। বিরুদ্ধবাদীরা অনেকে বলিতেন যে নিরাকার ঈশ্বর অপেক্ষা বৃহদাকার মেঠাইয়ের ও মেওয়াপূরিত পেড়াকীর আকর্ষণ

প্রবলতর হইয়াছিল। এই এগারই মাঘ যাহাতে পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন সমাজভুক্ত ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের প্রধান উৎসব বলিয়া গ্রহণ করেন তাহার জন্য মহর্ষি ঐ সকল সমাজের নেতাদের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া একই দিনে ঐ উৎসব সকল ব্রাহ্মসমাজে প্রচলনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই উৎসবের কথা কেন মহর্ষির মনে উদয় হয়, তাহা আমরা পরে বলিব।

বাটিতে মহিলাদের আর দুইটি বিশেষ উৎসবে মহর্ষি উৎসাহ দান ও সমারোহের ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। একটি জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীবাটা উপলক্ষে জামাতাদের আদর আপ্যায়ন। মহর্ষি ষষ্ঠী মাতৃকার সম্পর্ক তুলিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু জামাতৃ অর্চ্চনায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর একটি "যমের দুয়ারে কাঁটা" দিবার জন্য কার্ত্তিক মাসে ভায়ের কপালে ফোঁটা দিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ভ্রাতাভগিনীর প্রীতি সম্মেলনের উপলক্ষ মহর্ষির সম্পূর্ণ অনুমোদন পাইয়াছিল, যদিচ যমেরও যিনি ভয়স্থান সেই ভীষণং ভীষণানাংকে তিনি তাঁহার একমাত্র উপাস্য স্থির করিয়াছিলেন। সকল উৎসবেই বাটিতে ভিয়ান বসাইয়া নানারূপ আহার্য্য প্রস্তুত করা মহর্ষি পরিবারের একটি বিশিষ্টতা ছিল।

এই সকল উৎসব ভিন্ন মহর্ষি আর একটি ছোটখাট অপৌত্তলিক উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন। ইহা নববর্ষ উপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পরব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা। ইহাতে পরিবারস্থ ব্যক্তিদের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গ-দেরও উপাসনায় যোগদান করিতে আহ্বান করা হইত। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সময়ে প্রতিবৎসর বাংলা সালের প্রারম্ভে ১লা বৈশাখ তারিখে কুলদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনের বিশেষ পূজা করিয়া খাতা মোহরাঙ্কিত করা হইত। বাংলাদেশের সকল জমিদারদের মফঃস্বলে নূতন খাতা প্রবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন কাছারিতে ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা পুণ্যাহ (পুণ্যে) নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সদর কাছারি কলিকাতায় থাকায় কলিকাতায় সকল বৈষয়িক ব্যাপারে প্রচলিত বৎসরের প্রথম দিনে বাংলা

সনের ১লা বৈশাখে নূতন খাতার আরম্ভ হয়। কলিকাতার অধিকাংশ দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা এইদিনে খাতা মহরৎ করেন এবং তদুপলক্ষে তাঁহাদের বাঁধিখরিদ্দারদের এবং যাঁহাদের নিকট কিছু পাওনা থাকে তাঁহাদের আহ্বান করিয়া আদর আপ্যায়ন ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করেন। ইহাই 'খাতা মহরৎ' বলিয়া পরিচিত। কলিকাতায় ইংরাজ সওদাগরের অফিসের সাহেবেরাও এইরূপ নূতন খাতার মহরতের ব্যবস্থা করিতেন। প্রত্যেক সওদাগর অফিসে একটি করিয়া বাংলা সেরেস্তা থাকিত এবং তাহাতে খেরোবাঁধা খাতায় হিসাবাদি বাংলায় রক্ষিত হইত ও তাহা হইতে অফিসের জার্ন্যাল বা ডেবুক ও লেজার তৈয়ারী হইত। মহরৎ উপলক্ষে বাংলা সেরেস্তার নূতন খাতাগুলি কালীঘাটে লইয়া গিয়া মোহরাঙ্কিত করিয়া আনা হইত। তদুপলক্ষে ২৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় মঞ্জুর থাকিত। বাংলা সেরেস্তার আমলারা কালীঘাটে গিয়া আনন্দ করিত। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সময়ে বাড়ীতে যেমন পূজাদির ব্যবস্থা ছিল, সেইরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের এবং কাঙালী বিদায়ের ও কোন কোন বৎসর কাঙ্গালী ভোজনের বিশেষ ব্যবস্থা হইত। মহর্ষি এই ব্যাপারটি বজায় রাখিলেন। এ দেশের নানাপ্রকার বৎসর গণনা প্রচলন আছে, তন্মধ্যে সমস্ত উত্তরভারতে শকাব্দ সমধিক পরিচিত। সাতবাহন বা শালিবাহন বা শকাদিত্য এই অব্দ রাজা প্রচলিত করেন। কেহ কেহ বলেন যে-বৎসর তাঁহার দ্বারা শকেরা বিজিত হয়, সেই বৎসরে ইহার প্রচলন হয়। বাংলা সালে ৫১৫ যোগ করিলে ও ইংরাজি সাল হইতে ৭৮।৭৯ বাদ দিলে শকাব্দের সংখ্যা পাওয়া যায়। এখনও বাংলা দেশে অনেক পণ্ডিত এবং জ্যোতির্ব্বিদ কোষ্ঠী লিখিবার সময়ে ও পঞ্জিকা প্রস্তুতে ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন বিক্রম সংবৎ বলিয়া আর একটি অব্দ দেখা যায়। প্রবাদ যে ইহা রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাভিষেক বৎসর হইতে আরম্ভ। বাংলা বৎসরে ৬৫০ ও ইংরাজি বৎসরে ৫৬।৫৭ যোগ করিলে এই অব্দের সংখ্যা পাওয়া যায়। ইহা

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অব্দ বলিয়া আমাদের দেশের পণ্ডিতদের কাছে ইহার আদর যথেষ্ট। এই কারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুদ্রিত পুস্তকাবলীতে প্রকাশের তারিখ এই অব্দে দেওয়া আছে। বাংলা সালের ব্যবহার কেবলমাত্র বাংলাদেশেই দেখা যায়, বাংলার বাহিরে কোথাও নাই। এইরূপ শোনা যায় যে আকবর বাদশার মন্ত্রী রাজা টোডরমল বাংলাদেশে নূতন রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া তাহা ৪ কিস্তিতে দেয় স্থির করিলেন এবং মুসলমানী বা হিজরী সাল অনুসারে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু হিজরী সাল চান্দ্র বৎসর বলিয়া তাহা প্রতি বৎসরের ফসলের সহিত মিল থাকিত না। অথচ তখনকার দিনে রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট মুদ্রার পরিবর্ত্তে ফসলের নির্দ্দিষ্ট অংশে দেওয়া হইত। ইহাতে নানাবিধ অসুবিধা হওয়ায় ফসলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সৌর বৎসরে নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিবার জন্য বাংলার প্রজারা সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করে। তদনুসারে সম্রাট বঙ্গপ্রদেশে সন ইলাহী বলিয়া একটি নূতন সৌর বৎসরের প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু তাহা এক সংখ্যা হইতে আরম্ভ হইল না। সেই বৎসরে হিজরীর যত সাল ছিল তাহাই ঐ সৌর বৎসরের প্রথম বৎসর বলিয়া ধার্য্য হইল। ইহা হইতেই এই অব্দের উল্লেখে সন ও সাল লেখার প্রথা চলিতেছে। হিজরী সাল চান্দ্র বৎসরে থাকায় এই সৌর বৎসরের সহিত সমতা রক্ষা হইল না। এখন উভয় সালের মধ্যে ১২ বৎসরের পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপে যিশুকে কেন্দ্র করিয়া সময় গণনা চলিতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব (B. C.) ও খৃষ্টের জন্ম বৎসর হইতে খৃষ্টাব্দ (A. D.) বলা হয়। আমরা বাল্য-কাল হইতে ইতিহাসের সমস্ত সময় নির্দ্দেশ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে খৃষ্টাব্দ পাইয়া ইহাতে এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছি যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশের কাছে ইংরাজি খৃষ্টাব্দের উল্লেখ না থাকিলে সময়ের ধারণা স্পষ্ট হয় না। এই খৃষ্টাব্দ জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর হইলেও বিশেষ বিশেষ কাজে বিশেষ বিশেষ ভাবে বৎসর গণিত হয়। আমাদের গবর্ণ-মেণ্টের বৎসর কতকটা বাংলার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এপ্রিল

হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ধরা হয়। আজকাল শিক্ষাবিভাগের বৎসর জুলাই মাসে আরম্ভ হইয়া জুন মাসে শেষ হয়। বিলাতেও রাজার বা রাণীর রাজ্যাভিষেকের দিন হইতে তাঁহার নামের বৎসর গণনা করিয়া আইনগুলি সেই বৎসরে অমুক সংখ্যক আইন বলিয়া উল্লিখিত হয়। যথা ২৫ ভিক্টোরিয়া ৮ ষ্ট্যাটিউট অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের ২৫ বৎসরের ৮ নং আইন। এদেশে কিন্তু গবর্ণমেন্টের আইন খৃষ্টাব্দের সহিত নম্বরযুক্ত হইয়া প্রচারিত হয়। এইরূপ রাজার নামে আমাদের দেশে স্বাধীন ত্রিপুরায় ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে। ইহা ভিন্ন সাম্প্রদায়িক বৎসর গণনার প্রথাও আছে। যেমন আসামে শঙ্কর নামক মহাপুরুষের নামে শঙ্করাব্দ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মহাপ্রভুর নামে চৈতন্যাব্দ।

মহর্ষি তিন প্রকার অব্দ ব্যবহার করিতেন দেখা যায়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ সময়ে এবং আত্মজীবনীর বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ কালে শকাব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কখন কখন কোথাও ইংরাজী সাল দিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার বাংলা পত্রাদিতে চৈতন্যাব্দের অনুকরণে ব্রহ্মাব্দ লিখিতেন। এই ব্রহ্মাব্দ ১৮৩০ সাল হইতে গণনা আরম্ভ হইয়াছে এবং ১১ই মাঘ তারিখে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। এই ব্রহ্মাব্দের গণনা হিসাবে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। দৈনন্দিন বৈষয়িক ব্যাপারে ও খরচের খাতাপত্রে নিশ্চয়ই মহর্ষির বাড়ীতে বাংলা সালের ব্যবহার চলিত। সুতরাং বৎসরের প্রথম দিন ১লা বৈশাখে সংসারের মঙ্গলের জন্য মহর্ষি বিশেষভাবে উপাসনা করা ও কাঙালীদের অন্নবস্ত্র দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি পাঠ, আচার্য্যের বক্তৃতা ও ব্রহ্মসঙ্গীত অন্যান্য উপাসনার মত এ উৎসবের অঙ্গরূপে ধার্য্য হইল। কেবল উপাসকদের নিজস্ব দান গ্রহণের জন্য আচার্য্যের সম্মুখে একটি পাত্র রক্ষা করা হইত এবং তদনন্তর মহর্ষির দেয় মুদ্রা ও দ্রব্যাদির সহিত তাহা একত্রিত করিয়া উপস্থিত ভিক্ষুকগণকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত।

ইহাদের উপাসনার বিশিষ্টতা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ভাবের তাৎপর্য্য এখানে কিছু দিলে মহর্ষির ও তৎপরিবারস্থ সকলের আচরণীয় ধর্ম্মের সম্বন্ধে পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধা হইবে। মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা যে বেদ-সন্ন্যাসী গৃহস্থের উল্লেখ পাই (শ্লোক ৮৬—৯৭) মহর্ষি তাঁহার ও তাঁহার পরিজনগণের জীবন তদনুসারে পরিচালনা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'নিন্দসি যজ্ঞ-বিধেরহহশ্রুতিজাতম্' অবলম্বনে পৌত্তলিকতা আভাসযুক্ত হিন্দুক্রিয়াকর্ম্ম প্রথমে নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইল। তাহার পর বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কিছু কিছু রক্ষা করা হইল। তৎপরে বেদও পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদ্ দর্শনের ইঙ্গিতে নবতর হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইল। সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণের উপাসনা বেদে থাকিলেও 'রূপবিবর্জ্জিত' নহে বলিয়া নব উপাসনা প্রণালীতে তাঁহাদের অর্চ্চনা বর্জিত হইল। এমন কি ঋগ্বেদের হোতা, যজুর্ব্বেদের অধ্বর্য্যু ও সামবেদের উদ্গাতা যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, বৈশ্বানরের পূজা ও দেবনরের হিতৈষণায় যাঁহার একাধিপত্যের কীর্ত্তন করিয়াছেন, পৌত্তলিকতা বর্জ্জনের আগ্রহে সেই বেদবিহিত অগ্নিকে গৃহকর্ম্মে, উপাসনাতে ও ধ্যানধারণা ও ভাবনাতে কোন স্থান দেওয়া হইল না। পার্থিব-পদার্থের স্তবক রূপে আচার্য্য ও উপাচার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অগ্নিদেব নমস্যযোগ্য হইলেও গণ্য হইলেন না; এমন কি 'সর্ব্বধীসাক্ষীভূতং' গায়ত্রীর নিম্নপ্রতিষ্ঠিত সবিতৃদেবও আসন পাইলেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাড়িতে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান রহিত হইলে পর এখানে মাঘোৎসব প্রধান উৎসব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ইহার উৎপত্তি এইরূপে হয়। ১৭৩৭ শকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় তাঁহার মানিকতলা ভবনে 'আত্মীয়সভা' নামে একটি সভা সংস্থাপন করেন। সভা সপ্তাহে একদিন করিয়া হইত। শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদপাঠ করিতেন এবং গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন কিন্তু শ্লোকব্যাখ্যা হইত না। দ্বারিকানাথ ঠাকুর মধ্যে মধ্যে এবং ব্রজমোহন

মজুমদার ও অপর কয়েকজন নিয়মিতরূপে আত্মীয়সভায় উপস্থিত হইতেন। তন্মধ্যে রামমোহন রায়ের নবপ্রচারিত বেদান্তের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হইয়া বর্দ্ধমানের রাজষ্টেটের কর্ম্মচারী তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কোন্নগরের চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। টাকির প্রসিদ্ধ রায় কালীনাথ মুন্সি ও আন্দুল রাজপরিবারের মথুরানাথ মল্লিক এবং পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভায় আকৃষ্ট হন। এই আত্মীয়সভার উদ্যোগে ১৮১৯ খৃঃ তুলাপটির বেহারীলাল চৌবের ভবনে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বাঙ্গালীর-বেদপাঠে-অধিকার সম্বন্ধে ঘোরতর তর্কযুদ্ধ হয়, তাহাতে যুক্তিবলে রামমোহন রায়ই প্রাধান্য লাভ করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর সেই সময় তাঁহার বিরুদ্ধে কলিকাতা প্রভিন্সিয়াল কোর্টে নালিশ করেন এবং তাঁহার নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। রায় মহাশয় মোকদ্দমায় ব্যস্ত থাকায় কিছুকাল আত্মীয়সভার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এমন কি, রামমোহন রায়কে তাঁহার মাণিকতলার বাসভবন পরিত্যাগ করিতে হয়। সেইজন্য কলিকাতার উপনগরে ভূকৈলাসে রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটিতে দুই একবার এই সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে হয়। বহুকাল পরে ১৮২৩ খৃঃ অব্দে হরকরা পত্রে টাইট্‌লার সাহেবের সহিত কল্পিত নাম 'রামদাসে'র স্বাক্ষরে ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টানের ধর্ম্ম ও পৌত্তলিক হিন্দুর ধর্ম্মের ভিত্তিমূল যে এক,—অর্থাৎ ঈশ্বরের বহুত্ব ও অবতারবাদ, এবং ইহা প্রকৃত ধর্ম্মালোচনায় যে খণ্ডনযোগ্য, রামমোহন রায় তাহা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হন। তাহার ফলে ব্যাপ্‌টিষ্ট খৃষ্টান মিশনারী উইলিয়ম এ্যাডামকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে পরমেশ্বরের ত্রিভাব, যিশুর ঈশ্বরত্ব ও ক্রুশে অভিসিঞ্চিত তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ এ সকলে বিশ্বাস বা ইহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া মানবের আধ্যাত্মিক বল সংগ্রহ করা বাইবেলের শিক্ষাবিরুদ্ধ। তখন সহরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল এবং মিশনারী সম্প্রদায়

সেকেণ্ড ফলন্ এ্যাডাম (Second Fallen Adam) বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। এ্যাডাম্ সাহেব 'হরকরা' সংবাদ পত্রের আপিসে দ্বিতলে একখানি ঘর লইয়া নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া ইউনিটেরিয়্যান সোসাইটি নামক এক সভা স্থাপন করেন। তাহাতে সপুত্রদ্বয়, সশিষ্য ও কয়েকজন জ্ঞাতিবর্গ সমভিব্যাহারে রামমোহন রায় যোগ দিয়া ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হন। পরে টাকিতে রায় কালীনাথ মুন্সির উদ্যোগে একটি সভা আহূত হইয়া স্থির হয় যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীদের একটি স্বতন্ত্র উপাসনাস্থল নির্দ্দিষ্ট করা হউক, বিদেশীয়-দিগের আশ্রয়ে বাঙ্গালীদের যাইবার প্রয়োজন নাই। এই কল্পে চাঁদা উঠান হয় ও চন্দ্রশেখর দেব ভারপ্রাপ্ত হইয়া সিমলায় শিবনারায়ণ সরকারের বাটির দক্ষিণে একখণ্ড জমি সংগ্রহার্থে নিয়োজিত হন। কিন্তু অবশেষে জোড়াসাঁকোর ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটিতে একটি ঘর ভাড়া লইয়া ১৭৫০ শকে ১৮২৮ খৃঃ উপাসনাসভা সংস্থাপিত হইল। তথায় শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইতে লাগিল। দুইজন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন এবং বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীর সঙ্গীতে সভা সমাপ্ত হইত। পোর্টুগীজ বণিকদিগের অধীনে কর্ম্ম করায় এই বাটির পূর্ব্বসত্ত্বাধিকারী কমল লোচন বসু ফিরিঙ্গী কমল বসু বলিয়া আখ্যাত হন। তিনি হিন্দু কায়স্থ ছিলেন খৃশ্চান্ বা ব্রাহ্ম হন নাই। হরিহর শেঠ মহাশয় তাঁহার 'পুরাতনী'তে বলেন "বসু মহাশয়ের প্রকৃত নাম রামকমল বসু, তৎকালে (১৮৩০ খৃঃ) তিনি চন্দন-নগরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ছিলেন।" অপার চিৎপুর রোডে যেখানে মদন মোহন চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার পশ্চিমদিকের রাস্তার অপর পার্শ্বে এই বাটি অবস্থিত। পরবর্ত্তীকালে ইহা হরনাথ মল্লিকের ও লোকনাথ মল্লিকের বাটি বলিয়া পরিচিত হয়। ১৭৫০ শকের ১১ই

মাঘ (ইং ১৮৩০) হইতে ঐ বাটির অনতিদূরে রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত রাজা রামমোহন রায়ের নামে ক্রীত দ্বিতল বাটিতে স্থানান্তরিত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তীকালে ইহা আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দির হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১৭৫২ শকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় দিল্লীর বাদশাহী সনদে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ১৭৫৫ শকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার মৃত্যু ও সমাধি হয়। তিনি একখানি ট্রাষ্টডিড্ সম্পাদন করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এই উপাসনা-গৃহের ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেন এবং কতিপয় সর্ত্তে সাধারণের ব্যবহারার্থ এই বাটির সর্ব্বসত্ব দান করেন। রাজা নিজেও ট্রাষ্টিদের অন্যতম ছিলেন। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বনামধন্য রমানাথ ঠাকুর (পরে মহারাজা) ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়া বহুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। এই অর্পণনামা পত্রে সর্ত্ত আছে যে ইহা নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহৃত হইবে :—

"For a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly, sober, religious and devout manner, that no sermon, preaching, discourses prayer or hymns be delivered, made or used in worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the universe but not under or by any other name, designation or title used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever. That no graven image, statue, sculpture, carving, painting picture, portrait or the likeness of any thing shall be admitted

within the said messuage and that no sacrifice offering or oblation of any kind or of anything shall ever be permitted therein and no object animate or inanimate that has been or is or shall hereafter become or be recognised as an object of worship by any man or set of men shall be contemptuously spoken of or alluded to either in preaching, praying in the hymns or other mode of worship that may be used or delivered in the said building,"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, উপনিষদকারদিগের ভাবের-মধ্যবিন্দু-আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন; মহম্মদের একমাত্র-ঈশ্বরের-পূজা ও অপর সকল-দেব-পূজার-প্রতিবাদ, লুথারের ধর্ম্মচিন্তায়-ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা এবং থিওডোর পার্কারের মানব-প্রকৃতির-সর্ব্বাঙ্গীন-উন্নতি, এই সকল ভাবের সংমিশ্রণে রাজা একটি 'সার্ব্বভৌম উপাসনা'র কল্পনা করিয়া সত্যনিষ্ঠাপ্রসূত তত্ত্বান্বেষী কয়েকটি মানবের মিলিত হইবার একটি সুযোগ, আত্ম-উৎকর্ষ-তার ক্ষেত্র ও নিরুপদ্রবে সপ্তাহে একদিন করিয়া ঈশ্বরচিন্তার ঐক্যস্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"রামমোহন রায় বলিলেন, ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, সকলে এস, ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কর। যে জাতি, যে বর্ণ, যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোক হওনা কেন সকলে এস, সার্ব্বভৌমিক ভাবে একমাত্র নিরাকার, অগম্য, অনাদ্যন্ত পরব্রহ্মের পূজা কর।" তাই ট্রাষ্ট্‌ডিডে আরও লিখিত আছে যে ঐ বাড়িতে পূর্ব্বোক্ত উপাসনা প্রণালীর সহিত এরূপ উপদেশাবলী দেওয়া হইবে যাহাতে "the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue strengthening of the bonds of union between men of all religious, persuasions and creeds" সহজ ও সুগম হয়। এ যেন সেণ্টপলের বাণী "Be all unto all

men." বিশিষ্ট অসাম্প্রদায়িক উদারভাবের এবং তৎসহ বিশ্বস্রষ্টার নিকট সর্ব্বদাকৃতজ্ঞ ও বিনীত ভাবের পোষণ করিয়া স্মরণ ও মননের জন্য একটি সমবেত চেষ্টা জাতির জাতীয়ত্ব প্রতিপাদনের লক্ষণ বলিয়া ও তদানিন্তন ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নাগরিক অভিব্যক্তির নিদর্শনরূপে ধর্ম্মোদ্দেশে এই গৃহপ্রতিষ্ঠা। সেখানে বাকবিতণ্ডা তর্ক বা আলোচনা নয়, কেবল নব প্রণালীর সুসংস্কৃত উপাসনা করা আগন্তুকের কর্ত্তব্য ধার্য্য হইল। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়কে ব্রাহ্মসমাজের-স্রষ্টা বলা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি বারংবার নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে দলবদ্ধ হইয়া সম্প্রদায় গঠন বা সংকীর্ণ ধর্ম্মমত পোষণ বা সামাজিক আচার বা আচরণের কোন-রূপ পরিবর্ত্তন করার আবশ্যকতা নাই। স্ব স্ব শ্রেণীর ধর্ম্ম ও সামাজিক গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া Personal উপাসনার দ্বারা যিনি ইচ্ছা করিবেন চিন্তাধারাকে নির্ম্মল করিয়া লইতে পারিবেন। এমন কি, আবশ্যক হইলে তাঁহার বহুপ্রচারিত গ্রন্থের 'স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা' এ নির্দ্দেশ বাক্যটি পর্য্যন্ত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। প্রকাশ্য সভায় সর্ব্বজাতি সম্মিলিত হইয়া উপাসনা করা দেশীয় ভাব নহে, উহা মূলে বিদেশীয়দিগের—ইহুদী, আরব ও ইউরোপীয়দিগের অনুকরণ। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তেও দেখা যাইতেছে যে এ্যাডাম সাহেবের ইউনিটে-রিয়ান্ সোসাইটির অনুকরণে একটি উপাসনাসভা ও তাহার অকুস্থল একটি গৃহ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রারম্ভে কোন মুসলমান বা খৃষ্টান ভ্রাতার আনুকূল্য বা সাহচর্য্য প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার সাপ্তাহিক কার্য্য ঈশ্বরানু-সন্ধান ও ভগবৎ গবেষণাকে বিশিষ্ট হিন্দু আকার দেওয়া হইয়াছিল। জাতির বহুদিনের সংস্কার অনুসারে দীক্ষিত ব্রাহ্মণদ্বারা স্ত্রী-শূদ্রের অগোচরে বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদপাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং এই উচ্চারণের বিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দক্ষিণী ব্রাহ্মণ দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইত, কারণ বাঙ্গালী পণ্ডিতের সংস্কৃত পাঠ ব্যাকরণশুদ্ধ হইলেও সনাতন শ্রুতিভাষণরীতি-বর্জ্জিত ছিল।

ট্রাষ্টডিড্ হইতে বেশ বোঝা যায় যে এই ন্যাসস্রষ্টা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী বা বিশেষ শাস্ত্রবাদী ছিলেন না। কবি টমাস মুরের সহিত তাঁহার ফরাসীদেশে দেখা ও আলোচনা হয়, কবির দৈনন্দিন লিপিতে ধর্ম্মসম্বন্ধে রাজার মনোভাব যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সহিত ট্রাষ্টডিডের সম্পুর্ণ ঐক্য দেখা যায়। তিনি আজীবন সকল ধর্ম্মের পুস্তক নিষ্ঠার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তৎ তৎ ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত বিচারে তাহা নিপুণতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন ও তৎকালীন প্রামাণ্য বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, নতুবা তিনি বেদ বা বাইবেল প্রভৃতি কোন শাস্ত্র-বিশেষকে অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বা কোনও বিশেষ শাস্ত্রকে পরমেশ্বরের প্রেরিত বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যেভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম একরূপ বিশ্বজনীন ও সামাজিক হিতনীতিমূলক বলা যাইতে পারে, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রের যুক্তি ও ঈশ্বরের স্বরূপতত্ব নির্ণয়ই তাঁহার প্রতিপাদ্য। তান্ত্রিক সাধনা, মুসলমান পরিচ্ছদ, খৃষ্টানের অনেক আচার, খাদ্যাখাদ্য বিচাররাহিত্য, সুরাব্যবহার এবং আহারে বসিবার পূর্ব্বে এমন কি টেবিলেও 'গ্রেস'-এর অনুকরণে গীতার 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি' মন্ত্রের প্রয়োগ, তান্ত্রিক মন্ত্রের দ্বারা মদ্যশোধন করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।* তৎসহ মনঃপ্রাণ শোধনের জন্য বেদান্তের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে অবলম্বনস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনি গবর্ণর জেনারাল লর্ড এমহার্ষ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে বেদান্তাদি শাস্ত্রের ভ্রম প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার উপাস্য বলিতে গেলে নামরূপের অতীত 'একমেবা-

* রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্ণী মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরও মুখে আমরা একথা শুনিয়াছি।

দ্বিতীয়ম্' এবং শাস্ত্র বলিতে গেলে 'সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং'। ধ্যান ও চিন্তার দ্বারা ভাবের উপলব্ধি মাত্র। জ্ঞানমার্গীর পক্ষে প্রতীক, উপচার বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রণয়নে রাজা মনোযোগ দেন নাই, কেবল ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী অভ্যাসের দ্বারা নিত্য ভগবানে মন অর্পণ করা সাধকের কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত করেন। তাহাতে ভক্তির প্রণালী, উচ্ছ্বাস বা আনন্দ নাই। তিনি উপবাসের পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ ক্ষুৎপিপাসার তাড়না মনকে অশান্ত করে। জামাজোড়া আলবাসপোষাক পরিয়া উপাসনাসভায় যোগদান তিনি আবশ্যক মনে করিতেন, নতুবা নিজের এবং উপাস্যের সম্ভ্রমহানি হয়। হেতুয়া হইতে জোড়াসাঁকো উপাসনাভবনে তিনি শিষ্যবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া পদব্রজে যাইতেন এবং উপাসনান্তে গাড়ি চড়িয়া বাড়ি ফিরিতেন। ইহা যেন উপাসনার প্রারম্ভে তীর্থযাত্রীর মনকে নিষ্ঠাপরায়ণ করা এবং শুদ্ধ ও সংযতভাবে সাপ্তাহিক উপাসনায় নিরত থাকিয়া তীর্থপ্রত্যাগতের মত শান্ত চিত্তপ্রসাদ ভোগ করা। তিনি বলিতেন—

"The Vedas teach the only religion which considers toleration to be a duty of man. The moral precepts of Jesus are something most extraordinary. The Vedas contain the same morality but in a scattered form. Hinduism is aeligion of toleration and peace which Christ indeed also taught his apostles and disciples, but which his followers soon forgot. In religious discussions we should always respect the ideas and feelings of our antagonists." তিনি শাস্ত্রনিরপেক্ষ অথচ সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী ছিলেন, কিন্তু আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময় বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ লইতে অস্বীকার করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে বেদান্তগ্রন্থ হাতে লইয়া সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া শপথ গ্রহণ করেন।

তথাপি তাঁহাকে বেদান্তানুগামী হিন্দু বা ব্রাহ্মনামধেয়ী কোন সম্প্রদায়ের নেতা বলিলে ভুল হইবে। তাঁহার কার্য্য জ্ঞানান্বেষণ করায় বা আলোচনাতেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল। 'ব্রাহ্মসমাজের পঁচিশ বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' দিবার কালীন দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন : "রামমোহন রায়ের মনের ভাব, কিসে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা গিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়। বাইবেল, কোরাণ, হিন্দুশাস্ত্র হইতে পৌত্তলিক-ভাগ পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধান্ত করিলেন। ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল।… একমাত্র সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ঈশ্বরকে লোকের নিকট প্রতিপন্ন করিবার তাঁহার ভরসা ছিল না। যদিও তিনি জানিতেন, ধর্ম্মপ্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ জ্ঞান ছিল।"

ইং ১৮১৭ সালে রামমোহন রায় মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভূমিকায় লেখেন যে, ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে বেদান্তবাক্যপাঠ ও তাহার অর্থচিন্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়। পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদচিন্তনই উপাসনা, নীরব মননই শ্রেয়ঃ। শব্দের অবলম্বন দুর্ব্বলাধিকারীর জন্য,— তাহারা যদি মনস্থির করিতে না পারে ক্রমাগত ওঁ মন্ত্র জপ করিবেন। অন্যত্র তিনি বুঝাইয়াছেন ওঁ = সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, ভূর্ভুবঃস = ত্রিলোক প্রকাশক সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মানবের বুদ্ধিবৃত্তিনিচয়ের প্রেরয়িতা। ইহার দশেক পরে ১৮২৭ সালে 'গায়ত্র্যাপরমোপাসনা বিধানম্'-এ লিখিলেন : "বেদান্ত বাক্যের পরিবর্ত্তে অর্থচিন্তাপূর্ব্বক গায়ত্রী জপই প্রশস্ত উপাসনা।" ইহার ভিত্তি হইল সাবিত্রীনামীয় ঋগ্বেদের ঋক ৩।৬২।১০ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং (উচ্চারণ বরেণিয়ং) ইহাতে উপরোক্ত ব্যাহৃতি (ওঁ ভূর্ভুবঃস) যোজনা করিয়া ব্রহ্মচারীর উপনয়নে দীক্ষা দেওয়া হয় ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তদ্দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার প্রচার ও প্রচলন

করিতে তিনি বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাঁহার আক্ষেপ তাঁহার আত্ম-জীবনীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের' পুরোভাগে ইহাকে তিনি স্থান দিয়া বলিয়াছেন, চিন্তাপ্রণালী এইরূপ হইবে : "প্রথমে ঈশ্বর আছেন, দ্বিতীয় ঈশ্বর ক্রিয়াবান, তৃতীয় ঈশ্বর আমার নিয়ন্তা ও প্রভু। এই অনুভূতিতে প্রবেশ করিলে সাধক গায়ত্রী মন্ত্র অবলম্বন করিতে পারেন।" সমাজের উপাসনাও এই তিনভাগে বিভক্ত ও তাহাতে তিনটি বীজের ব্যবহার নির্দ্দেশিত। প্রথম সমাধান প্রথম ভাবের ঈশ্বরের অস্তিত্বের পরিপোষক, পরে স্বাধ্যায় বা পাঠ, সমাধানের দ্বিতীয় অংশ ক্রিয়াশীল ঈশ্বরের ভাবব্যঞ্জক "স পর্য্যগাৎ," "এতস্মাজ্জায়তে", "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" প্রভৃতি উপনিষদ্ বাক্যের আলোচনা, তৃতীয়, তিনি আমার নিয়ন্তা ও প্রভুভাবজ্ঞাপক "জগতকারণায়" বলিয়া স্তুতি ও প্রার্থনা, তৎপরে বক্তৃতা বা উপদেশ, অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোক পাঠ। রামমোহন রায় কোনও দিনই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কাজ করেন নাই। তাঁহার লিখিত ব্যাখ্যান রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশদ্বারা পঠিত হইত। দেবেন্দ্র-নাথ বক্তৃতা করিতেন। প্রথম প্রথম তিনি বেদীতে বসিতে দ্বিধা বোধ করিতেন, পরে কেশব সেনের পীড়াপীড়িতে বেদীতে বসেন। উপাস্য সম্বন্ধেও দুজনের বিশেষ প্রভেদ। রামমোহনের আরাধ্য ছিলেন সর্ব্ব-শক্তিমান্ নিরাকার নির্গুণ পরমেশ্বর আর দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য গুণযুক্ত সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্ম ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যে রত থাকা। ঈশ্বরের আদেশের অধীন হইয়া তাঁহার প্রেম অনুভব করা। এই প্রেমানুভূতিতে তিনি পৌঁছিলেন ভাবচর্চ্চার পথ দিয়া। তাঁহার বেদান্তচর্চ্চা অপেক্ষা, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ, সাধারণ সংস্কৃত কাব্য, Hamilton প্রভৃতি Scottish Intuitionistsদের দর্শন, জপজীসাহিবপোড়ী, গুরুনানক প্রভৃতিদের বাক্য, ও সর্ব্বোপরি দেওয়ানা হাফিজের ফার্সী কবিতা ও বিবিধ ব্রহ্মসঙ্গীত যাহাতে নাম ও জয়গান আছে তাঁহার সাধনার প্রধান উপজীব্য ছিল।

"দর্শনস্ত দর্শনেন নো মনো হি নির্ম্মলম্
বিবিধশাস্ত্রজল্পিতেন ফলতি তাত কিং ফলম্
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।"

(দেবেন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত দ্রষ্টব্য)।

তাঁহার শিথিলতা ও বিশৃঙ্খলা-বিরোধী মন ব্যক্তিগত উপাসনাতেও বাক্যের অবলম্বন অন্বেষণ করিয়াছে ও সকলের হিতার্থে তিনি সমাজীর উপাসনায় তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। রামমোহন অসাধারণ মনীষী হইলেও ধাবমানকালের অনুগামী ও অনুযায়ী আপোষের পক্ষপাতী হওয়ায় কতকটা যুক্তিবাদী (Intellectual) ও কার্য্যকলাপে Illogical. কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যদিচ সত্যাগ্রহী ও সর্ব্ববিষয়ে বাহিরে দার্শনিক হইলেও ভাবচালিত (Emotional) ও চিন্তাগত ব্যাপারকে সুনির্ব্বাচিত বাক্যের সাহায্যে একটি নির্দ্দিষ্ট আকারদানে কৃতবিদ্য (Practical) সুতরাং চিন্তা বাক্য কার্য্যে সমন্বয়ী (Logical)। তিনি স্বভাবতঃ নম্র ও ধীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ; সংস্কারকের উত্তেজনা তাঁহার মধ্যে ছিল না। কেবল বিশ্বাসের বল ও ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রাণতাই তাঁহাকে এই সংগ্রামে অপূর্ব্ব বীর্য্য প্রদান করিয়াছিল। বিপুল ঋণশোধের উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটের ভিতরেও তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে ধর্ম্মচিন্তায়, শাস্ত্রাধ্যয়নে ও ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বসনীয় মতের ও আচরণীয় [illegible]ের সমষ্টি গ্রথিত করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু উপাসনা প্রণালীর সংস্কারক। রামমোহনকে সংস্কারক বলা হয়, কিন্তু তাঁহার কার্য্য মাত্র বাহ্য অবলম্বন হইতে পূজাকে মুক্ত করিয়া আন্তরিক ও সর্ব্বজাতির গ্রহণীয় একটি Absolute রূপের পরিকল্পনাতেই পর্য্যবসিত। তিনি সকল ধর্ম্মের সারবস্তু একটা অখণ্ড ঐক্য সন্ধান করেন এবং মনঃসংযোগের জন্য সকল বাহ্যিক প্রয়োগ বর্জ্জন করেন, অথচ যোগীদের মত 'পবনবিজয়-স্বরোদয়ের' ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন। প্রাণায়াম সকলের আয়ত্ব করা সহজ হইবে না বুঝিতেন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অবলম্বন

করিলেন ; কিন্তু যে আশা ও আশ্বাসের বাণী রোগী, দুঃখী, দরিদ্র, পরবশ, কৃপণ, পাংশুল, পাপচেতাকে শান্তির আশ্বাস দিতে পারে, সেই পরম বাণী 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ'-র স্থলটি কিছু দিয়া পূর্ণ করার আবশ্যকতা দেখেন নাই। সে অভাব দেবেন্দ্রনাথ যদিও 'ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'-এর চর্চ্চায় নিজে পূরণ করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের জন্য অন্যভাবে বিস্তারিত বাক্যমালায় অর্পণ করেন। একটা জপমালা বা রেপার্টরী (Repertory) এ পথের পথিকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন, সঙ্গে সঙ্গে জগতের বৈপরীত্য ও বৈষম্যের দুঃখকষ্টের জন্য একটা বিশিষ্ট দার্শনিক তথ্য ও সত্যের অবতারণা, কাল্পনিক হইলেও, জরামরণভীত মুহ্যমান মানব-আত্মার পুনর্জীবন বাক্য, ও কর্ম্মোদ্যমের জন্য যে রাখা আবশ্যক তাহা অনুভব করিলেন না। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের অধীনতা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত ও কার্য্যকরী করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন না। দীর্ঘকালের স্বাস্থ্যবিধায়ী প্রলেপে শান্তি, ঈশ্বরের সর্ব্বমঙ্গলভাব ও সাধকের মনের মণিকোঠায় আত্মপ্রত্যয়ের অশ্রুত বাণীই তাহার পথের আলোক হইবে, তাহাতেই করকাধারার পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদের অমৃতবারি বর্ষিত হইবে, একান্তভাবে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে বিগতস্পৃহ হইয়া সর্ব্ব অবস্থাতেই ভক্তিমান্ থাকিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ হইবে, বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

তিনি ভাগ্যবান্, সে ভক্তির অধিকারী ছিলেন এবং দলস্থ লোকদের জন্য বিশেষ করিয়া ভাবিতেন, কিন্তু উহার উদ্ভব অনিশ্চিত ভগবৎকৃপাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পূজা ঈশ্বরের স্বরূপত্ব নির্ণয়ে রামমোহন তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া "ভগবান্"* আখ্যা দিতে পারেন নাই। তাঁহাকে Creator and Preserver—সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তারূপেই ধরিয়াছেন কিন্তু তাঁহাতেই

* পাদটীকা : ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃশ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব সন্নাংভগ ইতি স্মৃতঃ॥ (শব্দসার অভিধান)

যে সর্ব্ববস্তু প্রবেশ করিতেছে, তিনি যে প্রলয়কর্ত্তা "ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্" এবং সকল বিপরীত ভাব তাঁহারই প্রকাশ ও তাঁহাতেই অবশেষে আশ্রয় পায়, বা তাঁহার বিচিত্র লীলার রহস্য অনুধাবনে যে আনন্দঘন রসের অনুভবে মানব কৃতার্থ হয়, সে সকল ভোজ পথ্যের ব্যবস্থা "পথ্যপ্রদান"-এর প্রণেতা বিজ্ঞ ভিষকের কেন দৃষ্টি এড়াইল বুঝি না। হিব্রু পাঠ করিয়া ইহুদীদের ধর্ম্মপুস্তক, ইংরাজি অভ্যাসে বাইবেল ও আরবী ফার্সী চর্চ্চা করিয়া কোরাণের এবং মূল সংস্কৃতে বেদ-বেদান্ত অশেষ পরিশ্রমে আয়ত্ত করিয়া তাহাদের সারমর্ম্ম মনের বিশেষ ঔদার্য্য ও প্রশস্ততার বলে নিরপেক্ষভাবে তিনি গ্রহণ ও চালনা করেন। তৎকালে 'বৌদ্ধ' কথার প্রচলন ছিল না, তিনি একখানি পুস্তিকা 'লামাদের ধর্ম্ম' বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু সাগ্নিক পার্সীদের কলিকাতায় অবস্থান সত্ত্বেও তাহাদের ঋষি জরথুস্ত্রর (ইংরাজি উচ্চারণ জোরোএ্যাষ্টার Zoroaster) সঙ্কলিত 'জেন্দা-ভেস্তা'র (Zend Avesta) বিখ্যাত গ্রন্থের বা তাহার অন্তর্নিহিত ধর্ম্মচর্চ্চার কোন উল্লেখ পাই না। আর্য্যদের পূর্ব্ব বাসস্থান পারস্যে কৃষিজীবীদের মধ্যে এই ধর্ম্মের উদ্ভব হয় ও সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির উপাসনাই আদিষ্ট হয়। সংস্কৃত 'জ্ঞা'ধাতু ও জেন্দ (Zend) একই মূলগত। তাহাদেরও ধর্ম্মকথা শ্রুতির মত মুখে মুখে ও কর্ণে কর্ণে প্রচলিত ছিল, পরে সংকলিত হইয়া বেদের মত জীবের কল্যাণের জন্য জোরোথুস্তার প্রভৃতির চেষ্টায় সমগ্র জ্ঞান ও সত্যজ্ঞান ও বিজ্ঞানরূপে পূজিত হয়। এ ধর্ম্ম অতি প্রাচীন, বেদের সমসাময়িক এবং অগ্নিতে আহুতিদান প্রভৃতিতে আর্য্য সভ্যতার নিদর্শনে বেদের সহিত ঐক্য দেখা যায়। যেমন কার্ত্তিকমাসে ৶জগদ্ধাত্রী পূজার পূর্ব্ব ষষ্ঠী তিথিতে মৈথিলী হিন্দুস্থানীরা সূর্য্যদেবের বিশেষ পূজায় 'ছট্‌ব্রত উৎসব করে ও দলে দলে নরনারী নদীসৈকতে ফলমিষ্টান্নাদি প্রচুর লইয়া সূর্য্যাস্তের সময় অর্ঘ্যদানের জন্য সমবেত হয়, তেমনি পার্সী মহিলারাও পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে বিশেষ বিশেষ তিথিতে চন্দ্রকে অর্ঘ্যদানমানসে

নদীতীরে গমন করে। বিদেশীর আশ্রয়স্থল কলিকাতা মহানগরীতে এ দৃশ্য নয়নগোচর হয়, যদিও তাহাদের নিকট নদীপূজা বা গঙ্গাপূজার কোন আকর্ষণ নাই। পার্সীদের মধ্যে হুঁকা-কলকেতে তামাক খাওয়া বা চুরুট-সিগারেট-ব্যবহার নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে অগ্নিদেবের অবমাননা করা হয়। সকলকেই নিত্য প্রাতঃস্নান করিয়া অভুক্ত অবস্থায় সূর্য্যোপাসনা করিতে হয়। এক্ষণে যেমন শিখেদের গ্রন্থ-সাহীব আছে, পার্সীরা সেইরূপ আভেস্তা-গ্রন্থিক। হিন্দুদের এরূপ কোন বিশেষ Scripture না থাকায় রামমোহন বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম দিয়া তাহার অভাব পূরণ করেন। আধুনিক কালে মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের কতিপয় শ্লোক শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা আখ্যা পাইয়া এই স্থান অধিকার করিতেছে। মহাভারত, পুরাণ বা মহাকাব্য (Epic) বলিয়া প্রামাণ্য গ্রন্থ নয় কিন্তু গীতা সর্ব্ববাদিসম্মত পূজ্যগ্রন্থ। সনাতন হিন্দুসমাজে গীতা এক্ষণে "সর্ব্বোপনিষদোগাবো", সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ বলিয়া বেদান্তের স্থান অধিকার করিয়াছে, শ্রাদ্ধাদিতে পঠিত ও বিতরিত হয়। যদিও কঠোপনিষদের কতিপয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে কিন্তু দার্শনিক পণ্ডিতেরা বৃহদারণ্যক বা ছান্দোগ্যের ন্যায় প্রাচীনতা হিসাবে ইহাকে শ্রদ্ধা দিতে পরাঙ্মুখ, কারণ ইহাতে কপিল প্রবর্ত্তিত নিরীশ্বরবাদ মনোভাবের প্রাধান্য তাহা বেদসংশ্লিষ্ট উপনিষদ্‌গুলিতে নাই বলিলেও হয়। তাঁহাদের গণনায় সাংখ্য আধুনিক। গীতার মাহাত্ম্য অধিক পরিমাণে বরাহপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গীতার প্রতিপাদ্য সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ লইয়া ইহার ৩য় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ঃ

"জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।
কর্ম্মনামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে॥"

সাংখ্য দর্শনের তত্ত্ব ও পরিভাষা না জানিলে গীতা আয়ত্ত করা কঠিন। সে যাহা হউক, ইহার প্রভাব এখন বিশ্বব্যাপী, সকল সভ্য ভাষাতেই ইহার অনুবাদ হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও লোকে ইহার আদর্শে

জীবন গঠন লক্ষীভূত করিয়াছে। এমন কি, ইংরাজি সভ্যতার বড় বড় সামাজিক সমারোহে গম্ভীর functionএ Bible-bearersদের পার্শ্বে গীতা-bearersদের স্থান হইয়াছে। রামমোহনের সময়ে ইহার চর্চ্চা তাদৃশ ছিল না। রাজার নিকটলক্ষ্য ছিল মিশনারীদের অত্যাচার ও তাহাদের পৌত্তলিকতার অবজ্ঞার প্রতি; তাই জাতির এ কলঙ্ক দূর করিতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে। তিনি দেখাইলেন যে আমাদেরও ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ এবং অপৌত্তলিক শ্রেষ্ঠতর উপাসনাও আছে, তবে অধিকারিভেদে যে তাহা অবলম্বনীয় তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না। চেম্বারের জীবনী অভিধানে (Chamber's Biographical Dictionary) উইলিয়ম জ্যাকসনকৃত পুস্তক হইতে সংগৃহীত অবেস্তায় বর্ণিত পার্সীদের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের মত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য দেখিতে পাই "He carried on a political and a theological struggle for the wider establishment of a holy agricultural state as against Turanian and Vedic aggressors. The keynote of his system is that the world and history exhibit the struggle between Ormurzd and Ahriman, the creator or good spirit and the evil principle, the devil, in which at the end evil will be banished and the good reign supreme." অধর্ম্মের নিধন ও ধর্ম্মের জয়। এই হর্মার্সদ্ ও আহ্রমানের তথ্যই খৃষ্টীয় বাইবেল ও মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রন্থ ও মুসলমান সাহিত্যে ইব্লিস বা শয়তানের দুঃখ ও দমন কাহিনীতে রূপ পাইয়াছে এবং এই সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব কি বহিঃরাজ্যে কি অন্তররাজ্যে সকল সভ্য মানবজাতির ধর্ম্মের ভিত্তি। মার্কণ্ডেয় পুরাণে স্রষ্টার সৃষ্টিকার্য্যের অন্তরায়স্বরূপ মধুকৈটভের দানবীয় শক্তির প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহাদের বশে আনিয়া কেয়স (Chaos) বিশৃঙ্খলার স্থলে কস্‌মস্ (Cosmos) নিয়ম ও শৃঙ্খলার জগত আবির্ভাব করিতে, নিরস্ত্র সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে লোকপালনীয়

গুণের বশবর্ত্তী হইয়া, বৈষ্ণবী মায়া প্রকট করিতে হয়। তামসিক ও রাজসিক উভয় প্রকার বিভূতিই একমাত্র সাত্ত্বিকগুণোদ্‌ভাসিত বিভূতিতে আচ্ছাদিত করিতে হইল। নব প্রচারিত ব্রহ্ম উপাসনায় ঈশ্বরের রাজসিক ও তামসিক শক্তির প্রচ্ছন্নতাতেই একটু বিশেষত্ব দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উপাসকের তাহাতে লাভ অপেক্ষা সত্য পরিচয়ে ক্ষতিই বেশী। সম্ভবতঃ দুর্ব্বল মানব-মন এরূপ সমর কাহিনীতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পৌত্তলিকতাপরায়ণ ও তুল্যশক্তিযুক্ত ঈশ্বরের দ্বৈতভাব কল্পনা করিয়া, একাধিপত্ব ও একমেবাদ্বিতীয়ম্ বাক্যের খণ্ডতা আনয়ন করতঃ পরিমিত বিধাতার পূজায় ব্যাপৃত রহিবে, এই আশঙ্কা করিয়া, এদিকে রাজা দৃষ্টিপাত করেন নাই। ত্রিগুণাতীত একেশ্বরের উপাসনায় মনকে সদাসর্ব্বদা শুভের দিকেই লক্ষ্যবদ্ধ রাখিতে হইবে। Voltaire-এর "All is for the best in the best of this world" চিন্তা করিয়া সর্ব্বকল্যাণময় ঐশ্বরিক সাত্ত্বিক লক্ষণার জয়গান দিতে হইবে। দেবেন্দ্র-নাথের একটি বক্তৃতায় দেখিতে পাই "তাঁহার প্রতিরূপ সকল স্থানে। মাতার স্নেহ, ভ্রাতার সৌহার্দ্দ্য, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম, এ সকলই তাঁর প্রতিরূপ। সৃষ্টির সৌন্দর্য্য, মানুষের মুখশ্রীতে, ধার্ম্মিকের কল্যাণতর অনুষ্ঠানে তাঁহার ভাবের প্রতিরূপমাত্র দেখা যায়।" রোগক্লিষ্ট উপাসকের 'আরোগ্যরূপম্ দেহি মে' কিংবা অলক্ষ্মীরূপ অপসারিত করে কালাকাল-বিভেদিনী লক্ষ্মীরূপে আবির্ভূত হও, জয়দায়িনী আমার সেই বোধশক্তি জাগ্রত কর, বলিয়া কাঁদিবার স্থান নাই। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য প্রবীণ তান্ত্রিক রামমোহন কি মহিষমর্দ্দিনীর মায়াজাল জানিতেন না, যে মহিষ ও সিংহ উভয়েই তাঁহার সৃজিত এবং তাঁহারই পদানত, তবে ভাবের তারতম্য আছে, হর্ম্যাসদের পৃষ্ঠোপরি সম্পূর্ণ পদ দিয়া তিনি আনন্দ বিহারিণী, আর আহ্নমানের স্কন্ধে সতর্কে ও সন্তর্পণে অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া তাহাকে তাহার স্বীয় দর্পলীলায় পূর্ণানন্দ করিতে প্রশ্রয় দিয়াছেন।

''দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।"

আর সাধককে "স্তূয়মানঞ্চ তদরূপম্' ত্রিভাবকেই একত্রে বরণ করিতে হইবে, কেবল সাত্ত্বিকভাবটি বাছিয়া লইলে চলিবে না।

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা।

(মহাভাগবত পুরাণ)

তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—''ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা অজারে খোঁটায় বেঁধে থো—" ও' দুইই বলিদানের যোগ্য, মায়ের পায়ে ফুল দেবার সময় গোলমাল করে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডির উত্তরচরিতম্ .একদশ অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে আছে।

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ"

এবং তৎপরে অষ্টম শ্লোকে বলা আছে—

"সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে"

সুতরাং মানবীয় সাধনা ও সংস্কৃতি আলোচনার মধ্যেও তাঁহার উপাসনার সঙ্কেত পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্যা এই—

ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ?

বিষ, বিষ্ঠা, বিকৃতি, বায়ু, বর্জ্জন সম্বন্ধে বোধ ও তাহার ব্যাপকতা ও বশীকরণ লইয়া বৈদ্যদের ব্যাপৃত থাকিতে হয়। সেইজন্য মানবসমাজে তাহাদের শ্রেষ্ঠ আসন, কিন্তু তাহার বিশাল সমগ্রতা ধরিলেও উহা খণ্ডজ্ঞান; বাসনা-বাতিক বা প্রবৃত্তি-পৈত্তিক ঘুচাইতে বা সর্ব্বরোগহর বৈদ্যনাথকে চিনাইতে বা ব্রহ্মবিদ্যালাভে অল্পই সহায়তা করে। বৌদ্ধদের মধ্যে এই বিভেদ-জ্ঞান বা বিজ্ঞানের সমাদর বেশী, যেহেতু ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য, কর্ম্মযোগ ও জীবকল্যাণ সাধন, এই পথে প্রকৃষ্ট ভাবে হয়। নবযৌবনমার্গী তান্ত্রিকেরাও সেই কারণে ঔষধের চর্চ্চা ও রাসায়নিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াকে ধর্ম্মচর্চ্চার অন্তর্গত করিয়াছেন। শ্রীমদভাগবৎ গীতার মতে ইহা রাজসিক জ্ঞান।

"পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানা ভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥"

আত্মজ্ঞানান্বেষীদের খণ্ডজ্ঞান অতিক্রম করিয়া বৈষম্যের মধ্যে সাম্যের অনুসন্ধান করিতে হয়। তাহার ভিতর মনের ও প্রাণের বিকৃত অবস্থা লইয়া অনেক সত্য ও তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মানবকে ধর্ম্মপথে চালিত করিবার জন্য সকল প্রতিবন্ধক দমনের ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে। সমজ্ঞান ও দমনীতিই তাঁহাদের কারবার। বাংলাদেশে শরৎকালীন মহোৎসবের কেন্দ্রে যে ভগবতী দেবীর কল্পনা পৌরাণিকরা করিয়াছেন, এবং প্রবীণ সাকারবাদী পূজারীরা যাহা বর্ষে বর্ষে সম্মুখে রাখিয়া উপাসনায় নিরত থাকেন, সেই সুরথ রাজার পরিকল্পিত মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে দেখা যায় যে, একটা মহিষের দেহ খণ্ডিত হওয়ায় তাহার ভিতর হইতে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত অস্ত্রবিজড়িত সশস্ত্র মানবীয় মূর্ত্তি নির্গত হইতেছে। তাহাকে সাধারণে দানবীয় শক্তি বলিয়া ধরিয়া লয়। সাধকেরা কিন্তু তাহাকে নিজেরই প্রতিমূর্ত্তিবোধে পূজা করিয়া থাকেন। উহাকে একটি ভীষণ রক্তরক্তিকৃতাঙ্গ কেশরী মুখব্যাদনপূর্ব্বক নখদন্ত বলে বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে, ইহাই সাধকের তপস্যা বা আত্মবলের প্রতীক। যে করি-কুম্ভ অনায়াসে বিদারণ করিতে পারে, দুর্জ্জয় বলে বলশালী, বায়ুসম যাহার ক্ষিপ্রতা, যাহার সাহস অতুলনীয়, লোকের ভীতিপ্রদ, আত্ম-গাম্ভীর্য্যে সদা নিবদ্ধ, যে নিঃশঙ্ক ও নিঃসঙ্গ গিরিকন্দর আশ্রয় করিয়া থাকে, এমন সিংহকে ঋষিরা দেবীর উপযুক্ত বাহন কল্পনা করিয়াছেন, "তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্য।" সেই পশুরাজ, প্রজনন ব্যাপারকে এ মত জয় করিয়াছে যে, সেজন্য সে পুষ্পাঞ্জলি পাইবার যোগ্য। সে আধ্যাত্মিক পথের প্রথম সোপানরূপে পূজিত। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' সুতরাং অধ্যাত্ম হুতাশন রক্তমাংসবিশিষ্ট দেহেই প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে. অতএব শেষ পর্য্যন্ত পশুত্ব আশ্রিত। কামনার কঠিন স্থূলতর চর্ম্মে আচ্ছাদিত মহিষাকারে কুপ্রবৃত্তিপুঞ্জকে কারাপিঞ্জরমুক্ত সুবুদ্ধি সিংহের

কবলিত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। শরীর দ্বিখণ্ডিত হইলেও প্রবৃত্তির বিনাশ নাই। রক্তমাংসের অধীনতা ও মমতা হইতে মুক্ত হইলেও, সুখস্বপ্ন ও সুখস্পৃহা ও কালের বশ্যতা মানবকে উন্নতির পথে বাধা দেয়। কালের সম্মুখীন না হইলে মোহ কাটে না। মোহ মুক্ত না হইলে ভগবৎ দর্শন লাভ হয় না। অধিকন্তু প্রাণীমাত্রেরই কাম ব্যাহত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তাই উদ্‌গত সে ক্রোধকে অসুরদলনী তীক্ষ্ণভল্লদ্বারা বিদ্ধ করিয়া কালের নাগপাশে বদ্ধ করেন। ইহাই ভগবৎ কৃপা। আরাধনা করিয়া ইহা লাভ করিলে সাধকের অবিনাশী চরমজ্ঞানের বিকাশ হয় ও বিমল প্রতিভারূপ সাত্ত্বিক জ্ঞান ত্রিনয়না রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে তাহার নয়নে উদিত হইয়া নিত্য আনন্দ দান করেন। তাহাকে বেষ্টন করিয়া অন্নদা-বরদা কমলার আবির্ভাব হয়। যে জ্ঞানালোকে অস্বচ্ছন্দ বোধ করে, বাস্তববিলাসের তামসিকতা যাহার নয়নের অঞ্জন, সেই দিবান্ধ বা বিষয়ান্ধ পেচকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শ্রী-সৌন্দর্য্যশালিনী শতদল-বিহারিণী কনককমলপাণি অভিজ্ঞতা দেবীর আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। ইনি কাঞ্চনগৌরবর্ণা, ইঁহার কৃপা, ধর্ম্মার্থকাম-ত্রিবর্গের-বল, লাভ করিলে সাধকের পাথেয়স্বরূপ হয়। তৎপার্শ্বে মূষিকরূপী তীক্ষ্ণদন্ত বিচার শক্তিতে ভর করিয়া রাজসিক ও সাত্ত্বিক কর্ম্মনীতি সিদ্ধিদাতার আসন স্থাপিত হয়। ক্রমে তুষারশুচিজ্যোতিরূপা মোক্ষপ্রদায়িনী বিশুদ্ধ জ্ঞানের দর্শন ঘটে, বিদ্যা ও বাক্যে আনন্দের আস্বাদন মিলে। সৃজনশক্তির অনুভূতিতে পরাতত্ত্ব ও পরাশক্তির সমীপবর্ত্তী হওয়া যায়। তখন ক্ষীর নীর বিশ্লেষণ-কারী নিষ্কলুষ আত্মারূপী পরমহংসকে আশ্রয় করিয়া বীণাবাদিনী তাহার জীবনকে সুছন্দ দান করেন।

এই সকল বিগ্রহের সমন্বয়ের শীর্ষদেশে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' বিরাজিত থাকিয়া বিশ্বচিত্রশালার সুরাসুরের দ্বন্দ্ব মধ্যে পুজককে অটল থাকিবার ও নিত্য সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিবার শক্তি দিতে থাকেন। পুরাকালে শুধুই সিংহবাহিনীর রূপ কল্পনা করিয়া সকাম ও নিষ্কাম এবং

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিভাবের সংকল্পে পূজার অবতারণা হইত। পরে সাধকদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত অন্যান্য মূর্ত্তিবিশেষ ও চালচিত্তির যোগ হইয়া থাকিবে। দশায়ুধধারিণী দেবীই যে দশদিক রক্ষা করিতেছেন ইহাও পরবর্ত্তীযুগের কল্পনা। "নানারূপ ধরে দেবী" সুরঞ্জিত বৈচিত্র্যময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে, কিন্তু যাহার বোধ হয় সমস্তই পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় ওতপ্রোত একরঙা বস্ত্রখণ্ডে আবৃত সেই পদবী পায় সু-র, তাহার চোখের রঙই ভাল, সুদৃষ্টি। যে অকপট চিত্তে দৃঢ়-প্রত্যয়ের ভূমি হইতে বলিতে পারে—

"ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমসি হুতবহো গন্ধবাহস্ত্বমেব
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্ব্বিকাহং-কৃতিশ্চ
আত্মাপ্যেবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে॥"

(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত স্তোত্র)

সেই 'সদা পশ্যন্তি সূরয় দিবিব চক্ষুরাততম্‌' অসুরসূদন মহাবিষ্ণুর আশ্রিত হইবার যোগ্য। আর এতদ্ব্যতিরেকে যে পার্থক্যে মুগ্ধ বা জগতের সু এবং স্ব-ভাব না লইয়া, আপাতঃ দৃষ্টিতে ভোগবিলাসে মগ্ন রহে, সদা আত্মপরভেদজ্ঞানে যাহার জীবনপ্রবাহ চলিতে থাকে, সে 'অ-সুর.' তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পাণিনি ব্যাকরণের ধাতুরূপ ডু (তনাদিগণ) অবলম্বনে জগন্নাথের বিশাল রথচক্রনেমী পরিদর্শনে চর্পটপঞ্জরিকা স্তোত্রতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে ধ্রুবপদ দিয়াছেন—

"ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষীত ডু কৃঞকরণে॥'

তাহার অর্থ এইরূপ, "এ ভূমণ্ডল ও তন্মধ্যস্থ প্রাণীগণকে যিনি [illegible] আছেন ও যাহাদের ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে অন্তর্যামীরূপে যিনি বাস করেন, সেই সর্ব্বজ্ঞানের আধার গো-বিন্দকে তোমরা রূপভেদে দিশাহারা বিমূঢ়-বুদ্ধি মানবগণ প্রতিনিয়ত ভজনা কর। যেহেতু, মৃত্যুর সন্নিকট হইলে,

আমিই সব করিতেছি এরূপ ভাবান্বিত ব্যক্তি, অর্থাৎ বাহুবলে দৃপ্ত কর্ম্ম-কর্ত্তা, কখনই রক্ষা পায় না। এই কারণেই, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীকবচ সাধককে ধারণ করিতে বলা আছে ও তন্মধ্যে প্রার্থনা যোজিত হইয়াছে "অহঙ্কারং মনোবুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্ম্মধারিণী" অর্থাৎ দেবী যেন আমার অহঙ্কার মন ও বুদ্ধি সতত ধর্ম্মধারিণীরূপে রক্ষা করেন। জগতে এ তিনেরই প্রয়োজন আছে। সৎকর্ম্মে ও সৎপাত্রে অধিষ্ঠিত থাকিলেই মঙ্গল, নতুবা অশুভ। ধর্ম্মের হাতে আত্মসমর্পণ বাঞ্ছনীয়, যাহাতে এইগুলি ধর্ম্মভাবপ্রণোদিত ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে কার্য্যকরী হয়। পুরাণকর্ত্তাদের মতে অসুরের প্রধান পরিচয় ও প্রকাশ পরের ধন ও অধিকার হরণে, দেব-প্রকৃতি জীবের অনিষ্ট ও ক্ষোভ উৎপাদনে আর দর্প ও অহঙ্কারের বিকাশে। গীতার ষোড়শ অধ্যায় চতুর্থ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেকতা আসুরী সম্পদ। যে সকল ব্যক্তি রাজস্ কিম্বা তামস্ ভাব লইয়া জন্ম-গ্রহণ করে, তাহারা এই সকল গুণযুক্ত হইয়া দিন যাপন করে।

এই অহঙ্কারের নিত্য নানারূপ অভিব্যক্তিতে দ্বেষ, ঘৃণা, অবজ্ঞা, অস্পৃশ্যতা হিংসার পরিপুষ্টি দেখিয়া বৈষ্ণব দার্শনিকেরা অভিমানের ও অনুরাগের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্ব্বক মানবকে বাক্যে ও আচরণে সতর্ক করিয়াছেন। ফলে সাধন ও অভ্যাসবলে ঐ সম্প্রদায়ের লোকের বিনয়-ভঙ্গী ও সংযত বাক্য এরূপ অসাধারণ হইয়াছে যে জনসাধারণে অসুর ও পাষণ্ডপ্রকৃতির লোকের অধিকাংশের নিকট উহা এবং হরিচন্দনতুলসী-মালা শোভিত দেহ গেহ, হাস্য ও রহস্যালাপের বিষয়মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহার কারণ, সাধনের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্তর, চিন্তা বাক্য ও কার্য্যের ঐক্য সম্পাদন করা, শুধু আচরণ গ্রহণে হয় না। প্রতিমুহূর্ত্তে বোধ রাখা প্রয়োজন, যে মুরলীরূপা যোগমায়াকে করে ধরিয়া 'শিখিখণ্ড-বিমণ্ডিত ভালতটং' শ্রীকৃষ্ণ, জীবের হৃদ-পুণ্ডরীকে অবস্থান করিয়া সকল প্রেরণা (urge) দিতেছেন, যদ্দ্বারা তাহাদের প্রাণধারণ লীলা সম্ভবপর হইতেছে,

সুতরাং সকল রস ও সংস্কৃতির বা কালচারের (culture) অধিনায়ক সেই অন্তরবাসী ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান।

অনিমা লঘিমা ব্যপ্তি প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিতঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥ (শব্দসার)

ইহাকেই ভগবত বিভূতির অন্যতম "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য" বলা হইয়াছে। বিশ্বজগতে তিনিই বিষ্ণুরূপে ব্যাপ্ত, এবং তাঁহার সাকার মূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্র। যিনি ত্রেতাযুগে ধর্ম্মের গ্লানি নিবারণার্থে মনুষ্যসমাজে অবতাররূপে আবির্ভূত হন, তিনি নরোত্তমের আদর্শ। সেই হেতু সকল সাধু ব্যক্তিরই সর্ব্বচরাচরকে তাঁহার মত প্রেমবস্ত দৃষ্টিতে অবলোকন করা কর্ত্তব্য। স্থাবর, জঙ্গম, পশু, পক্ষী, জায়া, পুত্র, সংসার, সমাজ—সকলের সহিত ব্যবহারে ন্যায় ও বাৎসল্যের পরিচর্য্যা করিতে পারিলে, রামরাজ্যের পুণ্য স্মৃতিকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দেওয়া হয় ও আত্মোন্নতির পথ মুক্ত করিতে পারা যায়। ভক্তপ্রবর হনুমানের মত বলিতে পারা চাই, অন্তরে বাহিরে অজস্র বিভিন্নরূপ ও পূজার্হ বস্তু থাকিলেও "তথাপি মম সর্ব্বস্য রামঃ কমললোচনঃ" সকলই রামময় দেখিতে হইবে।

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম হইবে, দেবী দুর্গার বীজযুক্ত এই তিন উত্তম পুরুষের নাম, অর্থাৎ জগতের জীবনাত্মক ত্রৈলোক্যপালক শ্রীহরি, যে চিন্ময় পুরুষের প্রভাবে জীবের মধ্যে ভাবের উৎপত্তি ও লয় হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ ও রাঘবং রাবণারিং শ্রীরামচন্দ্র, পূর্ব্ববর্ত্তী তিনযুগের যাঁহারা মহামানব (superman) বলিয়া পরিচিত। মানবের ও বিশেষতঃ জীবন্মৃত বঙ্গবাসীগণকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাই ইঁহাদেরই নাম বত্রিশ অক্ষরে গ্রথিত করিয়া সর্ব্বসাধারণে ব্যবহারার্থে প্রচার করেন। তাঁহার পূর্ব্বেও শ্রীহরির পূজা ও জপ ও নামগান প্রচলিত ছিল তাহাকে তিনি অধিক পরিমাণে ভাবযুক্ত ও শক্তিশালী করেন পাণ্ডিত্যজনিত বিশ্বাসের বলে। যাঁহাদের বৈদিক সাবিত্রী-দীক্ষা ও ইষ্ট-মন্ত্রের জন্য তান্ত্রিক দীক্ষা হইয়াছে,

তাঁহারা নিজস্ব সাধনে এই নাম-মালার সহিত প্রণব ও লজ্জাবীজ যুক্ত করিতে পারেন। গণতন্ত্রে সমন্বয়, নাম মাহাত্ম্য ও কীর্ত্তনানন্দ ভারত-ব্যাপি প্রসার লাভ করে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়। নব জাতিয়ন্ত্রের উদ্ভব ও নৃত্যের দ্বারা ভগবতানুভূতি লাভ আমরা তাঁহারই প্রতিভার দানস্বরূপ পাইয়াছি। নামরূপের বিশেষত্বে মজিয়া যাইলে সর্ব্বজীবে রামময় দৃষ্টি আসিতে বিলম্ব হয়। বস্তুচর্চ্চার দ্বারা বস্তুজ্ঞান জন্মে, তত্ত্বদর্শন ও চিন্তার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মায় আর তত্ত্বমালা বিভূষিত শ্রীগুরুর কৃপা ভিন্ন ভগবত তত্ত্ববোধ লাভ হয় না, "একোহি-বহুশ্যাম," তিনিই যে বহু হইয়া তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এ বোধ আসে না।

"মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে
তেমনি আমার দোল দিয়ে যাও।
যাবার আগে, যাওগো আমায় রাঙিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে।

(নটরাজ)

ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি সুভাষিত উক্তি, বলা যত সহজ অনুভব [illegible] আর সেই নাচের ক্ষেত্রে থাকিয়া ভাবাশ্রিত সাধককে দিক্ [illegible] মাঝখানে নাচিতে হইবে, অথচ—

"না নড়িবে গণ্ডমুণ্ড, না নড়িবে কর্ণের কুণ্ডল (পদকল্পতরু)

ইহা আদর্শরূপে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের সাধনসাপেক্ষ হইলেও অভ্যাসে [illegible] করা কঠিন। তাই কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যদেবকে অঙ্কন [illegible] বসিয়া পয়ারে বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণময় তনু যার—অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥"

আর অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন তাঁকে, নরোত্তম ঠাকুরের ভাষায়—

"গৌরাঙ্গ বলিতে যার পুলক শরীর ॥
কৃষ্ণ নাম কহিতে নয়নে বহে নীর ॥"

অর্থাৎ হৃদয়কন্দর সতত গৌরসুন্দরের সুবর্ণ জ্যোতিতে পূর্ণ থাকা প্রয়োজন, দেহ ও মন নিষ্কলুষ ও চিত্ত বিক্ষোভশূন্য থাকিলে এই দিব্য ভাবের আস্বাদন হয়। ভোগায়তন স্বীয় দেহকে, কল্পনা হইলেও, 'দেব-মন্দিরম" জ্ঞান ও ধারণা করা এবং পবিত্রতা ও 'সৌন্দর্য্যবোধের তীক্ষ্ণতা ইহার মূলভিত্তি ও পত্তনভূমি।

অপরপক্ষে ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিতে ভর করিয়া ঊষরতা মোচন ও সর্ব্বপ্রকার সহনশীলতা, ঘৃণাদি জয় ও যোগ্যতা অর্জ্জন, তান্ত্রিক সাধনার অষ্টসিদ্ধি আয়ত্ত্ব করা, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অন্তরায় হইলেও অনেককে প্রলুব্ধ করিয়াছে, পরন্তু কিয়ৎপরিমাণে সাফল্য ও স্বার্থকতা দিয়াছে। সে পথে অহঙ্কারই প্রধান পরিপোষক, বিশ্বশক্তি আত্মজ্ঞানে সঞ্চারিত করাই প্রধান কার্য্য। সেইজন্য তান্ত্রিককে রাজসিক বল ও বিশ্বাসের মদ ও মাদকতা আশ্রয় করিতে হয়, কিন্তু মাৎসর্য্যের দমন না হইলে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ইঁহাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ আনন্দের তূরীয় অবস্থানে

"ন বীরো, ন ধীরো ন বা মোক্ষাকাঙ্খী,
সদাতুষ্টচেতা, ত্রিশূলকপালী
ললাটে পুণ্ড্রক্ গলে অক্ষমালা
করে পানপাত্র মুখে মন্ত্রহালা।

কপাল = নরকপাল = অর্ঘস্থাপনের ঘট, পুণ্ড্রক বা ত্রিপুণ্ড্রক = ঊর্দ্ধ ললাটে তিনটি রেখা রক্তচন্দন দ্বারা অঙ্কিত, অক্ষ = রুদ্রাক্ষ বা অস্থিসমূহ [illegible] কারণ-স্নান-জল-পানীয়ের চোষক, হালা = সুরা বা সমুদয়।

ভোজনে ঘৃণাসঙ্কোচশূন্য, 'যত জীব তত শিব' ভাবে, শূদ্রাদির সহিত সমপ্রাণতা ও সখ্যতায় নিবদ্ধ, অদ্বৈত আত্মার প্রচণ্ড দীপ্তিতে

ভাস্বর, অঘোরপন্থী অবধূতকেও যে সন্তর্পণে চলিতে হয়, যাহাতে খণ্ড ব্যক্তিত্ব-বোধের গর্ত্তে ও মমতা-আবর্ত্তে তাঁহার পতন না হয়। শ্রষ্টার আবরিকা মায়া এত দুর্ভেদ্য এবং মমতার ঘূর্ণির আকর্ষণ এমন অলঙ্ঘনীয় যে শাস্ত্রকাররা সততই সন্ত্রস্ত। জ্ঞানকর্ম্মপক্ষদ্বয়ে ভর করিয়া যে বিশ্বের রক্ষণ শক্তিকে বহন করে, সেই দ্বিজরাজ খগেন্দ্রেরও একদিন আরাম-প্রিয়তা, আত্মবোধ, পরাধীনতা ক্লেশ এবং যন্ত্রবৎ চালিত হওয়ার অসহিষ্ণুতা আসিয়াছিল, কিন্তু দর্পহারী মধুসূদনের দয়ায় প্রতিকূল বেদনের মধ্য দিয়া পুনরায় মানসিক স্বাস্থ্য লাভ করিয়া তিনি স্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার বর্ণনা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে গরুড়ের দর্প-প্রসঙ্গ আখ্যায়িকায় পাওয়া যায়।

গরুড় উবাচ—

সোঽহং পক্ষৈকদেশেন বহামিত্বাং গতক্লমঃ
বিমৃশ ত্বং শনৈস্তাত কো ন্বত্র বলবানিতি ॥

১০৫ অঃ। ১৭

ভগবানুবাচ—

ইদং ভারমেকং ত্বং পাহুং সর্ব্বেতরং বহ
একোঽহং ধারয়াম্যেনং সফলং তে বিকত্থনম্ ॥

১০৫ অঃ। ২১

[illegible] শতকিয়া মন (arithmetic mind), [illegible] সংকীর্ণ দৃষ্টি, যেদিন টাইপ (type) ধরিতে [illegible] সমীকরণে উৎপাদক (factors) এর সমীকরণ [illegible]) করিয়া বীজগণিতে অবস্থান করিতে পারিবে, সে নব গঠিত [illegible] mind) মন লইয়া সে দিন সে বীরাসনে বসিয়া উপরোক্ত [illegible] মহাশক্তির প্রতীকের বা ঐ সিম্বল (symbol) [illegible] মৃন্ময়ী প্রতিমার মূল্য (value) সম্যক বুঝিবে ও পূজার অধিকারী হইয়া সাধনপথের লভ্য ও প্রতিবন্ধকের হিসাবনিকাশ করিয়া

জয়যুক্ত হইবে। "সর্ব্বস্যরূপে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে" সর্ব্বানীই যে একাধারে, কামরূপা কামদা ও দুঃখহারিণী, ভীমনয়না হইলেও সর্ব্বরোগহরারূপে বিরাজ করেন, সেই সর্ব্বমঙ্গলা জ্ঞানদা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানটি লাভ করিয়া সাধক পরিত্রাণপরায়ণা জননী পরমজ্ঞানরূপিণী কাত্যায়ণীর স্নেহ-ক্রোড়ে আশ্রয় পায় ও সর্ব্ববিধ শঙ্কার হাত হইতে মুক্তিলাভ করে, বিশেষতঃ তার পাতকভীতি একেবারে তিরোহিত হয়। এই কাত্যায়নী দেবীকেই বৈষ্ণব-দার্শনিকরা বৃন্দাবন-দ্বাররক্ষাকারিণী-রূপে কল্পনা করিয়া থাকেন, অগ্রে তাঁহার পূজা প্রয়োজন। তিনি তুষ্ট হইলে লীলাসুন্দর নটবরের সাক্ষাৎ ও সঙ্গলাভ হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সকলপ্রকার অভিমান লজ্জা সঙ্কোচ ও ভয়কে ত্যাগ করিতে হইবে, তবে তাঁহার সহিত গাঢ় মিলন হইবে। তিনি ভক্তের হৃদিবৃন্দাবনস্থিত প্রেমময় গোলকেশ্বর এবং নিত্য বৃন্দাবনে হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধার সহিত রাসমণ্ডপে থাকিয়া নিত্য সিদ্ধ গোপ-গোপিকার নিত্য আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। মার্কণ্ডের পুরাণে দেবীর অবতারকল্পে বলা আছে যে তিনি পরবর্ত্তী যুগে

"নন্দ-গোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
তত স্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী॥"

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ১১ অঃ।৪২

হইবেন। রাধাতন্ত্রে কিন্তু আদ্যাশক্তি কালিকার কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণের কথা আছে এবং তাঁহার পরিপূর্ণ প্রেমলাভের জন্য স্বয়ং মহাদেব কৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত রাধিকামূর্ত্তিতে বিগ্রহান্বিত হন। ভক্তির আধিক্যে মহাভাবের ভিতর দিয়া প্রেমমাধুর্য্যে ভগবানের সহিত মিলন হয়। সেরূপ প্রেম সংযোগ জ্ঞানচর্চ্চায় ভগবানের ঐশ্বর্য্যবোধ দ্বারা লভ্য নহে।

"ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥"

গৌরাঙ্গদেবের উক্তি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দেখ।

একবার যবে রুক্মিনী সত্যভামার ইচ্ছাপূরণ মানসে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ রাসের আয়োজন করেন, ভগবান কিন্তু বৃন্দাবনের অনুষ্ঠিত রাসের আনন্দ মহিষীবৃন্দকে দিতে সমর্থ হন নাই। যেহেতু মহিষীরা কেহই ভক্তির পরাকাষ্ঠা সর্ব্বসঙ্কোচশূন্য আত্মাভিমানবর্জ্জিত মহাভাবের অধিকারিনী ছিলেন না। ইহার অপর একটি যুক্তি, পুরাণকর্ত্তাদের পরিকল্পনায় কৃষ্ণ যামল ও গোপালচম্পূতে পাওয়া যায়, তাহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের উক্ত-বচনের একটা সমীকরণ পন্থাও পাওয়া যায়। কংস কারাগারে দৈবকী-নন্দনরূপে বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করেন, আর গোকুলে যশোদাগর্ভে যোগমায়া সমভিব্যাহারে স্বয়ং গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তথায় বসুদেব যখন নিজতনয়টিকে লইয়া যান, তখন যশোদা-দুলাল ও বাসুদেবে মিলিত হইয়া একটি মাত্র শিশু হইয়া যায়। বসুদেব কন্যা যোগমায়াটিকে কারাগারে ফিরাইয়া লইয়া যান। বালগোপাল ও কিশোরগোপাল ভাবে বৃন্দাবনের মাধুর্য্যলীলা সকল সম্পাদিত হয়। বৃন্দাবন হইতে অক্রুরের রথে যখন কৃষ্ণ গমন করেন তখন গোলোকেশ্বর গোলোকে প্রয়াণ করেন ও নারায়ণ মথুরায় কংসবধ, দ্বারকায় রাজ্য-স্থাপন ও চালনা, এবং কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে পার্থ-সারথীরূপে সেই শ্রীভগবান তাঁহার ঐশ্বর্য্যলীলা প্রকট করেন। সুতরাং রাসলীলা বা ভক্তের সহিত প্রণয় সাহচর্য্য মথুরায় বা দ্বারকায় বা পাণ্ডব সহবাসে অসম্ভব কারণে নিয়মতান্ত্রিক ভগবানরূপে পূজিত হন। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর করুণা সরস চপল লীলায় অনিয়মে ব্যক্ত হয় ইহা তাহারই নিদর্শন, যে-হেতু তিনি সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বশক্তিমান সকল বৈপরিত্যের আকর ও আধার। পদকর্ত্তারা তাই বৃন্দাবনলীলা ও মাথুর ও প্রভাসলীলার পার্থক্য করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাবধি যুগলমূর্ত্তির উপাসকেরা ভজনকালীন ও ভজনসঙ্গীতে সে পার্থক্য নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করেন; একীকরণকে তাঁহারা সাধন ব্যাভিচার বলিয়া থাকেন।

বীজগণিতের সমীকরণ সাঙ্কেতিক সূত্র (formulæ) দ্বারা সুসাধ্য

হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক সমীকরণ বিধিবদ্ধ প্রণালীতে সূত্র দ্বারা সহজলভ্য বা আয়ত্বাধীন হয় না। প্রত্যেকের ভিতর হইতে আসা চাই। দেবেন্দ্রনাথ ইহা পরিণত বয়সে অনুভব করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্ম শিষ্যগণকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত formulæ সূত্র দ্বারা উপাসনা কালীন সে বিষয়ে সতর্ক হইতে বলেন।

"পঞ্চবিংশতির" ২৭-৩৩ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"একমাত্র সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ঈশ্বরকে লোকের নিকটে প্রতিপন্ন করিবার ভরসা যদিও রামমোহনের ছিল না এবং আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিতে লোকদিগকে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজজ্ঞানই ছিল। নতুবা সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি কেমন করিয়া সারসত্য সংকলন করিলেন? যে ধর্ম্ম সহজজ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা হইতে অনুষ্ঠান পদ্ধতি নিবদ্ধ হওয়া ও কার্য্যে পরিণত হওয়া ইহা নূতন সৃষ্টি। কেবল ভারতবর্ষেই সম্ভব।" তাঁহার মতে, ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তকখানি আত্মপ্রত্যয়পোষক অন্যতম আদর্শ গ্রন্থ, অদ্বিতীয় বা শেষ গ্রন্থ নয় বলিয়াই মনে করিতে হইবে। স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত একখানি পত্রে (পত্রাবলী ১০২) একখানি হিন্দী গান দিয়া দেবেন্দ্রনাথ এইটি বেশ বুঝাইয়াছেন। তিনি একটি হিন্দী পরমার্থ সঙ্গীত 'ভজন'-এর প্রথম ও শেষ পংক্তি হইতে উদ্ধৃত করেন।

"১। জিন প্রেমরস চাখা নেহী
অমৃতরস পিয়া তো ক্যায়া হুয়া ?
২। মৎলুব হাসিল ন হুয়া
রো রো মুয়া তো ক্যায়া হুয়া ?'

"যে ব্যক্তি প্রেমরস আস্বাদন করে নাই, সে যদি কেঁদে কেঁদে মরিয়া যায়, তো কি হয়? ঈশ্বরের প্রেমরস না পাইয়া, পর্য্যটক হইয়া, কেবল ভিক্ষাদ্বারা জীবন পোষণ করিলে, দুঃখে চক্ষুর অশ্রু দ্বারা বস্ত্রাঞ্চল

ভিজাইলে, হাহা রব করিয়া মরিয়া গেলে কি ফল ? যাহার জন্য পর্য্যটন, যাহার জন্য দুঃখ পাওয়া, যাহার জন্য অশ্রুজল বিসর্জ্জন দেওয়া, যাহার জন্য মরিয়া যাওয়া তাহার প্রতি তো তার লক্ষ্য হইল না। যে আপনি প্রেমরসে আদ্র হইয়াছে সেই অন্যকে আকর্ষণ করিতে পারে।" তিনি ১৭৯২ শকে (ইং ১৮৭০) মাঘোৎসব উপলক্ষে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে" উপাসনা করিয়া নিম্নলিখিত উপদেশ দেন।

"প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং হস্ততলং যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে ভাতি তত্ত্বং বিমলং। প্রেমসূর্য্য যদি আমাদের হৃদয়ে ক্ষণকালের নিমিত্ত অভ্যুদিত হয়, তবে আমাদের সকল কামনা সিদ্ধ হয়, আমরা সকল ফল লাভ করি। আমাদের কামনার পর্য্যবসান কি ? ঈশ্বরকে লাভ করা। যখন ঈশ্বরকে আমরা লাভ করি আমরা সমুদয় কামনার বিষয় লাভ করি, তাঁহাকে পাইয়া কিছুরই অভাব থাকে না। তাঁরই মুখদর্শনে—তাঁরই চরণসেবাতে আমাদের আনন্দের উপর আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।"

পূজাব্যাপারটি কি সাকার কি নিরাকার, যেমন চলচ্চিত্র ছবির (Bioscope) পর্দ্দায় নিজের আলোককেন্দ্র হইতে অভিক্ষেপ (Projection)। নিজের আলো ও বহিঃ প্রকাশের ক্ষমতার লেন্সের (Lens) উপর নির্ভর করে ; কেন্দ্রীকরণ (Focus) করিলে ছবি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে। লোকে বলে ময়ূরের পেখম চিত্রিত করিতে হয় না এবং করাও যায় না। উহা স্বয়ংপ্রকাশ, চিত্তাকর্ষক এবং জনপ্রিয়। উপাসনাও সেইরূপ। উপাসকের অন্তরজগতে এরূপ বর্ণবোধ উপস্থিত হয়, যে তাহার আর পার্থিবনয়ন উন্মিলনের প্রয়োজন হয় না। করিলেও ক্ষতি নাই, হৃদয়রূপের বর্ণচ্ছটায় জগতের বস্তুসকলের বর্ণ ম্লান বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষাভাণ্ডার হইতে দুএক 'কনিকা' 'ধ্রুবসত্য' আহরণ করা যাক :

"পলক পড়িলে দেখি আড়ালে আমার
তুমি আছ হে অনাদি আদি অন্ধকার।
আমি বিন্দুমাত্র আলো' মনে হয় তবু
আমি শুধু আছি আর কিছু নাই কভু।"

* * * *

"দিবসে চক্ষুর দম্ভ দৃষ্টিশক্তি লয়ে—
রাত্রি যেই হল, সেই অশ্রু যায় বয়ে।
আলোরে কহিল—আজ বুঝিয়াছি ঠেকি
তোমারি প্রসাদ বলে তোমারেই দেখি।"

চোখই আমাদের শত্রু, সদা কপটাচরণে রত, তাই ভেদদৃষ্টি বা আঁখিকেই জয় করা কঠিন হইলেও আত্মজিজ্ঞাসুর তাহাতে অগ্রে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

"সর্ব্বেষু ভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।"

ইহা সাত্ত্বিকজ্ঞান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সাধকের লক্ষ্যস্থল। ক্রমান্বয়ে সাধনফলে কালে লভ্য। দেবসেনাপতির বাহনের আশ্রয় লইতে হইবে, যাহার নিম্নদেশ পার্থিব জ্ঞান কদাকার, কিন্তু উপরিভাগ পরমার্থিক জ্ঞানের দিব্যছটায় উদ্ভাসিত। দৈবশক্তির বিভিন্নতা সত্ত্বেও চারুকলাপ বিলাসের সমন্বয়ের মধ্য দিয়া একটি মাত্র রূপ-কেই ফুটাইয়া তোলে। ময়ূরপুচ্ছের প্রত্যেক সূত্রে ও খণ্ডে বিভিন্ন বর্ণ কিন্তু একত্রে এক অদ্ভুত রংয়ের ছটা দৃষ্ট হয়। ময়ূরের প্রকৃতি সর্পের বিনাশ করা, তাই বিসর্পিল কালের গতি সে ওষ্ঠপ্রান্তে খণ্ড করিতেছে পূজ্যপ্রতিমায় দেখান হয়। আগেই চোখ লক্ষ্য করিয়া ঠোকরানো, অন্ধ করিয়া দেওয়া ময়ূরের স্বভাব, তাই ন্যায়নীতি চৈতন্যজনিত সমদর্শিতাকেই কর্ম্মশক্তির বাহন করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের 'মানসী'র স্মরণ লইতে হয়।

"আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে
একাকী অসীম ভরা
আমারি আঁধারে মিলাবে গগণ
মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে
আমার বিজন বাস
প্রলয় আসন জুড়িয়া বসিয়া
রবো আমি বারো মাস।

এই সমদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া গভীর নিরাশায় ও নিরানন্দে মগ্ন হওয়া নাস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত মানবের সম্ভব, কিন্তু জগতে বাঁচিয়া থাকিতে গেলে ধর্ম্মজ্ঞানকে পরিপাক করিয়া লোকব্যবহারে প্রয়োগ করিতে হয়। হিংসাপরায়ণ ষড়রিপুচালিত নরনারীর সহিত দৈনন্দিন বাস ও সংঘর্ষে আত্মদমন দুরূহ ও মলিনতাভারে মানবাত্মা কলুষিত হয়। তাই বলিতে হয়—

"ত্বমেব মাতা পিতাত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিত্তা দ্রবীনং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মমদেবদেব।"

শ্রদ্ধাষ্পদের শুধু ব্যক্তিত্ব নয়, পূজ্যপূজকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা প্রয়োজন, তবে মিলনের আশা থাকে। ভগবান যে দয়াপরবশ ও স্মরণাগতবৎসল এই প্রতীতির উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণের ও স্মরণাপন্ন হইবার এই উক্তি। সাধক তখন "আমি তোমারি, তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই কিছু নাই" এই ভাবে অবস্থান করিতেছেন। জ্ঞানপথে তখন আরাধ্য সে **পরাপর গুরুরূপে** অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন কর্ম্মসিন্ধুতে দূর-প্রসারি আলোকস্তম্ভবৎ জীবন-তরীকে গন্তব্য দিকের নির্দ্দেশ দান করেন। সতত অভ্যাস দ্বারা এই ভাব ও রসকে এত গাঢ় করিয়া তুলিতে হইবে যে, এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে "তুমি আমারই, অর্থাৎ আমার হিতান্বেষী সর্ব্ববিঘ্ন প্রসমনকারী অভীষ্টপূরণকারী **পরমেষ্ঠি গুরু**, তোমার সঙ্গ-

বিচ্যুতিতে আমি দিক্‌ভ্রান্ত হইব, তোমাকে ছাড়িয়া তোমার বিভূতি ও মায়ায় বিহ্বল ও নষ্টচেতন হইব। সুতরাং সাধনের এই স্তরে বিগ্রহমূর্ত্তির আবশ্যক হয়, ইহা নিম্নস্তর নহে—ইহা মননের ও মননানুযায়ী কর্ম্মাভ্যাসের উচ্চতর স্তর। আমার গোপালকে আমি স্নান না করাইলে, না খাওয়াইলে গোপালের স্নান হইবে না, খাওয়ার তৃপ্তি হইবে না, সে যে আমার নিষ্ঠাসেবা প্রত্যাশা করে। বৈষ্ণব-সাধন প্রণালী এইখান হইতে আরম্ভ। পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটকে ৬ষ্ঠ অঙ্কে ২১ শ্লোকে উদ্ধৃত হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রম্ শ্লোকাবলীর একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যথা—

যাযা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষ মেব
বিচার যোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়োবলীয়ঃ সবিশেষ মেব।

তাই কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যের বাণী নিম্নলিখিতরূপ দিয়াছেন :

ভগবান বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন॥
সে কালে নাইক জন্মে প্রকৃত মন ও নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মতে জীবয়।
সেহ ব্রহ্মে পুণরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥

অতএব পাঞ্চভৌতিক দেহে তাঁহার সাকাররূপে অবস্থান পৌত্তলিকতা অপবাদগ্রস্ত হইতে পারে না, এবং কিছু দুরূহ কল্পনাও নহে, যেহেতু

তাহাই প্রাকৃত। বিশ্বকল্যাণ মহাপ্রাণের চিচ্ছক্তির বিলাস, ইহা অসম্ভব মনে করা আর চক্ষুমুদিত করিয়া সূর্য্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া একই কথা। সেই পরমাত্মার এবং তৎসৃজিত ভাব সমূহের এবং বিশেষতঃ জীবগণের অস্তি ভাতি ও লীলাচঞ্চল আনন্দে স্পন্দিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক। ব্যক্ত জগতের ও তাহার অন্তর নিহিত অব্যক্ত শক্তির তত্ত্ব ও ক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রত্যেক মননশীল ব্যক্তিকে চিন্তায় প্রণোদিত করিবে। বাক্যে ও কার্য্যে তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে রূপ দান করিতে সচেষ্ট করিবে। তাহাতে সত্ত্ব রজঃ তম ত্রিভাবের প্রকৃতির সম্বিৎ, সন্ধিনী, ও হ্লাদিনী শক্তির উত্তেজনাও উপলব্ধিতে জাগ্রত করিবে। স্তরভেদে তাহাই ভজনা ও উপাসনারূপে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। হ্লাদিনী শক্তির আস্বাদন করিতে হইলে শুধু পূজ্য-পাদ নয়, প্রেমাস্পদেরও প্রয়োজন। দৈনন্দিন উপচার সহযোগে বিরাট শক্তির নিকট আত্মনিবেদন, বা অধিকতর প্রাণশক্তি সংগ্রহ, বা পূজা-প্রকরণের, অথবা "বুদ্ধং স্মরণ মহং গচ্ছামির" অভিযানের সূত্রপাত এই **পরমেষ্ঠি গুরুর** পদ হইতে। তাহার পর যাত্রি যতটা পাথেয় আহরণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে অর্চ্চনাকারীকে আরাধ্যের সহিত অনুভূতি-পথে নিভৃত মিলন ও তাঁহার সহিত সঙ্কেত আদান প্রদানের কৌশল আয়ত্ব করিতে হইবে, নতুবা বিশেষ জোরে দাঁড়টানা সত্বেও নোঙ্গর ফেলা তরণীর অবস্থা। এইজন্য মনকে ত্রাণ করে যে মন্ত্র ও শ্রুতিগোচর শব্দের প্রভাব, সম্বন্ধে ইষ্টমন্ত্রদাতার নিকট উপদেশ লওয়া আবশ্যক। ইহার রীতি সংগ্রহ করিতে হইলে পূর্ব্বগামী পথিকবৃন্দ ঋষি-গণের বাণীপূরিত অধ্যাত্ম গ্রন্থ সমূহ হইতে পুনঃ পুনঃ পাঠ ও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রদাতা ও তাঁহারা হ'লেন **পরম গুরু**। "শঙ্কর শঙ্কর সাক্ষাত ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং," তাঁহাদের সূত্রগুলি আমাদের সম্বল ও পথক্লান্তি নিবারক পথ্য। তাঁহারা সর্ব্বথা নমস্য। শঙ্কর বলেন, বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিতে হইলে "কোষেষু পঞ্চস্বাধিরাজমানা" কাশী

পরিক্রমা প্রয়োজন। কাশী হইতে আরম্ভ করিয়া কাশীতেই যাত্রা সমাপ্ত করিতে হইবে, সর্ব্বশেষে মনিকর্ণিকা ঘাটে হরিহর সান্নিধ্যে অবগাহন। কারণ,—

"কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা।"

কাশীকে জানিলেই কাশীকে পাওয়া হয়। অর্থাৎ অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য শরীর নিরপেক্ষ যে অপরাজিত বস্তুর বলে আমরা জীবিত ও কার্য্যক্ষম আছি, বোধবিশিষ্ট হই, তাহাই বিশ্বেশ্বরের কাশী। আত্মান্বেষীর সে কাশী কোন্ কাশী? তাহা

"জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা।"

আর তন্মধ্যে মনিকর্ণিকা সেই পদ যেখানে 'পরমোপশান্তিঃ মনোনিবৃত্তিঃ', সঙ্কল্প বিকল্পের তরঙ্গ উত্থিত হয় না, মানুষ 'বীতরাগভয়ক্রোধঃ' অবস্থায় আনন্দ লাভে সমর্থ। কাশীক্ষেত্রেই অজ্ঞানতা হইতে যিনি উদ্ধার করিবেন, সেই গুরুর সন্ধান মিলে অর্থাৎ গুরুলাভ হইয়া থাকে। তাই শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া শুভ কামনায় আসন পরিগ্রহ করিয়া **শ্রীগুরবে নমঃ** বলিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। সদ্যোজাত শিশু পলিতায় দুধটানে বা মাতৃস্তন হইতে যে ক্ষীরধারা গ্রহণ করিতে হয় জানে, তাহা তাহাকে কে শিখাইল? তাহা তাহার চেতনার লক্ষণ বা আদি সম্বিৎ। ক্রমে ভাল মন্দ জ্ঞান, সত্যাসত্য নির্ণয়, তাহার জ্ঞানের মধ্যে জাগে, উহাই তাহার সহজ জ্ঞান। পশুপক্ষীর দিবারাত্র বোধ, আহার অন্বেষণ ও খাদ্যাখাদ্য বিচার তাহার প্রাণরক্ষার হেতু হইয়া তাহার অন্তরস্থ চৈতন্যের পরিচয় দেয়। তাহাকে ইনষ্টিঙ্কট (Instinct) বা সহজজ্ঞান বলা চলে, কিন্তু ইহা সকলই শ্রীগুরুর কৃপা এবং এই বাঁচিয়া থাকার জন্যই ইন্দ্রিয়দ্বারা তন্মাত্রা ভোগের জন্য আমাদের স্রষ্টার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বাল্য বয়সে কৃতজ্ঞতা বোধ আসে না বা স্থায়ী হয় না, প্রৌঢ়ত্বে আসে, তাই ইহা মানব সংস্কৃতির পরিচায়ক। যেখানে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হয়

সেখানে নরের চিৎশক্তির অপরিণত ও শিক্ষাসংস্কারহীন অবস্থা ধরিতে হইবে, মানবসমাজে সেরূপ ব্যক্তি নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। আমি সামান্য জঙ্গম পশুপক্ষীর উপরের স্তরের চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট মানুষ আজ চরাচর ব্যাপ্ত মহাজ্ঞানের নিকট নতি স্বীকার করিতেছি, ইহাই আমাদের প্রথম প্রণাম। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিপদেই যে আমরা মৃত্যুকে জয় করিতেছি, সে কাহার বলে ? অতএব, এই চিন্ময় ভাবই পূজ্য ও শ্রদ্ধার বস্তু। ইহাই শিব বা মঙ্গল ভাব। পাশ্চাত্য-দার্শনিকরা ইহাকে কন্‌স্যান্স ও বিলিফ (Conscience ও Belief) আখ্যা দিয়া বহু বিস্তারের কথা বলিয়াছেন। ইহা কিন্তু বিবেক বুদ্ধি নয়। দেবেন্দ্রনাথও ইহাকেই ধর্ম্মের উৎস বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন ও অনুমান করেন যে, রামমোহনের ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারণা ও উপাসনার দ্বারা পুষ্টিবিধানেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল এই সহজজ্ঞানের প্রতি। বেদ-বেদান্ত তন্ত্রমন্ত্র অবলম্বন বাহ্যিক লোকাচার, সহজ-জ্ঞানের বিকাশে বাধা দেয় ও আত্মপুষ্টির অন্তরায় বিবেচনা করিয়া তাহা বাছাই ও পরিত্যাজ্য করা নব্য ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুদের ধারা হইয়াছিল।

বাইবেলে ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনায় জেনেসিস্ (Genesis)এ সৃষ্টি-রহস্য উদ্‌ঘাটন কালে বলা আছে “In the beginning was word” জগতের উৎপত্তি শব্দ হইতে। এ দেশীয় ধারণাতেও নাদব্রহ্ম হইতে সর্ব্ব বস্তুর ও ভাবের উদ্ভব, কিন্তু ক্রিয়ায় প্রভেদ আছে। ভগবত তত্ত্ব বাদ দিয়া মানবীয় চিন্তা-প্রণালী রহস্য পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা অনেকদূর লইয়া গিয়াছেন ও চমকপ্রদ তথ্য সকল আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু দার্শনিক ক্যাণ্ট (Kant) “Critique of Pure Reason” বা অবিকৃত জ্ঞানের আলোচনা নামে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। সিদ্ধান্তের পরিশেষে দেখিলেন যে মানবের প্রয়োজন উহাদ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাই পুনরায় Critique of Practical Reason বা কার্য্যক্ষম জ্ঞানের সম্বন্ধে আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহাতে পূর্ব্ববর্ণিত অনেক সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয়। নবনব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি বা

প্রতিভার আগমনের হেতু বা যুক্তিসিদ্ধ কারণ কিছু না পাইয়া কয়েকদল দার্শনিক উহা স্বভাবজাত স্বতঃ প্রামাণ্য ইনটুইসন (Intuition) বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। যেন মননশীলতার উহা পরিণামবাদ। প্রাচ্য দার্শনিকরা ইহাকে তপস্যালব্ধ প্রজ্ঞা বা বিশেষ ভগবত কৃপা বলিয়া স্বীকার ও নাদানুভূতি ইহার প্রথম স্তর ধার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু কেবল নাদ নয়, তাহার সহিত বিন্দু সংযোগ সৃষ্টির অনাদ্যান্ত অবস্থা ও সাধকের বিন্দু জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। "বিন্দু দিকবাসিনৈঃ নমঃ"। অন্তরস্থ চৈতন্যময় শিব সুপ্ত অবস্থায় থাকেন, তাঁহার শিরে মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত হইলে জগৎ-কল্যাণ সাধিত হয়। ব্যাসদেবের উক্তিতে বলিতে গেলে "অচ্যুত চরণ তরঙ্গিণী শশীশেখর মৌলীমালতী মালে"। ইহার উপলব্ধিতে জীবের ভগবত তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় ও সে অমরণের সন্ধান পাইয়া ভগবত সমীপে অবস্থান করে। যিনি প্রাণীগণকে কখনও পরিত্যাগ করেন না ও তাহাদের দেহাশ্রিত হইয়া পঞ্চবায়ুতে ক্রীড়াশীল থাকেন, সেই অচ্যুতের বিভিন্ন ভাবের রসে যে লহরীর দোলন উত্থিত হয়, তাহা চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত জটাজুটযুক্ত যোগীশ্বর শিবের আনন্দ উৎপাদন করে ও তাঁহার শীর্ষদেশে মালতীমালা হইয়া শোভা পায়। মা অর্থে তিমিরনাশিনী, ব্রহ্মবিদ্যা, তাহারই সঞ্চারিণী ভাব মালতী বা কান্তি, শ্রী। সুতরাং ইনিই ব্রহ্মবিদ্যাদায়িনী, প্রকৃতি-রূপা জগজ্জননী জীবকে কামনা ও মোক্ষ দান করেন। ইহাতে শ্রীহরির বিশেষানুগ্রহের স্পর্শ বর্ত্তমান। গৌরাঙ্গদেব শিবের ও জীবের মধ্যে অভেদত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। পরিচ্ছিন্ন মানবের পরিচ্ছিন্ন শক্তিতে ইহা সম্ভব নয়, অপ্রাকৃত বা কল্পনামাত্র। ইহাত দূরের কথা, ভক্তের জন্য তত্ত্বমসি ভাবটিও তিনি বলেন "প্রাদেশিক বাক্য," কিন্তু প্রণবকে তিনি "মহাবাক্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তবে "তত্ত্বমসি" যে মানবোচিত ধ্যান ধারণা ও তপস্যার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং পাণ্ডিত্য প্রতিভা বাদ দিয়া প্রেম উপজয়ার্থে প্রয়োজন, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে॥
পরিণাম বাদ ব্যাস সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
আর যে যে কিছু কহে সকলি কল্পনা।
স্বতঃ প্রমাণ বেদবাক্যে করেনা লক্ষণা"॥

(চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা)

শ্রীগুরুকে শুধু জানিয়া চরম উন্নতি লাভ হয় না, তাঁহার সেবা পয়স্বিনী গাভীর পরিচর্য্যার মত নিষ্ঠার সহিত দৈনিক করিতে হইবে। শ্রীভগবানের অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তিযোগ্য কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই। তথাপি তিনি জীবহিতার্থে অনুক্ষণ কর্ম্মনিরত আছেন, কারণ তিনি নিষ্কর্ম্ম থাকিলে সকল ধর্ম্ম লোপ পাইবে এবং প্রজাগণ মলিনচরিত্র হইয়া বিনষ্ট হইবে।

শ্রীভগবান উবাচ

"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥"

গীতা ৩ অ, ২৪ শ্লোক

প্রত্যহ ধর্ম্মচিন্তা মানবের চিন্তাশক্তির ক্রমোত্তর উৎকর্ষতা লাভের উপায়। সুতরাং ধ্যানযোগ্য ও কর্ম্মসাধ্য বস্তুগুলির মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা উচ্চতর ও প্রশস্ততর কৃষ্টির পরিচায়ক। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে জ্ঞান ও সদ্‌বুদ্ধি তাঁহারই নিকট লভ্য। এ স্থলে কিন্তু নব্য ব্রহ্ম-বাদিরা আচারের সংশয়-আবর্ত্তে পড়িয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ ভয় হইয়াছিল, তাই যীশু-ভজনাকে তিনি নরপূজা মনে করিতেন ও বলিতেন, শঙ্কর, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষ ও সাধুর ত কথাই নাই। তাহা এদেশবাসীর নমনীয় মনের কুসংস্কার বলিয়া তিনি উপাসনা মধ্যে আনিতে আপত্তি করিতেন। কৈশবীদলের সহিত তাঁহার মতভেদের ইহা অন্যতম কারণ। সেই পরম পূজ্যপাদের সন্ধান যিনি

দিবেন, তাঁহাকে সশরীরে লাভ করিয়া, তাঁহার মুখনিসৃত অমৃত বাক্য, যাহা সত্য যাহাতে আমার হিত এবং বলকারক পথ্য হইবে প্রত্যক্ষভাবে কর্ণকুহরে পাইয়া অভিবাদন করিলে, আত্মগ্লানিকর নরপূজা হয় না। Hero-worship বা Lionising হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্নেহপ্রণয় আদানপ্রদানের একটা সম্বন্ধ আরাধ্যদেবের সহিত রাখিতে হয়। তবেই তো তাঁহাকে ভাবা যায়—

"দুর্ব্বলের বল তুমি নির্ধনের ধন
রোগের ঔষধ তুমি শ্রান্তের আসন।"

ঈশ্বরকে চৈতন্যযুক্তবস্তু বা শক্তি ভাবিয়া তৃপ্তি হয় না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনুভব করাটাই ক্ষুদ্রমানবের প্রাণরসের পোষক। তাই দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের বাক্যের সহিত আত্মপ্রত্যয়ের বাণী মিলিত করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন—উপনিষদের মধ্যে ব্যক্তিকে খুঁজিয়াছিলেন, প্রাচীন ঋষিদের স্পর্শলাভ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার মনের কথা সায়লাভ করিয়া শান্তি পাইয়াছিল। ইহাই আধ্যাত্মিক লাভ (Spiritual force)।

আর একটু গভীরে গিয়া, এই ব্যক্তিত্বের সহিত অর্জ্জিত সমদর্শিতা একাধারে রক্ষা করিতে গেলে আমাদের প্রতিবন্ধক শুধুই আমাদের চর্ম্ম-চক্ষু নয়।

মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নে সে দোষে কেন।
আঁখিতে যে যত হেরে
সবই কি মনে ধরে
মনমত হ'লে পরে সে হয় হৃদিরতন।"

(মহারাজা বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত চক্ষুদান নাটকের গীত)

এই পার্থক্যের কারণ যেমন একদিকে মানুষের অন্তরনিহিত আদর্শ ও প্রকৃতিগত প্রবণতা, তেমনি সময়বিশেষে যেরূপভাবে সে অবস্থান করে বাহ্যিক বস্তুও তাহাতে অনুরঞ্জিত হইয়া তাহার নিকট দেখা দেয়। চলিত কথায় বলে, যে চোর সে সকলকেই চোর দেখে, যে সজ্জন সে সহসা

অপরকে অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আমাদের একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা মনে পড়ে। এক ঋষির আশ্রমে তাঁহার পরিচিত বাল্যবন্ধু একদিন আগমন করেন। তিনি ধনীর সন্তান ও ভোগবিলাসে রত ছিলেন। পরে এক ব্যাঘ্র তথায় আসায়, বন্ধুটি বিশেষ ভীত ও বিপন্ন মনে করিলেন। কিন্তু ঋষি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন যে ব্যাঘ্র হিংসাপরায়ণ নয়, সে বড় বাধ্য। তাহাকে বসিতে বলায় সেও অনতিদূরে থাবা পাতিয়া বসিয়া রহিল। তাঁহাদের কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোক তথায় আসিলেন ও ঋষির সহিত বাক্যালাপ করিলেন। তাঁহার আগমনে উপস্থিত তিনজনের মন চঞ্চল হইল। একই সময়ে একই বস্তু দর্শনে তিন প্রাণীর মধ্যে তিনটি ভাবের উদয় হইল ও তিনজনে বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাদের তিনজনের দেখা তিন প্রকার। ব্যাঘ্র নবাগতকে উত্তম খাদ্য বস্তু মনে করিল। লাম্পট্য-প্রবণ বন্ধুটি তাহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি অর্পণ করিল আর ঋষি তাঁহাকে ধর্ম্মপত্নীরূপেই দেখিলেন ও সত্বর কথা সমাপনান্তে আশ্রমকুটিরে প্রত্যাগমনের অনুমতি দিলেন। উপাসনাক্ষেত্রে এই কারণে সকল ভাব দমন করিয়া দৈবভাব গ্রহণপূর্ব্বক চিত্তবিশুদ্ধিতে মন অর্পণ করিতে হয়। শুধু ষড়রিপুজনিত ভাবের সাময়িক প্রশমন নয়, এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইলে আত্মপরীক্ষা মাঝে মাঝে আবশ্যক ও অনেক প্রকার অভিমানই ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, যে দৃষ্টিভঙ্গিতে বস্তু এবং জীবন অবলোকন করা শ্রেয়, অনেক সময় আত্মাভিমান চালিত হইয়া একই বস্তু বা ঘটনা বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়। সাবধানতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অনবধানতার বৈরাগ্য অনুরাগ বিদ্বেষের মত আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম জন্মায়। কোপণ, কৃপণ স্বভাব, লজ্জিত, শঙ্কাকুল, পীড়িত, শোকাচ্ছন্ন, জরাগ্রস্ত বিত্তসাট্যপরায়ণ, দৃষ্টি-কৃপণ ব্যক্তির দর্শন ও তজ্জনিত ভাব বিকৃত ও নির্ভরযোগ্য নয়। সে বিষয়ে সেই সেই ব্যক্তি নিজেরা সচেতন হইলেও অভ্যাস-নিগড়ের জন্য দৃষ্টিতে আশানুরূপ পরিবর্ত্তন আনিতে

প্যারেন না। আবার কেহ কেহ অতীতকে আঁকড়াইয়া থাকিতে ভাল বাসেন, কেহ বা নব্যতর অনুভূতির প্রয়াসী। এই স্থিতিবান ও গতিপ্রবণ মনের নয়নভঙ্গি তাহাদিগকে রক্ষণশীল বা উদারপ্রগতিশীল দৃষ্টিসম্পন্ন বলিয়া আখ্যাত করে। ধনী অবস্থাপন্ন লোকের দৃষ্টি একরূপ, আজকাল আবার তাকে না কি বুরজোঁয়া (Bourgeois) ভাব বলে, আর বুভুক্ষা পীড়িত কাঙ্গালের দৃষ্টি আর একরূপ, তাহার অতৃপ্ত ভোগবাসনাকে হ্যাঙলামো বলে, তাহারই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা লালসা বা কর্ম্মপ্রেরনা। Necessity is the mother of invention অভাববোধ হইতে বিবিধ বস্তুর উদ্ভব। সকল সময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই পথে হয় না। হয়ত জানার স্পৃহায়, কৌতূহল তৃপ্তির জন্য অধ্যবসায় বলে কিছু লাভ হয়, কিন্তু ঐশীদান বলিতে লোকে কুণ্ঠিত হয়, বৈজ্ঞানিক প্রতিভাই বলিয়া থাকে। আসলে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান ও প্রমাণ প্রয়োগে সিদ্ধান্ত স্থাপনের মূলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। বহুলোকের হিতের প্রতি লক্ষ্য, পর-দুঃখকাতর উদার রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রিগণের দৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহার বিকৃতির ফলে অফুরন্ত হিত না হইয়া বিরাট দুঃখের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ বিদ্যাবিদ অপেক্ষা সামাজিক জ্ঞান ও সহৃদয় মানুষের মত দৃষ্টি জনহিতৈষণা কর্ম্মে অধিক প্রয়োজন। "কর্ম্মনা বাধ্যতে বুদ্ধি," যেমন একদিকে প্রশংসনীয়, তেমনি পেশা বা কর্ম্মের জন্য দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতাও অনিবার্য্য। তাই জমিদার সদাগর জহুরী সাংবাদিক সৈনিক পসারী, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এটর্ণি, চা বাগান ও কয়লাখাদ পরিচালক, ইস্কুলমাষ্টার প্রভৃতির নজর বা দৃষ্টি সাধারণ হইতে বিভিন্ন হইয়া থাকে। সকল প্রকার বৈষম্য ও বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যস্থলের অনুসন্ধানে রত সমন্বয়ী দৃষ্টি হল দার্শনিকের, কিন্তু তাঁহাকে সর্ব্বজন উপযোগী তত্ত্বকথা, তথ্য বা সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে হয়, তাহা অন্য সকলের কর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকের খণ্ড আবিষ্কারগুলিকে একটি সমগ্র উপলব্ধির আশ্রয়ে সুবিন্যস্ত করিয়া ভবিষ্যত মানবের জন্য ভাণ্ডারজাত

করিয়া রাখা দার্শনিকের কার্য্য। একই ঘটনা, স্বত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে বোধ অর্থী প্রত্যর্থী উকিল-মোক্তার, জজ্-মেজিষ্টর পুলিশ ব্যারিষ্টার বিভিন্ন পেশানুযায়ী লোক বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাদের পোষ্যপরিজন ও বনিতারা ভর্ত্তার ধন ও পদমর্য্যাদার অংশীদাররূপে অভিমান পোষণ করিয়া দৃষ্টিভঙ্গি তদনুরূপ করিয়া সমাজে চলাফেরা করিয়া থাকেন যদিচ পেশা বা কর্ম্মের প্রাথমিক বা পরিণত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের কোন কালে যোগ থাকে না বা হইবার সম্ভাবনাও নাই। প্রাচ্য দার্শনিকরা ইহা ত্যাজ্য বিবেচনা করেন, কিন্তু ঔপন্যাসিকেরা জাগতিক ব্যাপারের রসধারার সৃষ্টির উপকরণ মনে করেন ও সেই দৃষ্টিতে দেখেন। কবির চোখ ইঁহাদের সকলের হইতে ভিন্ন, অথচ সে সকল দৃষ্টিও কিছু কিছু তাঁহাতে বর্ত্তমান, সময়বিশেষে বর্ণনায় তাহার প্রয়োগ হয়। বাহ্যবস্তু অবলোকনে তাহার আকার-প্রকার, বর্ণ-গন্ধ, রূপ ও রসের সংবাদ সুললিত ভাষায় দেশবাসী ও স্বভাষীদের গোচরে আনা তাঁহার কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। শ্রুতি-মধুর শব্দ প্রয়োগে আবশ্যক বোধে একটা ছন্দ-প্রণালী ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বলিবার ভঙ্গি সংক্ষেপ ও সরস হওয়া প্রয়োজন, যাহাতে শ্রোতার বোধে অনুরূপরসের স্পন্দন জাগাইতে পারেন। অন্য বস্তুর তুলনা দিয়া উপমা সৃজন ও প্রচলিত আলঙ্কারিক প্রয়োগে ঐ ভাবরস স্থায়ী ও গাঢ় করিতে যাহাতে পারেন সে বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার লক্ষ্য রাখা উচিত। তাঁহার রচনা লোকশিক্ষা ও আনন্দ-উদ্দীপনের সহায়তা করিলেই স্বার্থক। লিপিকুশলী চিত্রকরকে কৃত্রিম রেখা ও বর্ণের সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সাদৃশ্য দর্শকের মনে জাগাইতে হয়। উভয়েরই রূপচর্চ্চায় সৌন্দর্য্যবোধ প্রণোদিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবশ্যক, কিন্তু কবির দায়িত্ব কিছু বেশী। তাঁহার চিন্তার স্বাধীনতা, বাহ্যিক দৃশ্যের অন্তরালে অনুকূল বা প্রতিকূল ভাব, তাঁহার নিজের অন্তরে তাহার ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-নৈরাশ্যের দোলন, অতীত স্মৃতি, ভবিষ্যত স্বপ্ন, যাহা সে বস্তুর সহিত সহজে জড়িত থাকিতে

পারে, প্রসঙ্গক্রমে বাক্যমালায় বিস্তার করার ক্ষেত্র ও সুযোগ তাঁহার অধিক। কিন্তু তাঁহাকে সতত সাবধান হইতে হয় যাহাতে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের সন্ধানী নিরীক্ষণ তাঁহার বর্ণনার অঙ্গীভূত না হয়। কারণ, তাঁহার কার্য্য রূপের ব্যাখ্যা, সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটন ও ভাবরসের ঊর্শ্মিমালার শোভা, প্রপঞ্চ হইতে গ্রহণান্তে অন্তরে পরিপাক করিয়া পরকে পরিবেশন ও তাহাদের অন্তরে সমভাব উত্তোলন। তাঁহার প্রকাশভঙ্গিতেই তাঁহার উপলব্ধির ও অন্তর-দৃষ্টির গভীরতা বুঝা যায়। উপমার দ্বারা পরের মনে একটা দাগ বসান যায় কিন্তু তাহা যুক্তি নয়। বিরুদ্ধবাদীকে স্বমতে আনিতে যুক্তির নিপুণ প্রয়োগ প্রয়োজন, কিন্তু তাহা কাব্যে অশোভন ও আনন্দের ব্যাঘাত জন্মায়। বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত ও বাস্তব প্রমাণের ঘটা কাব্যের কোমলতার বিরোধী। তিনজনেরই কল্পনা প্রয়োজন কিন্তু তিন-ক্ষেত্রে তাহার লীলায়িত ভঙ্গি স্বতন্ত্র, ক্ষেত্রবিশেষে তাহা উপভোগ্য। ননীর প্রয়োজন আওটান ক্ষীরে সাধিত হয় না। কাব্যের তরলতা সফেন ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত তুলনীয়, জোলো ঘোলে বা গাঢ় ক্ষীরে সে ধারোষ্ণ দুগ্ধের স্বাদ ও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। দার্শনিক তত্ত্বের সারবত্তা ও বৈজ্ঞানিক সংযোগ বিশ্লেষণ প্রণালী কাব্যের সহিত মিশ্রিত থাকিলে তাহার উৎকটতায় কাব্যরসকে অনর্থক ভারী করিয়া তোলে। সোন্নার কর্ম্ম সাঁড়াসি দিয়া চলে না আর সাঁড়াসির কাজ সন্না দিয়া করিতে যাওয়া বাতুলতা। ব্যক্তিবিশেষের এই বস্তুর সবিশেষ বর্ণনায় নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব মিশ্রণ ও স্বাভাবিক তাপ গন্ধ বর্ণ বর্জ্জিত নৈর্ব্যক্তিত্বের প্রলেপ ভাল লাগিলেও সাধারণ পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে তৃপ্তিপ্রদ নয়। প্রাণরসে ঝলমল কবিতা, স্বাভাবিকরূপ স্বচ্ছন্দগতি ও সহজবোধ্য প্রসাদগুণে, মন আকৃষ্ট করে, তাহাতে উল্লিখিত মিশ্রণে উহার ব্যবহারিক মূল্যের হ্রাস হয়। মনের ভার লাঘব আশায় পাঠক ভালবাসেন সমশীর্ষ পদক্ষেপে লঘু রংদার কল্পনার ফেনপুঞ্জ মনের উপর দিয়া বুলাইয়া লইতে। সংক্ষিপ্ত বচন স্মৃতিপটে সংলগ্ন হইয়া থাকে, অবসর সময়ে মনের মধ্যে তাহা খেলা

করে। মনস্তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা সাময়িক কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হয়। যাহা জনিবার জানা হইয়া গেলে, আবর্জ্জনার মত মনে লেপিয়া থাকে ও যুক্তির দীর্ঘতা ও বীর-পদক্ষেপে ভোক্তার ক্লান্তিকর হয়। বহিঃ সৌন্দর্য্য ও মানবীয় হৃদয়ের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের যথাযথ বর্ণনা ও তাহার অঙ্কন পদ্ধতি মনের কষ্টিপাথরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে হেমের আভা রাখিলেও সময়ে অসময়ে তাহা ঠিকরাইয়া জ্যোতি বিকিরণ করে, তাহাতে কিছু তন্ময়তা ও ভাব সমাধি লইয়া আসে। ক্ষণস্থায়ী হইলেও তাহার একটা মূল্য আছে। পুঞ্জ পুঞ্জ পীতপুঞ্জ শোভিত বীথিকার ছবি কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) কে এমন আনন্দাপ্লুত করে যে বহুদিন পরেও তিনি মানসচক্ষে তাহা দেখিতেন ও অতীত সুখবোধকে নবীন হর্ষে পরিণত করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"For when in vacant or in pensive mood I lie
They flash upon that inward eye—which is
the bliss of solitude."

যখনই আমি শূন্য বা চিন্তাকুলমনে শুইয়া থাকি, তাহারা আমার অন্তর-চক্ষুর সমক্ষে জ্বলজ্বল করিয়া উঠে, এই বর্ণসম্ভার ভোগ, নির্জ্জনতার সুখ ও সান্ত্বনা। পূর্ব্ববর্ত্তীকালের বর্ণনা আমরা ঐতিহাসিকের নিকট পাই, কিন্তু তাহা কতকটা ব্যক্তিগত প্রতিভায় বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। দেখা যায় যে পথিমধ্যে কোন ঘটনা ঘটিলে তাহার যথাযথ বিবরণ বিভিন্ন পথিক বিভিন্ন ভাবে দিয়া থাকেন। ইহাতে প্রতিভা না থাকিলেও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে যে পার্থক্য ঘটে তাহা নিত্য বৃটিশ আদালতে প্রমাণিত হয়। সেইজন্য সাক্ষীর ব্যক্তিত্বের পরে তাহার সাক্ষ্য নির্ভর করে। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" —আমরা শুনিয়া আসিতেছি ও দেখিতেছি। কিন্তু ভাল লোক সম্বন্ধে সকলে একবাক্যে বলিয়া থাকেন "তাঁহার গঙ্গাজলের মত মন" অর্থাৎ সকল হিন্দুর মনে যেমন স্থির প্রতীতি যে ঐ সুর-নদীর নীর সতত নির্ম্মল ও পবিত্র, বহুতর বস্তুর সংস্পর্শ ঘটিলেও কখন

কলুষিত হয় না। ইহা বাহ্যিক রূপে নয় আন্তরিক গুণে। স্বচ্ছতা বুঝাইতে আমরা উপমা দিয়া থাকি কোন তটিনীর জল যেন পায়রার চোখের মত। যশোহরের সাগরদাঁড়ির তলে যে 'কপোতাক্ষ' প্রবাহিনী, তথাকার কবির, মাইকেল মধুসূদনের, লেখনীতে তাহা চিরঞ্জীবত্ব পাইয়াছে। তমসার তটে ছিল ঋষি বাল্মিকীর আশ্রম, যেখানে লবকুশের কণ্ঠে সর্ব্বপ্রথম রাম নামের জয় ঝঙ্কৃত হয়। তাঁহার তপোবনপদলেহি সেই নদীটির ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতা বুঝাইতে তিনি একটি উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা তাঁহাতেই সম্ভব,—

"রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা"

(রামায়ণ আদি কাণ্ড ২সর্গ ৫ম শ্লোক)

ভাবার্থে ইহা প্রতিপন্ন করে সজ্জন ও সাধুগণের মন ও দৃষ্টি রমণীয়, প্রসন্ন, ও গতিচাঞ্চল্য যুক্ত হইয়া থাকে। সমভাবে শিক্ষিত মন হইতে দর্শকের ও দৃশ্যের ভেদ বা ভিন্নতা সত্ত্বেও একইরূপ দৃষ্টি দর্শনফল উৎপন্ন হয় তাহাই সৌজন্য সৎ মনুষ্যের লক্ষণ ও তাহাদ্বারাই তাঁহার আচরণ সহজ, সরল, এবং হৃদয়গ্রাহী হয়।

সামাজিক ব্যক্তিবর্গের নানাবিধ দৃষ্টির কথা বলিলাম, ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনে লাগিলেও সাধন পথে এ সকলই বিভ্রম লৌকিক দৃষ্টি ও পারলৌকিক দৃষ্টি স্বতন্ত্র। ভূমানন্দ ও তাহার জ্ঞান ও অনুভূতি বুঝাইতে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্যদের নিকট হইতে যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তথাপি সাধককে আত্মবোধে ও কল্পনার সাহায্য লইতে হয়, কবিজনোচিত দৃষ্টি অভ্যাস দ্বারা কতকটা আয়ত্ব করিতে হয়, নতুবা জীবন বিরক্তিপূর্ণ, তিক্ত ও দুর্ব্বহ হয়। বাহ্যিক প্রকাশ, বাক্য বিন্যাস, ছন্দমাত্রা বোধ, ও গীতধ্বনির ব্যঞ্জনা দিবার ডাক তাঁহার পক্ষে কবির মত থাকে না বটে, কিন্তু 'হৃদিরূপং, মুখে নাম,' মস্তকে 'অচ্যুত-পাদোদক ও নির্ম্মাল্য,' চিত্তে অভিনিবেশ, বাক্যে সংযম, ইন্দ্রিয়গণে বশ্যতা রাখিয়া লোকের প্রতি

সম্ভাব ও ব্যবহারে সদাচারীতা অবলম্বন করিলেই তাঁহার অন্তর পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়। যদিও সর্ব্বজনহিতৈষণায় তাঁহাকে অভিব্যক্তি দিতে হয়, হৃদয়ের প্রশস্ততা আনয়নের জন্য তাঁহার মূল সম্বল হয় চিন্তা, "একমেবাদ্বিতীয়ম সুন্দরম্"। উহার ধ্যানে মনকে প্রচ্ছদন করিয়া চিত্ততে সর্ব্বসময়ে তাহা বিধারণ করিতে হয়। কালক্রমে তাঁহার তৃতীয় নয়ন লাভ হয়। সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টি যোগলভ্য। ত্রিকালজ্ঞ যোগীর চক্ষে ঘটনাজাল ছবির মত প্রতিফলিত হয়, কিন্তু তাহার হিতাহিত ভালরূপ ব্যষ্টিসমষ্টিভাবে বিবেচনা না করিয়া তাহা বাক্যে ব্যক্ত করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। দৃষ্টির দূরব্যাপী প্রসারতা লাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য। ক্রমে তাঁহার নয়ন-পটে বিশ্বনিয়ন্তার যুগচক্র (Cycle) বা কালের নিয়মানুযায়ী অভিপ্রায় প্রতিভাত হয় ও সেই নিরীক্ষণের ফলে মহাপুরুষরা তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত করেন। সুতরাং আত্মোন্নতিকামীকে সর্ব্বদাই ও সর্ব্বথাই মনোভাবের প্রতি কটাক্ষক্ষেপ করিতে হয়। অতএব আমাদের মনশ্চক্ষুরও যে সংশোধন বিশেষ আবশ্যক। তাহার সম্মুখে রক্ষিত সংস্কারের আবরণ অগ্রে উন্মোচন করিতে হইবে, উপাধিবিহীন মানুষ হইতে হইবে। ইহা ভক্ত কবীর অনুভব করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"ঘুংট্ পাট্ খোলে রে, তুঝে রামা মিলেগা
ঘট্ ঘট্ মে রামা থির
কঠোর বচন মৎ বোলে রে।
কবীর কহে শুন ভাই সাধো
আসন ছোড়কে মৎ ডোলে রে।"

ইহাও আত্মজ্ঞানের আভাষ। কবি টেনিসন্ যাহাকে "Self knowledge" বলিয়াছেন ও "Self discipline" অভ্যাস করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। কবি সেকস্‌পিয়ার আরও স্পষ্টতরভাবে বলিয়াছেন—

"To thine ownself be true
Thou canst not be false to any man."

নিজের নিকট সত্য হইও তাহা হইলে অপরের নিকটও সত্যরূপে প্রতিভাত হইবে তোমার ব্যবহার মিথ্যা হইবে না। প্রকৃত আত্মজ্ঞানে মানুষকে লোভ ও স্বার্থপরতার বশ্যতা হইতে রক্ষা করে। অন্য মানবকে 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' দৃষ্টি করিতে শিখায়, তাহারই ইঙ্গিত সেকস্‌পিয়রের উদ্ধৃত বাক্যের দ্বিতীয় পংক্তিতে পাওয়া যায়। আমাদের মোহযুক্ত অভিজ্ঞতার ফলে আংশিক জ্ঞানে আমরা 'True man'এর সন্ধান পাই না। খাঁটি মানুষ বা Absolute man জ্ঞানে গরীয়ান হইলেও সামাজিক সম্বন্ধকে শ্রদ্ধা করিয়া,

"মায়ামৃগং দয়িতেপ্সিত মন্বধাবৎ"

হইয়া থাকেন। ইহারই আদর্শ পাওয়া যায় সেই পরদুঃখকাতর, প্রেমে ও ত্যাগে সুন্দর, শৌর্য্যবীর্য্যশালী মানবশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মিষ্ঠ, প্রাণারাম মূরতি রামচন্দ্রে। তিনিই যে সুখদুঃখ ভোগী পালনকর্ত্তা বিষ্ণুরূপে সকল জীবে থাকেন, ইহা দর্শন করা ও ধারণায় রাখা কঠিন হইলেও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার লক্ষ্যস্থল ও জীবন ব্যাপী সাধনার যোগ্য। ইহা কত কঠিন তাহা লক্ষ্য করিয়া ঘোমটার পাট বলিয়া কবীর সঙ্কেত করিয়াছেন ও মনকে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া সকল তন্মাত্রার কারণ ভোক্তা ভগবানকে নিজের ঘরে বসতি করিতে বলিয়াছেন। এ সাধনপথে অগ্রসর হইলে, তাহার বাহিরের প্রতীক আবশ্যক হইবে না, হৃদয় কন্দর হইতে চিদ্‌ঘন আনন্দ-রসই তাহার উপভোগ্য হইবে ও একেশ্বর ইষ্ট দেবতাই বাহিরে নানারূপে তাহার প্রয়োজন সাধন করিতে থাকিবেন। শ্রীমদ্‌ ভগবত গীতায়—

অর্জ্জুন উবাচ—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

অর্জ্জুন বলিলেন—

"অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার মোহ দূর হইয়াছে, আমি স্মৃতি-

পুনর্লাভ করিয়া সংশয়শূন্য হইয়াছি। আমি এখন তোমার আদেশ পালন করিব।"

মনরূপী সিংহই জয়ী হইবে ও রক্তমাংসপুষ্ট অহমিকাস্ফীত দেহ-ভাবাশ্রিত স্বীয়প্রভাবমদগর্ব্বিত অসুরই পরাভব স্বীকার করিবে, কিন্তু একা সিংহের নৈতিক বলে কুলাইবে না, তাহাতে প্রাণময়ীর করুণা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। ইহাই সাকার উপাসনা তত্ত্ব। একাগ্রতার সহিত সাধক এ পথে উপাসনা করিলে তাহার প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃ দর্শন লাভ ঘটে ও তাহা উত্তরোত্তর উজ্জল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া বিগ্রহরূপী হয়, নতুবা তাহাকে আশ্বাস দিয়া অগ্রগতি দিবে কে? গীতার শ্রুতিফলে ও সঞ্জয়ের মুখে এই আধ্যাত্মিকরূপকের আভাষ পাওয়া যায়। দোগ্ধা গোপাল নন্দন গো-বৎস্য পার্থকে যে দুগ্ধে পুষ্ট করিয়াছেন, তাহার উদ্বৃত্তাংশে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক লাভ। জীবনসংগ্রামে জ্ঞানা-লোকে ইহার ফল আমাদের নিকট প্রকট হইয়া আমাদের সংসার-রোগ হইতে মুক্ত করিবে।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রী র্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

যেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর আর সংগ্রামে প্রবৃত্ত সাধন-ধনুক হস্তে অর্জ্জুন অবস্থিত থাকেন, সেখানে শত্রু পরাজয় উপযোগী উৎকর্ষ (বিজয়), উত্তরোত্তর প্রকাশমান বিভূতি, রাজলক্ষ্মীশ্রী, ও অবিচলিত ধ্রুবানীতি কার্য্যকরীজ্ঞান সদা বিদ্যমান থাকে। যে সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ভগবানকে সুহৃদরূপে অনুসরণ করিতে পারে ও তাঁহার কার্য্যকলাপে ও পরামর্শে স্থির জানে যে যাহা ঘটিবে তাহাই মঙ্গল, কল্যাণময়ের সংস্পর্শে নিজের কোন অহিত হইতে পারে না, সে ভক্তির অধিকারী হইয়া ক্রমশঃ ধৈর্য্য ও বীর্য্য আহরণে সমর্থ হয়। ভগবান জনার্দ্দন তাহার পথের প্রদর্শক ও রথের চালক হন। সে মহাভাগ পার্থ নির্ব্বি-চারে আত্মসমর্পণ করিলে সাধন-পথে প্রকৃত বন্ধুলাভ করে। "ত্রৈলক্য-

বাসীনামি (ভো) লোকানাং বরদা" নানারূপ দেবদেবীর সাহায্য সাধক প্রাপ্ত হয়। তখন অচিরে তাহার কামনা সাধন সমাপ্তিতে সিদ্ধিতে পরিণত হয়, অথৈ জলে প্রস্তরভূমিতে স্বীয় পদে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে পারে "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়"। সিসিলির সম্রাট হায়রোর রাজমুকুটের শ্বামিকা নির্দ্ধারণকারী প্রাচীন বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের মত উলঙ্গ হইয়া আনন্দাতিশয্যে সকলকে বলিতে পারে 'ইউরেকা, ইউরেকা' (I have found) আমি তাহা পাইয়াছি অর্থাৎ বিশ্বাসের ধন যথার্থ সত্য-প্রতিষ্ঠা এতদিনে পাইলাম। তখন অনায়াসে দুঃখসঙ্কুল পৃথিবীতে সে বিচরণ করিতে পারে। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির অফুরন্ত উৎস কোথায়? তখন মানসক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কূটরাজনীতিবিশারদ জ্ঞাতি বলদর্পিত আত্মমর্য্যাদারূঢ় দুর্য্যোধনের পতন হইয়াছে, আর সদাশঙ্কাকুল আরাজকতায় বাস নহে, ধর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আত্মরাজ্যে পূর্ণাভিষেকে জীবের সাদর আহ্বান। অন্তঃপুরচারিণী কৃষ্ণপ্রাণা অপরাজিতা সুনীতির লাঞ্ছনাকারী দুঃশাসন-ইন্দ্রিয়বুদ্ধির সমুচিত দণ্ডবিধান ও অন্ত্রনিষ্কাসনে শোণিত শূন্যতায় তাহার নিস্পন্দ বিকলতা, ইহারই আনুসঙ্গিক অন্যতম ঘটনা। নিষ্ঠার পুরস্কারে অধিক এবং দৃঢ় নিষ্ঠা-লাভ, ধর্ম্মচর্চ্চায় ধর্ম্মলাভ। তখন আর পাতকের আতঙ্ক থাকে না—ধর্ম্মপীঠ হইতে পদস্খলন হয় না। এই ভাবঘন হৃদয়ের চিদঘন মূর্ত্তির জন্য পিপাসা, বর্ণাবয়ববিশিষ্ট প্রত্যক্ষ দর্শনযোগ্য মনোহর প্রতিমার আকাঙ্খা ও সাকারবাদীর অন্তরের যুক্তির ছবি আমরা রবীন্দ্রনাথের 'সুরদাসের প্রার্থনা'র মধ্যে পাই—

"থামো একটুকু, বুঝিতে পারিনে, ভাল করে ভেবে দেখি
বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার চিরকাল রবে সে কি ?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে ফুটিয়া উঠিবে না কি,
পবিত্র মুখ মধুর মূর্ত্তি, স্নিগ্ধ আনত আঁখি ?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে দেবীর প্রতিমা সম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে চাহিছ হৃদয়ে মম,

বাতায়ন হতে সন্ধ্যা-কিরণ পড়েছে ললাটে এসে
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড় তিমির কেশে,
শান্তিরূপিনী এ মূরতি তব অতি অপূর্ব্ব সাজে
অনল রেখায় ফুটিয়া উঠিবে অনন্ত নিশির মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ আপনি সৃজিত হবে
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘেরিয়া চিরকাল জেগে রবে।"

(মানসী)

ইহাতে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক যোগের আভাষ বা মিষ্টিসিজ্‌মের ঈষৎ ছাপ থাকিলেও মনে রাখিতে হইবে যে কবি সাকারবাদী ভক্ত সুরদাসের মনোভাবে বাঙ্ময়রূপ দিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া পাঠকেরা কবিকে ভুল বুঝিবেন না। কাব্যক্ষেত্রের বাহিরে তাঁহার নিজস্ব উপাসনা-প্রণালী চিরকালই রামমোহন প্রবর্ত্তিত অপৌত্তলিক নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তনেই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছে। জগতের ভালমন্দ, মনের সুমতি ও কুমতি, রুদ্রের মঙ্গল ভাব ও অমঙ্গলজনক কার্য্য ও মানবের মনোরাজ্যে তাহার প্রভাব ও তাহার সহিত ভাব-পরম্পরায় কিরূপ যোগ সাধিতে হইবে তাহা তিনি সারাজীবনব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন ও বিপুলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার সমগ্র আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু কিছু কিছু পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা পাঠকদের গোচরে আনিতে চেষ্টা করিব। তিনিও সার্ব্বজনীন ভাবের পক্ষপাতী, কিন্তু তজ্জন্য কোন আধ্যাত্মিক প্রতীক আশ্রয় করার ঘোর বিরোধী। তাঁহার সবল মন তাহা উপেক্ষা করে। প্রাচীনতা বা হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই তিনি সহ্য করিতে পারেন না, এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহনের সহিত তাঁহার পার্থক্য। রামমোহন জাতি-গত বিভেদ অনুসারে সেই জাতির প্রচলিত শাস্ত্রকে প্রামাণ্য ও গণ্য বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু তাহা হইতে যুক্তির অসামঞ্জস্য পরিত্যাজ্য বিবেচনা করেন। পরবর্ত্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ আচার

পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে অনুরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সহজে জাতীয় ভাব ও আচার ত্যাগ করা উচিত নয়, বিশেষ পরের ভাবে ও সমালোচনায়, কিন্তু কালের প্রয়োজন ও যুক্তিবোধে যদি পরিহারযোগ্য সাব্যস্ত হয় ত মায়াবশে তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখা অনুচিত। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ঘোর বিশ্বাসী এবং দেশীয় শাস্ত্রকর্ত্তাদের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাপন্ন। তিনি জানিতেন ঐ সকল সত্য ও বাক্য তপস্যা ও ধ্যান লব্ধ, সুতরাং আমাদের বোধগম্য না হইলে অপেক্ষা করিয়া আমাদেরও তপস্যা করা প্রয়োজন। ক্রমে জ্ঞানের আলোক পাইলে, অনেক অসামঞ্জস্য লুপ্ত হইবে। সেইজন্যই তাঁহার সতীর্থদের প্ররোচনা সত্বেও তিনি দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর চিন্তা করিয়া তবে নবানুষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ হইতে বেদবেদান্ত কিয়ৎ পরিমাণে বর্জ্জন করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত আত্মপ্রত্যয় বা conscience and belief জনিত চৈতন্য বোধ selfrealisation কেশবসেনের চিন্তাধারায় প্রবল আকার ধারণ করিয়া শাস্ত্র বিশ্বাসকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে ও প্রত্যাদেশ ও দৈববাণীরূপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আধ্যাত্মিক সম্বলরূপে পরিগণিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নিকট ইহা পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া Instinct is more powerful than reason রূপে প্রতিভাত হয়। কার্য্য-কারণ অনুস্যূত যুক্তির অপেক্ষা স্বীয় সহজবোধই দিগ্‌দর্শনে অধিক কার্য্যকরী। ইহা ব্যুৎপত্তি কি বোধিসত্ত্ব বুঝা কঠিন, তবে যেন তেন প্রকারেণ ভগবৎ-দত্ত বিশেষ মানবের বিশেষ প্রতিভা বা প্রত্যুৎপন্ন মতি। উপার্জ্জন বা রোজগার নহে উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত দৌলত। তদ্দ্বারাই ভগবত বোধ ও Reverence উপস্থিত হয়। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের মত রবীন্দ্রনাথ বাহ্যিক প্রতিমাপূজার বিরোধী কিন্তু কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া ভিন্নজনের প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণের ও সমাজস্থিত পূজা-পার্ব্বণ ও উপাসনার প্রতি রাজা রামমোহন কতকটা সহনশীল ভাব রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিত, মৌলবী, পাদ্রীদের সহিত ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া তর্কবিতর্ক হইত, তাহাতে দৈবসম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার

আংশিক বর্জ্জনই কাম্য ছিল। সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে উচ্চাভিলাষ পোষণ, আত্মোন্নতির চেষ্টা, উন্নত প্রণালীতে মনের প্রশস্ততা ও পবিত্রতা আনয়ন এবং নিরাকার একেশ্বরবাদই যে শোভন ধর্ম্মচর্চ্চা, তিনি ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা স্থিরীকৃত করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মত (academic) পণ্ডিতগ্রাহ্য হইলেই হইল ও স্বেচ্ছাসেবক (volunteers) দ্বারা প্রতি-পালিত হইলেই তিনি সন্তোষলাভ করিতেন, সর্ব্বধর্ম্মযাযীরা যাহাতে একক্ষেত্রে মিলিত হইতে পারে তাহাই রাজার আদর্শ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু হিন্দুসমাজ রক্ষাকল্পে যত্নবান ছিলেন ও বহুদেবতার স্থলে একেশ্বর উপাসনা শুধু প্রশস্ত নয়, আমাদের মধ্যে প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া প্রচারকার্য্যে ব্রতী হন। স্বদেশবাসীর নীতিগঠনের দিকে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। যখন দেশীয় সু-উচ্চ দার্শনিকগণের সুচিন্তা ও বহু-গবেষণার ফলস্বরূপ একেশ্বর উপাসনা বিদ্যমান আছে, তাহা অবহেলায় অপচয় হইতে দেওয়া লক্ষ্মীমন্ত গৃহস্থের উচিত হয় না। শুধু স্বেচ্ছা-সৈন্যের দল ভলেন্টিয়ার হইলে চলিবে না, একেবারে ব্রতধারী ও ব্রতচারী হইতে হইবে, তবে ভ্রাতৃ বন্ধুগণ ও স্বীয় সমাজস্থ পরিজনের সহিত যথা-সম্ভব সদ্ভাব রক্ষা করিয়া অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করাই শ্রেয়। নবীন ধর্ম্মাবলম্বীদের পুরাতন সমাজের উপর অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া তিনি একটি ব্রাহ্মসমাজীয় বক্তৃতায় তীব্র সমালোচনা করেন। বলেন যে গণেশের শুঁড় ভাঙ্গিয়া বা পূজার দালানে উৎপাত করা বা বাটিস্থ পূজা বা দুর্গোৎসব বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া কোন সুফলের সম্ভাবনা নাই। তিনি আরও বলেন যেখানে গুরুজন বর্ত্তমান, পিতামাতা ও তাঁহাদের মনে ক্লেশ দেওয়া বিহিত নয়, কারণ তাঁরা সর্ব্বসময়েই পূজ্য ও সম্মানার্হ। তাঁহাদের অভ্যস্ত আরাধনায় হস্তক্ষেপ শুধু মর্ম্মপীড়া বলিয়া নহে ধর্ম্মনীতিরও বিরুদ্ধ, অশান্তির ত কথাই নাই। বরং সেরূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মদের গৃহত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইয়া নিজের কার্য্যে মনোযোগী হওয়া সমীচিন ও কর্ত্তব্য। অধিকন্তু সংখ্যালঘু নবীনদলের নীতি ও

চরিত্র এতটা উৎকর্ষ ও উদার হওয়া প্রয়োজন যাহাতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও রক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। এ বিষয়ে যুবকদের তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে আদেশ করেন। ইহা সত্ত্বেও ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের জন্ম যে সকল কাজ তিনি করিয়াছেন তাহারই একটি সকৃতজ্ঞ স্বীকারোক্তি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহাকে প্রদত্ত "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের" সভ্যগণের এক অভিনন্দন-পত্র। ঐ পত্রের ললাটে প্রথম তাঁহাকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত সম্বোধন ব্যবহৃত হয়। তদবধি ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে সকলের কাছে তিনি ঐ নামে পরিচিত ও সম্মানভাজন হইয়া আসিতেছেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে (১১ই কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক) নব্য ব্রাহ্মদলেরা ব্রাহ্মসম্মিলন সভা আহ্বান করেন, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান" বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি বলেন—"এক্ষণেও যাঁহারা শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম হইয়া কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইতেছেন, তাঁহারাও হিন্দুসমাজে মান্য থাকিবেন। কিন্তু যথেচ্ছাচার করিলে তাঁহারা তাঁহাদের নিকট আরও হেয় হইবেন। ব্রাহ্মেরা এইপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে ক্রমে যুক্ত হইতে পারিবে—তবে কেন তাহা হইতে বিযুক্ত হইব। অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজে রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া দেখ, ক্রমে অবশ্যই এই যত্ন সিদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের মধ্যে ভুক্ত করিতে হইবে, হিন্দুসমাজে রক্ষা করিতে হইবে—এই ব্রাহ্মসম্মিলন সভার তৃতীয় উদ্দেশ্যমাত্র। আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্থান প্রিয়তর, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রিয়তম। যে হিন্দুসমাজ রামমোহন রায়ের নাম শুনিবামাত্র খড়্গহস্ত হইত, সেই হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে—ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানেও কেহ কেহ উৎসাহ দিতেছেন, কেহ কেহ অশ্রুপাত করিতেছেন। যখন হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইতেছে, তবে কি নিরাশার সময়? আরো অধিকরূপে চেষ্টা করিয়া দেখিতে

হইবে, প্রিয়তর হিন্দু- সমাজে প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে।”

কিন্তু হিন্দুসমাজের পাকা বাড়িটাকে একেবারে ভিত্তিতে নাড়া দেওয়া যাক—এসকল আকাঙ্খা হইতে কোন শুভফলের আশা দেবেন্দ্র-নাথ করিতেন না। নূতন দলের সঙ্গে এইখানেই তাঁহার প্রণালীর পার্থক্য ছিল। ১৮৬৫ সালের জুলাই মাসে দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত ‘ইণ্ডিয়ান মিরর’ কাগজের অধিকার লইয়া গোলোযোগ বাধে এবং কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদকীয় দাবীর অজুহাতে ঐ সম্পর্কীয় সকল কাগজ-পত্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি হইতে অপেনার বাড়ীতে তুলিয়া লইয়া যান। তখন ইহা পাক্ষিক কাগজ ছিল কিন্তু পক্ষান্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া এবং দেবেন্দ্রনাথ যে টাকা দিয়া ইহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা উপেক্ষা করিয়া তৎকালের আইনের বলের পোষকতায় কেশবচন্দ্র সেন সাপ্তাহিকরূপে ঐ নামে একখানি কাগজ বাহির করেন। তাহাতে ১৮৬৬ সালে জুলাই আগষ্ট মাসের কতিপয় সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথকে ও ‘কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ’কে তীব্র আক্রমণ করেন। আমরা ‘আচার্য্য কেশবচন্দ্র’ মধ্য বিবরণ, প্রথম অংশ, ৭৯-৮৩ পৃষ্ঠা (সম্ভবতঃ ইহা প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় রচিত কেশবচরিতের অন্তর্গত) হইতে কয়েকটি কথা নিম্নে দিলাম, তাহা হইতে পাঠকগণ দেবেন্দ্রনাথের মত ও আদর্শের সহিত নূতন দলের কোথায় অনৈক্য হইয়াছিল তাহার আভাস পাইবেন এবং কেশবের বাংলা লেখার সহিত প্রসঙ্গক্রমে পরিচিত হইবেন। —“বাহিরে দেখিতে তাঁহারা সমাজগৃহের ট্রষ্টি, ভিতরে ভিতরে তাঁহারা সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও নিয়ামক।

ইনি বলেন, ইহা কেবল উপাসনার স্থান, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিশ্বাসাদি ব্যাখ্যান করিয়া পুস্তকপুস্তিকা এবং মাসিক পত্রিকা বাহির করেন।

ইনি মুখে বলেন, সামাজিক বিষয়ের সহিত ইনি সম্বন্ধ পরিহার

করেন, ইনি কেবল ধর্মসম্পর্কীয় অন্তর্ব্যবস্থান মাত্র, অথচ ইনি কর্তৃত্ব সহকারে সামাজিক ও গৃহসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ধর্ম্ম কোন বিশেষ গ্রন্থকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া গ্রহণ করে না, যে-কোন গ্রন্থে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাকেই গ্রহণ করেন। কার্য্যতঃ ইহা হিন্দুশাস্ত্র বিনা অন্য কোন শাস্ত্র স্পর্শ করে না; শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিকে গ্রহণ করে, এবং ক্রাইষ্ট পল্ প্রভৃতিকে ঘৃণা করে এবং অবমাননাসূচক কথায় আক্রমণ করে। উপনিষদের যে সকল বাক্যে অদ্বৈতবাদাদি আছে, সে গুলির অর্থান্তর করিয়া অথবা বিরুদ্ধ বাক্যাংশ পরিহার করিয়া খণ্ডিত বাক্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

ইহার ভিতরে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নাই, সকল নরনারীই ঈশ্বরের সন্তান, সমুদয় পৃথিবী ব্রহ্মের গৃহ, সমুদয় মনুষ্য ভ্রাতা। এ মত যে কথার কথা তাহা সকলেই জানেন। কলিকাতা সমাজ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বদৃঢ়তার সহিত রক্ষা করেন।

সমাজের আচার্য্যগণ গৃহে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন, সমাজে আসিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, অথচ তাঁহাদিগের এই কপটতা ভীরুতা ও অসারল্য অনায়াসে সমাজ সহ্য করেন, উৎসাহ দেন।

সাংসারিকতার জন্য পার্থিব অসত্যের নিকটে ঈশ্বরের সত্যকে হীন করিয়া একটি সুবিধার ধর্ম্ম করিয়া লওয়া হইয়াছে, যে সুবিধার ধর্ম্মে বিবেককে অপদস্থ করা হইয়াছে এবং সততা ও ঋজুতাকে সাংসারিক বুদ্ধির বেদী সন্নিধানে বলি অর্পণ করা হইয়াছে।" দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য কেহই কখনই এ আক্রমণ সহ্য করিতে পারিতেন না; বিশেষতঃ যখন কেশবের মত তাঁহার স্নেহ এতটা কেহই পায় নাই। তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অম্লানবদনে কেশবের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদের স্থাপিত নূতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বাংলায় উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার যে আঘাত লাগে নাই এমত নয়, তথাপি তাহার কোন লক্ষণ তাঁহার বাহিরের ব্যবহারে বা ভিতরকার সম্বন্ধে প্রকাশ পাইতে দেন

নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নব্যব্রাহ্মদের মধ্যে ভক্তির অন্দোলনের আবশ্যকতা এমন প্রবল হইয়াছিল যে খোলকরতাল যোগে ব্রহ্মনাম সংকীর্ত্তন ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উৎসাহে ইহা সংগঠিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই বৈষ্ণবী প্রমত্ততার পক্ষপাতী ছিলেন না। তথাপি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাকে ডাকিবামাত্র তিনি আসিয়া তাঁহদের কীর্ত্তনে যোগদান করেন ও তৎপরে উপাসনা ও বক্তৃতাদি যথা-নিয়মে সম্পাদন করেন। অধিকন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের তেতালার ঘরে একদিন ধর্ম্মপিপাসু এই যুবাদলকে আহ্বান ও একত্রিত করিয়া ব্রহ্ম-দর্শন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করেন। তাহাতে বলেন, "যাঁহারা ব্রহ্মকে দেখেন নাই কিন্তু দেখিবার জন্য ব্যাকুল তাঁহারাও ব্রাহ্ম। আমরা সূর্য্যালোকের মধ্যেই সর্ব্বদা বাস করিতেছি অথচ আমরা তো সর্ব্বদা বলিনা "এই সূর্য্য এই সূর্য্য।" পরে একটি দীপ দেখাইয়া তিনি বলেন "এই দীপটি যেমন প্রত্যক্ষ তেমনি তিনি আমার কাছে প্রত্যক্ষ। ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রাহ্ম হয় না। আজও তোমরা ব্রহ্মকে দেখ নাই?" ইহাতে, দেবেন্দ্রনাথের সহজাত ভদ্রতা ও মহানুভবতা কতটা ছিল, বেশ বুঝা যায়। ইহাই প্রকৃত আভিজাত্যের সৌজন্য, অভিসন্ধির সখ্যতা উপলক্ষ্য মাত্র ধরিতে হইবে। তাঁহার মতের জন্য একটি উক্তি এইখানে উদ্ধার করা আবশ্যক। "যদি আমাদের পুরাতন শাস্ত্রসকলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম না পাইতাম তাহা হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের আশ্রয়স্থান হইতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেরূপ হইলে, হিন্দুধর্ম্মের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষোভ পাইতে হইত। যদিও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে এরূপ উদারতা আছে যে, ইহা জাতিবিশেষে কখনই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না; তথাপি হিন্দুজাতির সহিত ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চির-কালই বিদ্যমান থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথ কবি হইলেও ধর্ম্মচর্চ্চায় তাঁহার পিতার ন্যায় ভাবচালিত ও সুখশান্তি অভিলাষী নহেন; বরং রাজা রামমোহনের মত যুক্তিমন্ত,

অধিকন্তু তিনি অনুকূল অপেক্ষা প্রতিকূল বেদনে ঈশ্বরের গাঢ় সান্নিধ্য প্রয়াসী, সূক্ষ্মভাব চিন্তায় তাই কতকটা বাংলার বৈষ্ণব কবিদের অনুগামী। তিনি যুগলমূর্ত্তির উপাসক, কিন্তু নবজলধরে ডাকিয়া নব অরুণেরে ঢাকিয়া থাকেন—

"ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন ॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা)

পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে যাহা গৌরাঙ্গদেব বলিয়াছিলেন,—ধর্ম্মব্যাখ্যানে রবীন্দ্রনাথ নির্ব্বিশেষকে সবিশেষ করিয়াছেন আর জগদরূপ বর্ণনায়, কবিতায়, গানে, উপন্যাস ও নাটকে সবিশেষকে নির্ব্বিশেষ পরিচ্ছদ দিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রের এই দোলনটি বুঝিতে পারিলে রবীন্দ্রনাথের বেদোজ্জ্বলা প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-নাথের মনেরও দুটা দিক আছে, তিনি বহু স্থানেই অন্তরের মানুষের উল্লেখ করিয়াছেন যেন রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ মানসক্ষেত্রে অবস্থিত *Cf.* "Looking beyond the human body, it will be seen that all organized beings are built after the same fashion. It will be found on close inspection that all other animals are so made. So likewise are all vegetables. Every leaf is duplex ; so is every part of a flower All organized beings are in truth formed of two halves joined together at a central line. Nothing organized is structured as one whole."—

The Mechanism of Man by E. W. Cox VI. &. II. সমাজ-পালক বিষ্ণু ও ধ্বংসকারী রুদ্রের যেন যুক্ত হরিহরমূর্ত্তি এক ঘটেই অবস্থিত তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, যে প্রেমপুষ্পের প্রস্ফুরণে দেবেন্দ্রনাথ হর্ষে আত্মহারা হইয়া শ্রীকণ্ঠ সিংহ, রাজনারায়ণ বসু ও পণ্ডিত শিবনাথ

শাস্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এবং যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মে ও সমাজে ফুটন্ত ও প্রাণবন্ত অবস্থায় রক্ষা করিতে রাজনারায়ণ অশেষ চেষ্টা করিয়া কৃতার্থমনা বোধ করেন, তাহা রবীন্দ্রনাথের মনীষার আলোকে ও কাব্য-গীতির বারিসেচনে স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারাইয়া বর্ণে যেন ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আদি ব্রাহ্ম-সমাজে নব দীক্ষিত ব্রহ্মবাদীর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়াছে। ইহার কারণ একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অতি সত্বরই মানুষের প্রশংসা আকর্ষণ করে, কিন্তু তাঁহার নির্লিপ্ততা ও ব্যক্তির সহিত ব্যবহারে আত্মকেন্দ্রীভাব মানুষকে দূরে সরাইয়া দেয়। একটি কেন্দ্রানুগ সেন্ট্রিপেটাল (Centripetal), অপরটি কেন্দ্রাতীগ সেন্ট্রিফিউ-গাল (Centrifugal) শক্তির ক্রিয়া, সুতরাং সাধকমণ্ডলীর সৃজণ ও রক্ষণে অক্ষম। অমোঘ নিয়মের দণ্ড ও সময়চক্রধারিণী পরিণামপ্রসূ প্রতীচ্য বিজ্ঞানদেবী পাশ্চাত্য দর্শনের পরিমাপযন্ত্র-হেমকটোরাহস্ত, ন্যায়-তূলাধৃক মূর্ত্তমান বিবেকবুদ্ধির সহিত আলিঙ্গন পাশে জড়িত থাকিয়া ধর্ম্মপ্রবণ কবি হৃদয়ে বৈখরী শব্দে শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। উভয়ের মিলিত করে ধৃত মূরলীমনোহর প্রতীক রবীন্দ্রনাথের উপাস্য ও কর্ম্মনিয়ন্তা।

বলিতে কি, আবহকালের এই "ভারত-ভাস্কর" কবি একাধারে Ikonolator ও Ikonoclast, প্রতিমাগঠনকারী আদর্শবাদী ও প্রতিমা-ভংসকারী মূর্ত্তিমান বিপ্লববাদী, কিন্তু কোনও দিনই রামমোহনের ন্যায় তিনি Ikonomachist নন। প্রতীকযাযীদের সহিত তর্কে লিপ্ত নহেন। কবিতায়, ব্যাখ্যানে, ধ্যানের জন্য অনেক নূতন প্রতিমা সৃজণ করিয়াছেন, আর নিজ অপৌত্তলিক সম্প্রদায়ে করণীয়ের অভাবে প্রতিবেশী সমাজের Ikonadorers সাকারবাদী হিন্দুদের দেবতামণ্ডলী Pantheon এর অন্তর্গত Apollo, Cupid, Venus, Minerva, Jupiterএর স্বকপোল কল্পিত অপৌরাণিক নবীন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। হয়ত অচলায়তনের সকল

প্রাচীর ও গণ্ডি ভাঙ্গিয়া, জ্ঞানদাসের সেই পুরাতন বাণী "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" বীজরূপে রাখিয়াছেন। আশীলক্ষ যোনী ভ্রমণ ব্যাপারটা হিসাবের বাহিরে ফেলিয়া দিলেও যে মনুষ্যজন্ম বিশেষ বাঞ্ছনীয় ও কর্ম্মকুশল, এইরূপ একটা বেদীর উপর আমাদের চিন্তাধারাকে বসাইয়া আন্তর্জাতিক মূল্য (International value) বাড়াইয়া দিয়াছেন। কবিপ্রাণের সহৃদয়তার বশে সকল স্তরের মানবের নরনারী নির্ব্বিশেষে বিবিধ অবস্থান্তরে তাহাদের ব্যাথার স্থানগুলির তথ্য লইয়াছেন ও অতুলনীয় ভাষার সাহায্যে তাহাদের রূপ দরদী হিয়াপটে চিরতরে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। এ Idology রবীন্দ্রের নিজস্ব, কবীন্দ্রের অধিকার, তাই দেশের উদীয়মান তরুণতরুণীর সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ। তাঁহার স্থান "অলোক আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে অনন্তের আনন্দ মন্দিরে"।

সেখান হইতে অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদে তিনি যে নিত্যরসের সংবাদ বহন করিয়া আনেন, তাহা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে তাঁহার সাহচর্য্যে "দিগ্বধূর ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন হ'তে শূন্যপথে নির্ভীকের অভিসার"। প্রাপ্তির বাহিরে গিয়া প্রেম যেন শাশ্বত আকাঙ্খার সামগ্রী হইয়া থাকে। তাঁহার "মেঘদূত" একদিন কবি কালিদাসের অভিনন্দনে বলিয়াছিল

"আপনি করিলে সৃষ্টি রূপসীর অপূর্ব্ব মূরতি
অন্তহীন কান্তিময়ী এতদিন ছিল গোপনে যে সতী

*　　*　　*　　*　　*

মর্ম্মে অধ্যাসীনা প্রিয়া তব ধ্যানোদ্ভবা
লয়ে তার বিরহের বীণা।"

এ কথা তাঁহার সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। তাঁহার উপাস্য এবং উপাসক তিনি স্থান কাল অতিক্রমে অপারগ প্রণয়ী যক্ষকে সমবেদনা জানাইতে ও সান্ত্বনা দিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে সীমা নির্দ্দেশিত করা যায়।

"সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হ'ল,
বিরহের দুঃখ তাপে প্রেম হ'ল পূর্ণ বিকশিত,
হেরিল সে আপনারে বিশ্ব ধরিত্রীর মাঝে।"

ইহাকে Idolism প্রতীক অর্চ্চনাও বলা যায়, Idealism বা আদর্শ স্থাপনও বলা চলে। বিচ্ছিন্ন হইয়া সে প্রেম দীপ্ত, বিরহদগ্ধ হৃদয়ের সবখানি ভাস্বর মূর্ত্তিতে জুড়িয়া থাকে। অনঙ্গ হইলেও তেজপূর্ণ, আলো হইলেও সাকার, সাবয়ব হইতেও দেরী লাগে না। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের বাৎসল্য রস পশু, পক্ষী, বা অপরের শিশুটির প্রতি বা বালক সমবায়ে অন্যত্র উৎসারিত হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং উহা সত্য ও উহার ব্যাপ্তিও সত্য ও তাহাতেই অধিকারীকে ধন্য করে। জাগতিক ব্যাপারে প্রাপ্তিতে হয়ত মলিনতা বা তৃপ্তির অবসন্নতা আনিতে পারে, উহার বর্হিমুখী প্রবাহ পরিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, অনন্ত অসীমতায়, সম্ভাব্যতায়, আশায়, আনন্দে উহা যেমন উজ্জ্বল ও পবিত্রকারী, অভাব পূরণে তদ্রূপ থাকে না। কৃষ্ণমিলনের আকাঙ্খাটাই যেন সব কিছু, রাধার প্রাণ, কায়ক্লেশ লঙ্ঘিয়া সুদূরে প্রসারিত।

তাঁহার "মানস সুন্দরী" কে একবার দৃষ্ট করুন—

"মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু এক ঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে আজি চারি ধার।"

ইহাই চিরঞ্জীবী প্রেমে বিশ্বরূপ বোধ আর ক্ষণে ক্ষণে তাহার অনুভূতি আধ্যাত্মিক চেতনা বা Spiritualism.

ঈশ্বরের সৃজিত বস্তুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ ও প্রণতি জ্ঞাপনের নির্ভীকা তাঁহার পিতৃদেবকে মহানির্ব্বান তন্ত্রের বিশ্বরূপ পদটি পরিবর্ত্তন করিতে প্রণোদিত করে, ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিজ্ঞাপত্রে ২নং প্রতিজ্ঞায় এই

কয়টি বাক্য যোজনা করিতে প্রেরণা দেয় "পরমেশ্বররূপে কোন ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তুর আরাধনা করিব না।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে লোকশিক্ষার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত ভাষণ দিতে তাঁহার "জীবনদেবতা" তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

"অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে
সে বীণা আজি উঠল বাজি হৃদয় মাঝে।
ভুবন আমার ভরিল সুরে,
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥

(গীতবিতান পৃঃ ৫৯৭)

শুধু তাই নয়, একদিকে যেমন কবি কোলরিজ (Coleridge) বলিয়াছিলেন "The study of poetry has helped me to see the beautiful in the universe" অর্থাৎ কাব্যচর্চ্চা আমাকে বহির্জগতের সৌন্দর্য্য দেখিতে শিখাইয়াছে, কবি রবীন্দ্রনাথেরও এই ব্যসন, যদিচ তিনি উহাকে কোনদিনই ব্যসন বা অবসর বিনোদন মনে করেন নাই, গুরুগম্ভীর ভাবে উহা তাঁহার নিত্য কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রবণতাকে শুধু চরিতার্থ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উপরন্তু বিশ্বের কেন্দ্রস্থিত ও আনন্দ ভাবের কেন্দ্রস্বরূপ সকল প্রাণলীলার উৎস "সত্যম সুন্দরমের" উপলব্ধির দিকেও তাঁহাকে ক্রমশঃ টানিয়াছে এবং তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসকেও ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। তাঁহার সৌন্দর্য্যজ্ঞানকে এত পরিমার্জ্জিত করিয়াছে যে, অনায়াসে বলা যায় এই সূক্ষ্ম এসথেটিক-বোধ (Æsthetic sense) তাঁহার নীতি ও চরিত্রকে সকল প্রকার নীচতা ও অশিষ্টাচারপরায়ণতা হইতে যেন বস্ত্রা-চ্ছাদিত করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে সতত রক্ষা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে ও কার্য্যকলাপে এই মানসিক শুচিতা একটি লক্ষ্য করিবার ও শিক্ষণীয় বস্তু। তাঁহার রচনাবলীতে ও ভাববিস্তারের অবসরের

মধ্যে এই নিত্য অভ্যস্ত সংযম ও শুচিতার ক্রীড়া পরিলক্ষিত হইবে। তিনি সর্ব্বদাই চক্ষু মেলিয়া অন্তরে "দিবীব চক্ষুরাততং" অনুভব করেন। তাঁহার তরুণ বয়সের কামনা—

"আকাশ ডোবা ধারার দোলায় দুলব অবিরত
আকাশ ভরা দেখার দেখায় দেখব অবিরত ॥"

তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা স্বরূপ তাঁহাকে উত্তরোত্তর বল ও অধ্যাত্ম স্পর্শ দিয়াছে। তাঁহার প্রাণকে করুণ রসে অভিসিঞ্চিত করিয়াছে। অগণ্য-নক্ষত্র-খচিত নৈশগগন তাঁহার অন্তরে যে অনন্তের ভাব উদ্রেক করে, তাহা তাঁহার "ভগ্ন হৃদয়" পাঠে বুঝা যায়। দেবেন্দ্রনাথও এইরূপ ভগবানের ব্যাপ্তিবোধ অনুভব করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বোধের আভাষ তাঁহার 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' আরও গভীরে গিয়াছে। অন্তর পুরুষের সন্ধান ভিন্ন স্থান কালে অপরিচ্ছিন্ন অফুরন্ত প্রাণধারার বোধ জন্মায় না। কসমিক্ (Cosmic) ও সোসাল কনসাসনেস (Social consciousness) বোধ পরস্পরে মিলিত। এথিকাল ও এসথেটিক (Ethical ও Æsthetic consciousness) তাহার সহিত যোগ দিতে যেন অগ্রসর হইতেছে। টেনিসনের ব্রুকের (Brook) মত তাঁহার কবিত্ত নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইয়া দূরপ্রসারী ও জগতপ্লাবী অশেষ কথার তরঙ্গিনী বহমানা করাইবার অভিপ্রায়, তাঁহার ভগবানের প্রাকাম্য ও প্রাকুর্য্য বিভূতি, যাহা সর্ব্বদা গতিশীল ও কালজয়ী হইয়া বিদ্যমান, নিজের অন্তরে মনে প্রাণে উত্থিত হওয়ার পরিচয় দেয়।

আচারে ও বক্তব্য মধ্যে তাঁহার অসাধারণত্ব সর্ব্বদাই জাগরুক। কানন মধ্যাস্থিত ঋজু তাল বৃক্ষের মত পারিপার্শ্বিক বনানী হইতে নয়নপথে তাঁহাকে অপরিমেয় ভিন্নতা দিয়াছে। কিছু কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রকৃতিকে প্রচলিত মানদণ্ডে বুঝিতে গেলে তাঁহাকে খর্ব্ব করা হয়। তাঁহার সত্য বস্তুতে আগ্রহ ও সাত্বিক গুণাবলী এত প্রচুর যে তাঁহাকে ঠিক আমাদের মধ্যে পাওয়াও যায় না,

বা আমাদের একজন বলাও চলে না। সে গৌরবটুকু অনুভব করিতে গেলে, তাঁহার অসামান্যতা হারাইয়া ফেলি। তাঁহার জন্য বিশেষ মাপকাটি নাইবা সৃজন করিলাম। বরং আমাদের আত্মতৃপ্তির পরিবর্ত্তে, তাঁহার বিশ্ববরেণ্য অসাধারণত্বই ও আভিজাত্যব্যঞ্জক ভাব ও ভাষার গাম্ভীর্য্য আমাদের অধিক গৌরবান্বিত করিতে থাকুক। সমুন্নত মানবের দ্বারাই জাতি পরিচিত ও উন্নত হইয়া থাকে।

"যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত দেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে"॥

গীতা ৩য় অঃ ২১ শ্লোক।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তিতা আমাদের মত ক্ষীণ জনের বা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। অপেক্ষাকৃত সাহসিকজণের পক্ষে এ বিষয়ে পদক্ষেপে প্রমাণিত হয় যে, যে স্বয়ং অসিদ্ধ সে অপরকে পথ দেখাইলে কিরূপ বিপত্তির হেতু হয়। তিনি অন্তর সাধনায় সিদ্ধ, তাঁহার বাণীর মূল্য আছে, তাহা তাঁহাতেই শোভা পায়। অনাচারে ও বিপ্লব আনয়ন বা নব সংস্কার অবলম্বনে সর্ব্বত্রই "তেজীয়সাং ন দোষায়", কিন্তু সবলের পক্ষে যাহা পথ্যামৃত দুর্ব্বল বা অসুস্থের পক্ষে তাহা বিষ। ইহা রাম-মোহন বেশ ভাল রকমই বুঝিতেন, তাই আচার পরিবর্ত্তনে লোককে উত্তেজিত করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ মানবের স্বাধীন ইচ্ছার দাবীর পক্ষ-পাতী, তাই তিনি প্রত্যেককে স্বীয় সুবিধা ও লাভ বুঝিয়া অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করেন।

রামমোহনের সার্ব্বজনীন উদার বিশ্ববোধ ও অপৌত্তলিক ঈশ্বরচিন্তা তাঁহার নিজের বাক্যে কার্য্যে কি ফল দর্শাইয়াছে একটু প্রণিধান করা যাউক। রাধানগর হইতে কলিকাতায় আসিয়া ফার্সী পাঠ ও চাকুরির চেষ্টায় তাঁহার মুসলমান সহবাস ও সংস্পর্শ ঘটে। তাঁহার প্রথম পুস্তক "তোহাফ্ তুল্ মোহদিন্" (পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ) ফার্সী ভাষায় লিখিত ও তাঁহার মুর্শিদাবাদ অবস্থানকালীন প্রকাশিত হয়। ইং ১৮৩০ সালে

বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে যে পূর্ণ ব্রহ্মবাদ অবলম্বনে উপাসনা-গৃহের ট্রাষ্টডীড প্রস্তুত ও তথায় ভজনার ব্যবস্থা হয়, তাহার আভাষ এসম্বন্ধে ফার্সী-ভাষায় লিখিত ঐ প্রথম পুস্তকখানিতে দেখা যায় না। বাবু রাজ-নারায়ণ বসু এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। "মৌলভীর সহিত বিচার" নামক বাংলা পুস্তক লিখিয়া তিনি মুসলমানদের বিরাগভাজন হন, বিশেষতঃ মহম্মদ, বা বড় পীরসাহেব, প্যাগম্বর প্রভৃতির মধ্যস্থতা অস্বীকার করায়। রাজা রামমোহনের গ্রন্থপ্রকাশক রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রারম্ভে বলিয়াছেন "প্রতিবাদকারীগণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কঠিনতা ও সাকার উপাসনার শাস্ত্রীয়তা ও ঔচিত্য এবং রামমোহন রায় ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের বেদজ্ঞানবিহীনতা ও বিবিধ ব্যবহারদোষ প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করেন (সনাতন হিন্দুসমাজের পণ্ডিত-গণের সম্বন্ধে এই উক্তি করা হইয়াছে)। রামমোহন রায় ঐ সকল গ্রন্থের খণ্ডনার্থ উত্তর গ্রন্থ সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে এই "পথ্য প্রদান" গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহা সকল বিচার গ্রন্থ অপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে প্রায় তাবৎ বিচার গ্রন্থের মর্ম্ম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে "রাম-মোহনের জীবনচরিত প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়া-ছেন "স্থানে স্থানে দুই একটি মিষ্টি বিদ্রুপ আছে; পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে—"আমাদের নিন্দার উদ্দেশে ধর্ম্মসংহারক আপন প্রস্তাবের নাম "পাষণ্ড পীড়ন" রাখেন, তাহাতে বাগ্‌দেবতা পঞ্চমী সমাসের দ্বারা ধর্ম্মসংহারকের প্রতি যাহা যথার্থ তাহাই প্রয়োগ করিয়াছেন। "পথ্যপ্রদানে" রাজা লিখিয়াছেন "গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্যচরিতামৃত যাহার শব্দব্রহ্ম, তাহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।"—এ অনুকম্পার প্রয়োজনাভাব। চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বাঙলাদেশের ধর্ম্ম সংক্রান্ত রাজার এরূপ মনোভাব তাঁহার ন্যায়দর্শিতা, সার্ব্বজনীনতা, স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির অপেক্ষা তাঁহার

ব্যক্তিত্বকেই বেশী পরিস্ফুট করিয়াছে। এই ব্যক্তিত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, বরং বাক্যে ও আচরণে ভবিষ্যত বংশীয়দের দৃষ্টান্তস্থল করিয়া তিনি অকাতরে তাহা দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা, পিতামহ বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রিত, ও তাঁহার মাতামহ তন্ত্রাচারপরায়ণ শাক্ত ছিলেন। রাজা বৈষ্ণবপন্থীদের নানাস্থানে সর্ব্বরকমে আক্রমণ ও শ্লেষ ও ব্যাঙ্গোক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার "গোস্বামীর সহিত বিচারে"ও ইহার অভাব নাই। কিন্তু ইংরাজিতে বাদানুবাদকালীন টলারেসান (Toleration) এর মহিমা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য ৺চন্দ্রশেখর দেবকে বলিয়াছিলেন "ধর্ম্মবিষয়ে তর্কের সময় প্রতিপক্ষের মত ও ভাবকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।"

চৈতন্যচরিতামৃত সম্বন্ধে রাজার মন্তব্য "পথ্য প্রদানের" ৩১৯।২০ পৃঃ দেখিলে তাঁহার অজ্ঞতা ও স্বকপোল কল্পনারই পরিচয় পাইয়া থাকি। তিনি যদি উক্ত গ্রন্থখানি একবারমাত্রও পড়িতেন, তাহা হইলে "পাষণ্ড-পীড়নের" অর্থ নিষ্কাষণে বৈয়াকরণ সাধিয়া উপরোক্ত পণ্ডিতি রসিকতা প্রচারের অনাবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতেন। "কায়স্থের সহিত বিচারে" মদ্যপান সম্বন্ধে ছাপা পুস্তকের পৃষ্ঠায় পোষকতা করিতে অগ্রসর হইতেন না। উহার দ্বারা উপাসনা ভাল হয়, এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সহায়তা করে, এবম্বিধ মত প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। শাস্ত্রানুযায়ী [illegible] করিলে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মহানি হয় না এপ্রকার মত "পথ্য প্রদানের" [illegible] পরিচ্ছেদেও সমর্থিত হইয়াছে। তথাপি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ [illegible] আনন্দ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, "শতাব্দি অতীত হইল, তবুও রামমোহনের প্রতি হিন্দুসমাজের বিদ্বেষের তাপ প্রশমিত হইল না, ইহাই [illegible] জ্বলন্ত প্রতিভার পরিচয়।" মহাপুরুষের প্রতি এভাবে শ্রদ্ধা ও [illegible] নিবেদন আমরা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রকারে রামমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্বকে পূজনীয় করিবার চেষ্টা আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন লাভ করে, কারণ ইহাই আমাদের স্বদেশ-

বাসীদের যুগযুগান্তরের স্বাভাবিক প্রবণতা ও সাম্প্রদায়িকগণের চিরন্তন রীতি। বৈষ্ণবপন্থীর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতি যেমন ধর্ম্মজীবনে আবশ্যক, নবীন ব্রহ্মবাদীদেরও ধর্ম্মজীবনে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আদিগুরুর প্রতি বৎসরে বৎসরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন তেমনি আবশ্যক। তাঁহাদের যে সে বিষয়ে শৈথিল্য বা নিষ্ঠার সঙ্কীর্ণতা এযাবৎ হয় নাই, ইহা আনন্দের বিষয়। "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে" রাজা বলিয়াছেন "ব্রহ্মকে সগুণ করিয়াও কহা যায় না। তবে যে তাঁহাকে স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায় সে কেবল প্রথমাধিকার বোধের নিমিত্ত।" দেবেন্দ্রনাথের মতে রামমোহন দ্বিতীয়যামদগ্ন্য; বিচারকুঠারহস্তে ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কুসংস্কার উন্মূলন ও পৌত্তলিকতা ছেদন করেন। ব্রাহ্মসভার গৃহের জন্য ট্রাষ্টডীডে লেখা হইয়াছে যে কোনরূপ বাহ্যিক প্রতীক তথায় ব্যবহৃত হইবে না—"that no graven image or carving or oblations or offerings of any kind be permitted therein," সুতরাং গেঁদাফুল ও পত্র দিয়া দেয়ালগাত্রে ওঁ রচনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও চলিতে পারে না।

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ?
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডি
অদৃশ্য অস্পৃশ্য হয় সেই যমদণ্ডি।
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক,
বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধ'তে অধিক।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে।
ইত্যাদি—

(চরিতামৃত মধ্যলীলা)

এ অভিধা রামমোহন বিদিত থাকিলে "পাষণ্ড" শব্দ প্রয়োগে নিন্দা বোধ না করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেন। কারণ, তাঁহার ধর্ম্মের নব আলোচনা ও তদনুযায়ী উপাসনাতে তাঁহার মূল কথা ছিল "শ্রীবিগ্রহ না

মানা" বা অপৌত্তলিক নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা, যাহাকে চৈতন্যদেব বলেন "বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধতে অধিক।" ইহা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের প্রতি কটাক্ষ, আর রামমোহনের মন্দিরে সমবেত উপাসনার ভিত্তি ছিল তৎকালীয় সাধারণ হিন্দুদের স্বল্পপঠিত শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত-বাদ। "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে" রাজা লেখেন :—

"ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। তিনি আপনার স্বরূপের নামে শক্তিমান নহেন। স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্জ্জয়, অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক।"

অথচ তিনি 'ব্রহ্মোপাসনা' পুস্তিকায় উপাসকদের ব্যবহারার্থ মহানির্ব্বান তন্ত্রের ৩য় উল্লাসের পঞ্চরত্ন স্তোত্রটি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে ব্যবহৃত শব্দের কোনরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা মনে করেন নাই। উক্ত স্তোত্রে আছে

"ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগতকারণং বিশ্বরূপং।"
"নমস্তে শতেতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।"

তিনি হয়ত অদৃশ্য অথচ প্রত্যক্ষ "গতিঃ প্রাণিনাং," "ত্বমেকং [illegible] সাক্ষিরূপং" সেই জগদ্‌বহির্ভূত "অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য [illegible] "তদেকং স্মরাম স্তদেকং ভজাম" বলিয়াই সাধন-তৃপ্তি লাভ করিতে [illegible] কিন্তু "ভবাম্ভোধিপোতং শরণং" "ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ [illegible] ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং পাবনং পাবনানাম্" কি করিয়া [illegible] উচ্চারিত হইতে দেন তাহা বুঝা যায় না। "শিবে সানুকম্পে [illegible] ব্যাপিকে বিশ্বরূপে" সমূর্ত্তি ব্রহ্মকে বাদ দিয়া, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-এর

সাকার সগুণভাব কেমন করিয়া অমূর্ত্তি ব্রহ্মতে উপাসক প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহা সমাধানের ব্যবস্থা রাজা করেন নাই।

"জগদ্ভাসকাধীশ" ভূতনাথের পূজা যে 'ভূতাত্মা ভূতভাবন'রূপে করিতে হইবে তাহা ব্যাখ্যানে ও পুস্তকাবলীতে রাজা প্রচার করিলেও কেন যে তিনি রুদ্রযামলের "ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্" এর নামমালায়

"অভীরুর্ভৈরবোভীরু ভূতপঃ যোগিনী-পতিঃ।
ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভানবান্॥"

শ্লোকের সমদর্শিতা ও ঈশ্বরে সকল বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ উপেক্ষা করিয়াছেন বলা কঠিন। প্রতিভাশালী রামমোহনের বৈদান্তিক মনকে উহা স্পর্শ করিল না, কারণ তিনি জগদীশ্বরের সহিত মানবের রাজা-প্রজা সম্বন্ধে অভিবাদন বা প্রণতিটাই অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিতেন, তদতিরিক্ত জীবোদ্ধারণ ব্রতে আস্থাবান ছিলেন না। বোধ হয় ভোগবিলাসী আত্মকেন্দ্রীর পক্ষে ইহা তুচ্ছ, কিন্তু দীনদরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া সকল ধর্ম্মের প্রচারকের আদর্শস্থল বলিয়া প্রশংসিত ও প্রচলিত আছে। হয়তো রাজা তদূর্দ্ধে গিয়াছিলেন। সাধনমার্গে তিনি তৎকালে স্ব-স্থানের অধিকারী হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন। তাঁহার সার্ব্বজনীন ভাব ও সার্ব্বভৌম উপাসনার প্রচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধ। সুদূর বিলাতেও লোকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইতে কুণ্ঠিত বোধ করিত না। Religion সম্বন্ধে তিনি ইউনিটেরিয়ান হইয়া খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের একীকরণ প্রয়াসী দলভুক্ত ছিলেন। অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বস্থানে তিনি মান পাইয়াছেন, কিন্তু ধনবিদ্যাগৌরবে আচ্ছাদিত হইয়া তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান গীতার লক্ষীভূত পণ্ডিতের সংজ্ঞায় তাঁহাকে স্থান দিতে পারে নাই।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী
শুনিচৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

গীতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এরূপ আদর্শবাদী লোককে

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আখ্যা দিয়াছে কিন্তু পণ্ডিত ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা ও সমাদর দিতে পারে নাই। তাহারা সংসারে অকেজো। রাজা সীতারাম রায়ের মন্ত্রণা-দাতা সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার তাঁহার কল্পিত আদর্শ। ব্যবহার-জীবী রামমোহনের সংস্কারবুদ্ধিও সম্ভবতঃ এইরূপ কোন একটা পার্থক্য কল্পনা করিয়া থাকিবে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পরদুঃখকাতর সহৃদয় মন-ভূলোকের জনসাধারণের অপাপবিদ্ধ সাংখ্যের নির্ব্বিকার পুরুষ ঈশ্বরের কল্পনায় বা খালি তাঁহার সাত্বিক ভাবের কীর্ত্তনে রাজার প্রবর্ত্তিত উপাসনা প্রণালীতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারে নাই। তিনি সাবিত্রি ঋকের শেষ দুইটি পাদ "ভর্গোদেবস্য ধীমহি" ও "ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ"কে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। ঈশ্বরের ক্রীয়াশীল রাজসিক চেতনাকে উপনিষদের পুষ্পময়ী ভাষায় পূজার্হ করিলেন। ক্রমে ত্রৈলোক্যপালক বিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপকতা, আকাশতুল্য অনিমেষ আঁখি, এবং যে অবিনাশী সাত্বিক প্রভাবে অমৃত-ক্ষরণ দ্বারা সব মধুময় ও মধুবৎ বোধ করাইতেছে ও করিতে থাকিবে, তাহাও নিত্য উপাসনার অন্তর্গত করিলেন। তাহারই স্মরণে "আনন্দ-রূপম অমৃতং যদ্বিভাতি" নব ধর্ম্মের বীজ শ্রেণীমধ্যে সংন্যস্ত করিয়া তাহাকে ভাবচিন্তায় সকল দুঃখ কষ্ট মলিনতার আবরণ সৃজণ করিলেন। "ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এর মধ্যে আমাদের সকল প্রয়োজন ও কার্য্য পর্য্যবসিত দেখিয়া, যাবতীয় তামসিক প্রকাশ ও ভাব এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থে প্রার্থনা আর স্বতন্ত্র ব্যক্ত না করিয়া ইহারই গর্ভে কবলিত রাখিয়া দিলেন। জগতে যখন আছে তখন সহিতেই হইবে, জন্মান্তর পাপ পুণ্যের বিচার অপ্রাসঙ্গিক। তাহা কাটাইয়া উঠিবার বুদ্ধিটুকু থাকিলেই যথেষ্ট এবং তাহা যাহাতে অবিকৃত ও অবিচলিত থাকে তাহার নিমিত্ত "প্রচোদয়াৎ" প্রয়োগ। কিন্তু ব্রহ্মের ভাব বৈলক্ষণ্য, [illegible] অবস্থা সম্পূর্ণ স্বীকার করতঃ উপাসককে প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন—

" রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম।"

কিন্তু অনুবর্ত্তীদের চরম লক্ষ্য কি থাকিবে তাহাও সিদ্ধান্ত করা প্রয়োজন,

তাই স্থির করিয়া দিলেন স্বর্গ নয়,—**ব্রহ্মলোক** প্রাপ্তি,—অর্থাৎ অনন্ত অবিকৃত চৈতন্যের মধ্যে সময় নিরপেক্ষ অবাধে কালযাপন। রাজার প্রণালীতে রুদ্র বা দক্ষিণ মুখ উক্ত করিলে পৌত্তলিকতার ভাব আসে, তাই তাঁহার তৎকালীন মনোভাবের সহিত ঐক্য রাখিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্যাসকৃত নিম্নে প্রদত্ত স্তবটি প্রত্যেক উপাসনার প্রারম্ভে পাঠ করিতেন,

> "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদবর্ণিতং
> স্তুত্যাঽনির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরোদূ'রীকৃতা যন্ময়া।
> ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যৎ তীর্থযাত্রাদিনা
> ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

হে অখিল গুরো! তুমি রূপবিবর্জ্জিত, অথচ ধ্যানের দ্বারা আমি তোমার রূপ যে বর্ণন করিয়াছি এবং স্তুতির দ্বারা তোমার যে অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি ও তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপিত্বকে যে বিনাশ করিয়াছি,—হে জগদীশ! চিত্তবিকলতা হেতু আমি যে এই তিন দোষ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর।

রামমোহন রায়ের স্থাপিত আত্মীয়সভাকে তৎকালীন লোকেরা ব্রহ্মসভা বলিত। রাজার জীবদ্দশায় এই সভার বার্ষিক অধিবেশনকেই ব্রহ্ম-সমাজের বার্ষিক উৎসব বলা হইত, এবং তাহা প্রতি ভাদ্র মাসেই হইত। ভদ্রলোকের সমাগম বা অধিবেশনকেই, মুসলমানী মজলিস্ বা আধুনিক ভাষায় কনফারেন্স (Conference) বলে। সেইরূপ সাম্বৎসরিক উৎ-সবার্থে মিলিত সমবেতমণ্ডলীকে তৎকালে ব্রহ্মসমাজ আখ্যা দেওয়া হইয়া-ছিল। নতুবা একধর্ম্মাবলম্বী নরনারীর স্থায়ী সঙ্ঘ সম্বৎসর ধরিয়া ক্রিয়াশীল ও পুরুষানুক্রমে বিশিষ্ট নিয়ম ও আচারমণ্ডিত জনমণ্ডলীকে আধুনিক কালে আমরা যাহাকে সমাজ বলিয়া থাকি সে অর্থ তখন ছিল না। শুধু উপাসনা নয়, একত্রে পানভোজন ও বৈবাহিকবন্ধনে পরস্পর আদান প্রদান এক-সমাজীয় লোকের বর্ত্তমানে অন্যতম লক্ষণ। সমবেত উপাসনাকে

নব বিচিত্র বর্ণে প্রস্ফুটিত করা ও তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উল্লিখিত লক্ষণা-যুক্ত একটি জনমণ্ডলীর সৃজন করা এবং বাঙলার গ্রামে গ্রামে তাহার শাখা স্থাপন করা দেবেন্দ্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টার ও ক্ষয়ক্ষতির নিদর্শন। তাহা অধ্যবসায় ও বহু অর্থ ব্যয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে, এই উপাসনা ভবনের সহিত দেবেন্দ্রনাথের সংযোগ ঘটার পরবর্ত্তী কাল হইতে। রাজার বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে চিৎপুর রোডস্থ নব গৃহে ১৭৫২ শকের (ইং ১৮৩০ খৃঃ) ১১ই মাঘ দিবসে এক শনিবারের অপরাহ্নে আত্মীয়সভার কাগজ-পত্র ভাড়াটিয়া বাটি হইতে আনীত হয়। শনিবার সমাজের উপাসনার দিন ছিল না এবং এ শনিবারে বিশেষ কোন উপাসনার উল্লেখ আমরা কোথাও পাই নাই। সুতরাং বহু বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ যখন ১১ই মাঘ তারিখটিকে সম্প্রদায়ের সকলের স্মরণীয় করার মানসে উৎসবের প্রচলন করেন, উহাতে কোন অর্চ্চনার স্মৃতি সজীব রাখার উদ্দেশ্য ছিল না। মন্দির-প্রতিষ্ঠা বা এস্থলে গৃহপ্রবেশের তারিখটির পুণ্যস্মৃতি কেবলমাত্র বরণীয় ও রক্ষিত করাই অভিপ্রায়।

দেবেন্দ্রনাথের অল্পবয়স হেতু রাজার বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বা ধর্ম্মসংক্রান্ত আলোচনা হইবার সুযোগ ঘটে নাই। গঙ্গাতীরে মালপাড়া গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ও শান্তিপুরের বিখ্যাত স্মৃতির অধ্যাপক রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতির শিষ্য পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৮১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। রামমোহনের আনুকূল্যে তিনি বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে কলিকাতায় নিযুক্ত থাকেন এবং পরে ১৮২৭ সালে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণান্তর হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজার রঙ্গপুর থাকাকালীন ১৭৯৮।৯৯ খৃঃ তীর্থস্বামীর সহিত পরিচয় ঘটে। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও উদার মতাবলী রাজাকে আকৃষ্ট করে ও উভয়ের মধ্যে এত গাঢ় প্রণয় হয়

যে রাজার বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত একাধিক দলিলাদিতে স্বামীজী সাক্ষী হন। রামমোহন তখন একজন ক্রিয়াবান তান্ত্রিক উপাসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কলিকাতায় লোকে হরিহরানন্দকে রাজার ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া জানিত, কারণ রামমোহনের মানিকতলা বাসভবনে তাঁহাকে এই বামাচারী অবধূতের সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতে ও গোপনে কিছু কিছু ক্রিয়া করিতে শুনা যায়। হরিহরানন্দের চতুর্থ ভ্রাতা উক্ত রামচন্দ্রের নিকট দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার সাহায্যে ইং ১৮৩৮ হইতে ১৮৪৪ সাল মধ্যে এগারখানি প্রধান প্রধান উপনিষদীয় দর্শনগ্রন্থের পাঠ সাঙ্গ করেন। এবং তাহার বিষদ আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা স্থাপন করিয়াছিলেন। কালে এই সভার কর্ত্তৃপক্ষ রামমোহনের উপাসনা ভবনের সাপ্তাহিক উপাসনার পরিদর্শন ও পরিচালনভার গ্রহণ করেন। পরে নিজেদের স্থিরীকৃত প্রতিজ্ঞাপত্র অবলম্বনে "বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম" ব্রত স্বরূপ গ্রহণের সঙ্কল্প এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে ২০ জন বন্ধু সহ পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সমক্ষে সসম্ভ্রমে উচ্চারিত করেন। ইতিপূর্ব্বে এক 'অভিষেক' উৎসব অনুষ্ঠিত করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে আচার্য্য ও পুরোহিত পদে ব্রতী করেন। লিখিত প্রতিজ্ঞা পাঠ ও অঙ্গীকার করাটাই দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের দীক্ষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিশেষ তিথিটি ঐ সনের সালের সৌর মাহা পৌষের সপ্তম দিবস হওয়ায়, তিনি ইহার বাৎসরিক প্রত্যাবর্ত্তনে বিলাতি প্রথামত তারিখটি লোকের মনে উৎসব ভাবে জাগরুক রাখিতে যে সকল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা আমরা পরে বলিব।

মতবাদ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে যে সকল বৈষম্য ছিল, তাহা তীক্ষ্ণধী রাজা রামমোহনের অগোচর ছিল না। দূরগত বিশেষ লক্ষ্য না থাকায় বা সমষ্টিগত ব্যক্তিগণের তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাধনা অভ্যাসের ফলে তাহাদের নিজেদের বা পরিজনবর্গের মধ্যে কি পরিণতি লাভ করিল এবং সাধারণ

হিন্দুভাবাপন্ন সমাজের মধ্যে পরিণামে কিরূপ আকার ধারণ করিবে বা করা উচিত সে সম্বন্ধে রাজা মনোযোগ করেন নাই। তবে তাঁহার সহিত বর্ত্তমান ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের যোগস্থাপন করিতে হইলে এই সমাজগৃহ বা মন্দির এবং তাঁহার একটি বাক্যকে ইহার উপাসনা-প্রণালীর বীজরূপে ধরিতে হয়।

রামমোহন রায় "বেদান্ত দর্শনের" ব্যাখ্যায় একস্থলে লিখিয়াছেন—"পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত **অনুবন্ধ** অর্থাৎ প্রীতি, আর **তাদ্বিধ্য** অর্থাৎ প্রীত্যনুকুল ব্যাপার, এই দুই পরম মুখ্য উপাসনা হয়।" দেবেন্দ্রনাথ ইহাকেই কেন্দ্রে রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন যে "ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ চতুষ্টয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যটি সকল অপেক্ষা সুন্দর এবং মহান—

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনেব"

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই বাক্যটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বেদোক্ত মনে করিয়াছিলেন। বসু মহাশয় তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন যে উহা বেদোক্ত নহে, মহর্ষির রচনা। তত্ত্ববোধিনী ১৮৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি লেখেন "একমাত্র এই বীজ চতুষ্টয় দৃষ্টিকরাই তাঁহাকে 'মহর্ষি'র আসনে অবিচলিত রাখিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে এইভাবের কথা থাকিলেও এই ভাবটিকে সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিকরা এবং বীজমন্ত্রের আকারে তাহাকে একটা বিশুদ্ধ গঠন দিয়া সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাতেই ভারতের ধর্ম্মজগতে দেবেন্দ্রনাথের আসন অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।"
বীজ চতুষ্টয়ের অন্যান্য বাক্যগুলি এই—

১। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

২। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

৩। শান্তং শিবমদ্বৈতং।

অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' -এর দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—"বিশ্বপতি যে সকল শুভ-কর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য, এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক তৎ-সমুদয় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম।" তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালীতে প্রার্থনার শক্তি যে কিছু নয়, তাহা নিম্নলিখিত রূপে দেখাইয়াছিলেন—

"পরিশ্রম = শস্য,
পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য
∴ প্রার্থনা = ০

প্রার্থনা দ্বারা কৃষাণের কস্মিনকালেও শস্যলাভ হয় নাই।" তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক ডীজম্ (Deism) করিবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহর্ষির ভক্তিভরা প্রাণ তাহার অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার গুরুভাইয়ের এই মতের প্রচার দমন করেন, কিন্তু শ্রীযুত অক্ষয় দত্তের সঙ্গত্যাগ করেন নাই। দত্ত মহাশয় শিরপীড়ায় কাতর হইয়া সমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইতে অক্ষয়কুমার ইহার সভ্য ছিলেন। তিনি মহর্ষির সহিত একই দিনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট "বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মে" দীক্ষিত হন ও উহাকে যাবজ্জীবন ব্রত-রূপে রক্ষা করিবার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করেন। তাঁহার বাটির বিবাহাদি তিনি পৌত্তলিক কায়স্থসমাজের রীতি অনুসারে পরিচালন করিতেন, আচারের পরিবর্ত্তন করেন নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রধান লেখক-রূপে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদার প্রমুখ কয়েকজনকে লইয়া মহর্ষির বাটিতে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার জন্য তিনি একটি খণ্ড সভা প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নামকরণ হয় "আত্মীয়-সভা।" রামমোহনের আত্মীয়সভা বহু পূর্ব্বে উঠিয়া যায়। তাঁহাদের

আলোচনার ধরণ ধারণ মহর্ষি পছন্দ করিতেন না ও "ব্রহ্মগোল" আখ্যা দিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের "নাস্তিক" বলিতেন। তাঁহাদের সচেতন করিবার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিতেন "নাস্তিকতা অপেক্ষা পৌত্তলিকতা বরং ভাল," আবার সকল "ব্রহ্মগোল" ও বিতণ্ডাও থামাইতেন। সমাজীয় উপাসনায় দত্ত মহাশয় যোগ দিতেন এবং কর্তৃপক্ষের মুখপত্র স্বরূপ মাঘোৎসবেও প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যান দিয়াছেন। ইং১৮৫১ সালের অধিবেশনে তিনি সমাজের পক্ষ হইতে ঘোষণা করেন "বিশ্ব-বেদান্তই বেদান্ত।" উক্ত বক্তৃতা হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী মসী দ্বারা লিখিতবৎ বিশ্বরূপ মূল গ্রন্থের এক এক পত্র স্বরূপ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ ধূমকেতু যাহার অবিনশ্বর অক্ষর স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল্প অভ্রান্ত শাস্ত্র। আমাদিগের আপন প্রকৃতিই আমাদিগের এক এক পরমশাস্ত্র স্বরূপ। যে নক্ষত্রের মনোবৎ দ্রুতগামী কিরণপুঞ্জ পৃথিবীমণ্ডলে উপনীত হইতে দশলক্ষ বৎসর অতীত হয়, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। আবার যে অতি সূক্ষ্ম শোণিতবিন্দু আমাদিগের হৃদয়াভ্যন্তরেই সঞ্চরণ করিতেছে তাহাও আমাদের শাস্ত্র। সমগ্র সংসারই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য।"

রামমোহনকেও তিনি তাঁহার স্বপক্ষে টানিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার বিশ্বাস সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়াছেন "বিশ্বরূপ বিশাল পুস্তক মাত্রই ঈশ্বরের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া তিনি (রাজা) প্রত্যয় করিতেন।" প্রকৃত প্রস্তাবে ধরিতে গেলে নবানুষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদ-বেদান্তের বর্ণিত হিন্দু চিন্তা-ধারা হইতে মুক্ত হইয়া যে-দিন স্বীয় পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক মানবের মহাকাশে উত্তোলন করিল, তাহাই তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার দিন। আজও ঐ দিনের স্মৃতি উৎসব যেমন ফরাসীদের স্বাধীনতা দিবস ১৪ই জুলাই ধার্য্য আছে, মার্কিনদের স্বাধীনতা দিবস (Independance day) প্রতি বৎসর ৪ঠা জুলাই (১৭৭৬ ইং সাল হইতে) অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি উপযুক্ত শিষ্যপরম্পরার দ্বারা অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাজের জন্মতিথি উৎসব প্রত্যেক

বৎসর হওয়া সমীচীন, কিন্তু রামমোহনের মন্দির স্থাপনার দিন ও বৎসর ইং ১৮৩০ সাল স্মরণীয় তিথি ও বৎসর না হইয়া ইংরাজি শুভ ১৮৫১ সাল হইতে নব ধর্ম্মের বৎসর বা ব্রাহ্মাব্দ গণনা করা বঙ্গবাসীগণের কর্ত্তব্য। এই পরমোক্তি ১১ই মাঘে উচ্চারিত হওয়ায় সর্ব্বসম্প্রদায়ের ব্রহ্মবাদীদের পক্ষে মাঘোৎসবটি প্রকৃত মহোৎসবরূপে অক্ষুন্ন রহিয়া গেল। কিন্তু যখন এই সম্প্রদায়ের ব্যবহারার্থ বীজ চতুষ্টয় দেবেন্দ্রনাথ ধার্য্য করিয়া দিলেন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ধর্ম্মযাযীরা নব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বেদান্তিষ্ট্স্ পরিবর্ত্তে ব্রহ্মজ্ঞানী সংজ্ঞা পাইলেন ও তাঁহাদের বিশ্বাসের চত্বরভূমি গণ্ডিবদ্ধ হইল, তাহা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ইঁহার মন ও লেখনী কার্য্য করিত। মহর্ষির পত্রাবলীতে প্রকাশ যে "ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত দুজনেই আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা নৈতিকতাকেই বড় বলিয়া জানিতেন।" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিন্তু অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "He was the intellectual head of our Samaj, while my father was the spiritual head." অর্থাৎ আমাদের সমাজে জ্ঞানচর্চ্চায় মাতব্বরপ্রধান ছিলেন অক্ষয়কুমার আর আধ্যাত্মিকতা ও ভগবতত্ত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ আসন ছিল আমার পিতার।

প্রসিদ্ধ জার্মাণ অধ্যাপক মোক্ষমুলার (Professor Maxmuller) তাঁহার "জীবনী-সংগ্রহ" বা "Biographical Essays" গ্রন্থে ৮৩ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"The stream is small as yet, but it is a living stream. It may vanish for a time, it may change its name and follow new paths of which as yet we have no idea. But if there is ever to be a new religion in India, it will, I believe, owe its very life-blood to the large heart of Rammohon Roy and his worthy disciples Devendra

Nath Tagore and Keshob Chandra Sen." পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ হইতে পাঠকেরা বুঝিবেন রাজা রামমোহনকে দেবেন্দ্রনাথের গুরুবলা কতটা সঙ্গত এবং কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াও মহর্ষি প্রদত্ত "ব্রহ্মানন্দ" উপাধিতে গৌরবান্বিত হইয়া গুরুদত্ত মন্ত্র-সমূহ ভাবধারা ও ব্যক্তিত্বর অভিব্যঞ্জনা কি পরিমাণে উত্তর পুরুষের জন্য অক্ষুণ্ণভাবে রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে পাঠক সম্যক অবগত হইবেন। যদি অল্পদিনের মধ্যেই নবানুষ্ঠিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম উপাসনা-পদ্ধতি ও ব্রাহ্মসমাজ খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া চার পাঁচটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে অব্যাহত প্রবাহিনী নদীর মত তাহার জীবনস্রোতের উপমাটা কিরূপ উপমানের সহিত তুল্য তাহাও বিবেচনা-যোগ্য। সাগরাভিমুখী গঙ্গার ব-দ্বীপের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার মত তখনকার বাঙালীদের দর্শনচর্চ্চা ও ভগবৎতত্ত্ব অনুসন্ধানের প্রবল আগ্রহের সাক্ষ্য ইহা দিতেছে, তথাপি পিতৃদেবের আত্মচরিতের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশকল্পে পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অবতরনিকায় এই বিভেদের একটু ইতিহাস ও অন্তর্নিহিত কারণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিতেছেন—

"In 1862 my father installed Keshob as Acharya of the Samaj and conferred on him the title of 'Brahmananda.' From that time my fathar was known as 'Pradhan Acharya' or Chief Minister of the Samaj. The temperaments of the two men differed too widely to allow of a permanent co-operation. My father was essentially conservative in his instincts and was not prepared for measures calculated to subverr the social fabric of modern Hinduism. He was never known to quote the Bible, nor do we find any allusion to Christ

or his teachings in his sermons. For him the Indian scriptures sufficed. Keshob on the other hand was a reformer of a more pronounced type, his out-look was more cosmopolitan and his whole character was moulded by western culture and Christian influences. His attitude towards Christ and Christianity was in marked contrast to that of my father's. The rupture between the two was further widened by an inter-marriage between two persons of different caste solemnised by Keshob in 1863. This was a reform which my father was not prepared to adopt. The mutual love between the Pradhan Acharya and Brahmananda delayed the catastrophie, but in February 1865 Keshob finally withdrew from the Parent Church. On the secession of Keshob's party, my fathar gave his own Church the name of **Adi Brahmha Samaj**. After Keshob's seperation my father practically retired from active work in the Samaj and appointed a Committee for the management of its affairs. For himself, he had now another call. It was to live before the world, as one has well said, in it and yet out of it, the life of a true Rishi and pour forth over all who came into his presence the genial radiance of a man of God. Henceforth he became the common Patriarch of all the Brahma Samajes and a Maharshi for all Hindoos."

মহর্ষিদেবের যে উক্তিসংগ্রহ তাঁহার প্রিয়শিষ্য প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দিয়াছেন তাহাতে আমরা দেখি যে ১৮১৩ শকের ১লা কার্ত্তিকে সমাধি-

যোগে প্রাপ্ত ঈশ্বরের বাণী যাহা তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তাহা এই—"তোমার দেহ অবসান হইলে আমার প্রেমালিঙ্গন লাভ করিবে এবং নিত্যকাল আমার সহচর হইয়া থাকিবে। হা ঈশ্বর! তোমার একি করুণা।" ইহা সামীপ্য মুক্তি কি সাযুয্য স্বারূপ্য মুক্তি তাহা চিন্তাশীল পাঠক বুঝিবেন। এই সকল উক্তি হইতে দেবেন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত নব-ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়।

১৭৬১ শকে ২১ আশ্বিন রবিবার (৬ই অক্টোবর ১৮৩৯ খৃঃ) কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেন। ইহার আগেকার নাম ছিল তত্ত্বরঞ্জিনী সভা ও প্রতি মাসের প্রথম রবিবারের সায়াহ্নে এখানে কেবল উপনিষদের চর্চ্চা হইত মাত্র। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামমোহন রায়ের সভার বক্তা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে এই পাঠ-চক্রের আচার্য্য নিযুক্ত করা হয় ও জোড়াসাঁকোর বাটির একতলার ঘরে ইহার অধিবেশন হয়, ইহার সভ্য মাত্র দশজন ছিলেন। পরে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ৫৬নং সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থিত বাটিতে (এক্ষণে ইহা লাহাবাবুদের বাড়ী) একটি ঘর ভাড়া লইয়া অধিবেশন হয়, তখন অক্ষয়-কুমার দত্ত ইহার সহিত যোগ দেন। তৃতীয় বৎসরে ৩০শে ভাদ্র তারিখে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, সমারোহ করিয়া মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত "জন্মতিথি উৎসব" সম্পন্ন হয়, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা করেন। উক্ত হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, "আপনার ধর্ম্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান না পাইয়া ও বেদান্তের প্রচার অভাবে ইংলণ্ডীয় ভাষার আলোচনার বিস্তার বৃদ্ধি হইতেছে ও শিক্ষিতগণ অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান অনুসন্ধান করিতে যায়, কিন্তু যদি এই বেদান্ত ধর্ম্মপ্রচার থাকে তবে আমাদিগের অন্য ধর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রকারে আমাদিগের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষায় যত্ন পাইতেছি।" রামমোহন রায় কিন্তু এরূপ স্বাতন্ত্রতা অবলম্বনে হিন্দুধর্ম্মের বিশিষ্টতা বর্দ্ধনে প্রয়াসী ছিলেন না একাকার করিয়া নিরাকারের উপাসনা, শুধু ধর্ম্মের দিকেই ঝুঁকিয়াছিলেন।

১৮৪২ খৃঃ অব্দে এক বুধবারে দেবেন্দ্রনাথ রাজার সভা দেখিতে যান। বুধবার সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলেন, "রবিবার ও শনিবার "রাম-মোহনের সহযোগীদের আমোদের দিন,' থাকায় উহা পরিত্যাগ করিয়া তখন 'আত্মীয়সভার' বৈঠক ও উপাসনা বুধবারে হইতেছিল। রাজা থাকিয়াই এই দিন ধার্য্য করেন। মহর্ষিও সেইজন্য পরে ইহাই তাঁহার সমাজীয় উপাসনার দিন ধার্য্য করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের উক্তি—"সেখানে এক ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও আর দুই তিন জন ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া এক দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণের উপনিষদ পাঠ শুনিতেছিলেন। আমি শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার নাই দেখিয়া শুনিয়া, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম। নির্দ্ধারিত হইল, তত্ত্ববোধিনী ব্রাহ্মসমাজের ও উপাসনার তত্ত্বাবধান করিবে। সেই অবধি তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে (সমাজগৃহে) ব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসনা ধার্য্য হইল। এবং ২১শে আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনীর সাম্বাৎসরিক সভা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস (?) ১১ই মাঘ সাম্বাৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হইল। ১৭৫০শকে ভাদ্রমাসে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় এবং এই ভাদ্রমাসে তাহার যে সাম্বাৎসরিক সমাজ হইত তাহা আমার ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ হইবার পূর্ব্বেই ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে উঠিয়া গিয়াছিল" (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী ৩য় সংস্করণ ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বাঙলা-দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিবসই সাম্প্রদায়িক উৎসব তিথি বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু তাঁহার সহিত আদ্যান্তে মহতী পূজা ও দরিদ্র নারায়ণের সেবার স্মৃতি বিজড়িত থাকে। উক্ত 'আত্মচরিত' পুস্তকের সম্পাদক খিদিরপুর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সংস্করণের (বিশ্বভারতী) ৭২পৃঃ লিখিয়াছেন "মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব এই দুইয়ের মধ্যে ভাদ্রোৎসবই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের

সাম্বাৎসরিক, তাহাই রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও প্রাচীনতর। মাঘ-মাসে সাম্বাৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ করা দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সাল হইতে আরম্ভ করেন।” আমরা দেখি যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাখানিও সমসাময়িক ১৮৪৩ খৃঃ অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকতায় ভাদ্রমাসে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। যাহাতে ঈশরের সঙ্গে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ রক্ষিত হয়, তজ্জন্য শঙ্করভাষ্যের পরিবর্ত্তে নূতন করিয়া উপনিষদের বৃত্তি লিখান হয়, এবং দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং সংস্কৃত ভাষাতে বৃত্তি প্রস্তুত করেন ও বাংলা অনুবাদ সহ তাহা ঐ পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল। ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি। ১৮৪৯ সালের ১১ই মাঘের পূর্ব্বে রামমোহনের উপাসনা ভবন বা সমাজগৃহের তেতালা নির্ম্মিত হয়, এবং উনবিংশ (?) সাম্বাৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে মহাসমারোহে মাঘোৎসব রাত্রিতে উহা উদ্‌ঘাটন হইল। বিখ্যাত ফরাসী Theist Fenelon সাহেবের রচিত Sermon রাজনারায়ণ বসু সুনিপুণ অনুবাদ করেন। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ বাক্য যোগ করিয়া সভাস্থলে পাঠ করেন, শ্রোতৃমণ্ডলী ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করে। আত্মজীবনীর ১৯০ পৃষ্ঠায় তাই দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—” ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে এ প্রকার ভাব কখনই দেখা যায় নাই। পূর্ব্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেম-পুষ্পে তাঁহার পূজা হইল।” এই আনন্দ হইতে উত্তরোত্তর দীক্ষিত ব্রাহ্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরে উপাসনার ও সঙ্গীতাদির প্রেমপূর্ণভাব অধিকতর বিকশিত হইয়া পৌত্তলিক সমাজের ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণকেও আকৃষ্ট করিতে লাগিল, সেইজন্য উপাসনা-প্রণালী দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে সমাজগৃহে গুরুগম্ভীর ভাবের স্তোত্রগম্ভীর সঙ্গীত ও ব্যাখ্যান দ্বারা উপাসনা হইত এবং অপেক্ষাকৃত তরল ও প্রেমানুভূতির বিস্তার মানসে লঘুধরণের ব্যাখ্যান সুর গান প্রভৃতি যোজিত সংক্ষিপ্ত উপাসনা সূর্য্যাস্তের পর হইতে লাগিল, তাহাতে, সমাজ-গৃহে স্থান সংকুলান না হওয়ায়, দেবেন্দ্রনাথের ভদ্রাসনস্থিত বিস্তৃত প্রাঙ্গন,

দালান ও দুই পার্শ্বের রক ব্যবহৃত হইয়া লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ১৮৬২ সালের প্রাতরুপাসনা কিন্তু জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হয় ও তথায় মুদ্রিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। তাহার পরে কোন্ সাল হইতে সান্ধ্য বৈঠক হয়, সে বিষয়ে কোন সাক্ষ্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে তাঁহার পিত্রালয়ে এই উৎসব সমারোহ দেখিয়া উত্তরোত্তর আনন্দ লাভ ও কর্ম্মের প্রেরণা পাইয়াছেন। নবধর্ম্মযাযীদের বার্ষিক তিথি বিশেষ ১১ই মাঘ ব্রাহ্মদিগের 'মাঘোৎসব' পুণ্যতিথির প্রচলনের ইহাই ইতিহাস।

মহর্ষির পিতামহ রামমণি ঠাকুরের সময় হইতে তাঁহাদের পরিবারে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি। মহর্ষির মধ্যমা পিসি এবং লেখকের বৃদ্ধা প্রপিতামহী রাসবিলাসী দেবীর একখানি পুঁথি হইতে জানা যায়, খড়দহ গ্রামের বৈষ্ণবীরা তাঁহাদের অন্তঃপুরিকাদের বৈষ্ণব স্তবাবলীর সাহায্যে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। উক্ত রাসবিলাসী দেবী মহাশয়ার হাতবাক্সে রক্ষিত শ্রীমদ্‌রূপ গোস্বামী রচিত 'হরি কুসুম স্তব' এর একখানি পুঁথিতে দেখিতে পাই যে কাল অক্ষরে সংস্কৃত শ্লোকটি লিখিত এবং প্রত্যেক শব্দের উপরে লাল অক্ষরে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া আছে। দেবনাগর ছোট অক্ষরে লেখা আছে 'লিখিতং শ্রীকিশোরী বৈষ্ণবী সাকিম্ শ্রীপাট খড়দহ গ্রাম'। পুঁথিতে কোন তারিখ নাই। আমার খুল্লপিতামহ ৺গোকুলনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন যে তাঁহার পিতামহী রাসবিলাসী দেবীর মুখে শুনিয়াছিলেন যে বিবাহের পর দুই তিন বৎসর বৈষ্ণবীর নিকটে মেয়েদের সংস্কৃত শিখিতে হইত। রাসবিলাসী দেবীর বিবাহ দশবৎসর বয়সে (ইং ১৮০০।১৮০১) হইয়াছিল। এই পুঁথির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই সঙ্গে দিলাম।

ইং ১৮৫০ সালের ৬ই নবেম্বর অপরাহ্ণে কলিকাতা শিমলা পল্লীতে একটি নারীশিক্ষা-মন্দিরের ভিত্তি সমারোহের সহিত স্থাপন করা হয়। গভর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ও সম্ভ্রান্ত বাঙালীদের অনেকে উপস্থিত

ছিলেন এবং কলিকাতার ফ্রিমেসন্‌রা ব্যাণ্ড বাজাইয়া একটি অশোক গাছের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নিকটে ভিত্তি-প্রস্তর অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রোথিত করেন ও বীটন্‌ সাহেব অশোক গাছের পাতা ছিঁড়িয়া ভূস্বামীর নিকট হইতে জমি ও ভিতের দখল লন। ভূমিখণ্ডটি দান করেন পাথুরিয়া ঘাটার সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র স্বনামধন্য বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইনি রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া জায়গীর প্রাপ্ত হন এবং ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ-এর তালুকদার শ্রেণীতে উন্নীত হন। তদানিন্তন লাট কৌনসিলের আইনসচীব (Law member) মাননীয় জন ইলিয়াট ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন্‌ (John Eliot Drinkwater Bethune), বাংলা ভাষায়, বেথুন সাহেব স্ত্রী-বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহার নাম বেথুন ইস্কুল ও পরে বেথুন-কলেজ হয়, কিন্তু সেদিন তাহার নামকরণ হয় "হিন্দু ফিমেল স্কুল"। স্ত্রীশিক্ষার জন্য আগ্রহযুক্ত তরুণদের চেষ্টায় যত্নে ও অর্থে ইহার উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন অন্যতম। নারীশিক্ষার প্রতীকস্বরূপ অশোক-তরু স্থাপন, দক্ষিণারঞ্জনের সৌন্দর্য্য বোধ (Æsthetic consciousness) উদ্ভূত কল্পনা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার ইহার স্বপক্ষে ও উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। "সংবাদ ভাস্করের" সম্পাদক 'গুড়্‌গুড়ে ভটচাজ' (পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ), ও ইহার বিশেষ পোষকতা করেন। পণ্ডিত মদনমোহন সম্বন্ধে আমরা বেথুন সাহেবের উক্তিতে পাই যে তাঁহার দুই-কন্যাকে শিক্ষার্থে এখানে তিনি প্রেরণ করেন ও স্বয়ং শিক্ষকতার ভার অবৈতনিক ভাবে গ্রহণ করেন এবং পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। "He not only sent his two daughters to the school but has continued to attend daily to give gratuitous instruction to children in Bengali and has employed his leisure time in the compilation of a series of elementary Bengali books for their use." সুকবি মদন-

মোহনের "বাসবদত্তা" অনেকের পরিচিত, কিন্তু তিনি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণ পরিচয়' রচনায় অগ্রগামী ও স্বল্পপরিচিত তাঁহার "শিশু-শিক্ষা' গ্রন্থাবলী রচনার হেতু যে এই নবস্থাপিত বিদ্যালয়টি তাহা আমরা উপরোক্ত মন্তব্য হইতে জানিতে পারি। পাঠ অভ্যাসের জন্য অন্যান্য স্বরবর্ণ বর্জ্জিত করিয়া কেবল অ-উচ্চারণে শিশুদের জন্য পাঠ রচনা করিয়া পদ্য ব্যবহার করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"খরতর বরসর হত দশবদন।
খগচর ফনধর নগধর শয়ন॥
জগদঘ অপহৃত ভবভয় শমন।
পরপদ লয়কর কমলজ নয়ন॥

এই হিন্দু ফিমেল স্কুলটি প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপিয়া ক্রমোন্নতির ফলে আমাদের অন্তপুরিকাদের মধ্যে আলোক বিস্তার করিয়া আসিতেছে, কারণ, প্রকৃতপ্রস্তাবে ১৮৫১ খৃঃ হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। অভিজাত সম্প্রদায় তখনও ঘোর পর্দ্দানসীন্ ও ইহার বিরোধী ছিলেন; সনাতন রীতিতে মা, জেঠাইমা, দিদিমাদের সংসারাশ্রমে শিক্ষিত ভক্তি-পরায়ণ গৃহস্থালিপটু দুহিতা বনিতার পক্ষপাতী ও অধিক শিক্ষা বিস্তারের কোন প্রয়োজন স্বীকার করিতেন না।

ইহার বহু পূর্ব্বেও কলিকাতা নগরীতে বালিকাবিদ্যালয় ছিল। অনেকগুলি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত ও বালিকাদের পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহা ইস্কুল কমিটির (School Committee) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত। সার এডভার্ড রায়াণ প্রভৃতি সুপ্রীম কোর্টের বিচার-পতিরা ও কতিপয় বঙ্গবাসী এই কমিটির সভ্য ছিলেন। শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব ও পাথুরিয়াঘাটার বাবু নন্দলাল (ওরফে উমানন্দন) ঠাকুর বহু পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে এই সকল পাঠশালা পরিদর্শন ও মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করিতেন। উমানন্দন ঠাকুরের বাটির সামনে বালিকাদের ব্যায়াম ও

ক্রীড়া করিবার একটি স্থান ছিল। সেকালে নারীশিক্ষায় উৎসাহদান মানসে রাজা রাধাকান্ত দেব "স্ত্রীশিক্ষা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, যদিচ তিনি সনাতনপন্থী "হিন্দুসভা" দলের নেতা ছিলেন। বিবি উইলসন আর্করাইট প্রভৃতি কতিপয় সহৃদয় মেম সাহেবের বঙ্গভাষা শিক্ষা দিবার ইস্কুল এবং কয়েকটি মিসনারিগণ পরিচালিত ইস্কুল সহরের শিক্ষার অভাব মোচনের জন্য স্থাপিত হয়। লাট ডালহোসীকে (Lord Dalhousie) বেথুন সাহেব ২৯শে মার্চ ১৮৫০ এক আবেদনপত্র দেন ও সরকারী সাহায্য দান ও কর্তৃত্ব গ্রহণের সম্বন্ধে এক প্রস্তাব করেন, তাহাতে লেখেন—

"The failure of every attempt to induce respectable natives to send their daughters to a Missionary school, and the conviction which I have that the system of Government schools is best calculated for producing a rapid and salutary effect in this country, induced me to establish my school on the same principle of **excluding** from it all religious teaching."

সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারাল তাঁহাদের ১১ই এপ্রিল ১৮৫০ এক অধিবেশনে স্থির করিয়া ইস্তাহার দ্বারা ইহার যাথার্থ্য স্বীকার করেন ও নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করেন :—

"The Council of Education may be informed that it is henceforward to consider its functions as comprising the superintendance of native, female education and that wherever any disposition is shown by the natives to establish female schools, it will be its duty to give them all possible encouragement and to further their plans in every way."

মহাত্মা বেথুন তাঁহার চরমপত্রে উইলনামায় তাঁহার একজিকিউটার-দের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়া যান :—

"I give my carriages and horses now used at the Female school in Calcutta to the East India Company to be retained and used for the purposes of the said school.

I give and devise all my interest in the lands, buildings and other property in Calcutta now intended to be used and occupied as a female school to the East India Company and their successors and assigns **for ever** with my request that they will endow the said institution as a "Female school" in perpetuity, and honourably connect therewith the name of Babu Dakhinaranjan Mookerjee in honourable testimony of his great exertion in the cause."

ইস্কুল প্রতিষ্ঠার পর সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের আনিবার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা পণ্ডিত মহাশয়দের পরামর্শে সাহেব করিয়াছিলেন, কিন্তু তত্রাচ অনেকেই বালিকা পাঠাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। জনমত গঠন অভিপ্রায়ে পণ্ডিত মহাশয়রা নিম্নলিখিত সুভাষিত শাস্ত্রোক্তি গাড়িগুলির গাত্রে লিখাইবার ব্যবস্থা করেন :—

"কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"

প্রকৃত শিক্ষার সহিত যে মেয়েদের স্বাধীনতা ভোগের দাবী আসিবে, এই আশঙ্কাই পুরাতন সমাজকে বিচলিত করে। সকলেরই যে তখন অত্যন্ত রক্ষণশীল মন ও প্রবৃত্তি। ইংরাজি প্রভাবান্বিত ধর্ম্মহীন শিক্ষা যে আমাদের গৃহের শ্রী ও শান্তি হরণ করিবে, একথা "সংবাদ প্রভাকর" প্রভৃতি কাগজে সর্ব্বদাই ঢকা নিনাদিত হইত। প্রতিভাশালী কবি ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্ত অসঙ্কোচে লেখেন—

"একা বেথুন্ এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে
পীঁড়ে পেতে আর কি তারা
সাঁঝ সেজুঁতির ব্রত গাবে ?
ও ভাই আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবে দেখতে পাবে
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।
গোটা কতক বুড়ো য দিন
ত দিন কিছু রক্ষা পাবে
তারা মলেই দফা রফা
হিঁদুয়ানী অক্কা পাবে।"

তৎকালীন এই অস্বাস্থ্যকর সাধারণ মনোভাবের প্রতিবাদকল্পে বাবু দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যাকে ও কনিষ্ঠা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বেথুন ইস্কুলে পাঠার্থে প্রেরণ করেন। তিনি তথাকার শিক্ষার সম্পূর্ণ পোষকতা করেন, শিক্ষার উৎকর্ষতার জন্য যত না হউক, তথায় বাইবেল-ঘটিত শিক্ষার কোন উৎপাত ছিল না বলিয়া।

কেবল উপাসনা পদ্ধতির সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াই মহর্ষি ক্ষান্ত হন নাই; অন্তপুরিকাদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইলেন। মহর্ষি তাঁহার পরিবারভুক্ত মেয়েদের জন্য কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৫৪শক, ইং ১৮৩২ আষাঢ়, ৯০ পৃষ্ঠায়) মুদ্রিত স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবনস্মৃতিতে দেখিতে পাই।

"আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণীও কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানা বই হাতে থাকিতেন, আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের তত্ত্ববিদ্যার সমজদার

তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা (যশোহর চেঙ্গোটিয়া নিবাসী ৺ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পত্নী), দিদিরা, বধুঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীন দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসের অনুরাগিনী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মামীমাতাঠাকুরাণীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যতকিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারীভরা পুতুল, খেলনা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্দুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত।" মহর্ষি তাঁহার অন্তঃপুরিকাদের সুশিক্ষার জন্য প্রথমে একজন মিশনারী মেম নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল না পাইয়া তাহার স্থানে ব্রাহ্মসভার আচার্য্য পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার নিকট মেয়েরা বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিতেন। অল্প বয়সেই (১১ বৎসরে বিবাহের পূর্ব্বেই) স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাশক্তির বিকাশ হয়। তাঁহাকে মহর্ষি স্বয়ং এবং তাঁহার দাদারা রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন। মহর্ষি তাঁহার একটি রচনা পড়িয়া তাহার পার্শ্বে লিখিয়া দিয়াছিলেন—"স্বর্ণ, তোমার লেখনীতে পুষ্পবৃষ্টি হউক।" আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতিতে দেখিতে পাই তিনি লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে আমার সেজদাদা (হেমেন্দ্রনাথ) মেয়েদিগকে "মেঘনাদ বধ" প্রভৃতি কাব্য পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। * * * আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরাজি হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা সেগুলি উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখি, আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি

শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিত।”

অন্তঃপুরিকাদের জন্য সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁহার পৈত্রিক বাটি হইতে সস্ত্রীক বিতাড়িত হন। মহর্ষি তাঁহাদের উভয়কে নিজবাটিতে স্থান দিয়া সাদরে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া লন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে মহর্ষির পুত্রত্রয় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনার দ্বারা মহর্ষিকে উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত সাহায্য করিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতাগুলি লিপিবদ্ধ করিতেন, পরে ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখান নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নবীন ব্রাহ্মসমাজকে খৃশ্চান মিশনারী সম্প্রদায় এবং পৌত্তলিকতা-বাদী হিন্দুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একখানি পত্রিকার অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। মহর্ষি Indian Mirror পাক্ষিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া মনমোহন ঘোষেরও পরে কেশবচন্দ্রের হাতে পরিচালনার ভার দিলেন। মহর্ষির সহিত মতদ্বৈধের ফলে যখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহর্ষিকে ত্যাগ করিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া আদি ব্রাহ্ম-সমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে দুইটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল, তখন কেশবচন্দ্র Indian Mirror লইয়া গেলেন। পরবর্ত্তীকালে Indian Mirror ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মুখপত্রের বিশিষ্টতা ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালী পরিচালিত একখানি উচ্চাঙ্গের ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথের আর একজন সতীর্থ নবগোপাল মিত্র আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া যখন জাতীয়তা উদ্বোধনার্থ National Paper প্রবর্ত্তন করেন, তখন মহর্ষি তাহার ব্যয়ভার বহুদিন বহন করিয়াছিলেন এবং উক্ত কাগজখানি ব্রাহ্মসমাজের কাগজ বলিয়া তৎকালে পরিচিত ছিল।

কল্পনার সহিত গঠন কুশলতার সংমিশ্রণ (constructive imagination) দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুণ। তাঁহার পিতা দ্বারিকানাথও অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতে এই গুণবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনা ছিল, ইংরাজের সহযোগিতায়, ইংরাজের সাহচর্য্যে, ইংরাজের আদর্শে নব্য বাংলার সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধন করেন। এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ইংরাজি ভাষায় সংবাদ-পত্র পরিচালনা এবং ইংরাজি বক্তৃতাদি প্রধান উপায় বলিয়া স্থির করেন। এইজন্যই প্রথম বার বিলাত যাইয়া পার্লামেন্টের মেম্বার জর্জ টমসনকে ইং ১৮৪৩ সালে কলিকাতায় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু কলেজের নব্য যুবকবৃন্দকে রাজনীতির আদর্শ ও আলোচনা-প্রণালী শিক্ষা ও অভ্যাস করিবার সুযোগ দিবার জন্য ফৌজদারী বালাখানায় ডাক্তার দ্বারিকানাথ গুপ্তের (D. Gooptu) দাওয়াইখানার দ্বিতলে দ্বারিকানাথ (ঠাকুর) মহাশয় Bengal British India Society স্থাপন করেন ও তথায় টমসন্ সাহেবের কতিপয় বক্তৃতার আয়োজন হয়। পরে তিনি George Thompson's Addresses নামে সেগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া প্রচারিত ও বিতরিত হইবার ব্যবস্থা করেন। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য না করিলে এখনকার দিনে কোন জাতিরই উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব-পর নহে বুঝিয়া, ইহার পূর্ব্বেই দ্বারিকানাথ Cobb Hurry সাহেবের ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদকতায় জমিদারের স্বার্থরক্ষা কল্পে ইং ১৮৩৮ সালে Bengal Landholder's Association নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকালে' অর্থাৎ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে কয়েকজন বাঙ্গালী ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়া জনমত গঠনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, দ্বারিকানাথ তাঁহাদের অগ্রণী। উত্তরকালে যখন কেবলমাত্র জমিদারশ্রেণীকে লইয়া কাজ করিলে চলিবে না, নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তাঁহাদের সহিত অধিকতর মিলাইয়া কার্য্য

করিতে হইবে বলিয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উপলব্ধি হয়, তখন তিনি উভয় সভাকে যুক্ত করিয়া ১৮৫১ সালে ৩১শে অক্টোবর British Indian Association নামে একটি নূতন সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার প্রথম সভাপতি ছিলেন রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া দেবেন্দ্রনাথ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই সভা বিদ্যমান, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বংশধরেরা ইহার সহিত যোগ রাখেন নাই। মহর্ষির আদর্শ কিন্তু, তাঁহার পিতৃ অভিপ্রায়ের অনুরূপ ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইলে, তাহাকে ইংরাজের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই কারণেই, ধর্ম্ম, ভাষা, শিক্ষা ও আচার ব্যবহারে যে প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে হইবে,—তাহার প্রধান অবলম্বন দেশীয় ভাষার ব্যবহার হওয়া উচিত। তাঁহার এই আদর্শ অনুসারে নিজ পরিবারেই তিনি কার্য্য আরম্ভ করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসম্প্রদায়েও তিনি কেবলমাত্র আচার, অনুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলেন নাই। তিনি বেদিতে বসিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যানের সহিত সমস্ত জনহিতকর অনুষ্ঠানে যথাসম্ভব সহযোগীতা ও পোষকতা করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া উপদেশ দিতে যত্নবান ছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে ও তাহার অনুসরণকারী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইহা একটি বিশিষ্টতা। আমরা জোতিরিন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি হইতে জানিতে পারি যে, একবার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যকল্পে ব্রাহ্ম উপাসনা মন্দিরে ব্রাহ্ম উপাসনার পর মহর্ষি এরূপ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দেরা যাঁহার কাছে যাহা ছিল তাহাই দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; টাকা সঙ্গে না থাকায় অনেকে ঘড়ি, বোতাম ইত্যাদি দিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহার বহুমূল্য শালখানি ঐ উদ্দেশ্যে মহর্ষির নিকট জমা দেন। আমাদের আলোচ্য জীবনকথায় রবীন্দ্রনাথের

এই গঠনকুশল কল্পনা ও কার্য্যক্ষেত্রে তাহার ক্রিয়া ও মিশ্র অভিব্যক্তির পরিচয় যথাস্থানে উল্লেখ করিবার বাসনা আছে।

উত্তরকালে বোলপুরে মহর্ষি শান্তি-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করিবার পর তাঁহার নিজের দীক্ষার দিবসকে স্মরণীয় করিবার জন্য তথায় একটি মেলা বসান। এখনও বোলপুরে ৭ই পৌষের মেলা বলিয়া তাহার প্রসিদ্ধি চলিতেছে। ১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ (সন ১২৫০ সাল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) বৃহস্পতিবার অমাবশ্যা তিথিতে বেলা ৩টার সময় মহর্ষি বেদান্তমতে অপৌত্তলিক ব্রহ্মোপাসনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কুড়ি জন বন্ধু সহ ৺রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট দীক্ষিত হন। ইতিপূর্ব্বে তিনি এই প্রতিষ্ঠাপত্র বা Brahmic Covenant প্রস্তুত করেন ও অদ্যাপি ইহা ব্রাহ্মসমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ধরিতে গেলে ইহাই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। সুতরাং এখান হইতেই ব্রহ্মাব্দ গণনা করা উচিত এবং আদিম সকল ব্রহ্মবাদীর দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশ, যিনি ১৮২৯-১৮৪৩ পর্য্যন্ত পনের বৎসর কাল রাজার প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার দীপশিখাটি "তপসোজ্জলন্তাং" করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাকেই ওই ব্রাহ্মসমাজের মূল প্রতিষ্ঠাতা বলিলে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। ব্রাহ্মদের বিশ্বাস্য বস্তুগুলি ধার্য্য হইয়া সনাতন হিন্দুসমাজে একটা non-conformist শাখা বা অননুবর্ত্তী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইল। ইংরাজি-শিক্ষিত বিবেকপন্থীদের আচরণাতিশয্যে ও পৌত্তলিক সমাজের চাপে শীঘ্রই উৎসাহশীল যুবকদের আপন আপন পরিবারে অন্তর্ভুক্ত থাকা কঠিন হইয়া উঠিল। অনেক ধর্ম্মপিপাসু হিন্দুও প্রতিজ্ঞা-পত্র-প্রস্তরে ঠেকিয়া স্বীয় সমাজে ফিরিয়া গেলেন। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ, "বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্মে" নব দীক্ষিতদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে ও অপৌত্তলিকবাদী আত্মাগুলিকে মিথ্যাচরণ হইতে রক্ষা করিতে, একটি স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি করিয়া তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শিষ্যগণকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিশিষ্ট উপাসনা-প্রণালী

বিধিবদ্ধ হইল। গার্হস্থ্য জীবনযাপনের জন্য দ্বাদশটি সংস্কারের ও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এবং নীতিমালা রচনায় দেবেন্দ্রনাথ মনোযোগী হইলেন। প্রতিজ্ঞাপত্রগুলির বারবার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের মানসিক সংশয় ও আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার ক্রম আলোচনার স্থান এ নহে। মোটের উপর পূর্ব্ব ব্যবহৃত সকল নাম পরিত্যাগ করিয়া এখন হইতে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকানামের চলন হইল। আগে ইহাদিগকে ভেদান্তিষ্টস্ (Vedantists) ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মসভার দল বা "বেহ্মোজ্ঞানী" বলিত। দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত আজীবন ইহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের হিতার্থে সংস্কৃত ভাষায় "ব্রাহ্মধর্ম্ম" প্রণয়ন করেন। প্রথম খণ্ডে উপাস্য ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান, দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রতধারীদের নীতিমূলক জীবন ও উপাসনা অনুকূল মনঃশিক্ষার ব্যবস্থা নানা হিন্দুশাস্ত্র হইতে সংকলন করেন, তাহার পর 'ব্রাহ্মধর্ম্মের বাংলা ভাষ্য' এবং 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান্' নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮৪৮ সালের শেষ ভাগে হয়। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "আত্মজীবনীতে" এই সময়ের কথা লেখেন "আমার এখন ভাবনা হইল যে ব্রাহ্মদের ঐক্যস্থল তবে কোথায় হইবে? তন্ত্র, পুরাণ, বেদান্ত, উপনিষদ, কোথাও ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল, ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করিলাম যে ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে। তখন ১৭৭০ শক (১৮৪৮ খৃঃ), আমার বয়স ৩১ বৎসর। তাঁহার কৃপায় আমার হৃদয় আলোকিত হইল, সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রহ্মধর্ম্মের একটি বীজ দেখিতে পাইলাম, একটি কাগজে লিখিলাম। তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক সত্য সকল আমার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, আমি তাহা উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলিতে লাগিলাম এবং অক্ষয়কুমার (দত্ত) তাহা তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। আমি দেখিলাম

যে পূর্ব্বে কেবল এক অজ আত্মা পরব্রহ্মই ছিলেন আর কিছুই ছিল না। তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। তিনি দেশকাল কার্য্য কারণ, পাপ পুণ্য কার্য্যের ফল সকল আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন ও তাঁহা হইতে মন প্রাণ ইন্দ্রিয় আকাশ বায়ু জ্যোতি জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া, তাঁহারই অনুশাসনে সকলই শাসিত হইয়া চলিতেছে। এই প্রকারে তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইয়া গেল। ইহাতে আমার পরিশ্রমের ঘর্ম্মবিন্দু নাই কেবলই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। আমার কেবল এক মনের টানে তাঁহার পদধূলি লাভ করিলাম এবং সেই ধূলি আমার নেত্রের অঞ্জন হইল। ইহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে আমার সমস্ত জীবন চলিয়া যাইবে, হয়ত অন্ত পাইব না। লেখা হইয়া গেলে তাহা আমি ষোড়শ অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম। এইরূপে ব্রাহ্ম বিষয়ক উপনিষদ, **ব্রাহ্মী উপনিষদ** প্রস্তুত হইল। ইহা কেহ মনে করিবেন না যে আমাদের বেদ ও উপনিষদকে আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংস্রব রহিল না। এই সকলের সার সত্য লইয়াই বেদরূপ কল্পতরু অগ্রশাখার ফল এই ব্রহ্মধর্ম্ম সংগঠিত হইল এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। তাহাই এই 'ব্রাহ্মধর্ম্মে'র প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

১৭৭১ শকে (১৮৫০ খৃঃ) সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, রবীন্দ্রনাথের জন্মের অব্যবহিত পরেই ১৮৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইহার তাৎপর্য্য ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬৯ সালে ডিসেম্বর মাসে তাৎপর্য্য সহিত সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বহুবিধ পুস্তিকা, ব্রাহ্ম সঙ্গীত, নীতি-মালা ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং পরিশেষে স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরিচায়ক 'স্বরচিত জীবনচরিত' তিনি প্রণয়ন করিয়া ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে প্রকাশের অনুমতি দেন। তিনি দেহত্যাগের পূর্ব্বে আরও দুখানি উপাদেয় গ্রন্থ ব্রহ্মসমাজ বা তাঁহার আদরের হিন্দু-সমাজকে দিয়া গিয়াছেন। একখানি "জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি" অপরটি

"পরলোক ও মুক্তি"। প্রথমটিতে খৃষ্টীয় প্রতিপাদ্য মানবের স্বাধীন-ইচ্ছা বা Free will এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ Science and Religion বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের আদিম জাতির ইতিহাস বেদ হইতে কিরূপে সঙ্কলিত হইতে পারে, তাহারও আভাষ তিনি দিয়াছেন। দ্বিতীয় পুস্তকে ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীগণের আবশ্যকীয় এই দুইটি চিন্তা সম্বন্ধে তাঁহার পরিপক্ক অভিজ্ঞতার ফল ও অভিমত পাওয়া যাইবে। ইহার একটি শ্লোক শ্বেত প্রস্তরে উৎকীর্ণ হইয়া বোলপুর শান্তি-নিকেতনের উদ্যানের দ্বারদেশে সংসারভার প্রপীড়িত মানবকে গন্তব্য পথের সন্ধান দিয়া থাকে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব ও রক্ষণশীলতা নবজ্ঞানলব্ধ ব্রাহ্মদিগের তৃপ্ত রাখিতে পারিল না। ফলে, ১৮৬৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে অষ্টত্রিংশৎ সাম্বৎসারিক মাঘোৎসবের দিনে মেছুয়া বাজার গির্জ্জার ভিত্তি স্থাপন হইল ও কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে **ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের** সৃষ্টি হইল। ক্রমে দাক্ষিণাত্যে ও এমন কি সুদূর ইংলণ্ড আমেরিকাতেও একেশ্বর উপাসনার নবদলের ধ্বজাপতাকা রোপণ হইল। পরে ২২শে মার্চ্চ ১৮৭৮ সালে সেন মহাশয়ের কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত কুচবিহারের মহারাজার বিবাহ উপলক্ষ করিয়া ব্রাহ্মমন্দিরে মিটিং ডাকিয়া 'ব্রহ্মানন্দের' বিরুদ্ধে Vote of censure পাস্ করিয়া তাঁহাকে আচার্য্যপদ হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় (Dr. P. K. Roy) প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপক পরে অধ্যক্ষ (Principal), পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু, সিভিলিয়ান কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত বরাহনগরের শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ঐ শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক **সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের** প্রতিষ্ঠা করেন ও কালে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তাঁহাদের উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত হয়। তিন বৎসর পরে কলিকাতা টাউন হলে সভা ডাকিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের উচ্চ ডঙ্কা নিনাদে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে "নবসংহিতা" বা Creed of the Church

of New Dispensation প্রচার করিয়া কেশবচন্দ্র বলিলেন,—

"My **Creed** is the Science of God which enlighteneth All.
My **Gospel** is the love of God which saveth All.
My **Heaven** is life in God which is accessible to All.
My **Church** is that invisible Kingdom of God
in which is All truth, All love, All holiness."

এই "নববিধানই" ব্রাহ্মধর্ম্মের তুঙ্গ-শিখর। দুঃসাহসিক মানবদের অভিযানের জন্য "Harmony of Reason and Faith, of Devotion and Duty, of Yoga and Bhakti" যেখানে সদা ঝঙ্কৃত, "সেই The Church of Universal Brotherhood, where caste, sectarianism and idolatry have no place" যেখানে অবস্থিত, সেই দুরধিগম্য দেবালয় "The Church of the One Supreme" এ সকল সম্প্রদায়কে স্বীয় স্বীয় আরাধ্য গ্রন্থ, আপ্ত বাক্য, ও নমস্য তীর্থঙ্কর ও পীরগণ সহ আশ্রয়দানের জন্য মুক্তদ্বার হইয়া সদা আহ্বান করিতেছে। মোটের উপর দেখা যায়; যে শ্রীমনমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপাসনা-প্রণালী ভিন্ন গত্যন্তর নাই—

"আদিত্যবর্ণা তমসঃ পরস্তাৎ। নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সহিত প্রত্যক্ষ মিলিত হইবার আকাঙ্খা মিটাইতে হইলে ও ঘনিষ্ঠতা করিতে হইলে মহাভাবের অধিকারী শ্রীগৌরাঙ্গের প্রদর্শিত Mystic Spirituality বা অধ্যাত্ম-প্রণয়-পরিচর্য্যা অবলম্বন ও মিলনক্ষেত্র। রামমোহনের অনুষ্ঠিত উপাসনার নির্ঝর বিস্তৃত আয়তনে পরিপূর্ণযৌবনা নদীতে রূপান্তরিত হইল।

মহাজ্ঞানান্বেষী শূন্যবাদী প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ না হইয়া, ভাববাদী প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণবদের, এবং ভাবে ভাষায়, একটি হাফ্‌মরক্কো বাঁধা বিলাতী রাজসংস্করণ; বিশেষ যখন অশ্রু, স্বেদ, কম্প, পুলক, রোমাঞ্চ, কীর্ত্তন, ভাবসমাবেশ, ও নর-পূজা প্রভৃতি বৈষ্ণবের সাত্ত্বিক লক্ষণার দ্বারা ইহাদের উপাসকমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক

অবস্থার মানদণ্ড নিরূপিত হইয়া থাকে। যদিচ দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মগোষ্ঠীর সহিত অন্য সম্প্রদায়গুলি ধারণা, বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান ও উপাসনা প্রণালীতে বহুধা বিভিন্ন, তথাপি তাঁহার নিত্য আশীর্ব্বাদধারা সকল সম্প্রদায়ের "ব্রহ্মবান ও ব্রহ্মবতীদের" পরে অজস্র বর্ষিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার ধীরতা, উদারতা, লোকপরিচালনা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের অসাধারণ ক্ষমতার নিদর্শন। তাই সকল সম্প্রদায়ই ১১ই মাঘের উৎসবকেই দেশব্যাপী সাধারণ উৎসবে পরিগণিত করিয়া তাঁহার গোষ্ঠী-পতিত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দীক্ষাদিবসের কোন স্মরণীয় উৎসব রাখেন নাই। ভগবানকে প্রিয় হইতে প্রিয়তর গণ্য করা ও তাঁহারই প্রিয়কার্য্যে রত থাকা, ও উপাসনাকালীন যথেষ্ট সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া ব্রহ্মে আত্মসমাধান করাই তিনি সাধনা করিয়া গিয়াছেন ও করিতে বলিয়াছেন। ঈশ্বরের করুণা লাভের অন্য কোন উপায় নাই, কেবল "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম।"

ইংলণ্ডে খৃষ্টীয় ধর্ম্মালোচনার ইতিহাসে দেখা যায় যে ত্রয়োদশ শতাব্দিতে একুইন্যাস (Thomas Aquinas) প্রমুখ পণ্ডিতগণ গ্রীসীয় দার্শনিক স্বনামধন্য এ্যারিষ্টটলের (Aristotle) তথ্যাবলী, নীতি ও সত্য দ্বারা বাইবেলের খৃষ্টীয় বাক্যাবলীর গর্ভস্থিত অর্থের নির্দ্দেশ করিতেন। তাহাতে অক্সফোর্ড (Oxford) বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ও পরে অধ্যাপক ডান্স্ স্কোটাস্ (Johannes Duns Scotus) প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডন করেন ও এই মর্ম্মে যুক্তি দেন "Theology rests on faith and faith is not speculative but practical—an act of will." তিনি স্বাতন্ত্র্যপন্থী হইলেও সনাতন রীতির সমর্থক। ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মালোচনা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত, আর বিশ্বাস বা তৎ প্রসূত উক্তি, দার্শনিক মতবাদ বা তর্কের বস্তু হইতে পারে না, তাহাকে মানবের প্রয়োজনোপযোগী পরিসরে রাখিতে হইবে। বিশ্বাস কখনই ভাবুকতা নয়, উহা একটি সুনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া,—ইচ্ছাশক্তির

বহির্মুখী কর্ম। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া কবি মিলটন (J. Milton) বলেন—"Belief is a matter of choice, I believe in God because I choose to, you disbelieve in Him because you chose to." "আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যেহেতু আমি তাহা ইচ্ছা করি; তুমি অবিশ্বাস কর, যেহেতু তুমি তাহাই ইচ্ছা কর।" দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সর্ব্বাগ্রে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে এই ইচ্ছা প্রাপ্তির জন্য সদ্‌বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রার্থনালভ্য। ব্রহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বর্ষের পরীক্ষীত 'বৃত্তান্ত' নামক পুস্তিকার ২৭-৩৩ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ এই ভাবের পোষকতা করিয়াছেন"। একস্থানে বলিয়াছেন "আমাদের ইচ্ছা নাই, প্রীতি নাই, এইজন্যই তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিতে পারি না," আর উপলব্ধিই ধর্ম্মচর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য ও সাধনের লক্ষ্য। তবে, বিশিষ্ট মত রক্ষাকল্পে তিনি কিরূপ সাবধানী ছিলেন তাহা তাঁহার একজন প্রচারক শিষ্যকে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখিবেন। "ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনটি বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতে হইবে। প্রথম বিঘ্ন পৌত্তলিকতা, দ্বিতীয় বিঘ্ন খৃষ্টধর্ম্ম, তৃতীয় বিঘ্ন বৈদান্তিক মত। আমি দেখিতেছি যে, তুমি বৈদান্তিক মতের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছ।"

আর একটা দিক হইতে তাঁহার নবরোপিত বোধন-বিশ্ববৃক্ষটিকে সযত্নে রক্ষা করিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। নববিজ্ঞানের আস্বাদনে, ব্রহ্মগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁহারা মনে করিতেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বৈজ্ঞানিক তথ্যের দ্বারা বুঝিয়া লইলে বুঝি জ্ঞানের, অথ পরম ও চরম জ্ঞানের, পরিচয় সহজলভ্য হইবে। এই দলের নেতা ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। দেবেন্দ্রনাথের মনে উদয় হইয়াছে কতবার "There are more things in this heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy." কিন্তু চক্ষুলজ্জার খাতিরে ইহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। কেমন করিয়া বুঝাইবেন যে জগতের

সত্য নির্দ্ধারণের একমাত্র পদ্ধতি কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পূর্ণ নয় কিংবা নির্ভরযোগ্যও নয়। আর অন্য পুরাণাদিতে উক্ত পৃথিবীর বাহিরে প্রাণের স্ফুরণ বা প্রাণের ধর্ম্ম, বা জ্যোতিষ্ক ব্রহ্মাণ্ড-সমারোহে প্রাণলীলায়ে একেবারে অসম্ভব, উপরন্তু যাহা কিছু দৃশ্যমান তাহা সসাগরা মেদিনীর পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ, এই ধরণীধামই কেবলমাত্র প্রাণোৎসবে মোহনীয় ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন দোষের নহে। যদিও দার্শনিক চর্চ্চা হইত, কিন্তু তাহা অন্তহীন কাল ও সীমান্তহীন আকাশে হেঁয়ালীর মত বোধ হইত। বিশ্বতথ্য ভূমিকার মধ্যে শৃঙ্খলা দেখাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের জ্ঞান ও কল্পনার আপাততঃ যে বিস্তারসাধন আনয়ন করেন, তাহাতে কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হইয়া অনেকেই মনে করিতেন যে তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে ছক্ কাটিয়াছেন সেই ছকই নির্ভরযোগ্য, বাকি সব উড়ো কথা, কবি-কল্পনা। কিন্তু কালবশে দেখা গেল যে কয়েকটি গুণে-পাওয়া ও মেপে-দেখা তথ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা যে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, জৈবলীলার বিশাল সত্যভূমিকার মধ্যে তাহার পরিসর সুবিস্তৃত নয়। আরও অনেক কথা অব্যক্তের গর্ভমধ্যে আবিষ্কৃত হইবার অপেক্ষা করিতেছে। "Ends and Means" নামক পুস্তকে "Beliefs" সম্বন্ধে এ্যালডুস্ হাক্সলি (Aldus Huxley) একটি অধ্যায় লিখিয়াছেন। আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে Huxley পরিবারে একাদিক্রমে তিনপুরুষ বিজ্ঞান চর্চ্চার ফলে একটি বংশধরের চিন্তাধারা বিংশ শতাব্দীতে মোড় ঘুরিয়াছে ও তাঁহাকে সন্দিহান করিয়াছে যে বাস্তবিকই বিজ্ঞানবিদেরা কোন্ [illegible] চলিতেছে, Quo vadis? Whither goest thou? [illegible] প্রকৃতির সহিত বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধ"টা কি হইবে ও হওয়া উচিত [illegible] সিদ্ধান্তের চেষ্টা করিয়াছেন। "Followers of Science are mo[illegible] ten convinced than not, that the scientific picture [illegible] arbitrary abstraction from reality is a picture of reality

as a whole and that therefore the world is without meaning or value." কিন্তু ধর্ম্মযাজকেরা এই ব্রহ্মাণ্ডে সুশৃঙ্খলা ও অবিচলিত নিয়মকে পরম কারুণিক পরম পিতার শক্তি ঐশ্বর্য্যের চরমবিকাশ অর্থপূর্ণ ও মানবের নৈশ্চত্যবোধের আশ্রয়স্থল বলিয়া ঘোষণা করিয়া মানবের মনকে ভগবৎ উপলব্ধির দিকে টানিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতে থাকেন। অথচ দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার ও নিয়ম সকল আবার অন্য বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারে অল্পকাল মধ্যেই বদলাইয়া যায়। সাধারণ মনে মানুষের ধারণা জগতে ভাবপুঞ্জ অতশীঘ্র বদল হয় না কিন্তু 'Highly intellectual'দের কথা স্বতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক অদলবদল প্রায় তাহার দশগুণ বেগশালী ও দ্রুত। তাই Huxley লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন—"Most ignorance is vincible ignorance. We don't know because we do not want to know. It is our will that decides how and upon what subjects we shall use our intelligence. Those who detect no meaning in the world, generally do so, because, for one reason or another, is suits their books that the world should be meaningless." সুতরাং গোলকধাঁধার ভিতর হইতে বাহির হইবার কোন পথ আপাতঃ দৃষ্টিতে না পাইয়া এবং স্রষ্টার সৃষ্টিকৌশলের সহিত নিজের মনকে শান্ত ও সমাহিত করিবার কোন সন্ধান, যাহা পূর্ব্ব দার্শনিকগণ (Philosophers) অবলম্বন করিয়াছিলেন, যাহাতে শুধু বিশ্বাস, ভক্তি ভাবটাকেই প্রবল ধরিয়া তাহার অন্তস্তলের নিগূঢ় কারণগুলিকে উদ্‌ঘাটনে বিরত থাকা সমীচীন মনে করিতেন, সেরূপ নিষ্ক্রিয় মনের অনির্ব্বচনীয় সুখের প্রত্যাশী না থাকায় হাক্সলি বর্ত্তমান ইউরোপীয় মনোজগতের একটি সংক্ষিপ্ত যথাযথ বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। "We are living now, not in the delicious intoxication induced by the early successes of science,

but in a rather grisly morning-after, when it has become apparent that what triumphant science has done hitherto is to improve the means for achieving unimproved or actually deteriorated ends." আমরা বর্ত্তমানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে। ইহা ঠিক সে সুমধুর মাদকতা নয়, যাহা বিজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থার ক্রমান্বয় সিদ্ধিলাভে সংগঠিত হইয়াছিল, বরং ইহা নেশার সমাপনে পরপ্রাতে যখন ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই অথচ নেশাচ্ছন্নও বলা যায় না, সে অবসাদগ্রস্থ আধা-চেতন অবস্থা ভোক্তার পক্ষে ভীতিজনক ও অসুখকর অসচ্ছন্দতা। সকলের নিকট এইটা এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে যে বিজয়ী বিজ্ঞান এ যাবত যাহা কিছু সম্পাদন করিতে পারিয়াছে সে কেবল উপায় মাত্র, হয় লক্ষ্যবস্তুর অনুন্নত বা কোথাও কোথাও প্রকৃত অপকর্ষতর ভাবের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য।

আমাদের শাস্ত্রানুসারে এই ভিন্নরূপে ভেদজ্ঞানকে শ্রীবিষ্ণুর মায়া বলা হইয়াছে এবং তাহা হইতে পূজকের উদ্ধারকল্পে বিশেষভাবে জ্ঞান আশ্রয় করা কর্ত্তব্য তাহাও বলা আছে। আচার্য্য বা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত যে আত্মন্ সম্বন্ধে বা নিজের উৎপত্তি ও লয়, এবং কার্য্য কারণ ক্রিয়া প্রভৃতি নিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বোধ জন্মায় তাহাই জ্ঞান। অর্থাৎ উপদেশজ অবগতি বা পরোক্ষ অনুভূতি আর "বিশেষতস্তাদনুভব" অর্থাৎ জ্ঞানের অপরোক্ষ যে ফল ভাবুকের সংস্কারে উদ্ভব হয় তাহাই বিজ্ঞান। প্রথমটি শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞান আর দ্বিতীয়টি "বিশেষেন জ্ঞায়তে অনেন" অর্থাৎ "ব্রহ্ম অস্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদ্দ্বারা বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান দ্বারা বোধ্য বস্তুতে অবস্থিতি মানে উপবাস বা উপাসনা। সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি সাধনের দৃঢ় সঙ্কল্প এবং সর্ব্বাত্মদর্শন যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া পুনর্দেহ সম্বন্ধ কারণ পাপ পুণ্যাত্মক কর্ম্ম উন্মূলিত করিয়া প্রত্যক্ষ ব্রহ্মবেদন। ইহারই আতঙ্কে

সার ফ্র্যানসিস বেকন (Sir Francis Bacon) দার্শনিকদের সতর্ক করিয়া বস্তুবাদ (Materialism) এর ভিত্তিস্থাপন করিয়া নববিজ্ঞান আখ্যা দেন, কিন্তু পরিভাষা বিচারের প্রসঙ্গে দেখেন যে মানুষের উচ্চারিত শব্দের সহিত মনে মনে বিশেষ বিশেষ ছবি এরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত যে দার্শনিককে বাক্যপ্রয়োগের পূর্ব্বে অর্থ সুনির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজন। গ্রীক্ দর্শনের প্রতিমা বা আইডল (Idola) বাদ দেওয়া যায় না, তাই জাতি কর্ম্ম ব্যবসায় গৃহস্থালি ও বিচার সক্রান্ত মনোভাবের চারিটি শ্রেণী-নির্দ্দেশক কথিত ভাষার বিভাগ করেন—

Idola of the tribe, Theatre, Market and Forum.

সুতরাং মননশীল ব্যক্তির পক্ষে একেবারে অপৌত্তলিক বা রূপবিবর্জ্জিত চিন্তা বা বাক্য বা absolute abstract idea without image কল্পনার বহির্ভূত মনে করিয়াছিলেন। ওদিকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা গণিতবিদ বৈজ্ঞানিক সার্ আইজেক্ নিউটন (Sir Isaac Newton) তৎকালীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাকারীদের সতর্ক করিয়া দেন 'Beware of philosophy" দার্শনিক চিন্তাকে সাবধান, বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কলুষিত করিয়া অন্যরূপ দিবে। আত্মস্বরূপ প্রকাশক বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে বিবেকপ্রত্যয়রূপ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিষিক্ত ভগবৎ-ভাবনায় অভিনিবেশ ও নিষ্ঠাপূর্ব্বক "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মন" হইয়া প্রজ্ঞা বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া রাখা,—বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রিত ব্রহ্মজ্ঞান। ইহাই দেবেন্দ্রনাথের দূর লক্ষ্য থাকায়, তিনি বেদান্তের ভাষা ও তাহার আবৃত্তিতে যে ভাবসমূহ অন্তরে জাগে তাহাতে তৃপ্ত রহিতে পারিলেন না, তাহা পরিপাক করিয়া তাহার অতীত যে অস্তিত্ব সেই অবাংমনস-গোচর ভাবের ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন, মহাধ্যানপরায়ণ বিশ্বকল্যাণ যে মহা-প্রাণ, তাহার পুণ্যময় অস্তিত্বের সহিত যে তাঁহার অস্তিত্ব অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, সে বোধ তাহার সহিত যুক্ত রাখিতে জনবিরল স্থানে প্রয়াণ করিয়া তিনি সচেষ্ট রহিলেন। প্রাণের লক্ষণ ধ্বনি, আলোক, গতি,

চাঞ্চল্য, ভাবের বিচিত্র প্রকাশে ব্যক্ত হয়, তাহারই একাগ্র ধ্যানে শিমলা-শৈলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অসনবসনের পারিপাট্য ও বিলাস বর্জ্জিত হইয়া পদব্রজে ভ্রমণ করতঃ দিন যাপন করিতে লাগিলেন। পরে একদিন এক পার্ব্বত্য-নির্ঝরের স্রোতস্বিনী কায়া ও ফেনোচ্ছল ব্যাকুলতা তন্ময়চিত্তে দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইল যে, সাধনলভ্য জ্ঞানকে ঐ তটিনীর মত নিম্নগামী ও প্রান্তরপ্লাবী করিয়া উষরতামোচন ও সমতল দেশকে রসাভিষিঞ্চন করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, ও ঈশ্বরেচ্ছা। 'Sermons in stones and gospels in running brooks' এর ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তখন দেবেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান আশ্রয় করিলেন ও তাঁহার অন্তরে আগমন বাণী প্রেরণ, কর্ম্মের নির্দ্দেশ দান প্রভৃতিতে মনোযোগী হইয়া Faith and Willএর উপর বেশী জোর দিলেন ও মণ্ডলীকে সেই পন্থায় অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিলেন। ফলের প্রতীক্ষায়, নীরব ধ্যান ধারণা ও নিধিধ্যাসন সহযোগে প্রতীক্ষা অবলম্বন শ্রেয় সিদ্ধান্ত করিলেন। তিনি ডান্‌স্‌স্কোটাসের মত Faith and Will ধরিয়া বেদান্তের শুধু কথা ছাড়িয়া ভাবের দ্বারা স্বাধীন চিন্তা ও মনের বাণী বা Conscienceএর উত্তেজনা ও **সহজ-জ্ঞানে** তাঁহার ধর্ম্মকে স্থাপন করিলেন। তিনি যে রামমোহনকে 'পরশুরাম' বলিয়াছিলেন, তাহার স্বার্থকতা তাঁহাতেই বেশী পরিমাণে প্রমাণিত হয়। রাজার ধর্ম্মে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে অদ্বৈতবাদী বেদান্তের ভাব দিয়াছিলেন, সেই সব গোলক, বাকড়া, আগাছা কিছু কিছু পরিষ্কার করিয়া ধর্ম্মবৃক্ষটিকে নূতন রূপ দিলেন।

১৮৮৮ সালে মহর্ষি যখন চুচুড়ায় গঙ্গার তীরে অবস্থান করিতেছিলেন একবার মাঘোৎসব উপলক্ষে ১৭ই মাঘ পূর্ব্বাহ্ণ ৮ঘটিকার-সময়ে দেখা যায় যে নানাপ্রকার নিশান ও ফুলপত্রে সজ্জিত একখানি জাহাজে পূর্ণ প্রায় পাঁচশো ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার আশ্রমের

দিকে অগ্রসর হইতেছেন। স্থলপথেও বহু ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের এক লিখিত অভিনন্দন পাঠ করেন, তাহাতে দেখা যায়—"আর্য্য, ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আপনার সময়, অর্থ ও সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিয়া ইহার অবসন্ন দেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। আপনার আগমনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিশয় হীন ছিল। ইহার চেষ্টা প্রধানতঃ কতকগুলি কুসংস্কারের প্রতিবাদে ও কতকগুলি বিশুদ্ধ মত প্রচারে পর্য্যবসিত হইত। আপনিই সত্য-স্বরূপের অর্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সেই জীবনের উৎসের সহিত আমাদের আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক পিতার কার্য্য করিয়াছেন।

আপনিই সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক প্রণালী অনুসারে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন; আপনিই সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধ উপাসনা প্রণালী প্রণয়ন পূর্ব্বক তদনুসারে নিজে সাধনা করিয়া অধ্যাত্মযোগের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্ম সমাজ আপনার নিকট চিরদিনের জন্য ঋণী।"

দেবেন্দ্রনাথের নিকট কেবল ঋগ্বেদ সংহিতার "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং, তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস," একমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম কাণ্ডারী-স্বরূপ রহিলেন। ইহা ঋক্ ১০।১২৯।২ মন্ত্রের শ্লোকের শেষ অংশ ও সার-মর্ম্ম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফটিক লাল দাস, বি, এ, ইহা এইরূপ অন্বয় করিয়াছেন [আনীৎ অবাতম্ স্বধয়া তৎ একম্। তস্মাৎ হ অন্যৎ ন পরঃ কিঞ্চন আস] একমাত্র সেই ব্রহ্ম মায়ার সহিত বায়ু না থাকিলেও নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন (অর্থাৎ স্বশক্তিতে জীবিত ছিলেন) তদ্ভিন্ন তখন সৃষ্টির পর বর্ত্তমান অন্য যা কিছু আমাদের এই ভূতভৌতিকাত্মক জগৎ ছিল না। আমাদের মনে হয়, এ বাখ্যায় কিছু উপনিষদীয় দর্শনের মিশ্রণ আছে,

২০

তাই রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তক হইতে পুরা শ্লোক ও তাহার বঙ্গানুবাদ পাদটিকায় দিলাম।*

কিন্তু কেবলমাত্র ভগবানের অস্তিসত্ত্বা লইয়াই আমাদের দুঃখময় অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন জীবনযাত্রা চলিতে পারে না, তাই "আনন্দাধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং সংপ্রবিসন্তি" ভগবানের পূর্ণ ভাতির রূপ আমাদের যথাসাধ্য নিত্য-অর্চ্চনায় গ্রহণ করিতে হয়। আনন্দ হইতে ভূত সকলের সৃষ্টির উদ্ভব হয়, জন্মের পর জীব আনন্দেই বাঁচিয়া থাকে এবং আনন্দেই শেষে প্রবেশ করে, অর্থাৎ লয় হয়। পরমেশ্বরের এই আনন্দস্বরূপ ভাব-প্রকাশের উপরে ভিত্তি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেমের ধর্ম্ম করিলেন ও ঋক্ সংহিতার ১০ম মণ্ডল। ১২১ শুক্তের দ্বিতীয় ঋকৃটি উপাসকের আশ্রয়স্থল ধার্য্য করিলেন।

"য আত্মদা বলদা, যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?

বঙ্গানুবাদ—যিনি আত্মদাতা বলদাতা,—
যাঁহার বিধানকে বিশ্বসংসার উপাসনা করেন

---

* ঋগ্বেদ। দশম মণ্ডল। ১২৯ সুক্ত। ২য় মন্ত্র

ন মৃত্যুরাসীদ মৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীত প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস।

রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না; কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মমাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

দেবতারাও যাঁহার বিধানকে উপাসনা করেন
অমৃত যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার ছায়া
তাঁহাকে ভিন্ন আর কোন্ দেবতাকে আমরা হবিদান করিব ?

মহর্ষি তাহারই তাৎপর্য্য অবলম্বনে সাগ্রহে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি উৎসাহের সহিত ঋগ্বেদের একটি ইংরাজি অনুবাদ ধারাবাহিকরূপে পণ্ডিতের সাহায্যে ১৮৪৮ সাল হইতে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত ২৪ বৎসরে প্রথম মণ্ডলের ১০৮ সুক্ত পর্য্যন্ত ১২৪৮টি ঋকের অনুবাদ তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত করেন। যে পূর্ব্বার্দ্ধ মূল ও ভাষ্য যাহা তৎকালে তত্ত্ববোধিনী সভায় সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করেন এবং এই কার্য্যের জন্য স্বনামধন্য দেশনেতা ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও Anglo Indian Hindu Collegeএর Capt. D. L. Richardsonএর ছাত্র, পরে বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত রাজনারায়ণ বসুকে উপযুক্ত বেতন দানে সহকারী নিযুক্ত করেন। ১৮৪৮ সালে ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনীতে এই অনুবাদের ভূমিকাতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"সূর্য্যের অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি সূর্য্যদেবতা। বায়ুর অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি বায়ুদেবতা। অগ্নির অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি অগ্নিদেবতা। ইহাতে বৈদিকেরা বাহ্য জড় সূর্য্য প্রভৃতিকে উপাসনা করেন না, কিন্তু তাহার অন্তর্যামী যে চৈতন্য পুরুষ তাহারই উপাসনা করেন।" এ পুরুষের প্রকার কিরূপ, অবয়ববিশিষ্ট, পরিমিত শক্তিশালী, না পুরমধ্যে যে Divine principle বা বিশ্বের হিতকর শক্তি সর্ব্বদা জাগ্রতভাবে থাকে, তাহা সুস্পষ্ট নয়।

তন্ত্রপুরাণের দেবতা আর বেদের দেবতা ইহাদের অনেক প্রভেদ, কিন্তু সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ভেদজ্ঞান নাই, তাই তাহাদের বিশ্বাস যে বেদে কালী দুর্গা কৃষ্ণ পূজার বিধি আছে, সেই সকল ভ্রম দূরীকরণের জন্যই এই কার্য্যে মহর্ষি প্রবৃত্ত হন, এবং পরবর্ত্তীকালে উপনিষদ্

আলোচনায় 'গোপাল তাপনী' উপনিষদ, যাহাতে মথুরাকে ব্রহ্মপুর ও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান পরমেশর পরমব্রহ্ম বলা হইয়াছে, মহানারায়ণোপনিষদ, গোপীচন্দন উপনিষদ, সুন্দরীতাপনী উপনিষদ, কৌলোপনিষদ, স্কন্দোপনিষদ্ প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থসকল পরিত্যাগ করিয়া উপনিষদের কণ্টকারণ্য হইতে বাছাবাছা ওষধি সংগ্রহ করেন, কিন্তু তাহাতেও গোল বাধিল। যখন বৃহদারণ্যকের "সোহস্মি" বা ছান্দোগ্যের 'তত্ত্বমসি' বা ৫ম প্রপাঠকের জন্মান্তরবাদে, পরিমিত কাল স্বর্গভোগ ও পুণরায় পুণ্যফলের সমাপ্তিতে ধরাতলে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করা, ইত্যাদি ব্যাপারে জড়িত হইতে হয় ও শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের অদ্বৈতবাদে সোহং তত্ত্বে অশ্রদ্ধায় পতিত হইবার ভীতি জন্মায় এবং "কর্ম্মানি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মাপরেৎব্যয়ে সর্ব্ব একী ভবন্তি" (১) অর্থাৎ নির্ব্বাণভাবে মানব-হৃদয় পূর্ণ করিতে পারে না—প্রলয়ের আভাষ দেয়, তখন "এষ দেবপথো পুণ্যপথঃ"-র সন্ধানে মণ্ডুক্যের ৩।১।৮ "জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্বস্তত স্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" (২)-তে বাসা বাঁধিয়া ছান্দোগ্যের "আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য" (৩) ইত্যাদি আদর্শে জীবনযাপন প্রকৃষ্ট পন্থাই বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন এবং "ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে" (৪) স্থির হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" যোগ করিয়া দিলেন। সাধন প্রণালীতে তিনস্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে শিষ্যগণকে চেষ্টা করিতে বলিলেন—অন্তরে, বাহিরে ও ব্রহ্মপুরে [illegible] তাঁহার যোগ। উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ [illegible] অবাতপ্রাণিত নিত্যজাগ্রত পুরুষ, আপনাতে আপনি [illegible]

পাদটীকা :—

১। কর্ম্মসমূহ এবং বিজ্ঞানময় আত্মা সকলেই অবিনাশী পরব্রহ্মে এক [illegible]

২। ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি জ্ঞানের প্রসন্নতা হেতু সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করিয়া [illegible] (অখণ্ড) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) দর্শন করিয়া থাকেন।

৩। গুরুকুল হইতে বিশিষ্ট 'ওম্,' লাভ করিয়া… [illegible]

৪। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হ'ন।

অবস্থিতি করিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন" ইহার ধারণা করিতে হইবে। "তিনি আমাদের অন্তরে জ্ঞানধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন আর বহির্জগতে শোভা সৌন্দর্য্য, কাম্যবস্তুসকল বিধান করিয়া আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন" কেবলই ভাবিতে হইবে। গুরু নানক যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন "যুগ যুগ একো বেশ" আর রাজা রাম-মোহন রায় যাঁহার মহনীয়তা অনুভব করিয়া বিরাট হিমাচল সদৃশ মহিমা ব্যক্ত করিতে কাতর হইয়া গাহিয়াছেন—

"করিতে যাঁহার স্তুতি
অবসন্ন হয় শ্রুতি স্মৃতি দর্শন।
কে করিবে তাঁহার বর্ণন।"

মহর্ষি বলেন, যে যোগী একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান ও অবিচলিত চিত্তে তাঁহার শাসন বহন করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন, তিনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মহর্ষিদেবের সেক্রেটারী ও প্রিয়শিষ্য ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়া-ছেন "ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের নবম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচকাশীতি॥'

১।১৬৪।২০ ঋক্।

ইহাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ লক্ষ্য অতি স্পষ্ট ও সুব্যক্ত রহিয়াছে। ইহাদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে অদ্বৈতবাদীর ধর্ম্ম নহে, ইহাতে জীবে ও পরমেশ্বরে যে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ, ইহার মুক্তি যে নির্ব্বাণ নহে তাহাই মহর্ষিদেব বুঝাইয়াছেন। শ্লোকটির অর্থ এইরূপ "দুই সুন্দর পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) এক বৃক্ষ (শরীর) অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্র থাকেন এবং উভয় উভয়ের সখা; তন্মধ্যে একটি (জীব) সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য (পরমাত্মা) নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।" ইহা বৈদিক ভাব, ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সুক্তে ২০

ঋক্ পরে 'মণ্ডুক্য' ৩।১।১ ও 'শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের' ৪।৬এ উদ্ধৃত হয়। ইহাতে অন্তর্বাসী ভোক্তা ভগবানের সন্ধান যেমন পাওয়া যায়, তেমনি "একং নিশ্চলং জগৎসাক্ষীরূপং কেবলম্ জ্ঞানংমূর্ত্তিং" বিবেকের জনয়িতা পরমেশ্বরের ধারণারও সুবিধা হয়, কিন্তু উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ, যে মিত্রতা ও সখ্যরসের ভিতর দিয়া কেমনে অর্জ্জন করিতে হয়, তাহা তাদৃশ পরিস্ফুট নহে। মহর্ষি এই শ্লোকটি বড় ভালবাসিতেন এবং ইহাতে তাঁহার মনের সকল সংশয় নিরশন করিয়া বোলপুরের শান্তি-নিকেতনের সাধনকুঞ্জের শতপর্ণ তরুচ্ছায়ে কত নবীন শিক্ষার্থীদের এই চিরন্তন তথ্যের ভিতর দিয়া নবধর্ম্মজীবনের প্রবেশাধিকার দিয়াছেন।

এইরূপে জাতির নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল। তখন সাহিত্যে অনেকগুলি কবি ছিলেন, তাঁহারা কল্পনাকুঞ্জে বিচরণ করিয়া বঙ্গীয় ভাষাজননীকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিতেছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। যাঁহারা মাইকেল মধুসূদনের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি, মাইকেল মধুসূদন তৎকালীন কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"If I am to doff my cap to any modern Bengali Poet, it must be to the author of 'Swapnaprayan' and to nobody else." "যদি কোনও আধুনিক বাঙ্গালী কবিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাকে টুপি খুলিতে হয়, তবে হইলে কেবলমাত্র 'স্বপ্নপ্রয়াণের' কবির জন্য হইবে, অন্য কাহারও জন্য নয়।"

কিন্তু নবজাগরিত জাতির সকলপ্রকার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা যিনি জাতীয় ভাষায় উপযুক্তরূপে প্রকাশ করিতে পারেন, এমন একজন শক্তিশালী বাণীর বরপুত্রের অভাব দেশমাতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন, এবং ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাইতেছিলেন; ভগবান

তাহা শুনিলেন এবং অচিরে সেই প্রার্থনা পূরণের ব্যবস্থা করিলেন। আমরা যে গুঞ্জনরত মধুব্রতের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি, তাহার কমলবন, স্থানকালপাত্র সমাবেশে, কিরূপ ছিল তাহারই কথঞ্চিৎ আভাষ দিলাম। এই বিচরণক্ষেত্র হইতে তিনি যে রস সঞ্চয় করেন, তাহা তাঁহার জন্মকাল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে বয়ঃসন্ধি পর্য্যন্ত তাঁহার দেহমনকে পুষ্ট করে ; এমন কি উত্তরকালে তাঁহার জীবন ও চিন্তা-প্রণালীও ইহার প্রভাবমুক্ত হয় নাই।

পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী বৎসরের কিরণ ছটায় উদ্‌ভাসিত যে পটভূমিকা বিস্তার করা হইল, তাহাতে এ গ্রন্থের বিষয়ীভূত নায়কের জন্মের শুভক্ষণ, স্থান, দেশ, কাল এবং আনুসঙ্গিক ঘটনাপুঞ্জ, ও পাত্রের জনক-জননী, ভ্রাতাভগিনী ও পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতির যথাযথ বিবরণ সন্নিবেসিত করা হইয়াছে।

যুগসন্ধিকালের দশকের মধ্যে, কালমোহিনী কল্প-বিধোয়িনী পূর্ণেন্দু নিভাননার গৌরসুন্দর ললাটফলকে, বঙ্গাব্দ ১২৬৮ সালটি (ইং ১৮৬১) শুভ্র শিশুসোম লেখাবৎ প্রতিভাত হইবে। তাহার অঙ্কে শোভমান নবজাত শিশুটির কর্ণযুগলে স্বয়ং ভারতী জননী যে আশীর্ব্বাদী কুণ্ডল পরাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে প্রাচী ও প্রতিচী দিঙ্‌মণ্ডল সমকালে আলোকিত হইল। কলিকাতা মহানগরীর মুখমণ্ডল, তথাকার ঠাকুরবংশের মুখচ্ছবি, বঙ্গের সুধীসমাজের মুখারবিন্দ এবং

"রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন বারি
মলিন মুখচন্দ্রমা যাঁহারই"

(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পরাধীনতাপাশ বেষ্টিতা, অজ্ঞতার তামস বাষ্পাচ্ছাদিতা সেই জননী ভারতের বদনসরোজও যুগপৎ কিছুদিনের জন্য নবালোকে নবশ্রী ধারণ করিল। সেই নাতিবৃহৎ আগন্তুকের প্রাণধারণ লীলায়, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে মূর্ত্ত বিশ্বজননীর অপার করুণা ও আনন্দাশ্রুর আবির্ভাব

আমাদের গোচরে আসিয়াছে। সেই নবজাতকের অরুণাধর নিসৃত "অমৃতং বালভাষিতং" দ্বারা আমরা সে অনুভূতি কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে পারি;

"একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল।"

(রবীন্দ্রনাথের বলাকা)

সেই ১২৬৮ সালটিও তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত মানবকটি চিরদিন আমাদের ও ভাবী বংশধরদের স্মরণপথের শরণী আলোকিত করিতে থাকিবে।

বালারুণচ্ছটায় তাহার প্রকাশ বাল্য, কৈশোর, যুবসন্ধির মধ্য দিয়া শিক্ষা, দীক্ষার, প্রতিভার ফলে কোরক-রবীন্দ্রের উন্মেষ আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিব। রবীন্দ্রের প্রস্ফুটিত দলবিলাস পরিচ্ছেদ-পরম্পরায় আলোচিত হইবে, তজ্জন্য পূর্ব্বাহ্নে পাঠকদের ধৈর্য্য ভিক্ষা করি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল, শিক্ষা ও প্রতিভার বিকাশ

যে ঔজ্জ্বল্যের আভাষ আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ইঙ্গিত করিয়াছি তাহা বর্ষচক্রের আবর্ত্তনে শশীকলার মত দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছে, পক্ষভেদে দর্শকের দৃষ্টিপথে কখনও অবলুপ্ত হয় নাই। প্রতিভা সংযোগে তাহার স্নিগ্ধ কিরণ বা দীপ্তির সমৃদ্ধি দৈববশে তাঁহার জনয়িত্রী গর্ভ-ধারিণীর অবলোকন করা ঘটে নাই বটে, কিন্তু ক্ষয়হীন পূর্ণচন্দ্রোদয় তাঁহার জনক যে জীবিতকালে দেখিয়া গিয়াছেন, ইহা উভয়ের এবং বঙ্গদেশের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে দেখিতে পাই যে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দ্বারিকানাথ ঠাকুরের ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহার যে আয় হইল, তদ্দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের সুব্যবস্থা করিলেন।

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলা, তাঁহার বংশগত আচার অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ, সামাজিকতা ও লৌকিকতা বজায় রাখা প্রভৃতি সকল দায়িত্ব হইতেই দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে ও তাঁহার পুত্রদের মুক্ত করিয়াছিলেন। সামাজিক ও পারিবারিক ব্যাপারে ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তনে তাঁহার তখন আর কোন বাধা নাই। অতীতের সহিত যোগসূত্র যতটা সম্ভব ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রপরিবারের জীবনযাত্রা ও চিন্তা প্রণালী সুনির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইয়াছে, ঐতিহ্যের বোঝা রবীন্দ্রনাথকে বহন করিতে হয় নাই। "Happy is the man, who has no

past." তাঁহার পিতার ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের জীবন বন্ধনমুক্ত। যে পরিবারে তিনি বর্দ্ধিত হইলেন তাহাকে একান্নভুক্ত পরিবার বলা চলে না। তাঁহার পিতামাতা ও দাদাদিদিদের লইয়াই সেই পরিবার পিতার কর্তৃত্বাধীনে চালিত হইতেছে। কাকা, কাকী, পিসি প্রভৃতির মত বৈষম্যের সম্ভাবনা বা প্রভাব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। মহর্ষি রাজনীতিক্ষেত্র হইতেও সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জমিদারী ট্রাষ্টিদের হাতে থাকায় তাহার সহিত কাহারও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। মহর্ষি তাঁহার নব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম কথা ও তদনুযায়ী নিত্য ও পর্ব্বোপলক্ষে উপাসনা-প্রণালী ও মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানের ক্রম সুনিশ্চিত করিয়া দেওয়ায়, পরিবারস্থ বালকবালিকাদের বিশ্বাস ও চিন্তাক্ষেত্রে অবাধগতির সুবিধা হয়। ছিন্নসংশয়ী রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী জীবনে চিন্তায়, বাক্যে ও কার্য্যে, চরিত্রস্ফুরণে এবং সাহিত্যে ও ধর্ম্মবিকাশে এই উপজীব্য কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। মহর্ষির পরিবার যেন সিমলাপ্রবাসী উচ্চবেতন-ভোগী বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীর সংসার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর্ত্তা পাহাড়ে থাকেন, কর্ত্রী কলিকাতা সহরে চাকরবাকরদের সাহায্যে নির্দ্দিষ্ট আয়ে সংসার চালাইয়া থাকেন। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর হইতেই মহর্ষি সকল দিকে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া তাঁহার ভ্রমণ, ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া, দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যের ব্যবস্থা রাখিয়া, সংসারে পরিবারবর্গের ভরণপোষণের নিয়ম ও ব্যয় সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। যে জাঁকজমক আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা ও উৎসব-পরম্পরার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ বাল্যকালে পরিচিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে তাহা দেখা বা শোনার সুযোগ ঘটে নাই।

সুতরাং তিনি সম্পন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের ছেলের মতই বর্দ্ধিত হন। কেবল নামমাত্র 'শ্রীমতাং গেহে' জন্মলাভ করিয়া 'ধীমতাং গেহের' অনুশাসনে আত্মোন্নতির পথে পরিচালিত হন ও তাহা সাধন করিবার

অনুকূল পরিবেশ সৌভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও অভিজাত্যের দরুণ সাধারণের সহিত সংমিশ্রণ ও ওঠাবসা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের শাখা প্রশাখা বিভিন্ন হইয়া যাওয়ায়, সাধারণ কলিকাতাবাসী সেই সকল দলস্থ ব্যক্তিদের সহিতও মিলিবার সুযোগ ও অবসর সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে আত্মকেন্দ্রী হইয়া পুস্তকের মধ্যে এবং নিজের অসামান্য সৃষ্টি-নৈপুণ্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

পাঁচবৎসরের পূর্ব্বেই তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়; কিন্তু ঠাকুর-বাড়ীর প্রথা ও বঙ্গদেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে শুভদিন দেখিয়া বাগেদবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক বালককে হাতে খড়ি ধরান হয় নাই। অন্য কোনও প্রকার অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানও এই উপলক্ষকে জয়যুক্ত করে নাই। তবে বাড়ীর পাঠশালাতে পরিবারস্থ অন্যান্য বালকদের সহিত গুরুমহাশয়ের নিকট রবীন্দ্রনাথের নিয়মিত লিখন পঠনের সূত্রপাত হয়।

তখন ঠাকুরবাবুদের সকলের বাড়ীতেই একটি করিয়া পাঠশালা থাকিত। তাঁহাদের বাটির নিকটবর্ত্তী আত্মীয়দের বাটির বালক-বালিকারা এবং প্রতিবেশীদের সন্তানেরাও একত্রে সেই পাঠশালায় পড়িত। চার বৎসর হইলেই বালককে অগ্রজদের সহিত পাঠশালায় যাইতে হইত এবং পাঠশালায় বসিয়া থাকা অভ্যাস করিতে হইত। গুরুমহাশয়েরা বলিতেন, আগে "আসনশুদ্ধি" হউক, পরে, লেখাপড়া হইবে। বালক গুরুমহাশয়ের অবাধ বেত্রচালনা দর্শন করিয়া ও তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া গুরুমহাশয়ের প্রতি ভয়ভক্তি অর্জ্জন করিত এবং অন্যান্য বালকদের পাঠাবৃত্তি শুনিয়া মুখে মুখে কিছু কিছু শিখিত। তখন তাহার শিক্ষার প্রতি কোন চেষ্টা করা অভিভাবক বা গুরুমহাশয় কেহই আবশ্যক বোধ করিতেন না। পরে পঞ্চমবর্ষে পূর্ব্বোল্লিখিত অনুষ্ঠান করতঃ বালকের হাতে খড়ি দিয়া তাহার রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইত। শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ আসন দুরস্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক

কিছু শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। গুরুমহাশয়ের নাম ছিল মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইহার বাড়ী বর্দ্ধমান জিলায়।

পাঠশালায় বিদ্যালাভ কতটা হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে শৈশবকালেই তাঁহার সাহিত্য-রসাস্বাদন আরম্ভ হয়। বাল্যে তাঁহাদিগকে চাকরের শাসনে থাকিতে হইত। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তখন পুরা "দাস রাজত্ব"।* কারণ ছেলেদের দোষত্রুটির জন্য চাকরদের ইট হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে ও অন্যান্য শাস্তি ভোগ করিতে হইত। আর তাহারাও ছেলেদের নানাবিধ উপায়ে শাসন করিত ও যাহাতে কোন রূপ অন্যায় আচরণ না করে তজ্জন্য কড়া নজর রাখিত। সেকালে বিস্তর বাঙালী চাকর পাওয়া যাইত। এখন তাহাদের স্থান হিন্দুস্থানী ও উড়িয়াতে অধিকার করিয়াছে। ক্বচিৎ বাঙালী খানসামা দেখা যায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'ঈশ্বর' নামে যে তাঁহাদের চাকর ছিল, সে সন্ধ্যায় ছেলেদের হট্টগোল নিবারণের জন্য তাহাদিগকে লইয়া বসিয়া রামায়ণ ও মহাভারত শুনাইত। অন্যান্য চাকরেরাও সেখানে আসিয়া বসিত। রবীন্দ্রনাথ একটু বড় হইয়া নিজেই পড়িতেন, তাহারা শুনিত, তখন আর ঈশ্বরের দরকার হইত না। পাঠশালার পাঠ্য কিন্তু অতি অল্পই ছিল, যাহা ছিল তন্মধ্যে চাণক্যশ্লোক ও রামায়ণই প্রধান পাঠশালার সঙ্গে সঙ্গেই ১২৭৩ বঙ্গাব্দে পাঁচ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বেশী দিন সেখানে থাকা হইল না। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন সেই খানেই রবীন্দ্রনাথ ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন তখন এই বিদ্যালয়টি জোড়াসাঁকোতে তাঁহাদের বাটির সন্নিকটে [illegible] শ্যামলাল মল্লিকের বাটিতে অবস্থিত ছিল।

---

* *Cf.* ইংরাজ-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১২০৬-১২৯৬ খৃঃকে [illegible] Slave Dynasties ('কুতুবুদ্দিন, রাজিয়া, নসিরুদ্দিন প্রভৃতির রাজত্ব' [illegible] এ কৌতুকাবহ প্রয়োগ কবি স্বরচিত 'জীবনস্মৃতিতে' দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রাণে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় একটা সুর বহিয়া যাইত, সেটা সহজাত; প্রথম ভাগে 'জল পড়ে' 'পাতা নড়ে' পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুরে প্রথম ঝঙ্কার উঠিল। ঈশ্বর যখন রামায়ণ পড়িত তখন সেই সুর ঝঙ্কৃত হইত। কিশোরী চাটুর্য্যের পাঁচালীর গানে সেই সুর বালক-হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। এই সুর যাঁহার প্রাণে জাগে, তাঁহার গায়ক ও কবি হওয়া আশ্চর্য্য নয়, তবে গানটা সহজেই আসে, কবি হওয়া অনুশীলন সাপেক্ষ। তখন বাড়িতে গানের হাওয়া চারিদিকেই বহিতেছিল। নাট্যাভিনয়ে গানের মহলায় গানের চর্চ্চা চলিত। প্রসিদ্ধ গায়ক 'যদুভট্ট' (যদুনাথ ভট্টাচার্য্য) তখন তাঁহাদের বাড়ীর মাহিনাকরা ওস্তাদ ছিলেন। বাড়ীর সকলে গানের চর্চ্চা করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাজা রামমোহন রায়ের নিযুক্ত গায়ক, ভ্রাতৃযুগল কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর নাম তখন সহরে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুর গুণপনা সকলকেই আকৃষ্ট করিতেছিল। এমন কি, ১৮৭২ সালে যখন বাঙ্গালীর সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ন্যাশানাল থিয়েটার বিডন ষ্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও বিষ্ণু রঙ্গমঞ্চের ভিতর হইতে গান গাহিতেন। তথায় প্রথম পুস্তক 'নীলদর্পণের' অভিনয়কালে স্বনামধন্য অভিনেতা ৺গিরীশ চন্দ্র ঘোষ সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন নাই। টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় এবং পেশাদারী নটজীবন তাঁহার মত-বিরুদ্ধ ছিল এবং ব্যবসা হিসাবে ন্যাশানাল থিয়েটারের সাফল্যে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তাই, ঐ অভিনয়ের প্রতি কটাক্ষ করিয়া একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন।

*　　*　　*　　*

"তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ-ইন্দু কিরণ, সিঁদুর মাথা মতির হার

*　　*　　*　　*

কিবা ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান,
অলক্ষেতে বিষ্ণু করে গান,

অবিনাশী মুনিঋষি করছে বসে ধ্যান,
সবাই মিলে ডেকে বলে 'দীনবন্ধু' কর পার।

*　　*　　*　　*

মিলে যত চাষা করে আশা,নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার।

*　　*　　*　　*

স্থানমাহাত্মে হাড়িশুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।"

'গিরীশ-জীবনী'

এই গানটিতে গিরীশচন্দ্রের বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। তিনি তাঁহার 'নটচুড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর' শীর্ষক পুস্তিকার একস্থানে লিখিয়াছেন ; গানের শ্লেষ এই —"স্থানমাহাত্ম্যে হাড়িশুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।" এই অর্দ্ধইন্দু সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা হাস্যরসিক ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি, ন্যাশানাল থিয়েটারের এ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী ও ড্রাম্যাটিক ডাইরেক্টর ছিলেন। অন্যান্য কর্ম্মীর নাম "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২য় মুদ্রণ ১২৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ আগমনী ও বিজয়ার গান এবং ব্রহ্মসঙ্গীত ব্যতীত কালোয়াতী ও অন্যান্য গান ৺গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈঠকখানায় একাধিকবার শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। বিষ্ণুর জীবনও অনন্যসাধারণ। তাঁহার পিতার নাম ৺কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। "ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রথম দিবসাবধি বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার অগ্রজ কৃষ্ণপ্রসাদ তাহার গায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হয় তখন হইতে একা বিষ্ণুই আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়কের কার্য্য করিতেন তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল, এবং সমাজের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। দ্বারিকানাথের জীবদ্দশায় বিষ্ণু ৫০ টাকা বেতন পাইতেন। পরে নানা কারণে সেই বেতন কমিয়া গিয়া টাকায় পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু বেতনের হ্রাস হওয়াতেও বিষ্ণু সমাজের কাজ পরিত্যাগ করেন নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত

পুস্তকের ষষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত প্রায় সকল গানেরই সুর বিষ্ণুর সৃজিত। তাঁহার সুকণ্ঠে সঙ্গীতের জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের নাম তৎকালে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়াছিল ও লোক আকর্ষণ করিত। ১১ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ৭৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই ৬৭ বৎসর-কাল একাদিক্রমে তাহার গায়কের কার্য্য করিয়াছেন। শুনিলে অবাক হইতে হয় যে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনি একটি দিনের জন্যও সমাজে অনুপস্থিত হন নাই (১৮৩০—১৮৯৭)। রাণাঘাট অঞ্চলের 'আন্দুলে কায়েত পাড়া' গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ১৯০১ সালে ৮২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।" (শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত পঞ্চদশ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।) যদিও রবীন্দ্রনাথের সেই সব আসরে তখন প্রবেশাধিকার ছিল না, কিন্তু দূরে থাকিয়া সে সকল রসের আস্বাদনের সুবিধা ও সুযোগ তাঁহার যথেষ্টই ছিল। কাজেই গান গাওয়া রবীন্দ্রনাথের সহজেই আয়ত্ব হইল। আর পদ্য লিখিবার সুযোগ একরূপ অনাহুতই আসিয়া জুটিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের খুল্লতাত-ভগ্নীর পুত্র ছিলেন জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বয়সে বড়। ইনি প্রসিদ্ধ শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ছয় সাত বৎসর, তখন জ্যোতিপ্রকাশ বাংলা শেষ করিয়া ইংরাজি পড়িতেন। তিনি একদিন হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে পদ্য লিখিবার প্রণালী শিখাইয়া দিলেন ও জোর করিয়া কয়েক ছত্র লিখাইয়াও লইলেন। রবীন্দ্রনাথ পয়ার বাঁধিতে শিখিলেন। তখন পদ্য লেখার চর্চ্চা আরম্ভ হইল। রবীন্দ্রনাথ যখন নর্ম্ম্যাল স্কুলে পড়েন, তখন তাঁহার পদ্য লিখিবার কথা পণ্ডিতগণের অগোচর ছিল না। একদিন নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক তৎকালীন প্রসিদ্ধ পাঠ্যপুস্তক "প্রাণী বৃত্তান্তে"র লেখক সাতকড়ি দত্ত নিম্নে দুই ছত্র কবিতার পরে কি লেখা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন।

'রবিকরে জালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।'

রবীন্দ্রনাথ মুহূর্ত্ত মাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—

'মীন গণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জল ক্রীড়া করে।'

অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহা অপেক্ষা এক বৎসরের বড় ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে বাড়িতে একই শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষা পরিদর্শনের ভার রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথের উপর ছিল। হেমেন্দ্রনাথ ছেলেদের ভাল করিয়া বাংলা পড়াইয়া ইংরাজি আরম্ভ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এই বাংলা শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের যে অশেষ উপকার হইয়াছিল তাহা বলিতেই হইবে। হেমেন্দ্রনাথ বালকদিগকে নানাবিধ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ বাঙালী কুস্তিগীর অম্বুগুহের গুরু হীরা সিং পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখিতে হইত। তাহার পরে বাংলা সাহিত্য, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল অধ্যয়ন, তারপরে স্কুল। বাড়ী আসিয়াই চিত্রবিদ্যা ও জিম্‌নাসটিক, সন্ধ্যার পরে ইংরাজি। রবিবারেও ছুটি ছিল না, ওস্তাদের নিকট সঙ্গীতচর্চ্চা এবং বাটির সংলগ্ন উদ্যান মধ্যস্থিত পুষ্করিণীতে সন্তরণ শিক্ষাও অভ্যাস করিতে হইত। ইহা ছিল হিসাবের মধ্যে, হিসাবের বাহিরে ছিল মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণের নিকট প্রাকৃত-বিজ্ঞান শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের লেখনী অবলম্বনে উত্তরকালে যে 'কঙ্কাল' আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছিল, সে কোন কঙ্কাল জানিনা তবে তারে গ্রথিত হইয়া একটা কঙ্কাল তাঁহাদের বাটির "ইস্কুল ঘরে"র দেওয়ালে আলম্বিত ছিল, তাহার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথকে অস্থিবিদ্যাও শিখিতে হইত। তখন সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাহির মহলে বালকদের জন্য স্বতন্ত্র একটি পড়িবার স্থান থাকিত, তাহাতে খোলাম

চেটায়ের পাখা, ব্ল্যাকবোর্ড, মানচিত্র ও দুটি গ্লোব থাকিত (Terrestrial ও Celestial) অর্থাৎ ভূমণ্ডল ও নভমণ্ডলের মানচিত্র। বাড়ীর লোকে তাহাকে ইস্কুল ঘর বলিত। রবীন্দ্রনাথ যখন ছাত্রবৃত্তির দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহার সহপাঠী বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ একদিন মহর্ষির কাছে একখানা বই চাহিতে গিয়া এমন সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা আর কিছুদিন নর্ম্মাল স্কুলে পড়িতে থাকিলে হয়ত বা ক্রমে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবেন, যেন এই আশঙ্কাতেই মহর্ষি তাঁহাদের বাংলা শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন। সত্য-প্রসাদের সাধুভাষা প্রয়োগের কারণও ছিল। মহর্ষির প্রকৃতিতে খেয়াল বা ক্যাপ্রিসের (Caprice-এর) স্থান ছিল না। তিনি ঢিলেঢালা ভাব পছন্দ করিতেন না। সকল জিনিষ বেশ সুনির্দ্দিষ্ট ও যথাযথ হওয়াই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। আচরণ; বেশভূষা ও কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে উপদেশ দিতেন ও কার্য্যান্তে কিরূপ হইল তাহার বর্ণনা লইতেন, ব্যতিক্রমে বিরক্ত হইতেন। এই শিক্ষার ফলে আমরা দেখিয়াছি যে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, এমন কি ভাষার এলোমেলো ব্যবহারে ও অযথা প্রয়োগে, বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন। মহর্ষি যখন বাড়ী আসিতেন তখন বাড়ীময় একটা সাড়া পড়িয়া যাইত, বাড়ীর সকলের দৈনন্দিন আচার ব্যবহার ও বেশভূষা পরিবর্ত্তিত হইত। সে সময় যেমন ধুতির সহিত দোবজা (চাদর) না থাকিলে পরিচ্ছদ ভদ্রোচিত হইত না, সেইরূপ পায়জামা ও পিরহানের উপর জোব্বা (বড় চোগা) না থাকিলে, এবং বাহিরে যাইতে হইলে জরীর থোবা দেওয়া লাল মখ্‌মলের টুপি ও শুঁড়তোলা লপেটা জুতা পরিচ্ছদে অপরিহার্য্য ছিল। মহর্ষির পরিবারে পুরুষেরা বাড়ীতে সাধারণতঃ ধুতি পরিতেন না, কিন্তু ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া ধুতি পরিতেন। সেকালে পর্ব্ব উপলক্ষে নীল কোর দেওয়া তিন আঙুল চওড়া পাড়ের দেশী তাঁতের ধুতি ও জরী দেওয়া হাতিসিপাই পেড়ে

ঢাকাই ধুতি সকলকেই পরিতে হইত। সম্মানার্হ ব্যক্তির নিকটে যেমন শুধু পেণ্টালুন ও সার্ট পরিয়া যাওয়া ইংরাজদের মধ্যে অসভ্যতা বলিয়া পরিগণিত, সেইরূপ তৎকালে আটপৌরে ঢিলা পায়জামা ও পিরাণ মহর্ষি পরিবারে অভদ্রতা বলিয়া অমার্জ্জনীয় ছিল। মহর্ষির নিকট যাইবার সময় সকলেই মুখের পান ফেলিয়া জোব্বা পরিয়া যাইতেন। অন্দরে রবীন্দ্রনাথের মাতৃদেবী মহর্ষির আহারের তত্ত্বাবধানের জন্য স্বয়ং পাকশালায় যাইতেন। হরকরা শুভ্র পাগড়ী ও চাপকানে সজ্জিত হইয়া অনুক্ষণ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত। কাজেই সত্যপ্রসাদের মনে একটা দারুণ সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়াছিল, বই চাহিতে গিয়া ভাষাতে তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এইবার রবীন্দ্রনাথের রীতিমত ইংরাজি পড়া আরম্ভ হইল। প্রথমে তিনি 'বেঙ্গল একাডেমি' একটি ফিরিঙ্গীপ্রধান স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে ইংরাজি বা ল্যাটিন বিদ্যা যত হোক বা না হোক স্কুল-পালান বিদ্যা যথেষ্ট আয়ত্ব হইয়াছিল।

২৫শে মাঘ ১২৭৯, ইংরাজি ১৮৭৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথের উপনয়ন মহর্ষি-প্রবর্ত্তিত নূতন অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়।

মহর্ষির সহযোগী ও নবাগত শিষ্যদলের মনে এই সংশয় ছিল যে, তাঁহাদের সমাজে ব্রাহ্মণের একটা বিশিষ্ট জাতিগত ও আভিজাত্যের চিহ্নধারণ করা উচিত কি না, এবং ধর্ম্মের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া একটি বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান দ্বারা প্রথম উপবীতগ্রহণ প্রচার করা আবশ্যক কি না, এবং উপনয়নের পর উপবীত-সাহায্যে গায়ত্রীজপের কোনও সার্থকতা আছে কি না। তাঁহাদের নিকট ইংরাজি শিক্ষার স্রোত প্রবাহে এ সমস্তই আত্মসম্মানের অন্তরায়রূপে কল্পিত। সমশ্রেণীর উপাসকের মধ্যে এরূপ বৈষম্যজ্ঞাপক চিহ্নধারণ ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধের বিরোধী বলিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। এই সকল আপত্তি মহর্ষিকে

কিছুদিন ধরিয়া দোদুল্যমান অবস্থায় রাখিয়াছিল, পরে তিনি বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে এ সকল মত অগ্রাহ্য করিয়া জাতিবর্ণের পোষকতা করাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয় এবং তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিপোষক। তাই, বিবাহের মত উপনয়নেরও একটি অপৌত্তলিক সংস্কার পদ্ধতি প্রণয়ণ করিয়া উহা ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি উপাসনায় আচার্য্যপদে বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ বরণ করিয়া সমাজের কার্য্য চালাইতেছিলেন। পরে স্নেহপরবশ হইয়া পুত্রতুল্য কেশবচন্দ্র সেনকে, ধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ সাহায্যকারী ভাবিয়া, 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দানে বেদী হইতে বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যা করিবার অনুমতি দেন, এবং ১৭৮৪ শকের ১লা বৈশাখ **কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে** পৌরোহিত্য ও আচার্য্যপদে দেবেন্দ্রনাথ অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে নিয়োগ করেন। ইহাতে তাহার পূর্ব্বাশ্রিত অনেক বিপ্রের ক্ষোভ ও অশ্রুপাত দেখা যায়। ১৮৬৩ সালে মহর্ষির পঞ্চমপুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়নকালে রীতিমত অনুষ্ঠান করিয়া কার্য্য আরম্ভ হয়, এবং তিনি পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশীকে বেদীতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিতে ও বালককে যদ্‌বিহিত উপদেশ দিতে আদেশ করেন। সাধারণ উপনয়ন-প্রথা হইতে তিনি ব্রাহ্মণের এই আদি সাবিত্র্যোপাসনা দীক্ষাটিকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত দেখিতেন। সেইজন্য স্থিরীকৃত দিনের পূর্ব্বে আচার্য্যের কার্য্য তিন বালককে বিশুদ্ধ উচ্চারণে কয়েকটি মন্ত্র কণ্ঠস্থ করান। উপনয়নের স্থিরীকৃত দিবসে অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যজ্ঞোপবীৎ ধারণ করান হয়। পরে তিন দিন এক কক্ষে বালককে নির্জ্জনে রাখা হইত, এবং পরে আর একটি অনুষ্ঠান, যাহা সাধারণতঃ উপনয়নের দিনই হইয়া থাকে, সেই সমাবর্ত্তন ক্রিয়া, আচার্য্যের উপদেশ, এবং বালকের প্রতিজ্ঞা দিয়া অপর একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান হইত। মহর্ষির এ ভাবের কখনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি গায়ত্রী ও সূর্য্যোপস্থানের উপর যথেষ্ট জোর দিয়াছেন, অবশ্য পৌত্তলিকভাব বা ধারণা তাহা হইতে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিতে

বালককে বলা হইত। সামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে সূর্য্যোপস্থানে যে মন্ত্র আছে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে, এবং রবীন্দ্রনাথও ব্যাখ্যানে ব্যবহার করিয়াছেন।

"উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং।"

জগতের প্রকাশনার্থে কিরণ সকল সেই সূর্য্যদেবকে উর্দ্ধে ধারণ করিতেছে। এই সূর্য্য কেবলমাত্র জগতের আলোকদাতা মহৎ উল্কাপিণ্ড নহেন, বেদের মতে, ইনি সকল জীবের মন ও ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। তাই প্রতিদিন বলিতে হয় "সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যঃ রক্ষন্তাম্" (যজ্ঞপতি ও ক্রোধপতি সূর্য্য, ক্রোধ এবং ক্রোধপতি ইন্দ্রিয়সকল ক্রোধকৃত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন)।

মহর্ষির এক শিষ্যকে লিখিত পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তাহা হইতে এ অনুষ্ঠানটির প্রতি তাঁহার কিরূপ আগ্রহ ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ছিল পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

"সমাবর্ত্তনের দিন বেদপাঠের পর 'সত্যং বদ ধর্ম্মঞ্চর' প্রভৃতি যে উপদেশ দিতে হয়, তাহা তুমি দিবে ও তাহার পরে বালকদিগকে বেদীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া আমি—কে ও—কে যে উপদেশ দিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিবে। ১৭৮৫ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৪ পৃষ্ঠাতে এই উপদেশ পাইবে। "তাদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" যে অধ্যায়ের প্রথমে আছে, সেই অধ্যায় সমাবর্ত্তনের দিন বালকদিগকে পাঠ করিতে হইবে। অতএব, এই অধ্যায়টি সকলে মিলিয়া তাহারা সমস্বরে যাহাতে কণ্ঠস্থ করিতে পারে এমত শিক্ষা দিবে। উপনয়নের দিন পালা করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করিতে হইবে। এই পত্র—কে দেখাইবে।"

উপনয়নের দিন পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তদ্দৃষ্টে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্ম প্রতিবাদ স্বরূপ সভাস্থল

ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সে সময়ে শূদ্রের অসাক্ষাতে ব্রাহ্মণের এই দীক্ষা দিতে হইবে এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সম্ভবতঃ এই উপনয়ন-পদ্ধতি বা প্রণালী তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকরী সভা হইতে স্থিরীকৃত হয় নাই, এবং নিজগৃহে এই অনুষ্ঠানের জন্য মহর্ষিও মণ্ডলীর মত লওয়ার আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। এই উপনয়ন নব্য ব্রাহ্মদের অনুমোদিত হইল না এবং হিন্দুসমাজের সনাতন বিধি অনুসারেও হইল না। অথচ, একটা সামাজিক সংস্কার হিসাবে এ উপনয়ন ক্রিয়াকে ধরা যায় না, কিন্তু ব্যক্তিগত সাধনায় পুত্রদের অগ্রসর করিয়া দিতে মহর্ষিদেবের লক্ষ্য থাকায়, ইহাকে একটি গৃহ্য অনুষ্ঠান ও দ্বিজত্বদানের ব্যক্তিগত সংস্কার বলিয়া ধরিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পুত্রের উপনয়নের কথা মনে আসে। বঙ্গে নব্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক রঘুনন্দন উপনয়ন পদ্ধতির সংস্কার করিয়া নিজ পুত্রের উপনয়ন দেন। উপনয়নান্তে নূতন ব্রহ্মচারীকে উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অভিবাদন করিতে বলেন। কানভট্ট রঘুনাথ শিরোমণিকে বালক প্রণাম করায় তিনি প্রশ্ন তুলিলেন যে, যদি নব্য পদ্ধতির উপনয়নকে যথার্থ পদ্ধতি বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে তিনি ও অন্যান্য সবাই অনুপনীত বিধায়, ব্রাহ্মণবালকের অভিবাদন গ্রহণে অধিকারী নন। আর যে পদ্ধতিতে তাঁহাদের উপনয়ন হইয়াছে, তাহা যদি ঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে নব্য উপনীতের উপনয়ন সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং সে ব্রাহ্মণপদবাচ্য বা প্রত্যাভিবাদন যোগ্য নয়। ইনি রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বঙ্গের নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া সকলেরই পূজার্হ ছিলেন। কথাটা পণ্ডিতি রহস্যালাপের মধ্যেই গণ্য হইল, কোন দলাদলির সৃষ্টি করিল না এবং রঘুনন্দনের পুত্র যে সদ্‌ব্রাহ্মণ হইলেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। তদবধি ক্রমশঃ বঙ্গদেশব্যাপী রঘুনন্দনের পদ্ধতি গৃহীত হওয়ায়, এক্ষণে সর্ব্বত্র উপনয়ন ক্রিয়া ঐ পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। পরবর্ত্তীকালে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া, মহর্ষির পদ্ধতি অপৌত্তলিকদের জন্য বিধিবদ্ধ হয় ও

কেশবচন্দ্রের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া নতুন সমাজ স্থাপন করায়, মহর্ষি আদি ব্রাহ্মসমাজ গঠন করেন ও তাহার সদস্যবৃন্দের সহিত এ পদ্ধতি পুনরালোচনা হইয়া বাঁধাধরা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রচারিত হয়। আমরা রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিতে' ইহার আভাষ পাই এবং নিম্নে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। এ ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আবশ্যক। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার পিতার আত্মজীবনীর ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"The name "Sadharan" Samaj is significant, as showing that it claims to have advanced from a church Government of a theocratic type to a church Government on representative and democratic principles."

মহর্ষি আবাল্য 'ব্রাহ্মণ শাসনমাস্থায়'তে অভ্যস্থ হওয়ায়, সাধারণের প্রতিনিধিমূলক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁহার সমাজকে কি পূর্ব্বে, কি পরে পরিচালিত হইতে দেন নাই। পণ্ডিত আচার্য্যগণের বাণীই তাঁহার সমাজের অনুশাসন বাক্য ছিল। ইহাই আদি ব্রাহ্মসমাজের বৈশিষ্ট্য।

"১৮৭৩ সালে প্রাচীন উপনয়ন পদ্ধতি যতদূর ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত করা যায় তাহা তিনি করিলেন। নূতন উপনয়ন পদ্ধতিতে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাপূর্ব্বক উপবিদ্ গ্রহণ করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। প্রথমে আমি নূতন উপনয়ন প্রথার বিপক্ষে ছিলাম, কিন্তু এইরূপ উপনয়ন ব্যতীত আদি ব্রাহ্মসমাজের হিন্দু অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাতে যোগ দিয়াছিলাম। আমরা কেবল এই মাত্র দেখিব যে পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব না থাকে, যেহেতু অপরিমিত দেবতার পরিবর্ত্তে পরিমিত দেবতার উপাসনা ব্রাহ্মের পক্ষে নিষিদ্ধ। নূতন প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে দেবেন্দ্রবাবু, সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ দুই পুত্রের উপনয়ন দেন। পৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ

সকল নিয়ম পালন করিয়া উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমি উপস্থিত ছিলাম, তবে যে দালানে ক্রিয়া হইতেছিল তথায় শূদ্র বসিতে পারিবে না, এমন নিয়ম হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রকাশিত হয়, তাহাতে উপনয়ন বলিয়া একটি ক্রিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্রাহ্ম উপদেষ্টার নিকটে বালককে আনিয়া তাঁহার উপর বালকের ধর্ম্ম-শিক্ষার ভার অর্পণ করা।" (রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত।)

উপনয়নের সময় দেবেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র সাবিত্রী-দীক্ষা পুত্রদের কর্ণে দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তাহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও তাহার অর্থ এবং 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' পুত্রদের বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রাজা রাম-মোহনের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথেরও বাংলাদেশে প্রচলিত সংস্কৃত উচ্চারণ বিকৃতবোধে মনঃপূত ছিল না। তিনি আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদ ও বেদান্ত পুত্রদের শিক্ষা দেন। ভট্টাচার্য্য বি. এ. পাস করিয়া ইংরাজিতে কৃতবিদ্য হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে ইংরাজিও পড়াইতেন। দেবেন্দ্রনাথ বেদাঙ্গ ও অপরাবিদ্যা অর্জ্জন পুত্রদের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পরাবিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধ কিছুই রক্ষিত হয় নাই, কেবল তত্ত্বজ্ঞান নিষ্কাসন করিয়া তাহাই ইঁহাদের জীবনের পাথেয় স্বরূপ প্রদান করা হয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনের ও সাধনার সূত্রপাত। উপনয়নের পর হইতে তিনি নিষ্ঠার সহিত নিত্য গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতেন। তাঁহার তরুণ মনে পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধার বীজ সত্বরই অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং পিতার দৃষ্টান্তে ও বাক্যে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এমন কি অল্পবয়সে ভয় পাইলে অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবিদ্ জড়াইয়া গায়ত্রীমন্ত্রজপে সে ভয় দূর করিতেন। সাংসারিক দুঃখ কষ্ট দুর্যোগে ইষ্টমন্ত্রে মনোনিবেশ পূর্ব্বক সে দুঃখ উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এই বিশ্বাস তাঁহার ভক্তিমান পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। তারপরে একবার তাঁহাকে মহর্ষির সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইতে হয়। ভ্রমণ-

কালটা বেশ একটু লম্বা রকমের হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে একবারমাত্র রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। ডেঙ্গুজ্বরের ভয়ে তাঁহাদের কিছুদিন ছাতুবাবুদের (প্রসিদ্ধ আশুতোষ দেবের) পেনেটীর বাগান বাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এবার মহর্ষি তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রবাসে গিয়াছিলেন। প্রথমে কয়েকদিন বোলপুরে থাকিয়া, তাহার পরে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েকদিন করিয়া কাটাইয়া অমৃতসরে একমাস থাকেন। অমৃতসরের গুরুদ্বারা ও স্থবর্ণ-মন্দির এবং জাতিভেদশূন্য শিখেদের তথায় দিবারাত্র আরতি, ভজনগান ও আরাধনা মহর্ষির মনে দৃঢ় রেখাপাত করে। সেইরূপ বঙ্গদেশে একটি স্থান বা আশ্রম স্থাপিত দেখিতে তিনি উৎসুক ছিলেন, কিন্তু সম্যক কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তথা হইতে ড্যালহাউসী পাহাড়ে তাঁহারা বক্রোটাশিখরে পৌঁছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথকে কিছু ইংরাজি, কিছু সংস্কৃত, সঙ্গে সঙ্গে কিছু গণিত, আর জ্যোতিষ পড়িতে হইত। মহর্ষি স্বয়ং তাঁহাকে পড়াইতেন।

চারমাস বাদে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মহর্ষির একখানা পত্র (হিমালয় বক্রোটা শেখর ১৪ই আষাঢ় ১৭৯০ শক) হইতে জানা যায় "রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি, তাহার প্রমুখাৎ এখানকার তাবৎ বৃত্তান্ত চুম্বকরূপে জানিতে পারিয়াছ।" এই জীবন্তলিপিটি তাঁহার অনুচর কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়ের জিম্মায় কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছে। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে আবার সেই বেঙ্গল একাডেমিতেই যাইতে হইল, কিন্তু যে স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়াছে সে বন্ধন মানিতে চায় না। দীর্ঘকাল বন্ধন দশায় থাকিয়া পঙ্গু না হইলে পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গমকে ধরিয়া আনিয়া পুনরায় পিঞ্জরে পুরিয়া দিলে সে পলাইতেই চায়। রবীন্দ্রনাথ স্কুল হইতে পলায়ন নিয়মিত আরম্ভ করিলেন। অভিভাবকগণ সে কথা বুঝিয়া তাঁহাকে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সেণ্টজেভিয়ার কলেজিয়েট স্কুলে পাঠাইলেন।

১২৮১ সালের ২৫শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। এই সময় তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন তাঁহার বৌঠাকুরাণী জ্যোতিরিন্দ্র নাথের পত্নী কাদম্বিনী দেবী। ইনি কলিকাতার খ্যাতনামা সঙ্গীত সুরসিক ৺জগমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী। শিক্ষার গুণে ইনি একজন বিদুষী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তৎকালীন যুগসাহিত্যপ্রবর্ত্তক কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতা ইঁহার প্রিয় থাকায়, ইনি কবিবরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত আসন পাইয়া কবিবর বিহারীলাল "সাধের আসন" লেখেন। ইনি রবীন্দ্রনাথকে বিহারীলালের কবিতার আদর্শে কবিতা লিখিতে উৎসাহিত করিতেন। তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগী মাত্র ছিলেন না, তাঁহার স্বামীর উপদেশে অশ্বারোহণ বিদ্যায় নিপুণা হইয়াছিলেন। কলিকাতায় ও চন্দননগরের রাজপথে বিচরণকালে এই অশ্বারূঢ় দম্পতি তাঁহাদের সহৃদয় সামাজিকতার গুণে বহু সম্ভ্রান্ত প্রাচীনপন্থীরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। নূতন স্কুলে যাইয়াও রবীন্দ্রনাথের আচরণের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হইল না। ব্যাপার বুঝিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। এতদিনে রবীন্দ্রনাথের মনোস্কামনা পূর্ণ হইল, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলেন। এই সময়ে তাঁহার শিক্ষকেরা তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে কালিদাসের কুমারসম্ভব ও সেক্স্পিয়রের ম্যাকবেথ প্রভৃতি অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন এবং তাঁহাকে অনুবাদ করিতে উৎসাহ দিতেন। ম্যাকবেথের কবিকৃত অনুবাদ পরবর্ত্তীকালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের স্কুলের পড়া এই পর্য্যন্ত। সাধারণ বালকেরও যাহা সাধ্যায়ত্ত, রবীন্দ্রনাথ সেই ম্যাট্রিকুলেশন্ (তখনকার এণ্ট্রেন্স) পরীক্ষাও দিতে পারিলেন না। কিন্তু এ বয়সে রবীন্দ্রনাথ অন্ততপক্ষে কতটুকু লাভ করিয়াছিলেন দেখা যাক্। সেই বয়সেই (বয়স তখন চৌদ্দ বা পনের বৎসর

মাত্র) অল্প ইংরাজি (তা অতি সামান্য বলিলেই চলে), অল্প জ্যোতিষ, অল্প সংস্কৃত, সামান্য অস্থি ও স্বাস্থ্যবিদ্যা তিনি শিক্ষা করিয়াছিল, এ সব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে মাতৃভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। তখন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে অতি অল্পই তাঁহার অপঠিত ছিল। বৈষ্ণব কবিতা ও মহাজন পদাবলীর প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চুঁচুড়া হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার একটি সুন্দর সংস্করণ বাহির করেন। বালক রবীন্দ্রনাথ তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন ও স্বাভাবিক প্রবণতায় বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎ-ব্যতীত 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র পুরাতন কয়েকখণ্ড এবং প্রতিমাসে প্রকাশিত 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব', 'অবোধ বন্ধু' 'বঙ্গদর্শন' রবীন্দ্রনাথের মনের আহার যোগাইত। ইহা ভিন্ন সেই সুর—যে সুর প্রাণে বাজিয়া বাজিয়া তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিল—সেই সুরই তাঁহাকে শিখাইল সঙ্গীত, আর শিখাইল কবিতা-রচনা। গুণেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'নব নাটকে'র মহলা দিবার সময় বাড়ির বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হইয়া তাহার সঙ্গীতলহরী আয়ত্ব করিতেন। বালক রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত শিখিতেন, পাঁচালীদলগঠনকামী পিতৃ-অনুচর কিশোরীর নিকট, পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ বাবু শ্রীকণ্ঠ সিংহের নিকট, অগ্রজ জ্যোতিদাদার নিকট, অনিয়মিত ভাবে ক্রীড়ার ছলে, আর বেতনভোগী ওস্তাদের নিকট। তাহার উপর বড়দাদা হারমোনিয়ম বাজাইতেন, জ্যোতিদাদাও বাজান, কতলোক গান করে—ইহাতে নানাদিক হইতে সঙ্গীতে সাফল্য লাভ অপরিহার্য্য। স্বভাবতঃ সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে সকলেই গাহিতে বলিতেন, তিনিও তাহাতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার গান শুনিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। নবদশ বৎসর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ বাটির মাঘোৎসবে গায়কদের সহিত গানে যোগদান করিতেন। তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে মৌলাবকস্ প্রভৃতি বিখ্যাত ওস্তাদের

গতিবিধি ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পর লক্ষ্ণৌএর নবাব ওয়াজেদ আলিশা সপারিষদ ও চিড়িয়াখানাসহ কলিকাতার অপর পারে মেটিয়া-বুরুজে সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার আশ্রিত বড় মিঞা, ছোট মিঞা প্রভৃতি ওস্তাদগণ এবং চিকিৎসাব্যবসায়ী হাকিমগণ কলিকাতার অভিজাত সমাজে বিশেষ সমাদরের সহিত আহুত হইতেন। কবিরাজী ও এলোপ্যাথীর মধ্যস্থ তৃতীয় পন্থা হাকিমী চিকিৎসারও আদর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আর ওস্তাদি গানের মজলিসে প্রায় সকল বড় লোকের বৈঠকখানাই সরগরম ছিল। কিন্তু ওস্তাদের সঙ্গীত শিক্ষা রবীন্দ্র-নাথের চিত্তে বিদ্রোহ জাগাইত। একদিকে যেমন স্কুল-পালান বিদ্যা অগ্রসর হইতেছিল, অন্যদিকে তেমনই ওস্তাদদের এড়াইয়া চলার সাধনার অনুশীলনও চলিতেছিল। বিখ্যাত কালোয়াৎ যদু ভট্টের ইচ্ছা ছিল যে, সুকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যেন কানাড়া রাগিনীতে তাঁহার ঘর এবং নাম বজায় রাখেন। সেদিকে ওস্তাদজির সকল চেষ্টা কিরূপে তিনি এড়াইয়া চলিয়াছিলেন, সে কৌতুককর কবি-কাহিনী আমরা কবির নিজের মুখে একাধিক বার শুনিয়াছি। আর কবিতা রচনা? কাগজে, শ্লেটে কবিতা-রচনা অবিরাম চলিতেছিল—যদিও তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই—যদিও ছন্দবন্ধের কঠোর নিয়ম-পদ্ধতি নিজের মনোমত করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইতে তখনও বালক কবির সাহস হয় নাই। ললিত পদবিন্যাস, রচনা-চাতুর্য্য ও ভাষার মাধুর্য্য অবধান করিয়াও কেহই কিন্তু বালকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উচ্চাশা পোষণ করেন নাই। স্কুলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক মানদণ্ডে তাঁহার গৌরবভার অনেক কমিয়া গেল।

বড়দিদি সৌদামিনী দেবী হতাশা জানাইলেন, কেহ কেহ অনুযোগ করিলেন, গুরুজনেরা তাঁহাকে তিরস্কার করা পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন—কেবল একজন তাঁহার আশা ছাড়িলেন না—তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

জোর করিয়া রবীন্দ্রনাথকে কোন কাজ করান যায় না, ইহাই তাঁহার

প্রকৃতি। যতদিন তাঁহাকে জোর জবরদস্তি করিয়া চালাইয়া লইবার পন্থাগুলি অনুসৃত হইতেছিল, ততদিন তাঁহার মন ছিল ভাঙ্গা বেড়ার দিকে,—এখন পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া তিনি সাহিত্যের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যে অন্তঃপ্রেরণা তাঁহাকে কার্য্যে ব্রতী করিতে চাহিত, হৃদয় মন তাঁহাকে যে পন্থা অনুসরণ করিতে বলিত, যে সব বিষয়ে জানিবার জন্য, পড়িবার জন্য তাঁহার আকুল আগ্রহ জন্মিত, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের অবশ্য পঠিতব্যতায়, স্কুলের উপস্থিতির বাধ্যতায় সে সবই নষ্ট করিয়া দিত। ফল হইত এই, এদিক ওদিক দুদিকের কোনটাই হইত না। এখন সে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল। এখন ইচ্ছামত পঠন, ইচ্ছামত ভ্রমণ, ইচ্ছামত সবই হইতে লাগিল—তবে মাষ্টার পণ্ডিত এখনও ছিল। এই সময়েই মেট্রোপলিট্যান ইন্‌সস্টিটিউসনের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট ৺বাবু ব্রজনাথ দে ও ঐ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেডপণ্ডিত ৺রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয় রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন।

রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় কবিকে শুধু শকুন্তলা পড়াইয়া ক্ষান্ত হন নাই। সেকালে টোলে শিক্ষিত পণ্ডিত মহাশয়েরা ছাত্রদের নির্দ্দিষ্ট কাব্য যেমন পড়াইতেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অনেক উদ্ভট শ্লোক ও কৌতুকজনক অনেক সংস্কৃত শ্লোকও ছাত্রদের মুখে মুখে শিখাইতেন। রবীন্দ্রনাথেও যে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, সে পরিচয় কবি 'রাজা ও রাণী'তে দিয়াছেন। রাজা বিক্রমদেবর ও দেবদত্তের কথোপকথনের মধ্যে যখন রাজা বলিলেন—

> "কাল বলেছিলে তুমি
> পুরাতন কবি বাক্য—'নাহিক বিশ্বাস
> রমণীরে'—আর বার বল শুনি।"

তখন দেবদত্ত প্রথমে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক আরম্ভ করিলেন রাজা বাধা দেওয়ায় দেবদত্ত রহস্য করিয়া বলিলেন—

"অনুস্বর ধনুঃস্বর নহে, মহারাজ,
কেবল টঙ্কার মাত্র ! হে বীর পুরুষ,
ভয় নাই ! ভাল, আমি ভাষায় বলিব।
যত চিন্তা কর শাস্ত্র, চিন্তা আরো বাড়ে,
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে,
শাস্ত্র নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে।"

সংস্কৃতের ললিত বঙ্গানুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ সৃষ্টিনৈপুণ্যের অধিকারী হইয়াও অনুবাদ বিভাগে ভ্রাতাদের ন্যায় যে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় এই সামান্য অনুবাদেও যাহাতে পাঠকেরা পাইতে পারেন, তজ্জন্য "রাজা বিক্রমদেবের" ভয়স্থান মূল সংস্কৃত বাক্যটি নিম্নে দিলাম—

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
স্বাঙ্কে স্থিতাপি যুবতী পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ কুতো বশিত্বং॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "নবরত্নমালা" গ্রন্থে সন্নিবেশিত কতকগুলি উদ্ভট শ্লোকের রচনা রবীন্দ্রনাথ কৃত ছন্দে অনুবাদ দেখা যায়। এখানে একটা কথা বলা, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্যকথা' হইতে জানিতে পারি যে, যখন গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ঠাকুরবাটিতে 'নবনাটক' অভিনীত হয়, তখন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী নবরত্নের নামসম্বলিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি নাট্যমঞ্চের শিরোভূষণ হইয়াছিল—

ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥

'রাজা ও রাণীর' দ্বিতীয় দৃশ্যে উত্তেজিত প্রজাবৃন্দকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে দেবদত্তের মুখে একটি যমক অনুপ্রাসে শ্লোক দিয়া কবি দেখাইয়াছেন যে, মানুষ অর্থ না বুঝিলেও কেবল শব্দঝঙ্কারে কিরূপে বিমোহিত হয়। এ শ্লোকটিও নিশ্চয় পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত এবং যমক অলঙ্কারের দৃষ্টান্তরূপে কবির চিত্তে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছিল। এই শব্দঝঙ্কার যথাযথ ফুটাইবার জন্য অভিনয়কালে এই ভূমিকার ভার লইয়াছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্লোকটি এই—

"নসমানসমানসমানসমাগমমাপসমীক্ষ বসন্তনভ
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমবচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ।"

এই শ্লোকটি 'নলোদয়' গ্রন্থের ২য় সর্গ, ১৬ শ্লোক। এই 'নলোদয়' একটি অদ্ভুত কাব্য। আদ্যোপান্ত যমক অনুপ্রাসে চারি সর্গে রচিত। কিম্বদন্তি এই যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম ঘটকর্পর কয়েকটি যমক অলঙ্কারবিশিষ্ট শ্লোকে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং তাহারই একটি শ্লোকে গর্ব্ব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অপেক্ষা কেহ যমক অলঙ্কারে শ্রেষ্ঠ রচনা করিতে পারিলে, তিনি ঘটের কর্পরে (কলসীর কাণায়) জল আনিয়া তাহার পদধৌত করিয়া দিবেন। এই গর্ব্বোক্তি কালিদাসের অসহ্য হওয়ায়, তিনি এই কাব্য রচনা করেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা কিন্তু ইহাকে মহাকবি কালিদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না এবং কাব্য হিসাবে ইহাকে নিকৃষ্ট স্থান দেন। তবে অধুনা মুদ্রিত কালিদাসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহা স্থান পাইয়াছে। ইনি কোন্ কালিদাস বলা কঠিন। পাঠকদের কৌতূহল নিবারণের জন্য নিম্নে শ্লোকটির বাংলা অর্থ দেওয়া হইল—

কামুকগণ ভ্রমণশীল মেঘমালার ভ্রান্তিজনক বিপুলমদযুক্ত ভ্রমরা-

বলি বিশিষ্ট বসন্তকালিক নভস্তল নিরীক্ষণপূর্ব্বক মানসাভিমান বিশিষ্ট (বক্রীভাব প্রাপ্ত) বন্ধুর সমাগম লাভ করিয়াছিল।*

(কালিদাস গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ)

রবীন্দ্রনাথ সংসারে নিঃসঙ্গ ছিলেন। জননীর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া তিনি জননীর স্নেহভাজন ছিলেন, সন্দেহ নাই। বহুসন্তানবতী জননীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের লালনপালনের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকা সম্ভবপর হয় নাই। সে ভার তাঁহার বড়দিদিকে লইতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতার দিক হইতেও তাদৃশ সান্নিধ্যলাভ ঘটে নাই। বৃহৎ যৌথ-পরিবারের একজন হইয়া, এমন কি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত 'বৌঠাকুরাণীর হাটের' মাঝে থাকিয়াও সে পরিবারের সহিত সম্বন্ধ ভাসা ভাসাই ছিল। তাঁহার প্রায় ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সংসারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়া পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে তিনি তখন সংসারে শেওলার মত ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন, কোথাও শিকড় গাড়িতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি বাল্যাবধি বহুর মধ্যে থাকিয়াও একা, চিত্তবৃত্তি স্ফুরণের একান্ত অভাব বোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ নিঃসঙ্গ অবস্থাই তাঁহাকে অন্তর্মুখী করিয়াছিল। নিজের ভাব ও কল্পনায় বিভোর থাকাই তাঁহার পক্ষে সহজ ও প্রীতিজনক। তদুপরি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে তাঁহার একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল। সঙ্গীহীন রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতির সহিত হৃদ্যতা স্থাপনে যত্নবান হইয়াছিলেন, তেমনই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পুস্তকপাঠেও অধ্যবসায়ী ছিলেন। এই সকল কারণই তাঁহাকে নিজের রচনার মধ্যে নিজেকে বিস্তার করিবার পথে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কেবল পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনই একজন রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট নয়, ইহা ভগবৎ কৃপা ও অলৌকিক প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে,

* ভুগ্লি কলেজের শিক্ষক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফটিকলাল দাস আমার অনুরোধে যে সংস্কৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃতানুরাগী পাঠকদের জন্য (ঙ) পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

"কবিত্ব ও ল্যাজ" ভিতরে না থাকিলে টানাটানি করিয়া তাহাদের বাহির করা যায় না।

কবিতা রচনা চলিতে লাগিল। হোক সেগুলি মাত্র উচ্ছ্বাসের আবেগ, হোক সেগুলি কল্পনার অপরিস্ফুট প্রতিকৃতি, হোক সেগুলি কায়াশূন্য ছায়ামূর্ত্তি, কিন্তু ভাবের বাহন ভাষার উপর কবির অধিকার স্বতঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের পারমার্থিক কবিতা শুনিয়া মহর্ষি হাসিয়াছিলেন। ভারতমাতা সম্বন্ধীয় কবিতায় 'নিকটে'র সহিত 'শকটের' মিল গুণেন্দ্রনাথ কোন ক্রমেই মঞ্জুর করিতে না পারিয়া হাসির ঝড়ে কোন অজানা পথে সে শকট উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা-রচনা সমান ভাবে চলিতেছিল। আর রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিলেন, তাহার পরিমাণ যে কত তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই যতক্ষণ না জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের প্রুফ সংশোধনের সময়ে (১৮৭৫ সাল) রবীন্দ্রনাথ তথায় উপস্থিত হইয়া জহরব্রত পালনের দৃশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লিখিত গদ্য বক্তৃতার স্থলে একটি গীত সন্নিবেশ করিয়া দৃশ্যটির গাম্ভীর্য্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে 'সরোজিনী'র

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ স'পিবে বিধবা বালা—"

গীতটি রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুত এবং অতি অল্প বয়সেই ও অত্যল্প সময়েই ইহা রচিত হইয়াছিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইলেন। এই সময়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজাইয়া হিন্দি সুর ভাঙ্গিয়া নানারকম গৎ প্রস্তুত করিতেন। সেই সময়ে তাঁহার বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনেই দুইপার্শ্বে বসিয়া সেই সকল গতের সুরে গান বাঁধিতেন। ইহারই ফলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' (পরে পুনর্বসন্ত নামে প্রকাশিত) গীতিনাট্যের সৃষ্টি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীও গতের সুরে কতকগুলি গান বাঁধিয়াছিলেন। ইহাদের এই গান রচনার পদ্ধতিটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণতঃ আগে গানের কথা রচিত হয়, পরে তাহাতে সুর সংযোগ হয়, ইঁহারা উল্টা দিকে আরম্ভ করিলেন। আগে গৎ বা সুর প্রস্তুত হইত, তারপর সেই সুরের উপযোগী ভাষা রচনা করিয়া গান রচিত হইত। শুনেছি, ইহাই পশ্চিম ভারতের অনুমোদিত প্রথা।

এইটাই ছিল ঠাকুরবাড়ীতে পরিবর্ত্তনের যুগ। মহর্ষি নিজে স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত ছিলেন, কাজেই সকলেই সেই ভাবে ভাবান্বিত হইতেন। মহর্ষি মাতৃভাষারও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নশীল ছিলেন। একবার তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহাকে ইংরাজিতে পত্র দিয়াছিলেন, মহর্ষি সেই পত্রখানি অপঠিত অবস্থায় ফেরত দিয়াছিলেন। তিনি যে নব ভাব উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরিবারস্থ সকলেরই উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বেশভূষায়, কাব্যে, গানে, চিত্রে, নাট্যে, ধর্ম্মে, স্বাদেশিকতায় সর্ব্বপ্রকারে নানারূপ পরিবর্ত্তন চলিতেছিল। 'ন্যাশান্যাল নবগোপাল' নামে খ্যাত নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসুর পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করিবার নিমিত্ত যে 'চৈত্র মেলা' (পরে নাম হয় হিন্দু মেলা) স্থাপিত করিয়া স্বদেশী শিল্পে নূতন প্রাণ জাগাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ঠাকুরবাড়ী সর্ব্বতোভাবে তাহাতে সহায়তা করিতেছিল। সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের নামের সহিতই 'ন্যাশান্যাল' (জাতীয়) আখ্যা প্রদান করিতেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে 'ন্যাশান্যাল নবগোপাল বলিত। তিনি পাড়ায় পাড়ায় তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া জিমন্যাসটিক চর্চ্চার আখড়া করিয়াছিলেন ও সর্ব্বদা বক্তৃতায় ব্যায়ামের উপযোগীতা ঘোষণা করিতেন। তাই, তাঁহাকে 'ফাদার অফ ফিসিক্যাল কালচার ইন বেঙ্গল' (Father of physical culture in Bengal) বলিত। বাঙ্গালীর সত্ত্বাধিকারত্বে স্ত্রীপুরুষে মিলিত বাঙালী খেলোয়াড়ের সাহায্যে তিনি সার্কাসের দল গঠন করেন, সেজন্য তাঁহাকে বাঙ্গালী সার্কাসের

প্রবর্ত্তক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি একটি অশ্বশালা রাখিয়া 'রাইডিং স্কুল' (ঘোড়ায় চড়া শিখিবার স্কুল) করেন। তাহাতে বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করেন। নবগোপাল পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স অফিসার রূপে বহুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বোম্বাই হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সায়া, সেমিজ, জ্যাকেট, পার্সিসাড়ী ও ঐ দেশীয় ভাবে কোঁচা দিয়া সাড়ী পরিবার প্রথা, প্রভৃতির সাহায্যে বঙ্গমহিলার বেশভূষার মনোজ্ঞ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছিলেন। আবার ওদিকে তাহার পূর্ব্বে মহর্ষি বাঙ্গালী পুরুষের দরবারি পোষাক আগুলফলম্বিত 'জোব্বা'কে, আজানুলম্বিত 'চোগা'য় রূপান্তরিত করেন। 'নব নাটকে'র অভিনয়ে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উমানন্দন ঠাকুর প্রবর্ত্তিত বৃহদায়তন শামলার পরিবর্ত্তে দিল্লীর হালকা উজিরী পাগড়ীর নকলে, যে পাগড়ী প্রচলন করেন, তাহাই আজও দেওয়ান সাহেব, রায় বাহাদুর ওদেশীয় পোষাকের পক্ষপাতী ডেপুটিবাবুদের শিরোভূষণ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দি সুর ভাঙ্গিয়া বাংলা সুর গড়িতেছিলেন। দৃশ্যকাব্যে ইঁহারা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। সে সকল বিস্তৃত ভাবে বলিবার স্থান এ নয়। রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্ত্তন যুগের মাঝখানে আসিয়া পড়ায় তাঁহার অনুভূতি ও শিক্ষা হইতেছিল নানা রকমে। এই পরিবর্ত্তন রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে আলিঙ্গন করিলেন। এই আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ বিকশিত হইলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা, [illegible] হইতে শ্রীকৃষ্ণ দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' এবং বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কাগজ 'অবোধ বন্ধু' পত্রিকায়, প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাঁহার গদ্যরচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভার সমালোচনা' ও 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রথম বাহির হইয়াছিল। 'জ্ঞানাঙ্কুরে' যে বীণা বাজিয়াছিল তাহা আর বন্ধ হইল না, আজও তাহা মধুরতর হইয়া মহিমাময় হইয়া

ঝঙ্কার দিতেছে। ইহার পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় "ভারতী" প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন ইহার নির্দ্দিষ্ট লেখকদের একজন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ষোল বৎসর। রবীন্দ্রনাথের "মেঘনাদবধ সমালোচনা" এই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ সমালোচকের বিরুদ্ধবাদিতার সহিত একমত না হওয়ায় পাদটীকায় নানাবিধ মন্তব্য করিয়াছেন। ইহাতেও রবীন্দ্রনাথের অব্যাহতি হয় নাই। যোগেন্দ্রনাথ চূড়ামণি "ভারতী ও মেঘনাদ বধ" নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় প্রতিবাদ ও আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। প্রথম বৎসরে শ্রাবণ ১২৮৪ হইতে "ভারতী" পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের দুইটি প্রবন্ধ, দ্বাবিংশতিটি কবিতা, ছয়টি সমালোচনা, প্রথম উপন্যাস "করুণা"র কিয়দংশ, "ভিখারিণী" নামক বড় গল্প ও "কবিকাহিনী" কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ঐ পত্রিকার "সম্পাদকীয় বৈঠক"এ তাঁহার অনেকগুলি সঙ্কলন ও রচনা প্রকাশিত হয়। কবির পুস্তকাকারে মুদ্রিত প্রথম রচনা সম্বন্ধে কেহ বলেন 'কাল মৃগয়া গীতিনাট্য', কেহ বলেন "বনফুল" কাব্য উপন্যাস, কিন্তু কবি নিজে বলেন যে যখন তিনি আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ছিলেন, তখন তাঁহার কোন বন্ধু প্রথম বৎসরের 'ভারতী' হইতে "কবি-কাহিনী" পুনর্মুদ্রিত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহা ১৯৩৫ সংবৎ বা ১২৮৫ সালের কথা। এই বন্ধুর নাম প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। পুস্তকাকারে মুদ্রিত ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। ইহার পূর্ব্বে কবির রচিত কবিতা "ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ", চৈত্রমেলার প্রকাশ্য সভায় তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পঠিত হয়, এবং চৈত্রমেলার উপহাররূপে আর একটি লম্বা কবিতা তাঁহার নামে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল। কবির প্রথম উপন্যাস "করুণা" কোনও দিন সম্পূর্ণ না হওয়ায়, মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। কবির দ্বিতীয় পুস্তক "বনফুল" কাব্যোপন্যাস ১২৮৬ সালে "জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া তাঁহার অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

হইয়াছিল। সাধারণে জানে, সোমেন্দ্রনাথ বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। আমরা তাঁহার একটি গীত কবির ভাগ্নী সরলাদেবীর "শতগান" (পৃঃ ২০৩) হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ললিত—আড়াঠেকা

[সুর—হিন্দুস্থানী—]

দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার
তরঙ্গ সে কিছু নয় আতঙ্কই সার।
অসীমের ভাব যত হৃদয়ে আনিবে তত
ক্ষুদ্র তৃণটির মত দেখিবে সংসার।
কম ঝড় বয়ে যাবে হৃদয় অটল রবে
কি ভয় কি ভয় তবে ?
অতিক্রমি দুঃখ শোকে অনন্ত অনন্ত লোকে
নিরখিবে অনন্তের মহিমা অপার।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্যভাবধারার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়া স্নেহরসে অভিষিক্ত থাকায়, তাঁহার সাহিত্য জীবনের প্রথম উন্মেষ হয়, ও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার রচনাবলীকে এক-প্রকার "পারিবারিক সাহিত্য" বলিয়া আখ্যা দিলে অলেহ্য হয় না। এই প্রতিভা বিকাশের দ্বিতীয় স্তর আমরা পরে দেখাইতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুবক রবীন্দ্রনাথ

আমেদাবাদে অবস্থান কালে কবির ইংরাজি শিক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। তিনি ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার ভাব অবলম্বনে বাংলা রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন যশের কিরীট মাথায় ধারণ করিয়া বাণীকুঞ্জে বিচরণ করিবেন, তখন অনেকেই তাহা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু "কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম", স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের এই গর্ব্বিত বাণী, সম্পূর্ণ ভাবে সার্থক করিয়া রবীন্দ্রনাথ আজ যে বিশ্ববরেণ্য বিশ্বের গুরু হইয়াছেন, তাহা অদৃষ্টদেবতা আপনার পেটিকার মধ্যেই গুপ্ত রাখিয়াছিলেন,—মানুষে তাহা তখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। কাজেই রবীন্দ্রনাথ আর মানুষ হইলেন না, অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার আয়ত্ব হইল না। এই চিন্তায় বিব্রত হইয়া আত্মীয় সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ব্যারিষ্টার করিবার জন্য বিলাতে পাঠাইলেন। মাত্র সতের বৎসর বয়সে, ইংরাজি ১৮৭৮ সালে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে "পূণা" নামক জাহাজে বিলাতে যাত্রা করেন। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী তখন ছেলে মেয়েদের সহিত ইংলণ্ডে ব্রাইটন অঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেইখানে আশ্রয় লইলেন, এবং সেখানকার পাবলিক স্কুলে অর্থাৎ এদেশীয় উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। সেখানকার অধ্যক্ষ প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "What a splendid head you have!" 'তোমার মাথাটি কি সুন্দর'। বহিরাকারে ও চোখ মুখের ভাবেই

শিক্ষকের মনে আশার সঞ্চার হয়, কারণ বুদ্ধির পরীক্ষার তখনও কোন সুযোগ ঘটে নাই। সে বিদ্যালয়ে থাকিয়া তাঁহার কিন্তু, বিশেষ ফলপ্রসূ শিক্ষালাভ ঘটিল না। মিষ্টার তারকনাথ পালিত (পরে সার তারকনাথ) তাঁহাকে লণ্ডনে লইয়া আসিলেন। তাঁহার ল্যাটিন শিক্ষকের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বাড়ীতে দুই তিন জন শিক্ষকের নিকট পড়িয়া লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র হইলেন। সেখানে তাঁহার গুরুদের মধ্যে ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-অন্যতম মর্লি (Morley) ভ্রাতৃদ্বয়, জন ও হেন্‌রি। জন মর্লি, পরবর্ত্তী-কালে লর্ড মর্লি নামে বিলাতীয় ভারত-সচিব হইয়াছিলেন। তাহার পর রবীন্দ্রনাথ প্রফেসার বার্কারের পরিবারে ও ডাক্তার স্কটের পরিবারে কিছু-দিন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। সাহিত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় সঙ্গীত শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন মানসে, বিলাতের তৎকালীন বিখ্যাত রাজনীতিক বক্তা ব্রাইট্ ও গ্লাড্‌ষ্টোন্ সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে, রবীন্দ্রনাথ পার্লামেন্টের হাউস-অব-কমন্স্ সভার অধিবেশনগুলিতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকিতেন। আর সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুস্তকাগার ও চিত্রশালার অন্যতম, বৃটিশ ম্যুজিয়ামে (British Museum) গ্রন্থপাঠাদিতে রত থাকা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। লণ্ডনে অবস্থান কালেই 'ভারতীতে' 'ভগ্ন-তরী' নামক একটি কবিতা ও 'ইয়োরোপ-প্রবাসীর পত্র' নামে কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হয়। যে চিঠি সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথের এতটা প্রসিদ্ধি, এই তাহার সূত্রপাত। ইয়োরোপ প্রবাসীর পত্রে তিনি বিলাত ও ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করিতেন, সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ পাদটীকায় তাহার সমালোচনা করিতেন; রবীন্দ্রনাথ আবার তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে [illegible] সহিত তাঁহার কিছুদিন উত্তর কাটাকাটি চলিয়াছিল।

লণ্ডনে তারকনাথ পালিতের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত

তাঁহার আলাপ হয়। লোকেন্দ্র তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন ও I. C. S. পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ভারতে ফেরেন। এই আলাপ ক্রমে গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। 'লোকেনে'র জীবিতকাল পর্য্যন্ত সে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। দেড় বৎসর পরেই সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী দেশে ফিরিলেন; মহর্ষির আদেশে রবীন্দ্রনাথকে সেই সঙ্গে ফিরিতে হইল। তাঁহার আর ব্যারিষ্টার হওয়া হইল না। বিলাত প্রবাসের ফলে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি ভাষা আয়ত্ব করিলেন, আর শিখিলেন ইংরাজি গান ও ইংরাজি চাল চলন। দেশে আসিয়া "বাল্মিকী প্রতিভা" ও "কাল মৃগয়া" লিখিত ও অভিনীত হইল। কবি স্বীকার করিয়াছেন, এই রচনায় তিনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর ভাব ও ভাষা অনুসরণ করিয়াছেন। তবে—

"এত' রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী"

আমাদিগকে পাঁচালীর বুনিয়াদই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইংরাজির সুর ভাঙ্গিয়া বাংলা গান, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহু পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ এই 'বাল্মিকী প্রতিভায়' প্রথম অন্তর্নিবিষ্ট করেন। "বিদ্বজ্জন সমাগমের" (পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য) এক সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ বাল্মিকীর ভূমিকা অভিনয় করেন। তাহাতে প্রমাণিত হইল যে, রবীন্দ্রনাথ একজন ভাল অভিনেতা। সে অভিনয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের নামই 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত বিদ্বজ্জন সমাগমের বিবরণীতে পাওয়া যায় (পরিশিষ্ট গ২ দ্রষ্টব্য)। অভিনয় যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ডাক্তার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিনয় দেখিয়া নূতন অভিনেতাকে একটি গানে অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়াতে কবির দেশবাসী কলিকাতা টাউনহলে যে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন, সেই সভায় স্যার

গুরুদাস তাঁহার সেই বহুকাল পূর্ব্বে রচিত গানটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর।
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হ'লো হের
উঠেছে নবীন 'রবি' নব জগতের ছবি ,
নব 'বাল্মিকী প্রতিভা', দেখাইতে পুনর্ব্বার।
হের তাহে প্রাণ ভরে, সুখ তৃষ্ণা যাবে দূরে।
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি পাবে শান্তি অনিবার।
"মনিময়" "ধূলিরাশি" খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর।"

ঠাকুরবাড়ীতে এই 'বাল্মিকী প্রতিভার' অভিনয় বহুবার হইয়াছে। সকল অভিনয়েই অন্যান্য ভূমিকার পরিবর্ত্তন হইলেও, বাল্মিকী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও দস্যুসর্দ্দার ছিলেন অক্ষয় মজুমদার। বিদ্বজ্জন সমাগমের শেষ সম্মিলনীতে এই বাল্মীকির ভূমিকা লইয়া নাট্যমঞ্চে কবি সাধারণের সম্মুখে প্রথম দেখা দিলেও ইহাই কবির প্রথম অভিনয় নয়। তাহার বহু পূর্ব্বে (১৮৭৬ ?) তিনি আত্মীয়দের সম্মুখে বাটিতে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "মানময়ীতে" 'মদনের' ভূমিকা এবং 'বিবাহ উৎসব' গীতি-নাট্যে একটি স্ত্রী-ভূমিকা (১৮৭৭ ?) ও "এমন কর্ম্ম আর করব না" প্রহসনে 'অলীক বাবুর' ভূমিকা অভিনয় করেন (১৮৭৭)।

'মানময়ীর' পরিচয় আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। ইহা কয়েক বৎসর পরে মুদ্রিত হয়। এই গীতি-নাট্যে কবির সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ইন্দ্রের ভূমিকা এবং তৎপত্নী নীপময়ী দেবী শচীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই বাড়ীর মেয়েদের লইয়া প্রথম অভিনয়। ইহার পূর্ব্বে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ কমিটি অফ্ ফাইভের উদ্যোগে আমোদের মধ্যে যে 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতার' অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে পুরুষেরাই স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারীর মাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কমিটি অফ্ ফাইভ বা পঞ্চজনার সভার সদস্য ছিলেন,—১। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪। অক্ষয়-কুমার চৌধুরী এবং ৫। কৃষ্ণবিহারী সেন। তাহার পর গণেন্দ্রনাথ প্রমুখ 'বড়'-র দলের উদ্যোগে 'নব নাটক' যখন অভিনীত হইয়াছিল (১৮৬৭ ইং সাল), তখনও পুরুষেরা স্ত্রী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বহু বৎসর পরে 'মানময়ী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে 'পুনর্বসন্ত' নামে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে' 'ভারত সঙ্গীত সমাজে' অভিনীত হয়। 'বিবাহ-উৎসব' কোনও দিন মুদ্রিত হয় নাই। ইহাতে 'কবির গানে'র আদর্শ। বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে কতকগুলি গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বাড়ীর এক বিবাহ উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বিবাহের সপক্ষদলের একটি স্ত্রী-ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে পুরাণের বিখ্যাত রম্ভাশুক সংবাদ আমাদের মনে পড়ে। আজন্মবিরাগী শুকদেব যখন পিতা ব্যাসদেবের অনুরোধেও বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতে অসম্মত হইলেন, তখন শুকদেবকে বুঝাইয়া বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য ব্যাসদেব অপ্সরী-কুলশ্রেষ্ঠা স্বর্বেশ্যা রম্ভার শরণাপন্ন হইলেন। তখন রম্ভা নানাবিধ বিলাস-সম্ভোগের বর্ণনা করিয়া শুকদেবকে বিবাহে সম্মত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুকদেব নিবৃত্তি-মার্গীর যুক্তিশৃঙ্খলার দ্বারা রম্ভাকে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করেন। এই সওয়াল জবাবে রম্ভার [illegible] নিষ্ফল হয় এবং শুকদেব চিরকুমার রহিয়া যান। আদিরস ও শান্তিরসের যুগপৎ সমাবেশে যে গঙ্গাযমুনার যুগলধারার, সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত রসসাহিত্যে অতুলনীয়। 'এমন কর্ম্ম আর করব না'-র পরে [illegible] হয় 'অলীক বাবু'। এই প্রহসনে জোড়াসাঁকো বাড়ীর অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের একজন সহযোগী অভিনেতা ছিলেন তাঁহার বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, 'সত্যসিন্ধুর' ভূমিকায়।

বিলাত হইতে ফিরিবার পরে ২০ বৎসর বয়সে "ভগ্নহৃদয়" প্রকাশিত

হইল। বিলাতে ইহার আরম্ভ। তুষারধবলা শ্বেত-দ্বীপবাসিনী রমণী-কুলের মাঝখানে পড়িয়া কবির হৃদয় হাবুডুবু খাইয়াছিল কি না, বলিতে পারা যায় না, তবে হৃদয়টাকে লইয়া এমনভাবে নাড়াচাড়া করা জিনিষটাই বিলাতী।

হেমচন্দ্রের—

'কার ধন কারে দিলি সে আমার হলো না
তারে যে পাবার নয়
তবু কেন মনে হয়
জ্বলিল যে শোকানল
কেমনে নিভাইরে—'

তারপর নবীনচন্দ্রের—

'দেখিলাম উন্মাদিনী গলায় আমার'

তারপর ঈশানচন্দ্রের—

'হেথা পাপ পুণ্য নাই, স্বর্গমর্ত্ত এক ঠাঁই,
অনর্গল প্রেমিকের যুগল পরাণ,
তাই, প্রেমে প্রতিদান না পাইলে ব্যবস্থা,—
"স্মৃতি কিম্বা হৃৎপিণ্ড কর উৎপাটন"

পর্দ্দায় পর্দ্দায় মধ্যমে উঠিয়া আসর একরকম গরম করিয়াই রাখিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পঞ্চমে সুর চড়াইয়া গাহিলেন—

"কি হল আমার বুঝিবা সখী হৃদয় আমার হারিয়েছি।
একদা প্রভাতে, ভানুর প্রভাতে, মন লয়ে সখী গেছিনু বেড়াতে
মন ছড়াইতে, মন কুড়াইতে, মন ফুল দলি চলিয়া যেতে

* * * * *

সহসা সজনী চেতনা পেয়ে, সহসা সজনী দেখিনু চেয়ে
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝে হৃদয় আমার হারিয়েছি।"

হৃদয় লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলা আর কেহ কখনও খেলে নাই।

লোকে বইখানি দেখিল, পড়িল, মজিল। মনে কেমন একটা অতৃপ্ত উদ্দাম আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিল :—কি যেন কি নাই, কি যেন হারাইয়াছে, কি যেন না পাইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে, আশা আকাঙ্খাজনিত এই-রূপ একটা ভাবই মনের ভিতর খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা পরলোকগত বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বইখানি পড়িয়া নিজ মন্ত্রীকে পাঠাইয়া কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কবিত্ব হিসাবে ইহার মূল্য যাহাই থাক, এই মন ছড়ান, মন কুড়ান ব্যাপার ভারতের ভাবধারার সহিত মিল খায় না ; মূলে এ ভাবটাই বিদেশী আর ছলনাময়। কবি, বোধ হয়, পরে তাহা বুঝিয়াছিলেন। গ্রন্থখানির আর দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই। পরে কিন্তু দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ এই অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য করিয়াছেন।

"চলেছে ভেসে মিলন-আশা তরী
অনাদি স্রোত বেয়ে
কতকালের কুসুম উঠে ভ'রি
বরণ ডালি ছেয়ে।"

এই পুস্তক প্রকাশের পর যুবক মহলে, ছাত্র মহলে, রবীন্দ্রনাথের নাম পড়িয়া গেল। তিনি বাংলার "শেলী" হইলেন—তাঁহার বেশ, তাঁহার কেশ, তাঁহার চসমা সবই অনুকৃত হইতে লাগিল। তাহাই ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইল। আকাশে বাতাসে তখন 'রবিবাবু', কাব্যে এলো নূতন ছন্দ, উদাস ভাব। ক্রমে ১২৮৮ সালে "সন্ধ্যা সঙ্গীত" প্রকাশিত হয়। গদ্যে তখন রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে "বিবিধ প্রসঙ্গ" ও "বৌঠাকুরাণীর হাট" লিখিতেছিলেন। "সন্ধ্যা সঙ্গীতে" কবির নিজের সুর প্রথম ফুটিয়া উঠিল। এলো মেলো ছন্দে অসম্পূর্ণ প্রকাশ এবং ভাবুকতার বাড়াবাড়ি থাকিলেও তাহা অনুকরণ নয়। ১২৯০ সালে "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" ও "প্রভাত সঙ্গীত" প্রকাশিত হইল।

নবছন্দে নবভাবে বঙ্গসাহিত্য ভরপুর হইয়া উঠিল। পিশুন-বৃত্তি

সমালোচকদল গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এ সব অস্পষ্ট, ভাষা বোঝা যায় না—এ চালবে না—এ কাব্য নয়—এ 'কাব্যি'।" কাব্যের শব্দগুলা কিন্তু সবই বাংলা ভাষায়, দেখিলে বাংলা অভিধানে সবই পাওয়া যাইতে পারিত।

প্রতিভাও উদ্বোধনের অপেক্ষা রাখে। বাটিতে পূর্ব্বোল্লিখিত তাঁহার নতুন-বৌঠান, স্বপ্ন প্রয়াণের কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও নতুনদাদা, তাঁহার দিদি স্বর্ণকুমারী ব্যতীত রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বয়সে উদ্বোধিত করেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী।

বঙ্গসাহিত্যের আর এক নব জাগরণের প্রভাত-আলোকে যে কলকণ্ঠ বিহগকুলের কাকলিতে ভারতী কুঞ্জ মুখরিত হইয়াছিল, তাহার অগ্রণী ছিলেন "সারদা মঙ্গলের" কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া যে নবীন যাত্রীরা সাহিত্যক্ষেত্রে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই দলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, 'এষার' কবি অক্ষয় কুমার বড়াল, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং কবিগুরু বিহারীলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু। হাওড়া জিলার আন্দুলে ইহার নিবাস। এম, এ, বি, এল, পাস করিয়া হাইকোর্টের এটর্ণী হন। কিন্তু বাস্তব জগতের আদালতের কাজ অপেক্ষা কল্পরাজ্যে কাব্য রচনা ও চিত্রশিল্প তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিয়া ছিলেন :—

অক্ষয় ভাইটি আমার,

'‘বনের পাখী বনে এলে
গান গায় প্রাণ ঢেলে
তাহার কি কর্ম্ম, থাকা আদালত-পিঞ্জরে ?
বসন্তের সহকার
মুক্তবায়ু প্রাণ যার

অবরুদ্ধ কারাগারে, সে কি কভু মুঞ্জরে ?
তোমার কি সাজে সখা আদালত-পিঞ্জরে ?"

ইংরাজি কাব্য সাহিত্যে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বঙ্গ-সাহিত্যেও তাঁহার অনুরাগ কম ছিল না, এবং তাঁহার লেখনী রস-বিকাশেও সফলতা লাভ করিয়াছিল। কবিতায় "আর্য্য ইতিহাস" রচনায় এবং নানাবিধ সঙ্গীত রচনায় এবং "উদাসিনী" কাব্যে ইঁহার পদলালিত্য ও কল্পনাশক্তি সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গতের সুরে সঙ্গীত রচনায় অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন। তাঁহার একখানি পত্রের উত্তরে তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথ একবার লেখেন,

"অতএব নমঃ নমঃ
অধম অক্ষমে ক্ষম
ভঙ্গ আমি দিনু ছন্দরণে
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে
কল্পনার ঘোড় দৌড়ে
কে বল পারিবে তোমা সনে।"

এখন রবীন্দ্রনাথ 'ভারতীতে' 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে' গাহিলেন—

"জগৎ দেখিতে হইব বাহির,
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে!
আমি ঢালিব করুণা ধারা,
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ কারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

*   *   *

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
নব নব দেশে বারতা লইয়া

হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান ;
যত দেব প্রাণ
বহে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে,
এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে,
এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর !"

তখন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী "অভিমানিনী নির্ঝরিণীর" প্রাণের ব্যথা বুঝিয়া ভারতীতে লিখিলেন—

"মহান্ জলধিজলে, প্রাণ ঢেলে দিব বলে
সুদূর পর্ব্বত হোতে আসিনু বহিয়া,
পুরাতে প্রেমের সাধ, না গণিয়া পরমাদ
কত বাধা, কত বিঘ্ন—দাপটে ঠেলিয়া
এইত সাগর জলে মিশিনু আসিয়া !
কিন্তু—কিন্তু—তবে কেন, আশায় নিরাশা হেন,
কিছুই আশার মত হ'ল না ত হায়,—
যাহার আশ্রয় পেলে, থাকিব রে হেসে খেলে
কই রে ! সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়।

*　　　　*

পর্ব্বতে মায়ের কোলে ছিনু যবে শিশুকালে
কে জানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ,
হ'ল সার অশ্রুঢালা, নিরাশ মরম-জ্বালা,
দিবা নিশি কুলু কুলু আকুল বিলাপ !

তবে কি মায়ের কোলে উজানে যাইব চ'লে
সুখ সাধ সুখ আশা করি বিসর্জ্জন,
সহিতে পারি না আর প্রণয়েতে অত্যাচার
মরমে ঢাকে না আর জলন্ত যাতন।

অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাহিত্য-সহচর ছিলেন। প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইঁহার সহিত কাব্যশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। পুরাতন কবির অনুকৃতি করিয়া ইংরাজ বালক-কবি চ্যাটার্টনের (Chatterton) রচনার কথা অক্ষয়চন্দ্রের নিকট শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের ভাষায় কাব্য লিখিতে মনস্থ করেন। "ভানুসিংহের পদাবলী" রচিত হইল। এই 'ভানুসিংহ' লইয়া একটি কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অধ্যাপক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্ম্মানীতে ছিলেন। সেখানে তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত এদেশের কবিদের তুলনা করিয়া একটা নিবন্ধ লেখেন। এই নিবন্ধে 'ভানুসিংহ'কে প্রাচীন পদকর্ত্তা বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। এই নিবন্ধ লিখিয়া তিনি 'ডক্টর' উপাধি পান।

'ভানু' যে 'রবি'র নামান্তর মাত্র তাহা তখনও প্রকাশ পায় নাই। গভীর প্রত্নতত্ত্বালোচনার অনুকরণে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক রচনা "ভানু-সিংহ ঠাকুরের জীবনী" তখনও "নবজীবনে" প্রচারিত হয় নাই। পাঠকদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য নবজীবন ১ম বর্ষ হইতে পরিশিষ্ট ৬-য় উদ্ধৃত হইল। কিন্তু পদাবলী অভ্যস্ত বাঙালীর কানে বৈষ্ণবের বাঁশরী, ঊনবিংশ শতাব্দীর নন্দদুলাল রবীন্দ্রনাথের হাতে ঠিক সুরে বাজিল না।

তিনি পরে গাহিলেন,

"বাঁশরী বাজাতে চাই বাঁশরী বাজিল কই!"

তাঁহার প্রশ্ন উঠিল "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?" রবীন্দ্রনাথ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণব বৈকুণ্ঠেশ্বরকে গান শুনান না। তাঁহার উপাস্য ব্রহ্মের আনন্দ-রস-ঘন-মূর্ত্তি নিত্য-বৃন্দাবনস্থ গোলোকেশ্বর।

রবীন্দ্রনাথ যখন "বঙ্গভাষার লেখকে" নিজের জীবনী লেখেন, তখন নিজেকে তিনি বাঁশরী বলিয়া বর্ণনা করেন, এবং বিভিন্ন ছিদ্র দ্বারা আনন্দের সুরলহরী জগতে প্রচার করা তাঁহার তেমন মনোমত হয় নাই। পরিণত বয়সে কিন্তু তিনি লিখিয়াছেন—

"বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার।
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার॥"

তিনি যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী তাঁহার মধ্য হইতে বহু বিচিত্র সুর বাহির করিতেছেন, এই ভাবে সারা জীবন সাধনা করিয়া কবি শেষে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

বিলাত হইতে ফিরিবার পর প্রসিদ্ধ সাহিত্যসমালোচক ও কবি প্রিয়নাথ সেনের সহিত রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য ঘটে। প্রিয়নাথ সেন তখন ইউরোপীয় সাহিত্যে কৃতবিদ্য। বিখ্যাত গ্রন্থকারদের পুস্তকাবলী সবই তাঁহার অধীত ছিল। "ভগ্নহৃদয়" প্রকাশিত হইলে প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হন। কিন্তু "সন্ধ্যা সঙ্গীত" প্রকাশিত হইবার পর প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। ইনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। আজ বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, তাহার আরম্ভ এইখানে। তখন হইতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে চিরদিনই সজাগ আছেন। নব প্রকাশিত কোন গ্রন্থই তাঁহার [illegible] নাই। ইহার উপর আশুতোষ চৌধুরীর ও লোকেন পালিতের প্র[illegible] রবীন্দ্রনাথের উপর যথেষ্ট ছিল। কিন্তু প্রিয়নাথের মত অত [illegible] বিস্তার কেহই করিতে পারেন নাই। এইখানে আর একটি [illegible] কথাও স্মরণ করিতে হইবে। সে প্রভাব আচার্য্য জগদীশচন্দ্র [illegible] আচার্য্য জগদীশের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অল্প বয়সে হয়, [illegible] হইতেই উভয়েই অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই কবি ও বৈজ্ঞানিকের মিলনে উভয়েই পরস্পরের সাময়িক অবসাদ দূর করিয়া পরস্পরের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া-

ছিলেন। হয়ত এই বৈজ্ঞানিকের সাহচর্য্যের ফলেই রবীন্দ্রনাথ ভাবুক-তার আতিশয্যের মধ্যে আপনাকে ক্রমশঃ সংযত করিয়াছেন। প্রকৃতির আনন্দের মধ্যে তিনি বাস্তবের বেদনা বিস্মৃত হন না, তাঁহার বহু রচনায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এমন কি তাঁহার প্রিয় ঋতু বরষার আনন্দের মধ্যেও তিনি পথবাসী গৃহহারার কথা বলিতে ভুলেন নাই, "হায় পথ-বাসী; হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা।" আর উদ্ভিদের রাজ্যে প্রাণের সাড়া জীবরাজ্যের মত কিনা তাহার সন্ধানে জগদীশচন্দ্র যে একনিষ্ঠ সাধনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও কবির উৎসাহ যে কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন। উত্তরকালে কবির পরিণত বয়সে রবিমণ্ডলীভুক্ত তাঁহার ভক্ত শিষ্য বাংলার ছন্দ-সম্রাট কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবও যে তাঁহার উপর কিছু আসিয়াছিল একথা অস্বীকার করা চলে না।

বলিতে ভুলিয়াছি 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' ও 'প্রভাত সঙ্গীতে'র মাঝখানে আর একবার তাঁহাকে বিলাত যাত্রা করিতে হইয়াছিল—আত্মীয়েরা সেজন্য উঠিয়া পড়িয়া অনুরোধ অনুযোগ করিয়া মহর্ষির অনুমতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, লোকচরিত্রাভিজ্ঞতা, ঘটনা-সমাবেশের পারিপাট্য ও সমস্যা বিশ্লেষণের শক্তির পরিচয় তাঁহার প্রতি পুস্তকেই পাওয়া যায়। তাঁহার বাগ্মিতাও অসাধারণ। কণ্ঠস্বরের এতটা বৈচিত্র্য আমাদের দেশে অতি অল্প বাগ্মীরই আছে।

রবীন্দ্রনাথের স্বর সাধারণতঃ অতি কোমল, মধুর, কিন্তু প্রবন্ধপাঠের সময়ে সেই স্বর মাধুর্য্য না হারাইয়াও যে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ গভীর নাদে পরিণত হইতে পারে তাহা না শুনিলে কেহ অনুমান করিতেও পারেন না। সে সময়ে তাঁহার সেই মৃদু মধুর কণ্ঠস্বর এমন গম্ভীর, এমন ব্যাপক হইয়া উঠে যে কলিকাতা টাউনহলের মত স্থানেও বক্তার কথাগুলি হলের অপর প্রান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সভ্য বলিয়া অভিহিত পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি সাদর আহ্বান

পাইয়াছেন, এবং সকল দেশেই তাঁহার এই অসামান্য শক্তি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যদি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ক্রোড়পতি হইতে পারিতেন, কিন্তু ভাগ্য-বিধাতা চন্দ্রমাধব ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে লইয়া যে খেলা খেলিয়া-ছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে লইয়াও সেই খেলাই খেলিলেন; মান্দ্রাজ হইতে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। মহর্ষি যে ইহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না বরং ভগবানের আদেশ বলিয়াই ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইবার বিলাতযাত্রার পথে আশুতোষ চৌধুরীর সহিত রবীন্দ্রনাথের আলাপ হয়। এ যাত্রায় ইহাই পরম লাভ।

মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রবীন্দ্রনাথ অবাধে নিরঙ্কুশ অবস্থায় কাব্যালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। যে সকল মাসিক পত্রের একটু নাম হইয়াছিল, তাহারাই রবীন্দ্রনাথের রচনা বক্ষে ধারণ করিতে যত্নবান ছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত এক স্থানেই থাকিতেন, চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানে, কলিকাতায় সদর ষ্ট্রীটে, দার্জ্জিলিঙে, সর্ব্বত্রই রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রের সহচর ছিলেন। কিছুদিন এইরূপে কাটাইয়া রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই অঞ্চলে কারোয়ারে সত্যেন্দ্রনাথের নিকট চলিয়া গেলেন। এইখানে "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখিত হয়। "সন্ধ্যা সঙ্গীতে" "প্রভাত সঙ্গীতে" আনন্দের জন্য, সৌন্দর্য্যের জন্য কবির একটি চঞ্চল আবেগময় আকুল আকাঙ্খারই প্রমাণ পাওয়া যায়। "প্রকৃতির প্রতিশোধে" সসীম অসীমের দ্বন্দ্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে—সসীমও তুচ্ছ নয়—অসীমও পূর্ণ নয়—উভয়ের মিলনেই পূর্ণানন্দ। ভাবরাজ্যে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় এই কথাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সকল কাব্যের ও কবিতার উদ্দেশ্য বা নির্দ্দেশ বোধ হয় তাহাই। "প্রকৃতির প্রতিশোধে"র পর 'ছবি ও গান' (১২৯০) ও 'কড়ি ও কোমল' (১২৯২) প্রকাশিত

হইল। কড়ি ও কোমল প্রকাশের পর "কাব্যি" সমালোচকদল অন্তর্হিত হইলেন। কেবল 'রাহু' এ কাব্য হইতে মধু সঞ্চয়ে বঞ্চিত হইয়া মক্ষিকার মত দুচারিটা ব্রণ খুঁজিয়া বাহির করিয়া—

"উড়িসনে রে পায়রা কবি,
খোপের ভিতর থাক ঢাকা।
তোর বক্ বকামি ফোঁস্ ফোঁসানি,
তাও কবিত্বের ভাব মাখা।
তাও ছাপালি গ্রন্থ হল,
নগদ মূল্য এক টাকা।"

বলিয়া গম্ভীর ভাবে উপদেশ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সকল সমালোচনায় নিরুত্তর থাকিতেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রচনায় সিদ্ধহস্ত হইয়াও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সাহিত্য ব্যক্তিগত বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের প্রশ্রয় দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কেবল তাঁহার 'দামু বোস ও চামু বোস' ইহার ব্যতিক্রম। তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতে তাহাও কিন্তু শেষে পরিত্যক্তা হইয়াছিল।

এই সময়েই (১২৯৬ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথের নাটক 'রাজা ও রাণী' প্রকাশিত হয় এবং কলিকাতায় বিজ্জাতলায় সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে সস্ত্রীক সত্যেন্দ্রনাথ, সস্ত্রীক রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মিলিয়া বাটিস্থ মহিলাদের লইয়া অভিনয় করেন। এ অভিনয়ের প্রশংসায় কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশীয় নাটকীয় ভাবের ও অনুভূতির তীব্রতায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন হরণ করিল, কিন্তু তাহার মধ্যে জাঁকজমকহীন অনাবিল বাঙ্গালী-জীবনের সারল্যের ভাবে দুখানি গান মনোরম হইয়াছিল তাহা আমাদের প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী ও খাঁটি দেশীয় সঙ্গীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে বন মাঝে কি মন মাঝে" প্রাচীন পদকর্তার ভাবে হুবহু পঠিত। দ্বিতীয়খানি কাঠুরিয়া সাজিয়া হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভাস সুরে গান করেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা স্বনামধন্য প্রতিভা সুন্দরীর

মত খুব মিষ্টকণ্ঠ না হইলেও সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং ইংরাজি সঙ্গীতে অভিজ্ঞ ছিলেন। এ অভিনয়ে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয় প্রতিভা ও ইন্দিরা নামিয়াছিলেন, তখনও ইন্দিরাদেবী কুমারী আর প্রতিভা দেবী কিছুদিন হইল তরুণ ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরীর গৃহিনী হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত আশু চৌধুরীর সহোদর প্রমথনাথ, যিনি পরে ইন্দিরা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক স্বনামধন্য "বীরবল" বলিয়া পরিচিত হন, এ অভিনয়ে কুমার সেনের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার মাথা ও মুখের আদর্শে মোমের একটি অবিকল মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া রঙ্গমঞ্চে একটি আধারে করিয়া রক্তাক্ত কাটামুণ্ড উপস্থিত করা হয়। দর্শকদের এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে একটা থ্রিলের (thrill) সঞ্চার হয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে। আমরা যে গানটির কথা বলিতেছিলাম, তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অগ্রে দিয়া পরে প্রাচীনতর কবির ভাষায় দিব। ভাবগত সাদৃশ্য বড়ই মধুর।—

"বঁধু তোমায় ক'রব রাজা তরুতলে
বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে
সিংহাসনে বসাইতে হৃদয়খানি দেব পেতে
অভিষেক ক'রব তোমায় আঁখি জলে।"

(রাজা ও রাণী ৫ম অঙ্ক ৬ষ্ঠ দৃশ্য [illegible] পৃঃ

সন ১৩১২ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পল্লীসাহিত্যে 'মধুমালার গান' প্রবন্ধে দেখা যায়।

"বঁধু তোমায় করবো রাজা বসে তরুতলে।
চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে॥
বন ফুলের মালা গেঁথে দেবো তোর গলে ;
সিংহাসনে বসাইতে দিব এই হৃদয় পেতে,
পিরিতি মরম মধু দিব তোরে খেতে
বিচ্ছেদেরে বেঁধে এনে ফে'লবো পায়ের তলে
মাণিক আর [illegible] ডালে।"

পল্লী-কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস পল্লীবাতাসেই লয় পায়, কিন্তু এ সেবাভাব বাঙালীর যে মজ্জাগত ছিল, তাহা অভিজাত সম্প্রদায়ের মুকুটমণি সহরের বিলাসমগ্ন 'নিধু বাবু'র লেখনীতে আরও সংক্ষেপে সরলতা ও বিনয়ের সহিত প্রকাশিত হয়—

"যেও যেও প্রাণনাথো
প্রেম নিমন্ত্রণ!
নয়ন জলে স্নান করাব
কেশেতে মুছাব চরণ॥"

পর বৎসরে 'বিসর্জ্জন' রচিত ও প্রকাশিত হয়। এখানিও পার্ক ষ্ট্রীটে সত্যেন্দ্রভবনে পরিবারস্থ মহিলা-পুরুষ সহযোগে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে 'রঘুপতির' ভূমিকা লইলেন। সে অভিনয় অভূতপূর্ব্ব। দর্শকদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

কবির পরবর্ত্তী গ্রন্থ 'মানসী' যখন প্রকাশিত হয়, তখন কবির জীবনে ভাবুকতার আতিশয্য চলিতেছে। পশ্চিম অঞ্চলের কোনও স্থানে নিজের আদর্শের অনুরূপ একটি কবিকুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া তিনি নিভৃতে দিন যাপন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে গাজিপুরে কিছুদিন ছিলেন এবং সেখানে একটি বাটিও ক্রয় করেন। 'মানসীর' অধিকাংশ কবিতা ও 'গোলাপছড়ি' গল্প গাজিপুরে লিখিত হয়। গাজিপুর হইতে কবি ফিরিয়া আসিলেন, কবিকুঞ্জ আর হইল না। সে বাড়িখানি তাঁহার ভাগিনেয় অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়কে বসবাসের জন্য দান করেন। কলিকাতায় আসিয়া গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া গো-শকটে পেশোয়ার পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল ভ্রমণে বাহির হইবার সংকল্প কবি করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় এই সময়ে জমিদারী দেখা রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে আসিয়া জুটিল। আমরা সে সব কথা পরে বলিব।

এই সময় শশধর তর্কচূড়ামণি ও পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন কলিকাতায় আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধাকর্ষণকল্পে

হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্বলিত বক্তৃতা আরম্ভ করেন। "বঙ্গবাসী" পত্রিকা সে সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। সে ভাবতরঙ্গ কলিকাতা ছাইয়া ফেলিল। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—"নবজীবন" ও "প্রচার" প্রকাশিত হইল। এই ধর্ম্ম লইয়া আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ নীরবে উপভোগ করেন নাই। নব শৃঙ্গোদ্যামে বৃষশিশু অন্ততঃ মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়াও শৃঙ্গ কণ্ডুয়ন উপশমিত করে, রবীন্দ্রনাথের লেখনীও নানাপ্রকারে এই বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়া পড়িল—বঙ্কিম চন্দ্রকেও যে বাদ দেন নাই 'ভারতী' ও 'প্রচারে' তাহার সাক্ষ্য রহিয়া গিয়াছে।

"ছবি ও গান" ও "কড়ি ও কোমলের" মাঝখানে "বালক" জন্মিল। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদকতায় বাড়ীর ছেলে মেয়েদের রচনা অভ্যাসের জন্যই বোধ হয় 'বালক' পত্রিকার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে "মুকুট" নাটক ও "রাজর্ষি" উপন্যাস, "হেঁয়ালী নাট্য", "ভ্রমণ বৃত্তান্ত" ও কিছু গদ্য প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ যে শিশুসাহিত্যের অবতারণা করিলেন—তাহা অপূর্ব্ব অভাবনীয়—সম্পূর্ণ নূতন। তাহারই পরিণতি আমরা 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ' এবং 'সে'-তে দেখিতে পাই। রাজর্ষির আখ্যান ভাগ লইয়া পরে "বিসর্জ্জন" নাটক রচিত হয় ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সিটিটুটের ভাণ্ডার বৃদ্ধি কল্পে প্রথম অভিনীত হয়। [illegible] পরিবারস্থ ব্যক্তিদের লইয়া এই অভিনয়ের আয়োজন [illegible] উদ্দেশ্য লইয়া "বালকের" জন্ম হয় তাহা সিদ্ধ হইল। কিন্তু 'বালক' নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিল না। "ভারতীর" অঙ্কে চাপিয়া [illegible] "ভারতী ও বালক" কিছুকাল একত্র দেখা গেল। অল্পদিন পরে [illegible] দুর্দ্দশা হইল, সে সেখানে থাকিয়া আহার স্বল্পতায় মৃত্যুমুখে [illegible] গেল। মৃতবৎসা "ভারতী" "সাধনায়" মনোনিবেশ করিলেন।

১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথের লেখনীর উপর বহুল ভাবে নির্ভর করিয়া

তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রেরা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকদের কর্ম্মশক্তি লইয়া সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হইয়া, 'সাধনা'র প্রকাশ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশ। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনায়' গদ্য পদ্যের জুড়ি হাঁকাইয়া দিলেন'। "সাধনার" সময়ে কবির রচনা নানাপ্রকারে বিচিত্র। সাময়িক ইংরাজি মাসিক পত্রিকা হইতে সার সঙ্কলন, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, রাজনীতির আলোচনা, সমাজতত্ত্ব, গ্রন্থ সমালোচনা, মাসে মাসে কাব্য ও ছোট গল্প প্রভৃতি বিবিধ রচনা "সাধনায়" প্রকাশিত হইত। একই বৈঠকে নানারূপ বিভিন্ন বিষয় লিখিয়া কেহ যে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছেন, ইহা বোধ হয় ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রেও বড় দেখা যায় না। ইহা ভিন্ন সাপ্তাহিক "হিতবাদী" প্রকাশের সহিতও তাঁহার এই সময়ে সম্বন্ধ ঘটে। সুধু লেখা নয় তিনি একজন ডিরেক্টারও হইয়াছিলেন। কাগজের নামের নীচে যে সংস্কৃত ভাষণ (motto) দেওয়া হইয়াছিল, তাহা দ্বিজেন্দ্রনাথ নির্ব্বাচন করিয়া দেন। তাহার অর্থ, হিতবচন মনোহারী হওয়া দুর্লভ। 'মাব্রুয়াত সত্যমপ্রিয়ম' ধরিয়া থাকিলে কাগজ প্রকাশের সার্থকতা থাকে না। এই "সাধনাতেই" রবীন্দ্রনাথের প্ররোচনায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ "স্বপ্ন প্রয়াণের" চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার প্রতিভা স্বাধীন-বিকাশে পথের সন্ধান পাইল। যে ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী, তাহারও আরম্ভ "হিতবাদী" পত্রিকায় ও "সাধনায়"। ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের আনন্দ আমরা তাঁহার একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু না করে ছোট ছোট গল্প লিখিতে বসি, তা'হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য্য হ'লে বোধ হয় পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। * * * * গল্প লেখার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখিব, তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে। আমার একলা

মনের সঙ্গী হবে। বর্ষার সময় আমার বন্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময়ে পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের উপর বেড়িয়ে বেড়াবে।"

এই সময়ে যথার্থই কবি সাধনার একটা স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে-ছিলেন, এ সময়ের কথা তাঁহার একখানি পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রকৃত পক্ষে তখন আমার সাধনাই ছিল। নৌকার উপরে থাকিতাম। সঙ্গে যে লোক ছিল, সে প্রত্যহ প্রত্যূষে একবাটি ডাল সিদ্ধ করিয়া আমার টেবিলের উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া যাইত। আমি সেই ডাল-টুকু খাইয়া লিখিতে বসিতাম; সমস্ত দিন লিখিতাম। কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ হইত না, অপরাহ্ন পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার সময় খানকতক লুচি খাইতাম, তাহার পর বাহিরে "ইজি" চেয়ারে শয়ন করিতাম; নৌকা নদীর উপর অশ্রান্ত ভাবে চলিতে থাকিত। এক Sitting-এ পঞ্চভূতের ডায়রি, গল্প, কবিতা, অনর্গল লিখিয়া যাইতাম। ক্লান্তি বোধ করিতাম না।"

"পঞ্চভূতের ডায়েরি"—যাহা হোক নূতন জিনিস বটে। এখানে "আরম্ভ সুভায় ভবতি" কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নাই। কেননা—কবির প্রকৃতিই এই

"সখা, শেষ করা কি ভাল
তেল ফুরোবার আগেই আমরা নিভিয়ে দেব আলো।"

(চিরকুমার সভা)

সাধনা অকালে ১৩০২ সালে বন্ধ হইয়া গেল। সাধনার শেষ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদক ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এখন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যশ এখন লোকের মুখে মুখে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর, সাহিত্য-সাম্রাজ্যে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট তাহা লোকে মানিয়া লইয়াছিল। কেহই বা না লইবে?

সাহিত্যে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ—কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গাথা, নাট্য-রহস্য, ছোট গল্প, রঙ্গরস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সকল দিকেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয়—তাঁহার লেখনীস্পর্শে সবই সুন্দর, মনোরম মোহ-মাধুরীযুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অন্য কোন গ্রন্থকার সাহিত্যে এমন করিয়া ভাব সম্পদ ঢালিয়া দেন নাই। নিত্য নূতন জিনিস পাইয়া সাহিত্যে বাঙ্গালির যথার্থ আনন্দের অনুভূতি জন্মিল, নবচিন্তা ধারায় সে ওতঃপ্রোত মশগুল হইয়া গেল। বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া নবরসে উৎসারিত হইয়া নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহার সম্বন্ধেও সে কথা প্রযুজ্য। বঙ্গসাহিত্যে তিনি রথ এবং পথ দুইই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সৃষ্টির আনন্দ নিজের ও পাঠকদের মধ্যে বণ্টন করিয়াছিলেন।

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ, নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসক হইলেও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ রূপের মধ্য দিয়া আনন্দের বিকাশ ঘটাইয়াছেন। তাঁহার নিজের সৃষ্টিতেও নাম রূপের পরিবর্তন ঘটাইয়া আনন্দের রসই পরিবেশন করিতে তিনি ভালবাসেন। তাঁহার "বউঠাকুরাণী" "প্রায়শ্চিত্ত" করিয়া "পরিত্রাণ" লাভ করিল। তাঁহার "মাসী" "ঋণ শোধের" পর "শোধ বোধ" করিয়া দিলেন। তাঁহার যাহা "গোড়ায় গলদ" ছিল তাহাতেই "শেষ রক্ষা" হইল। তাঁহার যৌবনের "রাজা ও রাণী" বৃদ্ধ বয়সে "ভৈরবের" নিকট বলি দিয়া "তপতী" হইল। "অচল আয়তন" গড়িয়া "গুরু" স্থাপিত হইল। বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য যে, কবি দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত করিয়া পরিপক্ক বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে নিজের রচনা সংশোধন করিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

"সাধনা" বন্ধ হইয়া যাইবার পরে রবীন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি সম্পাদন করেন। বঙ্গদর্শন (নবপর্য্যায়) প্রথম নয় বৎসর (১৩০৮-১৩১৬), "ভারতী" ২২ বর্ষ হইতে ২৬ বর্ষ (১৩০৫-১৩০৯) "ভাণ্ডার" (স্বদেশী যুগের ত্রৈমাসিক পত্র, ১৩১২), "তত্ত্ববোধিনী"

পত্রিকা (১৮৩৩-১৮৩৬ : শকাব্দা, ১৩১৮-১৩২১), "সমালোচনি" (১৩০৮), "শান্তিনিকেতন" (১৩২৬), ইংরাজী "বিশ্বভারতীর" কোয়াটারলির প্রথম সংখ্যা (১৩৩০)। এতদ্ভিন্ন "প্রদীপ," "প্রবাসী", "সবুজপত্র" ও সাপ্তাহিক "হিতবাদী" সম্পাদনের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন নবপর্য্যায় "বঙ্গদর্শন" সম্পাদন আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে পরলোকগত প্রভুপাদ বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের সংশ্রবে আসিতে হয়। বঙ্গদর্শনের প্রুফ দেখিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার ভার গোস্বামী মহাশয়ের উপর ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের মত ছিল এই যে, কোনও প্রবন্ধ বা মতবাদ যদি তর্কের সাহায্যে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারা যায় কিম্বা বিচারসহ প্রতিপন্ন করা না যায়, তাহা প্রকাশ করা উচিত নয় এবং কোনও উদ্ধৃত অংশে যদি কোন ভুল থাকে, তাহা হইলে সেটা পত্রিকার গুরুতর কলঙ্ক। কাজেই রবীন্দ্রনাথেরও নিস্তার ছিল না। এমন অনেক দিন ঘটিয়াছে, কবি কোনও স্থান হইতে সন্ধ্যা-বেলায় বা রাত্রিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, গোস্বামী মহাশয় তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। কবির লেখা সম্বন্ধে কবির সহিত আলোচনা না করিয়া মুদ্রণের আদেশ দেওয়া যাইতেছে না। কবিকে অনেক সময় মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত তর্ক করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বুঝাইয়া এবং প্রবন্ধের কোনও কোনও স্থানের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়া এবং উদ্ধৃত অংশগুলি মিলাইয়া কাজ মিটাইতে হইত। এইরূপে প্রতি-রচনায় পরীক্ষা দিয়া কবির শক্তি পুষ্টিলাভ করিত এবং প্রতিবাদের উত্তর দিবার অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তুলিত। কবি বলেন যে গোস্বামী মহাশয়ের সংস্পর্শে তাঁহার রচনায় সতর্কতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৩১০ বঙ্গাব্দে রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁহার কবিতাগুলি "অমৃত-মদিরা" নাম দিয়া প্রকাশকালীন ভূমিকায় সিমুলিয়া নিবাসী সুপণ্ডিত সুরসিক সুহৃদ্বর সখা প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের কার্য্যদক্ষতা ও বিদ্যার উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা :—

"তিনি যে আমার পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন, ইহা তত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; কেননা, সাহিত্য-জগতে ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, হইতেছে ও কামনা করি ভবিষ্যতেও বহু বহু বৎসর ধরিয়া হইতে থাকিবে,—কিন্তু মনে হইল যে, কে আমি, আর আমার এ লেখা থাকিলেই বা কি, গেলেই বা কি ? তবে এ পরিশ্রম তিনি কেন করিলেন ? এ প্রেম,—সাহিত্য না দুর্ব্বল—কাহার প্রতি ? গোস্বামীপাদ বাণীরই হউন আর দীনেরই হউন, আমার হৃদয়ে বরণীয় এবং (পারি যদি) চিরস্মরণীয়। আমার রোগশয্যার পার্শ্বে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরাধিক রাত্রি অতীত করিয়া এই দীন কবিতাগুলিকে গ্রন্থের আকার দিয়াছেন। শুদ্ধ বর্ণাশুদ্ধি-সংশোধন নহে, যেখানে আমার ভাব স্পষ্ট হয় নাই, ভাষার দোষ দৃষ্ট হইয়াছে, অর্থ নষ্টপ্রায় হইবার উপক্রম করিয়াছে,—গোস্বামী মহাশয় বারবার পাঠ করিয়া,—বারবার তাহা আমাকে শুনাইয়া, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচার,—তন্ন তন্ন অনুসন্ধানে, সেই সকল স্থান সুধীসজ্জনের গ্রহণোপযোগী করিয়া লইয়াছেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সঙ্গীতালোচনা

হিন্দু সঙ্গীত-শাস্ত্রানুসারে সঙ্গীত ত্রিধাবিভক্ত—গীত, বাদ্য ও নাট্য। নৃত্য-কলা নাট্যের অন্তর্গত। বাদ্যযন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের কথা আমরা শুনি নাই। নাট্যাভিনয়ে ও গানে তিনি দেশবিদেশে প্রসিদ্ধ। পারিবারিক পরিস্থিতির মধ্যে তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষা, গীত রচনা, সঙ্গীতালোচনা ও অভিনয়ের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।

বিদেশী সঙ্গীত শিখিয়া দেশীয় সঙ্গীতের গুণাগুণ ও উন্নতি সাধনের কথা রবীন্দ্রনাথের মনে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল। তিনি চিরদিন স্বাধীনতার প্রয়াসী—কোনরূপ বন্ধন মানিতে চাহেন না। রাগরাগিনী ও তালের নাগপাশে দেশীয় সঙ্গীতের যে দুশ্ছেদ্য বন্ধন তাহাও তাঁহার প্রীতিকর হইত না। এজন্য অনেক সময়ে তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র হিতেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মতভেদ হইত। তাঁহারা উভয়েই সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া খ্যাত ছিলেন তবে রক্ষণশীল, শাস্ত্রবিধি পালনে তৎপর হওয়ায় রবীন্দ্রকৃত ব্যতিক্রমের অনুমোদন করিতেন না। অশেষ শাস্ত্রবিৎ রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিশেষ ঝোঁক ছিল ক্লাসিক্যাল (Classical) বা ওস্তাদি সঙ্গীতালোচনার দিকে, সুতরাং পথ ও মত ভিন্ন ছিল। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺প্রমোদকুমার ঠাকুর ইউরোপীয় যন্ত্র সঙ্গীতে পারদর্শী হইয়া অনেক গৎ রচনা করেন। তাঁহার একখানি সাঙ্গীতিক স্বরলিপি "নীল-যমুনা-হিল্লোল" "Blue Jumna Waltz" জার্মানীতে বিশেষ আদৃত হয়। তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের সখ্যতা

ছিল ও তাঁহার সঙ্গীতানুভূতির জন্য কবি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। হয়ত তাঁহার অকাল মৃত্যু না হইলে, রবীন্দ্রনাথের মনের বাসনা, দেশীয় সঙ্গীতে পাশ্চাত্য হারমনি ও মেলডির (Harmony and melody) সংমিশ্রণের কল্পনাটা আরও সত্বর ও সুন্দররূপে প্রতিফলিত করিতে পারিতেন। বিলাতে দ্বিতীয়বার যাইবার ঠিক পূর্ব্ব দিনে তিনি মেডিকাল কলেজের হলে বিটন সোসাইটির (Bethune Society) আহ্বানে সঙ্গীত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং নিজে গান গাহিয়া তাঁহার বক্তব্য সভাস্থলে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার ভূমিকা ও উপসংহার অংশ ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সভায় সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উক্ত প্রবন্ধের ও "বন্দে-বাল্মিকী-কোকিলং" বলিয়া প্রবন্ধকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রকাশ্য সভায় রবীন্দ্রনাথের ইহাই প্রথম প্রবন্ধ পাঠ। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতেরও উন্নতি কামনা করিতেছিলেন, ক্রমে কিছুদিন পরে তাঁহার সে সুযোগ মিলিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুণায় গিয়াছিলেন, তথায় তিনি "গায়ন-সমাজ" দেখিয়া আসেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সেইরূপ একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা হয়। কলিকাতার ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নির্দোষ আমোদের মধ্য দিয়া যাহাতে প্রত্যহ অসঙ্কোচ মিলনে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে পারেন, এরূপ একটি সাধারণ মিলন গৃহের অভাব-বোধই তাঁহাকে এ বিষয়ে মনোযোগী করে। বিশেষতঃ রসচর্চ্চার দ্বারা অনেক লোকের অনেক মনের ও কথোপকথনের একটি মানস-মিলনক্ষেত্র জাতির কল্যাণার্থে এ মহানগরীর বাঙ্গালী ভদ্রপল্লিতে সংগঠিত হইয়া স্থায়ী আকারে বর্ত্তমান থাকে তাহারও প্রয়োজন অননুভূত ছিল না। যদিচ ইংরাজি কেতায় ইণ্ডিয়া ক্লাব (India Club) ভারতীয়দের একটি স্বতন্ত্র মেলামেশার স্থান ছিল, তাহার লক্ষ্য ও কার্য্য-

প্রণালী বিভিন্নরূপ ছিল এবং মাসিক চাঁদার হারও মধ্যবিত্তের পক্ষে কিছু অধিক বিবেচিত হইত। সহরের ধনী-গৃহে সঙ্গীত-অভ্যাস, আমোদ-প্রমোদ, ও জমায়েতের কেন্দ্রের জন্ত প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র 'বৈঠকখানা-ঘর' থাকিলেও তাহার কার্য্যকারিতা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। গৃহস্বামীর রুচি অনুসারেই অভ্যাগতদের চলিতে হইত ও আরাম, স্বচ্ছন্দতা, আমোদ ইত্যাদির সকল ব্যয়ই গৃহস্বামীকেই বহন করিতে হইত। শিক্ষিত আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অন্যের দ্বারে উপস্থিত হওয়া, আদর আপ্যায়নের বা সম্ভ্রমের কোনরূপ ত্রুটি না থাকিলেও, কেবল কাল-ক্ষেপণের জন্ত ঘন ঘন যাওয়া গ্লানিকর বোধ হইত। অনেক চেষ্টার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইয়া জোড়াসাঁকোর স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের বহির্বাটীর দোতালার হলে ও পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি কামরা লইয়া "ভারত সঙ্গীত-সমাজ" নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইল। কলিকাতার অভিজাত বংশের যুবক ও মধ্যবয়স্ক অনেকেই আগ্রহের সহিত ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন ও প্রায় নিত্যই সমাজভবনে মিলিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে মিষ্টার এস, পি, সিংহ, মিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ ব্যারিষ্টারবৃন্দ ও বিলাতফেরত ডাক্তাররা অনেকেই ইহার সভ্য হন। সুচারুরূপে কার্য্য আরম্ভ হইল, কিন্তু আমাদের যেমন হয়,—তিনজনে এক সঙ্গে কাজ করিতে পারি না, এ ক্ষেত্রেও দলাদলি আরম্ভ হইয়া শেষে সেটা কেলেঙ্কারীতে পরিণত হইল। সে সকল বিবৃত করিবার স্থান এ নহে। জ্যোতিরিন্দ্র প্রমুখ অনেকেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের অনতিদূরে একটি সমগ্র বাটি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর নামে "লীজ্" লইয়া "ভারত সঙ্গীত-সমাজের" পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অপর দল পূর্ব্বস্থানে "সঙ্গীত সমিতি" নাম দিয়া কিছুদিন তাঁহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিলেন।

সমাজ বাঙালী ভদ্রলোকের 'বৈঠকখানার' আদর্শে "সমাজের" পরিচালনা হইত। সেইজন্ত বিস্তৃত হলে দোতালায়, কুর্শি কেদারা

চেয়ার টেবিল সোফা বর্জ্জিত প্রশস্ত সাদা জাজিম তাকিয়া দেওয়া ফরাস বিছানা ও আলবোলা গড়গড়া পানদান ও গোলদানি ইহার আনুষ্ঠানিক রূপ ধার্য্য হয়। বিলাতি ধরণের ক্লাবের পানভোজনের ও কলেট্ টেবিলের পরিবর্ত্তে আমপাতার নল দেওয়া রূপাবাঁধা হুঁকা ও বৈঠক, পরাতে সজ্জিত সুবাসিত তাম্বুল ও বরফসংযুক্ত জল ও এরেটেড্ পানীয়ের ব্যবস্থা হয়। দেশীয় নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, বিলাতি সচিত্র পত্রিকা-বলী, তাস, দাবা ও পাসা সভ্যদের ব্যবহার ও অবসর বিনোদনের জন্য তথায় রক্ষিত হইত। মধ্যে মধ্যে বৈঠকী গান ও কথকতা দেওয়া হইত। তরুণদিগের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থায় একটি স্বতন্ত্র ঘর ছিল। অধিকন্তু তাঁহাদের অভ্যাস ও শিক্ষার কারণ একখানি ঐকতানের ঘর পিয়ানো, টেবিল-অর্গ্যান, হারমোনিয়ম, বড় বেহালা ইত্যাদিতে সজ্জিত ছিল ও একজন সঙ্গীতাচার্য্য নিযুক্ত ছিলেন। এক ঘরে ক্রীড়ার জন্য সবুজ বনাতমোড়া এক প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ড খেলিবার টেবিল মায় আনুসঙ্গিক সাজসরঞ্জাম ও দর্শকদের জন্য বসিবার বেঞ্চ থাকায়, তাহা প্রায়ই ফাঁক যাইত না। উৎসব উপলক্ষে সে ঘর বন্ধ করিয়া দিতে হইত। প্রাঙ্গণে একটি সুবৃহৎ বাঁধা ষ্টেজ রঙ্গমঞ্চের জন্য ছিল।

কণ্ঠসঙ্গীতে বা যন্ত্রসঙ্গীতে কৃতী বা গুণী কেহ কলিকাতায় আসিলেই যেমন তাঁহাকে সমাজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার কৃতিত্ব দেখিবার সুযোগ সভ্যদের দেওয়া হইত, তেমনিই আনন্দ, শিক্ষা ও সংস্কৃত প্রণালীর অভিনয়ের ব্যবস্থাও হইত।

প্রারম্ভ হইতে রবীন্দ্রনাথ পরম উৎসাহ সহকারে "ভারত-সঙ্গীত-সমাজে" যোগ দিয়াছিলেন। অভিনয়ের সহিত সঙ্গীতের নিত্য সম্বন্ধ। সমাজের সভ্যদিগকে লইয়া অভিনয়ের আয়োজন হইত। কোন মহিলা সভ্য না থাকায় স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করিবার জন্য কয়েকজন বেতনভোগী কিশোর স্থায়ীরূপে প্রতিপালিত হইয়া সমাজের বিশিষ্ট অভিনয়ভঙ্গিতে দীক্ষিত হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সহযোগী সম্পাদকরূপে যেমন সকল

ব্যবস্থা ও আয়ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তেমনি অভিনয়, গীত ও নৃত্য শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। সঙ্গীতচর্চ্চার জন্য "সঙ্গীত প্রকাশিকা" নাম দিয়া স্বরলিপিবহুল একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। সৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত দণ্ড ত্রিকোণ মাত্রিক স্বরলিপি ছাপার অসুবিধা বিধায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক নব প্রণালীর প্রচলন করেন। অদ্যাবধি সুলভ মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য সেই গীতলিপি-পদ্ধতিই ব্যবহৃত হইতেছে। স্বাধীন ত্রিপুরাধীপের ইচ্ছাক্রমে এই পত্রিকাখানি "ভারত-সঙ্গীত-সমাজের" মুখপত্র স্বরূপ চালিত হয় ও ইহার প্রকাশের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহারাজ মাসিক স্বতন্ত্র দানের ব্যবস্থা করেন। সমাজের অনুষ্ঠিত অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত করিতে রবীন্দ্রনাথও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তবে "সঙ্গীত প্রকাশিকায়" সহযোগিতা করা বা সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে বা বক্তব্য জ্ঞাপনে তাঁহার লেখনী তৎকালে বিরত ছিল।

সাধারণের জন্য সমাজগৃহ প্রত্যহ বৈকাল ৪টা হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। অবৈতনিক সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণকে সাহায্য করিবার জন্য উপযুক্ত বেতনদানে কর্ম্মচারীবৃন্দ, পাণ্ডুলিপিলেখক এবং বেহারা দ্বারবান প্রভৃতি ভৃত্যবর্গের বন্দোবস্ত ছিল। কাজেই দিবসেও প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকা হইতে তথায় লোক-সমাগম হইত। কেহ কেহ দৈনিক সংবাদ-পত্র দেখিতে আসিতেন, কর্ত্তৃ-পক্ষেরা কার্য্য পরিদর্শন প্রভৃতি যাবতীয় কাজই ঐ গৃহে করিতেন; ব্যক্তিবিশেষের সম্বর্দ্ধনার জন্য সময়ে সময়ে দস্তুরমত মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্য ভোজের আয়োজন হইত ও তাহা নির্ব্বাহার্থে যথেষ্ট স্থানও ছিল। সময়ে সময়ে মেনুকার্ড মুদ্রণ করা হইত ও বিরাট ভোজ্যতালিকায় ও তাহার লিখনভঙ্গিতে সহরবাসী চমৎকৃত হইয়া যাইত। স্বাধীন ত্রিপুরা-ধিপতি, কুচবেহারের মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, স্যার বঙ্গেশ্বর, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও বাঙ্গলার মফস্বলের জমিদারগণের অনেকেই ইহার সভ্য ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যায় অবকাশ [illegible]

নির্মিত সমাজভবনে পদার্পণ করিতেন ও সাধারণের সহিত সমান ভাবে মিশিতেন। সেদিন তাঁহাদের সম্মানার্থে বিশেষ আয়োজন কিছু হইত না। বিদেশীয় বা কোন ইংরাজের জন্য কখনও অভ্যর্থনার আয়োজন হয় নাই। সকলের মনের ভাবগতি দেখিয়া কেহ সেকথা উত্থাপিত করিতেও সাহসী হইতেন না। বিলাতে নব আবিষ্কার প্রদর্শন করিয়া যখন জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় (পরে স্যার) স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য এক সান্ধ্য আয়োজন ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। অভিনয়ে সময় নিষ্ঠার (Punctuality) জন্য সমাজের সুনাম ছিল, তাহা দীর্ঘ কয় বৎসরের মধ্যে কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বিত্তবান সভ্যদের পক্ষে ইহা কম গৌরবের নহে। রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত কবিতা "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র" এই উপলক্ষে রচিত হয়।

সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের ব্যক্তিরা সখের খাতিরে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অভিনয় করিতেন, কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, তাঁদের মধ্যে অনেকে এমনই ছিলেন যে মাতৃভাষা উচ্চারণ করিতে অনেক সময়ে তাঁহাদের জিহ্বা অস্বীকার করিত, তন্মধ্যে কেহ কেহ বিলাতপ্রত্যাগতও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিপ্রহরে কাহারও কাহারও বাটিতে ও সমাজভবনে গিয়া তাঁহাদের উচ্চারণ সংশোধন করিতেন, আবার সন্ধ্যার পর মিলিত হইয়া তাঁহাদের ভূমিকা পাঠের আবৃত্তি গ্রহণ করিতেন ও আনুসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দিতেন। সেটা প্রকাশ্যভাবে সকলের সমক্ষেই সমাজ-বৈঠকে হইত ও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে মঞ্চোপরি হইত। এইরূপে কিছু-দিন ধরিয়া পরিশ্রম স্বীকারের পর যখন সমাজ জাঁকাইয়া উঠিল, রবীন্দ্র-নাথ তখন ধীরে ধীরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ইহাই কবিসুলভ প্রকৃতি—

জীবন যাত্রা আগে চলে যায় ছুটে—
কালে কালে তার খেলার পুতুল
পিছনে ধুলায় লুটে।

(রবীন্দ্রনাথ কৃত নববর্ষের কার্ডের জন্য লিখিত রচনা)

আমি যখন এই সমাজের সভ্য নির্ব্বাচিত হই, কবিবরের সঙ্গলাভ সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। সমাজের "বিসর্জ্জন" নাটকে রবীন্দ্রনাথ "রঘুপতি" সাজিয়া স্বীয় অভিনয়-খ্যাতি আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন এবং জনসাধারণকে নূতন অভিনয়ভঙ্গীর প্রতি আকৃষ্ট করিলেন। এই সমাজের অভিনয়ার্থ "গোড়ায় গলদ" রচিত হয়। সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথের বহুজনাদৃত সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। কিন্তু স্বর্গীয় অমৃতলাল বসুর স্মৃতিপটে কোন প্রকারে ইহা জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের কৃতিত্ব বলিয়া যে স্থান পাইয়াছিল, তাহা 'অমৃত মদিরায়' আভাস পাই। ইহার একটু কারণ আছে। যে সময়ের অভিনয়ের কথা তিনি বলিতেছেন, তৎকালে মুদ্রিত গ্রন্থ বাহির হয় নাই এবং গ্রন্থকর্ত্তার নামও প্রকাশিত হয় নাই।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি হইতে যথাযথ ভূমিকা শিক্ষা দেওয়া হয়। নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ পুস্তকখানির অভিনয় কালে দেখা গেল যে উহা দীর্ঘ ও অত্যধিক সময়সাপেক্ষ হইয়াছে এবং নাটকীয় রস তেমন জমিল না। তখন রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের ও ক্ষিপ্রতার সহিত উহার আমূল সংশোধন করিলেন। লিখিত অংশের বহু স্থান নির্মম ভাবে কাটিয়া দিলেন। নূতন কথোপকথন সংযোগ ও অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের পরিবর্ত্তন দ্বারা উহাকে যে নূতন রূপ দান করিলেন তাহাতে সকলের মনস্তুষ্টি ও সময়ের সাশ্রয় হইল। সভ্যেরা উৎসাহভরে পুনরায় তাঁহার কাছে শিক্ষা লইতে লাগিলেন ও প্রকাশ্য অভিনয়ে যথাকালে যথেষ্ট যশ লাভ করেন। এক এক দিন শিক্ষাবৈঠকে রিহার্স্যালে (Rehearsal) রাত্রি দেড়টা, দুইটা বাজিয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথ পদব্রজে তখন সংকীর্ণ গলিপথ ধরিয়া কাঁসারিপাড়ার মধ্য দিয়া বাড়ি ফিরিতেন। নিত্য অধিক রাত্রি হওয়ায় মৃদু প্রতিবাদ স্বরূপ একদিন সন্ধ্যায় সভ্যদের সমক্ষে একটি গল্পের অবতারণা করেন ও এমন বাস্তব ভাবে বর্ণনা করেন যে সকলে সচকিত হইয়া উঠে। তিনি বলেন, "কাল রাত্রে ফেরবার সময়

যা মুস্কিলে পড়েছিলাম !" সভ্যেরা বলিয়া উঠেন "কি রকম ? পথে দুর্ঘটনা কিছু হোল না কি ?" তিনি বলেন "না, চোরের মত রাত্তিরে পা টিপে টিপে ত খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকলাম, অস্পষ্ট আলোকে সন্তর্পণে ত উপরে গিয়া চুপি চুপি শোবার ঘরে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিলাম। ঢাকা খুলিয়া খাবারে হাত দিতেই দেখি খাবার ত ঠাণ্ডা, ওদিকে খাটের পরে গিন্নি গরম, কোন প্রকারে ত দুদিক সামলাতে হল।" বলিবার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিয়া উঠিল এবং তদবধি নিত্যই কেহ না কেহ বলিত "ঘড়ির কাঁটা স্মরণ করাইয়া দিচ্ছে খাবার ঠাণ্ডা, গিন্নি গরম।" ইহা একটি ষ্ট্যাণ্ডিং যোক (Standing Joke) হইয়া দাঁড়াইল। কবিও পরিশোধিত নাটকে উহা একস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপ হাস্যোজ্জ্বল অনাবিল রসিকতার উদাহরণ তাঁহার সকল পুস্তকেই তিনি দিয়াছেন ও সৃজন বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। কোথাও তাঁহার পরিহাস-উক্তি হিউমার (Humour), কোথাও অমার্জ্জিত বা মোটা, কোর্স (Coarse) নহে। শিক্ষিত সমাজে ইহার প্রচলনে তিনি বঙ্কিমের পথানুগামী। তাঁহার দৃশ্যকাব্যগুলি সংক্ষিপ্ত আকার, ভাষায় কথার বাঁধুনীতে তীক্ষ্ণ ও প্রবচনে উজ্জ্বল। যাহাতে স্বল্প আয়োজনে অল্প সময়ের মধ্যে অভিনীত হইয়া উচ্চাঙ্গের নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের অনুভূতিতে অধিক আনন্দ বিতরণ করিতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা মনোযোগী। অভিনয়-কেন্দ্রগুলি তাহার মনোহারিত্বের পরীক্ষার স্থল, শিক্ষাকালীন আবশ্যক মত পরিবর্ত্তনের দ্বারা তাহার শেষ রূপ ধার্য্য হয়। সুতরাং সঙ্গীত আলোচনা ক্ষেত্রে তাঁহার নাটকীয় রচনার উৎকর্ষতা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন কতক পরিমাণে, কিন্তু অভিনেতাদের অভিনয়কলার আদর্শ উচ্চতর বোধের অভাবে সহজে কেহ রচনার মাধুর্য্য ফুটাইতে পারেন না। ইহার কথা আমরা পরে বিস্তারিত ভাবে বলিব। আলোচ্য বইখানিতে সমাজের অভিনয় নৈপুণ্যের কথা নটশ্রেষ্ঠ অমৃতলালের ভাষাতে পাঠক সমীপে উপস্থিত করিতেছি :—

"সঙ্গীত-সমাজের নিমন্ত্রণে আর, এস, ভি, পি"—এই আর, এস, ভি, পির অর্থ সাধারণের জন্য একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সকল ইউরোপীয় সামাজিক নিমন্ত্রণের আহ্বানে এই অক্ষর কটি (R. S. V. P.) দেওয়া থাকে ও ভারত-সঙ্গীত-সমাজের নিমন্ত্রণ-কার্ডেও ছাপা হইত। ইহার পূর্ণ আকার হয়, ফরাসী ভাষায়, রেপন্দে সিল্ ভু প্লে (Repondez Sil Vous Plait)। তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সত্বর উত্তর দিতে হয়, তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন কি না, এরূপ প্রথা আছে। ইহাই নিমন্ত্রণগ্রহণের পদ্ধতি ও গৃহস্বামীর প্রতি সৌজন্য বলিয়া পরিগণিত। উপস্থিতে অপারগ হইলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া লেখা একান্ত কর্ত্তব্য। অকস্মাৎ কোন কারণে অনুপস্থিত হইলে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পত্র দ্বারা জানান রীতি। বসুজ মহাশয় চক্ষুর পীড়ায় কাতর থাকায় এই পত্র পাঠাইয়াছিলেন ও সভাস্থলে এই পদ্যটি পঠিত হয়। আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

আবার বসন্ত আসে এবার মকর মাসে
দেবেন সাকার রূপে দেখা সরস্বতী
সমাজের সভ্যগণ আনন্দে উন্মুক্ত মন
সারস্বত-সন্নিধানে দিয়াছেন মতি
বসন্তে বসন্তে যেন ফুটন্ত হৃদয়ে হেন
প্রেমসূত্রে গাঁথা হয় বাণীপুত্র-হার
বসুজ অমৃতলাল পুরিয়া প্রাণের থাল
স্নেহ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা দেয় উপহার
যদি নাহি প্রাণ তার ভেঙ্গে ফেলে কারাগার
ছুটিয়া পালায় এই রোগের জ্বালায়।
হ'লে পুন নিমন্ত্রণ গিয়া গীত-নিকেতন
আসিবে আনন্দ ভরে হৃদয় ডালায়॥

চালিয়া কতই মধু   গিয়াছে সে সন্ধ্যাবধূ
প্রমোদ গীতের তান আজো কানে বাজে
আজো এই স্মৃতিমাঝে   সৌন্দর্য্য বাড়ায়ে লাজে
যামিনী-কামিনী উঁকি মারে সেই সাজে ॥

*   *   *

আবার পালটে পট   কারা এরা নব নট
"জয় জয় ষারবঙ্গ-ভূপতির জয়"
নাটোরের মহারাজ   সঙ্গে রবি কবিরাজ
ধনী জ্ঞানী সুধী সনে নয়নে উদয়
ভাষার রাখিতে মান সবে ত্যাজি অভিমান
সমাগত অভ্যাগতে করেন সৎকার
গরবে আদরে গলে'   বঙ্গ গ্রন্থকার দলে
কমকণ্ঠ বাণী শোনে অতি চমৎকার ॥
পরে সুরু অভিনয়   কাব্যে জ্যোতি কথা কয়
সরস প্রকৃতি হতে হাসি ধারা ঝরে
আঁখি-মন-অভিরাম   "গোড়ায় গলদ" নাম
প্রহসন লোকমন প্রফুল্লিত করে
হেমচন্দ্র বেণী সঙ্গে,   প্রকাশ প্রকাশ রঙ্গে
অঙ্গভঙ্গী রঙ্গ দেখে হইল বিস্ময়
সবে সখে অভিনেতা, কে জানি এদের নেতা
প্রতিভা যে শিক্ষদাতা বুঝি পরিচয় ॥"

(অমৃত মদিরা)

"উক্ত গ্রন্থকারে দেওয়া উদ্দেশ বিবৃতি :—

নাটোর—নাটোরের রাজবংশের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়।

রবি—কোকিল-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অষ্টম পুত্র।

জ্যোতি—পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নাট্যকবি, সংস্কৃত নাটকাবলী ও বিবিধ ফরাসী গ্রন্থের প্রখ্যাত অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হেমচন্দ্র—গোপীনগরের প্রসিদ্ধ বসু মল্লিক বংশীয় তালতলা ক্রীক রো নিবাসী হেমচন্দ্র মল্লিক, সালিখা হুগলি-ডকের সত্বাধিকারী।

বেণী—বহুবাজারের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের বেণীমাধব দত্ত। "রেইস ও রাইয়ৎ" পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক যোগেশ চন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রকাশ—বহুবাজারের প্রসিদ্ধ অক্রূর দত্তের বংশধর প্রকাশ চন্দ্র দত্ত।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই "নেতা ও শিক্ষাদাতা" স্বয়ং গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি এই পুস্তকে মঞ্চে উঠেন নাই, নেপথ্যে থাকিয়া অভিনেতাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহাতে অভিনয়টি সর্ব্বজনমনোরম হয়, সে সম্বন্ধে কিরূপ উৎসাহ লইয়াছিলেন তাহার একটি কৌতুকাবহ ঘটনা উল্লেখ করি।

বন্ধুবর ৺অটল কুমার সেনের মুখে আমরা ইহা শুনি ও ৺বেণীমাধব দত্তও ইহার সমর্থন করেন। উভয়েই আমার সতীর্থ ছিলেন। এই অটলবাবু চোরবাগান কাঁসারিপাড়া নিবাসী ৺রাজেন্দ্রনাথ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। চুঁচুড়ানিবাসী বিখ্যাত কিঙ্কর সেন, যাঁহার নামে চন্দননগরে এখনও কিঙ্কর সেনের গড় বলিয়া স্থান প্রচলিত আছে, ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন। অটলবাবু কলিকাতায় বাঙালী ফ্রীমেসনদের মধ্যে খ্যাতাপন্ন কর্ম্মী, এমন কি, তাঁহার নিজনামে একটি স্বতন্ত্র মেসনিক লজ বা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তির জয় ঘোষণা করিতেছে। তিনি "বানহৌসের বড় বাবু" বলিয়া সমধিক পরিচিত। জাহাজের আমদানি ও রপ্তানি মাল পোর্ট কমিসনারের গুদামে কারবারীদের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট খরচে সংরক্ষণের জন্য যে সমিতি আছে তাহাকে বণ্ডেড্ ওয়্যার হাউস এসোসিয়েসান (Bonded Warehouse Association) বলে, চলিত কথায় মহাজনেরা তাহাকে "বানহৌস" বলিয়া থাকেন। এই সমিতির বিশস্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ রূপে অটলবাবু বহুদিন কার্য্য করেন। "গোড়ায় গলদ" অভিনয়ে তাঁহার "বিনু ডাক্তারের" ভূমিকা ছিল ও তাহাতে "নিমাই"এর ভূমিকায় বেণীবাবু অবতীর্ণ হন। সমাজের

অভিনয়ের জন্য অটলবাবু সামনের গোটা দুই দাঁত তুলিয়া ফেলিয়া কৃত্রিম "দন্তরুচি কৌমুদী" ব্যবহার করিতেন। অভিনেতারা যাহাতে দর্শকের মন হইতে সকল প্রকার কৃত্রিমতার আভাস বিলুপ্ত করিতে পারে, ও কথা-বার্ত্তায় হাবভাবে চালচলনে গলার স্বরে ও শব্দের উচ্চারণে অভিনয়ে বেশ সহজ ঘরোয়া ভাব-ভঙ্গি ফুটাইতে পারে, ইহাই ছিল সমাজের অভিনয়-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানের বিশেষ লক্ষ্য। বাক্যের রসস্ফুরণ নিমিত্ত শব্দবিশেষগুলিতে শ্রোতার মন আকৃষ্ট করা ও খুঁটিনাটি অঙ্গচালনা সম্বন্ধে তাঁহাদের এত মনোযোগ ছিল যে, সময়ে সময়ে শিক্ষাকালীন নটেদের বিশেষ ধৈর্য্য পরীক্ষা হইত ও লোকে বলিত সমাজ বড় ফ্যাসটিডিয়াস (Fastidious)। বেণীবাবু বড় সশঙ্ক অভিনেতা ছিলেন, যাকে বলে নার্ভাস এবং স্থানবিশেষে যেখানে সশব্দ হাসির প্রয়োজন, কিছুতেই হাসিতে পারিতেন না। তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ভূমিকা হইতে প্রার্থিত অব্যাহতি দেন নাই, উপরন্তু আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তিনি নেপথ্য হইতে তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দিবেন, কেবল বেণীবাবু যেন অভিনয়কালীন তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখেন। যথাকালে মঞ্চে বেণীবাবু হাসিয়া দর্শকদের মুগ্ধ করেন। ইহার হেতু গুরু-শিষ্য সংবাদ। রবীন্দ্র-নাথ এমন একটি মুখভঙ্গি করেন যে "নিমাই" না হাসিয়া থাকিতে পারেন না ও পরবর্ত্তী নট-কর্ত্তব্য অধিকতর স্বাভাবিকতা ও স্ফূর্ত্তির সহিত সম্পাদন করিয়া যথেষ্ট যশ প্রাপ্ত হন। রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু কখনও হাসির ভূমিকা বা কমিক পার্ট লইয়া ষ্টেজে অবতরণ করেন নাই। এই অভিনয়ে হেমচন্দ্র মল্লিক মহাশয় "নিবারণে"র ভূমিকায় ও প্রকাশ দত্ত মহাশয় "বিন্দুর" ভূমিকায় মঞ্চ অধিকার করেন, তাহারই স্মৃতি বন্ধুজ মহাশয়ের রুগ্ন শয্যায় জাগিয়াছিল। সাধারণের অবগতির জন্য আরো দুটি নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারি। কলিকাতা হাইকোর্টের দু'জন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার Mr. B. M. Chatterjee ও Mr. S. C. Bose. "ললিত চাটুর্য্যে"র ভূমিকায় শ্রীভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও "চন্দ্রবাবু"র ভূমিকায়

শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় এমন স্বাভাবিক অভিনয় করেন যে, অভিনয়ান্তেও লোকের মনে ছাপ ছিল। এমন কি, কিছুদিন যাবৎ বোস সাহেবের নাম লুপ্ত হইয়া "চন্দর দা" নামে তিনি পরিচিত হইতেন।

তিনি (শ্রীশচন্দ্র বসু) বহুজন-পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। মিষ্টভাষী ও সদালাপী বলিয়াই শুধু তার খ্যাতি নয়, উত্তরকালে রঙ্গালয় সংশ্লিষ্ট তাঁর যথেষ্ট গৌরব হইয়াছিল। তিনি ফরাসডাঙ্গার বিখ্যাত বোসবংশীয়; এবং আজও পর্য্যন্ত সে প্রদেশেরও বাস্তু ভিটার সহিত সমানভাবে যোগ রাখিয়াছেন, যদিও সাধারণতঃ বালিগঞ্জে অবস্থান করেন। তাঁহার ভরাট গলার স্বর, ব্যঞ্জনা দিবার ভঙ্গি ও নাটক সম্বন্ধীয় বিষয়ে উৎসাহ ও শিক্ষা-দান ক্ষমতা তাঁহার যৌবনকালের অভিনীত চরিত্রগুলিকে লোকের মনে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। চন্দননগরে একটি সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত ৺গিরীশ চন্দ্র ঘোষের "প্রফুল্ল" নাটক অভিনয়ে তিনি "যোগেশের" ভূমিকা এত সুন্দর করিয়াছিলেন যে, এখনও প্রবীণদের মুখে তাঁহার কথা শুনিতে পাই। এই উপলক্ষে তথাকার স্বনামধন্য কবি নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য একটি ছন্দোবদ্ধ প্রস্তাবনায় ঐ নাটকটির বক্তব্য সুন্দররূপে পরিস্ফুট করেন। তাহার একটি মর্ম্মস্পর্শী আবৃত্তি শ্রীশবাবুর কণ্ঠে শুনা আমার সৌভাগ্য হয়। এখানে বলিয়া রাখি যে নরেন্দ্রনাথ কবিগুরুর একজন ভক্ত ও কিছুকাল বিশ্বভারতীর সংশ্রবে শান্তিনিকেতনে কবির সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন নব পর্য্যায়ে' কবির সম্পাদকত্ব কালে ও সমসাময়িক মাসিক-পত্রে কিছু কিছু কবিতা প্রকাশ করিতেন, পরে কয়েকখানি কবিতা পুস্তক রচনা করেন। বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া অতি সুললিত গদ্যে বুদ্ধের জীবনকাহিনী অবলম্বনে "বুদ্ধ" নামধেয় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত টেনিসনের ইনোক আর্ডেন ও প্রিন্‌সেসের বঙ্গভাষায় ছন্দে ভাবানুবাদ দর্শনে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে উৎসাহপূর্ণ প্রশংসাসূচক পত্র লেখেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। শুধু কবিবরের নহে, তিনি ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েরও স্নেহ

শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আবাল্য সুহৃদ বসু মহাশয়ের সহিত তাঁহার নিয়মিত পত্র ব্যবহার ছিল। ইউরোপে অবস্থানকালে একবার বসু মহাশয় নাট্যাভিনয় ব্যাপারে বাঙ্গালী যুবকদের ইংরাজি অভিনয়ে যথেষ্ট সৎ পরামর্শ দেন ও সহযোগিতা করেন। অধুনা সিনেমা জগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল ও শ্রীযুক্ত মধুবোস, বাঙ্গালী যুবকদের মিলিত করিয়া কয়েকখানি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া পাশ্চাত্ত্যে অভিনয় প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্ট আফিস' (Post Office) বা ডাকঘর নাটকের ইংরাজি অনুবাদ ইহাদের প্রদর্শনীর মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। বসু মহাশয়েরও কিছু যোগ ছিল। তিনি নিজে একজন সৎসাহিত্যিক, 'মালতি মাধবের' একটি অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে উপরোক্ত নরেন্দ্রনাথের কয়েকখানি সুললিত গান সন্নিবিষ্ট আছে। বাঙ্গলার সাধারণ রঙ্গালয়ের একটি ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া ইংরাজি সাময়িক পত্রে শ্রীশচন্দ্র প্রকাশ করেন।

সাধারণ নাট্যশালার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুটে যে জুবিলি উৎসব ও জলসা হয়, তাহাতে কলিকাতাবাসী রসিকবৃন্দের পক্ষ হইতে নেসানাল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নট ও নাট্যকার রসরাজ অমৃতলাল বসুকে একটি রৌপ্যাধারে রক্ষিত ফুলের তোড়া উপহার দেওয়া হয়। শ্রীশবাবু স্বরচিত একটি কবিতার সহিত উহা প্রবীণ নটকে প্রদান করিলে, তিনি তাঁহার বিগত দিনের সহকর্মী অভিনেতাদের প্রতিনিধিরূপে সাশ্রুনয়নে যথোচিত ভাষণে উহা গ্রহণ করেন। কারণ, যে সকল উৎসাহী যুবক অশেষ ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাণদান করেন, তাঁহাদের সকলেই তখন লোকান্তরে। এ সভায় রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও নাট্যসহচর স্বর্গগত মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় পৌরোহিত্য করেন।

বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয়কালীন মহারাজা জগদীন্দ্র "অবিনাশের" ভূমিকা গ্রহণ করেন ও গ্রন্থকর্ত্তা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং "কেদারের" ভূমিকায়

অবতীর্ণ হন। "কেদারের" সাজপাটে, ভঙ্গিমা ও চালচলনে, মেক্‌আপ ও ম্যানারিস্‌মে (make up and mannerism) এমন একটা হ্যালা-গোছা ও কপট বিনয়ের অবতারণা করিয়াছিলেন, যাহাতে চরিত্রের অন্তর্লিখিত ভাবটি সহজেই পরিস্ফুট হয়, এবং 'অবিনাশে'র সাজের অতিরিক্ত পারিপাট্যের পার্শ্বে বৈষম্যটাও দর্শকদের বেশ লক্ষীভূত হয়। চেষ্টাকৃত অযত্নের আবরণে স্বার্থসাধনের গূঢ় অভিপ্রায় ঢাকা দিবার 'কেদারে'র চেষ্টা যেন সহজেই নজরে পড়ে। আঁচড়ান চুলের উস্কখুস্ক ভাব আঙ্গুল চালাইয়া করা, ভাল সার্টের হাতের ও গলার বোতাম খোলা ঝলঝলে ভাব, ও অগোছালো পাট করা চাদর প্রভৃতির সাহায্যে সহজেই যাহাতে মনে হয়, 'কেদার' লোকটা বেশ সাদাসিধে নিরীহ এবং বিনয়ী। এইরূপ বেশ-ভূষায় এই নাটকের প্রচ্ছন্ন করুণ রসটি শেষ দৃশ্যে প্রকট হইয়া দর্শকদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

সাধারণ থিয়েটারের পঞ্চাশত বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে অনতিকাল পরে 'ষ্টার' প্রেক্ষাগৃহে যে সাধারণ সভা (Public Meeting) হয়, তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীশবোস মহাশয় সভাপতি হইয়া একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। এই সকল জয়ন্তি উৎসবের, যদিচ এ শব্দটা তখনও ব্যবহারে আসে নাই, কার্য্যকরী সমিতিতে বসু মহাশয়ের সহযোগী সম্পাদক রূপে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমান লেখকেরও গৌরব অনুভব করিবার সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীশবাবুর মুখে শুনিয়াছি যে 'রবিবাবু' প্রথম প্রথম একটু নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিতে ভালবাসিতেন। একটা ষ্ট্যাণ্ডঅফিসনেস (Stand offishness) ছিল ও ষ্টেজে বাহির হইতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে আভিজাত্যের সঙ্কোচ কাটিয়া যায়, ও পুনর্ব্বসন্ত নাটকের রিহার্শালে কোমরে চাদর বাঁধিয়া হাতে তালি বাজাইয়া সখিদের নাচ দেখাইয়া দেন। চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় শেষ গানটি শ্রীশবাবুর গেয় ছিল, কিন্তু তিনি গাইতে অক্ষম থাকায়, 'রবিবাবু' নিজ নামেই ষ্টেজে বাহির হইয়া উহা গাহিয়া দিলেন। তাঁহার অবতারণার জন্য নাট্যকীয় কথোপ-

কথনে কিছু যোগ করিয়া দেওয়া হয়। 'চন্দ্রবাবু' তাঁহার বন্ধুদের রবিবাবুর গান শুনিবার জন্য একটু বসিতে বলেন, কারণ সেইদিনই তাঁহার দেখা করিতে আসিবার কথা আছে। পরে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশে সকলের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয় ও তাঁহাকে গাহিতে অনুরোধ করায় পুস্তকের সেই গীতখানি তিনি গাহিলেন। **'বিসর্জ্জনের'** 'রঘুপতি'র ভূমিকায় গ্রন্থকার যে রূপ ও অঙ্গভঙ্গি দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। দেশে এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশে শ্রীশবোস মহাশয় অনেক নটকেই গুরুগম্ভীর ভূমিকায় শুনিবার ও দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, কিন্তু 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজে' অভিনীত রবিবাবুর রঘুপতির মত অভিনয়-নৈপুণ্য আর দেখেন নাই। ইহা তাঁহার কৃতিত্বের কম প্রশংসা নহে।

বাঙালী কর্ত্তৃক **ইংরাজি নাটকাভিনয়** আমাদের পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কলিকাতার পেশাদারী ইংরাজি পরিচালিত নাট্যালয়ে সাঁ। সুসি থিয়েটার (Sans Sauci Theatre) এ বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য 'ওথেলো'র ভূমিকায় যশ অর্জ্জন করেন। লোকে তাঁহাকে "ওথেলো বৈষ্ণব" বলিত। ইং ১৭ই আগষ্ট ১৮৪৮ সালের এক অভিনয়প্রসঙ্গে আমরা "সম্বাদ-প্রভাকরে" দেখিতে পাই, "বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য ওথেলোর ভঙ্গি ও বক্তৃতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। তিনি চতুর্দ্দিক হইতে ধন্য ধন্য শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন।" পরবর্ত্তী ১২ই সেপ্টেম্বর তাঁহার দ্বিতীয়বার মঞ্চে অবতরণের কথাও বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার ১৬ বৎসর পূর্ব্বের "সমাচার দর্পণে" (ইং ৭ই জানুয়ারী ১৮৩২) আমরা দেখিয়াছি যে, ইংরাজি ভাষায় অভিনয়ের জন্য ভদ্র বাঙালী যুবকদের একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা অভিপ্রায়ে একটি সমিতি গঠিত হয়।

'দর্পণে'র সম্পাদক লিখিতেছেন :—

"**হিন্দুনাট্যশালা**—হরকরা পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুধবারে হিন্দুর নাট্যশালায় নাট্য ব্যাপার আরম্ভ হয়। এক মহাশয় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠান-পত্র পাঠ হইল। তৎপরে শ্রীযুত ডাক্তার উইলসন্ সাহেব

কর্ত্তৃক সংস্কৃত 'রামচরিত্র' বিষয়ক ইংরাজিতে ভাষান্তরীকৃত সুসজ্জ যাত্রানুষ্ঠায়ী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইল।"

রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদিত Enquirer 'এনকোয়ারার' পত্রিকায় ঐ অভিনয়ের নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ দিয়াছেন :—

"The Native Theatre talked of before opened on Wednesday evening for the first time with the performance of the first Act of Utterram Charita, translated from Sanskrit by Dr. Wilson, and the fifth Act of Julius Caesar. The exhibition took place at the garden of Prosonno Coomar Tagore. The actors were all amateurs and were for the most part brought up at the Hindoo College. The characters were remarkably well sustained. Sir Edward Ryan and others were present. সুতরাং বাঙালীর সখের থিয়েটারের প্রচলনের ও তদ্দারা দেশের লোককে আমোদ কৌতুক অনুভব করিতে শিখানোর সূত্রপাত হয়, স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে, উৎসাহে ও অর্থানুকুল্যে, তাঁহার মাণিকতলাস্থিত বর্ত্তমান শুঁড়োর বাগান হইতে বাঙ্গালা, সন ১২৩৮ সালে। ইহাই বাঙালীর প্রথম থিয়েটার, বা সাজসজ্জা, সরঞ্জাম, দৃশ্যপট সাহায্যে পাশ্চাত্য রীতিতে নাট্যাভিনয়।

ভারত-সঙ্গীত-সমাজেও ইংরাজি নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হয়। সেক্সপীয়ার কৃত "জুলিয়াস্ সিসার" হইতে কতিপয় দৃশ্য অভিনীত হয়, স্ত্রী-চরিত্র বাদ দেওয়া হইয়াছিল, বোধ হয়, লোকাভাবে। নিম্নলিখিত সভ্যগণ ভূমিকা গ্রহণ করেন—

জুলিয়াস সিসার—শ্রীযুক্ত বি, এল, মিত্তার (বড়লাট কাউন্সিলের ল-মেম্বার, বর্ত্তমানে সুপ্রসিদ্ধ সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র)

মার্ক এণ্টনি— „ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আই-সি-এস্

ব্রুটাস— ,, হেমচন্দ্র মল্লিক
ক্যাসিয়াস্— ,, প্রকাশচন্দ্র দত্ত
ক্যাস্কা— ,, অটলকুমার সেন
মেটেলাস্‌শিম্বার ,, বেণী মাধব দত্ত
} ইঁহাদের পরিচয় উপরে দেওয়া হইয়াছে।

লুসিয়াস্— ,, মনোজমোহন মল্লিক, ব্যারিষ্টার, ইনি লোয়ার সারকুলার রোডের বাবু নগেন্দ্রনাথ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

সুথসেয়ার (দৈবজ্ঞ) ,, পূর্ণচন্দ্র দত্ত, ইনি প্রকাশচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও স্বনামখ্যাতা মহিলা কবি গিরীন্দ্র মোহিনীর পুত্র।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তখন ঘাটের কোটায়, আমেদাবাদে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসনস্ জজ। অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে কলিকাতায় থাকিয়া ফারলো উপভোগ করিতেছেন। তাঁহারই উৎসাহে ও শিক্ষায় তরুণদলের এই আয়োজন। উদারচেতা সত্যেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠদের সহিত মিশিবার স্পৃহা ও শক্তি বয়সের পার্থক্যে বাধা পাইত না। তাঁহার ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অমায়িক ভাব ও লোক-সঙ্গ-প্রিয়তা প্রবল না হইলে, নিত্য বালিগঞ্জ হইতে চোরবাগান অঞ্চলে ফার্ষ্ট ক্লাস Hackney (ঠিকা) ফিটান গাড়ি করিয়া "সমাজে" আসা ও মধ্যরাত্রে বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইত না। সাহিত্যকে যে বয়স্কদের মজলিসে আনন্দের উপাদানে পরিণত করা যায়, তাহা সত্যেন্দ্রনাথ "স্বয়ং আচরি" প্রথম দেখাইলেন। তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুটের এবং ভারত-সঙ্গীত সমাজ-মঞ্চে ইংরাজিতে ও বাঙলাতে কাব্যাংশ উপযুক্ত স্বরভঙ্গিতে পাঠ ও আবৃত্তি করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করেন। তৎপূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, কাব্যপাঠ বা আবৃত্তি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পারিতোষিক বিতরণের উৎসবের অঙ্গ, বয়স্ক লোকদের পক্ষে নিতান্ত ছেলেমানুষী। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আবৃত্তি ও পাঠ নাট্যাভিনয়ের ন্যায় বয়স্কদেরও যে উপভোগের বস্তু, তাহা সত্যেন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনিয়া লোকের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইত, এবং তাঁহার অনুসরণে সমাজে বহুবার প্রৌঢ়দের আবৃত্তি হইয়াছে

ও সংস্কৃত আবৃত্তিও পরে যোগ হয়। দু' একজন প্রবীণ সভ্য, যথা এটর্ণি Mr. J. C. Dutt তাহাতে উৎসাহভরে আসরে নামিয়াছিলেন।

সমাজের 'জুলিয়াস্ সিসার' অভিনয়ে যদিচ সকল অভিনেতাই বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন, বাঙলা নাট্যাভিনয়ের অভাবে তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় বা অভিব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্যক পরিস্ফুট হইবার অবকাশ পায় নাই। তাই পরবর্ত্তী পুস্তক নির্ব্বাচিত হইল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতি' তাহার ভূমিকালিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সেলিম— শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু মল্লিক।

প্রতাপসিংহ—,, নগেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক (পার্সি বাগানের ৺দীনেন্দ্রনাথ মল্লিকের পুত্র, ইঁহারাও পটলডাঙ্গার মল্লিক গোষ্ঠি বলিয়া পরিচিত।

আকবর— ,, রায় পশুপতিনাথ বসু (বাগবাজারের)।

পৃথ্বীরাজ— ,, কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর (ঝামাপুকুর নিবাসী রাজা দিগম্বর মিত্রের জ্যেষ্ঠ পৌত্র)।

ইহাতে সমাজের বিশিষ্ট অভিনয় প্রথা ও নির্ব্বাচিত সভ্যদের প্রাণবন্ত ভাবণ সর্ব্বজন কর্ত্তৃক প্রশংসার সহিত স্বীকৃত হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। সামাজিক নাটক ভিন্ন ব্যক্তিগত প্রতিভা বিকাশের সুবিধা হইবে না জানাইলেন। রবীন্দ্রনাথকে কেবল শিক্ষা ও মধ্যাধক্ষতায় পাইয়া সভ্যেরা তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না, তাই তাঁহাদের অনুরোধে স্বয়ং কবিকে মঞ্চে আরোহণ পূর্ব্বক সশিষ্য "বিসর্জ্জন" নাটক খানি জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইল। তিনি "রঘুপতি"র অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। তাঁহার অভিনয় সঙ্গী কুশীলব ছিলেন "জয়সিংহে"'র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মল্লিক। উপরোক্ত অটলবাবু ও বেণীবাবু, রাজা ও সেনাপতি সাজিয়াছিলেন, আর ইঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ সভ্য, রায় পশুপতিনাথ বসুর পুত্র শ্রীমান অমরনাথ বসু "নক্ষত্র রায়ে"র ভূমিকায় গুণপনা দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কখনও ইংরাজিতে নাটকীয় চরিত্র অভিনয় করিয়াছেন

বলিয়া শুনি নাই, তবে তাঁহার মেজদাদার মত পরিণত বয়সে রেডিও ও গ্রামোফোন রেকর্ডে বাঙলা ও ইংরাজি কাব্যাংশের আবৃত্তি দিয়াছেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রদেরও ইংরাজি কাব্যের রসাস্বাদন তাঁহার নিকট পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। কলিকাতার সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিয়াছেন ও পূর্ব্বে পূর্ব্বে গান শুনাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে শুধু আমোদের জন্য কখনও আবৃত্তি করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। অবসর বিনোদনের স্থান ভিন্ন, তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতিও গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া চলেন, তাঁহার চলাফেরায় কথাবার্ত্তায় ডেকোরাম (Decorum) বোধ যথেষ্ট প্রতিভাত হয়, আভিজাত্যের ব্যবধানটা বেশ সুস্পষ্ট। তাঁহার ব্যক্তিত্ব তখন বেশ একটু রাসভারি রকমের হয়। তাঁহাকে দেখিবার ও শুনিবার জন্য জনসাধারণের আগ্রহ চিরকালই প্রবল, কিন্তু তাঁহার নিকটস্থ হইয়া কথা বলার সাহস অল্পলোকেরই হয় ও ভাগ্যে ঘটিয়াছে। ৺গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈঠকখানায় ঠাকুরপরিবারস্থ বালকদের "মিলনী" নামক সভার পাঠচক্রে তাঁহাকে "Readings from Mathew Arnolds Poems" ইংরাজ কবি ম্যাথু আর্ণল্ডের কাব্যাংশ ও তাঁহার স্বকৃত নাটক 'মালিনী' ও গল্প "ক্ষুধিত পাষান" পড়িয়া শুনাইতে দেখিয়াছি, তখন তিনি পঞ্চাশোর্দ্ধে (বোধ হয় ১৯১০ কি ১৯১১)। সে স্বরলহরীর সুখ স্মৃতি এখনও কানে লাগিয়া আছে। এই বৈঠকখানাতেই শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির তরুণ বয়সে সান্ধ্য বৈঠকের একটি ব্যবস্থা কিছুকাল ছিল। তাহাতে পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় (পরে বিদ্যারত্ন) সংস্কৃত কাব্য, নাটক, ও সময়ে সময়ে মূল রামায়ণ বা মহাভারত হইতে পাঠ করিতেন ও অর্থ অলঙ্কারাদির রসোদ্ঘাটন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। অন্যান্য পুরাণের উপাখ্যানও কখন কখন বলিতেন। এইরূপে মুখে মুখে তাঁহাদের সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক কিছু জানা হয় এবং দীর্ঘ প্রসঙ্গ আলোচনা শুনিবার ধৈর্য্য ও আনন্দ আহরণ করেন। রবীন্দ্রনাথও মধ্যে মধ্যে শ্রোতারূপে এই বৈঠকে সান্ধ্য অবকাশ যাপন করিতেন। শুনিয়াছি বাটিস্থ তরুণদের পক্ষে এইরূপ

একটা স্বাস্থ্যকর মানসিক পরিবেশ থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথই এই ব্যবস্থার মূলে ছিলেন।

অভিনয় শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আমরা তৎকালে যেমন শুনিয়াছিলাম, এখানে কিছু দিলে ভবিষ্যত বংশীয় কলা-রসিকদের কিছু উপকারে আসিতে পারে। তাঁহার মত যে, অভিনয়ে কিছু তেজস্বিতা বরং ওভার-একটিং ভাল, তাহাতে অভিনেতার আত্মাভিমানজনিত সঙ্কোচের যে অভ্যাস দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ও দর্শকের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীজাতির সামাজিক জীবনযাত্রার ফলে স্বাভাবিক প্রবণতা আণ্ডার-একটিংএর দিকে। অনেক দুঃখে বলিয়াছিলেন বঙ্গজননীকে, "এতগুলি সন্তানে বাঙালী করিয়াছ মা, মানুষ কর নাই।" মৃদু অভিনয় ছলা ও মিনমিনে গলা, অঙ্গচালনায় বাধ বাধ ভাব, দর্শক ও শ্রোতাদের মনকে রঙ্গমঞ্চস্থিত কার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই ভাবরসের ব্যাপারে উচ্চারণের প্রতি কুশীলবদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। মুখস্থ খুব ভালরূপ না হইলে শব্দ প্রক্ষেপ তেমন জোরের সহিত হয় না এবং শিক্ষাকালীন উচ্চারণ বিষয়ে প্রথম হইতে মনোযোগী না হইলে, দুষ্ট উচ্চারণ সংশোধন ক্রমেই দুষ্কর হইয়া উঠে। সামাজিক নাটকে সমস্ত রসটাই কথার মারপ্যাঁচে ঘাত-প্রতিঘাতের উত্তরের ক্ষিপ্রতা ও খেলার পরেই নির্ভর করে, সুতরাং শ্রোতারা যদি অস্পষ্ট কটু উচ্চারণের ফলে কিছু কথা হারাইয়া ফেলে তাহাতে দৃশ্যকাব্যের রস জমে না। সাধারণ আবৃত্তিতে সেন্টেন্স (Sentence) বা বাক্যের শেষভাগটায় দম খাটো হইয়া পড়ে, প্রান্ত-ভাগের কথাগুলিতে বিশেষ যোর না দিলে প্রেক্ষগৃহের শেষ পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয় না। ইহাতে উচ্চারণের কিঞ্চিত কৃত্রিমতা প্রয়োজন হইলেও ব্যবহার্য্য। অভিনেতার একটু সতর্ক থাকা আবশ্যক যে কৃত্রিমতার মাত্রাধিক্য বশত ব্যঙ্গের কারণ না হয়। শ্রীমান শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরবর্তী কালে এই উচ্চারণ বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করিয়া বাজিবার

ভঙ্গিতে প্রভূত উন্নতি আনয়ন করিয়াছেন। ফলে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চে একটি নূতন সুর জাগাতে সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণ নাট্যালয়ে তাঁহার শিক্ষকতার গুণে অনেক নটনটী পূর্ব্বাপেক্ষা ভাষণরীতি মার্জ্জিত করিয়া সাধারণে অভিনয় কলার সুউচ্চ মানদণ্ড সম্বন্ধে কিছু বোধ উদ্বুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সমাজে "বিসর্জ্জন" নাটকে অভিনয় করিয়া ও করাইয়া রবীন্দ্রনাথ স্বীয় যশ আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন এবং জনসাধারণের মনকে অভিনব অভিনয়-প্রথার প্রতি অধিকতর আগ্রহান্বিত করিলেন। কলাশিল্পের এই বিভাগে কবির অসাধারণ কৃতিত্বের কথা স্মরণার্থে, তিনি বিভিন্ন সময়ে যে সকল ভূমিকা আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর নব নব রসের পরি-বেশনে স্বদেশবাসীদের মানসিক ভোজে যে তৃপ্তি আনিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করিতেছি।

জোড়াসাঁকোর বাটিতে "মানময়ী"তে 'মদন', 'এমন কর্ম্ম আর করিব না'তে "অলীকবাবু" জোড়াসাঁকোর বাটিতে বিদ্বজ্জন সমাগমের এক অধিবেশনে, এবং নিজেদের বাটিতে বড়লাট-পত্নী লেডি ল্যান্সডাউনের আগমনে সম্বর্দ্ধনার জন্য 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় 'বাল্মিকী', জোড়াসাঁকোয় 'কালমৃগয়া'য় 'অন্ধমুনি', সখী-সমিতির অনুরোধে রচিত 'মায়ারখেলা'য় 'মায়াকুমারী', বির্জিতলায় সত্যেন্দ্রনাথের ভবনে 'রাজা ও রাণী'তে 'রাজা বিক্রমদেব', পার্ক ষ্ট্রীটে সত্যেন্দ্রনাথের ভবনে ও সঙ্গীত-সমাজে 'বিসর্জ্জন'এ 'রঘুপতি', পরে ৬৩ বৎসর বয়সে এম্পায়ার থিয়েটারে 'বিসর্জ্জনে' জয়সিংহ', জোড়াসাঁকো গগনেন্দ্রনাথের বাটিতে ও মহারাজা নাটোরের বাটিতে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় 'কেদার', শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতায় শারদোৎসবে 'ঠাকুরদা' ও 'সন্ন্যাসী', বোলপুরে 'প্রায়শ্চিত্ত'তে 'ধনঞ্জয় বৈরাগী,' 'রাজা'য় 'ঠাকুরদাদা', 'অচলায়তন'এ 'আচার্য্য', বোলপুর ও কলিকাতায় 'ফাল্গুনী'তে 'অন্ধ বাউল ও কবি', 'ডাকঘর' এ 'ঠাকুর্দ্দা,' 'তপতী'তে 'বিক্রমদেব', 'অরূপরতন' এ 'রাজা' 'নটীর পূজা'য় 'ভিক্ষু

উপালী'র ভূমিকায় তিনি দর্শকদের নূতন নূতন সৃষ্টির আনন্দ দান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কলার পারিপাট্য সাধনে আজীবন যত্ন করিয়াছেন। **সাধারণ রঙ্গমঞ্চ** যে, জাতীয় শিক্ষার ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র, ইহা উপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে অভিনেতৃবৃন্দকে আবৃত্তি ও অভিনয়-ভঙ্গীতে প্রাণ সঞ্চারের নূতন পন্থা দেখাইয়া প্রবুদ্ধ করেন। এই কারণে তিনি উত্তরকালে পুরাতন নাটকের পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে ঘনীভূত আকারে ও যথাযথ ভাবে গানে অভিব্যক্ত করিয়া বাংলার প্রতিষ্ঠিত সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলিতে কলাবিদ্যার তৎকাল প্রচলিত আদর্শের সংস্কার সাধন করিয়া যুগান্তর আনয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। অভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'তপতি'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল ; দৃশ্যপট তা'র বিপরীত ; অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু ; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে, সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্ব্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সঙ্কীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সঙ্কীর্ণ হয় না। এই কারণেই, যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে, সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষীকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ, বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।"

ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে রামমোহন লাইব্রেরীতে ইউরোপীয় সঙ্গীতের আদর্শে ভারতীয় সঙ্গীতে হার্মনিক্স (Harmonics) এর অভাব সম্বন্ধে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সূত্রে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচলিত রাগরাগিণীর দ্বারা সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ভাব প্রকাশের স্থলে তাদের অন্তর্বিষয় ব্যতিক্রম সাধন করিয়া কিরূপে নূতন ভাবের ...

রসের অবতারণা করা যায়, তাহা ব্রহ্মবাদিনী ছন্দমাতার বরপুত্র সে ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছিলেন। তখনও তাঁহার গলা পূর্ব্ববৎ সুমিষ্ট ও সমান টিম্বারে (Timber) ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি কল্পে এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে গবেষণা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে তিনি সকলকে আহ্বান করেন। তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় বোলপুরের ছাত্র ও ছাত্রীদের মিলিত কণ্ঠে সুর তৃতীয়-পঞ্চমের যোগে বা সুরের সহিত অর্দ্ধ শ্রুতি বা কোমল সুরের মিশ্রণে গানে কিরূপ স্বরসংগতি মেজর ও মাইনর-কর্ড (major or minor chord) যোগে সমবেত সঙ্গীতে (chorus) নাদ গম্ভীর ও দানাদার (tone) করিতে পারা যায়, তাহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ জনসাধারণের শ্রুতিগোচর করেন। তৎকালীন উপেক্ষিত অধুনা পুনঃপ্রচলিত ভারতীয় নৃত্যকলার স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতি আনয়নের জন্য তিনি বোলপুর বিদ্যালয়ে রীতিমত নৃত্যকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গীত রচনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষার যথেষ্ট সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বজন স্বীকৃত। তবে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের পক্ষপাতীরা দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন যে, এই গীতবাহুল্যের প্রভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের অনির্ব্বচনীয় মোহিনী শক্তি ও তদ্‌চালনার বিপুল শাস্ত্রজ্ঞান আয়ত্ব করিতে প্রলুব্ধ না হইয়া রবিবাবুর গানের ভাষার প্রতিই লোকে অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে এবং তাহাই দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, গানে সুরের অপেক্ষা কথার দিকে অধিক মাত্রায় মনোযোগী হইতেছে। এ অন্তরায় অতিক্রম করিবার জন্য পূর্ব্ব মনিষীগণ বিশেষ সতর্ক ছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের একটা বিশেষ পরিচয় আমরা "হিন্দু-সঙ্গীতে"র অন্তর্গত খেয়াল সুর প্রণালীতে পাই। সেখানে ছন্দতাল সুরে সাঙ্গীতিক সঙ্গতিটী জাগরূক, সাহিত্যের ভাব প্রেরণা নাই, যাহাতে গায়কের সমগ্র মনঃপ্রাণ ও অভিনিবেশ কেবল সুর ও সুরসমন্বয়ে নিবদ্ধ থাকে, চিন্তাধারাকে কোন প্রকারে উত্তেজিত ও বিক্ষিপ্ত না করে, সেজন্য উহাতে কতকগুলি অর্থহীন শব্দের সমাবেশে সুরলীলা

দেখান হয়। ধ্রুপদ খেয়ালেও বাক্যের অংশ যৎসামান্য, ও গাহিবার রীতিতে ও পাট পাট করিয়া বাঁটোয়ারার বহরে তাহাও প্রায় অর্থহীন হইয়া পড়ে। গায়কের কৌশলের তারিফ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাবে শ্রোতার মন আচ্ছন্ন করে না। ইহা রসজ্ঞ ও অধ্যবসায়ীর পক্ষে আনন্দ-দায়ক উত্তেজনায় পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু অনভিজ্ঞ সাধারণ দেশ-বাসীকে বিশেষ আমোদ বা তাহাদের কর্ম্মক্লান্ত দেহ ও পরিশ্রান্ত মনকে নব উম্মাদনা দিয়া প্রফুল্লিত করিতে পারে না। মানুষ স্বভাবত কথার কাঙ্গাল, তাহার উপর এদেশের আবাল্য সংস্কার কিছু আধ্যাত্মিক খোরাকের আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতের অভিব্যক্তিতে বৈচিত্র্য পূর্ণ সুর ও তালের সহযোগে যে ভাবব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্য করিয়াছেন, তাহা সঙ্গীতামোদিদের মধ্যে প্রচলিত করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। অধুনা ভারতবাসী প্রধান প্রধান সঙ্গীতাচার্য্য ও সুরজ্ঞেরা মানিয়া লইয়াছেন যে আর্য্যাবর্ত্তের খ্যাতনামা "হিন্দু-সঙ্গীতে'র অন্তর্ভুক্ত "রবীন্দ্র-সঙ্গীত" বলিয়া একটা বিভাগ থাকা উচিত। প্রতিযোগিতা আসরে বা পরীক্ষান্তে উপাধি বা সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা আছে, [illegible] দুটি ধারা সৃজিত হইয়াছে, একটি প্রাচীন বা ক্ল্যাসিকাল (Clas[illegible] অপরটি আধুনিক বা মডার্ণ (modern)। আবার মডার্ণের মধ্যে [illegible] রচিত গানের একটি বিশেষ থাকের ও ঐ গানে অভিজ্ঞ পরীক্ষক [illegible] করা হইয়াছে। যাহাতে শাস্ত্রানুযায়ী মানদণ্ডের স্থলে বাণীর [illegible] ও কবির দেওয়া বিশেষ কর্ত্তপের খোঁচগুলির বিচার অনুসারে [illegible] ধার্য্য হয়। গীতের বর্ণনীয় বিষয় বস্তুটি যাহাতে শ্রোতাদের [illegible] রেখাপাত করিতে পারে, সেজন্য গায়ক ইচ্ছানুসারে মিশ্র সুরের [illegible] করিয়া থাকেন। সেখানে রাগরাগিনীর সংস্কারানুযায়ী সুরের [illegible] কথা না হইয়া, কবির কথানুগামী স্বরলহরীর মূর্চ্ছনা [illegible] চিত্তাকর্ষক হইয়া লোকের সহজ ও ব্যাপক ব্যবহারে আসে। [illegible] প্রক্রিয়া প্রাদেশিক হইলেও যখন বাঙলাভাষীদের নিজস্ব [illegible]

উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার মর্য্যাদা দিয়া তাহাকে জাতীয় কল্যাণার্থে থাকিতে দেওয়া সমীচীন, নতুবা জাতীয় গীত-প্রতিভা নষ্ট হইয়া যাইবে। বাঙলার পদাবলী-কীর্ত্তন সঙ্গীত, সারীগান, বাউল ও রামপ্রসাদী মালসী সুরের মত রবীন্দ্র-সঙ্গীতও আমাদের মনের নিত্য-প্রয়োজনের সে অভাব পূরণ করিয়াছে।

ললিতকণ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গলা স্বভাবতঃ উচ্চ স্বরগ্রামে খেলিতে ভালবাসে; তাহাতে যে সঙ্গীতের আভাষ ও আন্দোলন, তাহার রূপ ও রস তিনি শ্রোতাকে যথাসাধ্য বণ্টন করেন। কিন্তু তাঁহার কবি-প্রকৃতি মন তাহাতে তৃপ্তি পায় না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথা ও ভাবের দ্বারা নিকটস্থ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে লোলুপ। কেবল সুর আলাপনে, গুঞ্জনে, মিড়ের খেলায়, ও গৎ রচনায়, তাঁহার অভিব্যক্তির প্রেরণা ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; তাঁহার কথাব্যাকুল প্রকৃতি উত্তর-সাধককে বাঙ্ময়রূপের দ্বারা অন্য স্তরে লইয়া যাইতে চায়, তাই তিনি বলেন—

"আমার সুরগুলি পায় চরণ,
আমি পাই নে তোমারে।
[illegible] গানের খেলা,
দূরের খেলা যে,
[illegible] বাঁশি বাজায়
সকল বেলাতে।"

[illegible] কবিতার ছন্দে ও সঙ্গীতের ছন্দে বেশ প্রভেদ আছে। উভয় [illegible] দোলনায়, যাহাতে বাণীর ও সুরের চাল কতকটা এক [illegible] আমাদের প্রাণকে রসসিক্ত করে ও ক্ষণিকের তন্ময়তা আনে, সেই [illegible] বাঁধিয়া আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা রঞ্জিত যে অভিনব কলকা- [illegible] সৃষ্টি করেন, তাহা তাঁহারই গলায় স্বাভাবিক ও শোভন হয়। [illegible] অর্থবোধক যতি ও সুরতরঙ্গের বিরাম স্থান যাহাতে সমকালিক হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন; এই বেদন-বাঁশরীর ফলে সঙ্গীতের সাবেকি

চালের ও ঢংএর ব্যাত্যয় হয়, কিন্তু এই অপূর্ব্ব মিশ্রণে একটি অশ্রুতপূর্ব্ব স্বরলহরীর সৃষ্টি হয়, তাহা পরম উপভোগ্য। অন্যান্য দেশে গায়কের এ স্বাধীনতা থাকায়, গানের অভিব্যক্তির বিচিত্রতা যথেষ্ট পাওয়া যায়। যাহারা শুধু সুর-প্রবাহে মজিয়া থাকিতে সক্ষম, তাহারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (Classical), ধ্রুপদ, খেয়ালে বেশী আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু জনসাধারণ প্রাত্যহিক জীবনে সময় ও ধৈর্য্যের স্বল্পতা বশতঃ, তাহাতে অনেক পরিমাণ আনন্দে বঞ্চিত হয়, তাই তাহাদের মন ভরাটের জন্য হালকা রকম সুরে কথা ও ভাবের ব্যঞ্জনা আবশ্যক। সে কারণে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত পন্থাটি এত জনপ্রিয় হইয়াছে। তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়,
অসীম চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।'

তাঁহার অন্তরের এই মর্ম্মকথা স্বকীয় শক্তিতে নির্ভরশীল গায়কগণকেই উপলব্ধি করেন। কার্য্যকালে নির্দ্দিষ্ট সীমায় থাকিয়াও তাঁহারা স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা কতকটা লইয়া থাকেন।

বিখ্যাত গুণী সঙ্গীতাচার্য্য ও সুরবাহার বাদক স্বর্গত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় কিছুদিন আদি ব্রাহ্মসমাজের মূল গায়ক ছিলেন। তাঁহার সাহচর্য্যে ও স্বরলিপি প্রস্তুত করণে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উপকৃত হন। গোসাঁইজী পরে কাসিমবাজারের মহারাজা স্বর্গীয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর গায়কমণ্ডলীর প্রধান পদ অলঙ্কৃত করেন এবং তাঁহার সহিত ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে যোগদান করেন। তথায় শ্রীযুক্ত [illegible] মিত্র

প্রমুখ কয়েকজন ভাগলপুরবাসী গুণী বাঙ্গালীর চেষ্টায় একটি জলসা ও সান্ধ্য বৈঠক হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ বোলপুর হইতে তথায় গমন করেন ও বিশেষ উৎসাহের সহিত গোসাঁইজীর কালওয়াতি গান ফরমাইস করিয়া শুনেন। গোসাঁইজী কলিকাতায় আসিলে, ৺গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈঠকখানায় আহূত হইতেন। সেখানে কবির অনুরোধে আমরা গোসাঁইজীকে বসন্তবাহার, রাগ আলাপ, ও বাঙলা গান করিতে দেখিয়াছি।

যখন ১৩৩১ সালে (বঙ্গাব্দ) কৈসরবাগ লক্ষ্ণৌতে নিখিল-ভারত সঙ্গীত-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হয়, তখন গোসাঁইজী সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের এবং সুশিক্ষিত সুমার্জ্জিত সুমিষ্ট কণ্ঠের গীত আলাপনে, আলাবন্দ খাঁ সাহেব ও ভাতখণ্ডেজী প্রভৃতি রাজ্যোয়াড়া, বোম্বাই ও উত্তর ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদদের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া, বাঙলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তিনি নিজে রসজ্ঞ ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রণালীর ভাবগ্রাহী হওয়ায়, ঐ সম্মিলনীতে ভারতীয় সঙ্গীতের বিভাগে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি স্বতন্ত্র স্থান লাভ, ও প্রতিযোগীতার বিষয়রূপে গণ্য হওয়া সহজসাধ্য হইয়াছিল।

এই অর্দ্ধশতাব্দি ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথও স্বকীয় প্রবর্ত্তিত সঙ্গীত-প্রণালী ও অভিব্যক্তির অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি অনেকগুলি সুযোগ্য এক্সপোনেণ্টস (Exponents) পাওয়ায়, তিনি ইহাকে কিয়ৎ পরিমাণে স্থায়িত্ব অর্পণে সক্ষম হইয়াছেন। এতাদৃশ সৌভাগ্যলাভ অন্য কোন সঙ্গীত-রচয়িতা ও বিশিষ্ট প্রণালীর উদ্ভাবকের ভাগ্যে ঘটে নাই।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে কতকগুলি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির একত্র সমাবেশে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নব অভিব্যক্তির অঙ্কুর যেন উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়াছিল। তাঁহার অগ্রজ ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তাঁহার ভগ্নি ৺স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁহার বিদুষী কন্যা সুপরিচিতা শ্রীমতী সরলা দেবী

এবং ৺প্রতিভা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রমুখ কবির ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ ও ৺হিতেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মণ্ডলী তাঁহার কণ্ঠনিসৃত এই নবাগত বাণীর উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নিজ কণ্ঠের অনবদ্য মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া বৎসরের পর বৎসর ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিবস উৎসবোপলক্ষে বাঙলার রসপিপাসু নরনারীকে উপঢৌকন দিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাদের মধ্যে লিখিত স্বরলিপি করিতে সক্ষম থাকায়, মধ্যে মধ্যে মাসিক-পত্রের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিতেন। কিন্তু বাহিরের লোক ইহা তাদৃশ আয়ত্ত করিতে সক্ষম না হওয়ায়, নিজের গান পরের মুখে শুনিবার আনন্দ কবির পক্ষে অধিকাংশ স্থলে হরিষে বিষাদ উৎপন্ন করিত। যেরূপ প্রচুর পরিমাণে তাঁহার গানের ফসল হইত, তাহা আলোচনা ভিন্ন স্মরণে রাখা দুষ্কর। এমন কি, কবি নিজেও কার্য্যগতিকে ও অবসর অভাবে ভুলিয়া যাইতেন। ব্রাহ্মসমাজের নিযুক্ত গায়কমণ্ডলীর অগ্রণী ও শিক্ষকরূপে পণ্ডিত শ্যামসুন্দর মিশ্র কাজ করিতেন। তিনি কবির নির্দ্দেশমত গান গাহিতেন ও তাঁহার ছাত্রদের ও মাঘোৎসবের গায়কদের মৌখিক শিক্ষাদান করিতেন। ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয় ও শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ ও লেডি চৌধুরীর (কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ৺প্রতিভা দেবী) প্রতিষ্ঠিত "সঙ্গীত সঙ্ঘ"তে তাঁহার বিস্তর ছাত্রী ছিল। তৎকালে তিনি একমাত্র "রবীন্দ্র-সঙ্গীতে"র বিশেষ শিক্ষকরূপে কলিকাতায় পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর ব্যবহারার্থ তিনি কতকগুলি গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাহা তাহার নিজ নামে কোনও দিন প্রকাশিত হয় নাই। মহিলাদিগের মধ্যে তখনও ওস্তাদি ঢঙের গান শিখিবার আগ্রহ তাদৃশ ছিল না। ঠাকুরপরিবারের সংশ্লিষ্ট লোকেদের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচলন তখন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণের সুবিধার্থে আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ৺কাঙ্গালী চরণ সেন কয়েকখণ্ড "ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি" নাম দেয় পুস্তক প্রকাশ করেন ও মধ্যে মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশ করিতেন। তিনি

সঙ্গীতের স্বরলিপি "শত গান" নাম দিয়া শ্রীমতী সরলা দেবী প্রকাশ করেন। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মক ও প্রণয় আদি বিবিধ গান মাত্র কয়টি ছিল। প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র-বিক্রেতা (দ্বারকিন কোম্পানী) (Dwarkin &. Co.) ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দিয়া একখানি "হারমোনিয়াম শিক্ষা ও স্বরলিপি" ও "স্বরলিপি গীতিমালা" প্রস্তুত করাইয়া প্রকাশ করেন। তাহাতে স্বকৃত এবং রবীন্দ্রনাথেরও ব্রহ্মসঙ্গীত ব্যতীত অন্য শ্রেণীর গানের অনেক স্বরলিপি সাধারণে প্রচারলাভ করে।

পরবর্ত্তীকালে কবি এক স্বতন্ত্র স্বরলিপিকার নিযুক্ত করেন। সেইজন্য আধুনিক বিস্তর গানের স্বরলিপি এক্ষণে সহজপ্রাপ্য। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানি যখন প্রকাশিত হয়, তখন প্রত্যেক গানের স্বরলিপি তৎসহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় এবং "গীত-বীতান" প্রভৃতি কবি নিজেও অনেক গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজার প্রধান গায়ক সঙ্গীতাচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক্ষণে খ্যাতনামা সঙ্গীতবিদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দ্রুতলিখনে সত্বর স্বরলিপি প্রস্তুত করিতে পারদর্শী শুনিয়া কবি তাঁহাকে নিযুক্ত করেন ও তদ্দ্বারা বহু গান স্বরলিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হন (১৯০৮-১১)। এ বিষয়ে পণ্ডিত শ্যাম সুন্দর মিশ্রের উপযুক্ত শিষ্য ও জামাতা শ্রীমান [illegible] মিশ্র সঙ্গীত-চৌধুরী এ বিষয়ে দক্ষ থাকায় ও সারঙ্গি যন্ত্রে কবির গানের সহিত বাজাইয়া তাঁহার সূক্ষ্ম মূর্চ্ছনার অভিব্যক্তিগুলির রূপ বাহির করিতে সক্ষম হওয়ায়, কবি তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া যান ও সেখানকার সঙ্গীত ও অভিনয়ে হারমোনিয়াম ক্রমশঃ রদ করিয়া এসরাজ ও সারঙ্গির সঙ্গতে নিজের মনোমত সাঙ্গীতিক সংস্কৃতি সাধন পূর্ব্বক জনসাধারণকে ঋতুমঙ্গল সঙ্গীতে ও অভিনয়ে ও বোলপুর প্রবর্ত্তিত মনিপুরি প্রভৃতি নাচের ঢংএ বিশেষ অনুরাগী ও শিক্ষিত করিতে সমর্থ হন। সঙ্গীত জগতে অন্য ক্ষেত্রের মত বিচারের আবশ্যক হয় ও তাহাতে যিনি শাস্ত্রসঙ্গত বিচার করিতে সমর্থ হন, তাঁহাকে সঙ্গীতমণ্ডলী 'চৌধুরী'

উপাধি ভূষিত করিয়া রেফারি (Referee) বা আম্পায়ারের (Umpire) পদ দিয়া থাকেন। তাঁহার সাঙ্গীতিক জ্ঞান ও সভ্যজনোচিত ব্যবহার ও ন্যায়বত্তা সর্ব্বজনমান্য হয়। কবিবর হায়দ্রাবাদ ভ্রমণকালীন চৌধুরী বাচাওয়ান মিশ্রকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যান এবং তথায় নিজেও ওস্তাদজীর সাহায্যে তাঁহার গানের নিদর্শন দিতে সক্ষম হন ও বোলপুরের জন্য অর্থ ও নবীন শিষ্য সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য্য হন। এক্ষণে সিন্ধু, বোম্বাই, গুজরাট, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি প্রদেশের লোক বাঙলা শিখিয়া রবীন্দ্র-গীত ও সঙ্গীত-প্রণালীর পক্ষপাতী। উহার মনোহারিত্ব অপরিসীম, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

বোলপুরে **শান্তি-নিকেতনের** ছাত্রগণকে নব আদর্শে শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে কবি তথায় গীতচর্চ্চার ব্যবস্থা করেন। অন্যতম প্রধান শিক্ষকরূপে অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীকে পাওয়া যায়। তিনি যেমন শিক্ষা বিভাগে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তেমনি তিনি সুকণ্ঠ থাকায় বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গ্রাম্য সুরের চর্চ্চার ও তাহাতে রচিত কবির গীতাবলী ও বালকদের উৎসবের জন্য লিখিত নাটিকার সুরাবলীর জন্য অনেকগুলি তরুণ আধার কবির মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু যে রসধারায় আজ ঐ আশ্রম সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তাহাকে উৎসারিত করিবার সুযোগ হয়, যখন দীনেন্দ্রনাথ বিলাত প্রত্যাগত হইয়া তথাকার সঙ্গীতগুরু ও নাটকীয় বিভাগের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। তিনি নিজে সুকবি, সাহিত্যরসে সুরসিক, ও বিবিধ সঙ্গীতজ্ঞ, ও একজন দক্ষ অভিনেতা। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ (ক) পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠের অতুলনীয় সুরঝঙ্কারে কবির গানগুলি সাহিত্য রসানুভূতি মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। সুর সম্বন্ধে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও দ্রুত স্বরলিপি লিখন অভ্যাস স্বয়ং কবিকে আনন্দবিহ্বল করিয়াছে এবং শৌর্য্যে ও ঔদার্য্যে কবির

রচনার উৎসধারাকে অধিকতর লীলা-চঞ্চল করিয়াছে। ঈপ্সিত রকমের একটি সুযোগ্য শিষ্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমী অধ্যাপক ও প্রচারক পাইয়া, কবি যথার্থই বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। তাই তাঁহার গীতবহুল নাটিকা 'ফাল্গুনী' খানি দীনেন্দ্রকে উৎসর্গ করার সময়, কবি নিজের তৃপ্তিকে এইভাবে আকার দিয়াছেন—"আমার সকল নাটের কাণ্ডারী, আমার সকল গানের ভাণ্ডারী" ইহা অত্যুক্তি নহে। দীনেন্দ্রনাথের প্রতিভায় ও প্রচেষ্টায় আজ সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আবৃত্তি-ভঙ্গী, বাই-প্লে (Bye play) সমন্বিত অভিনয়, ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত সঙ্গীত আলাপন আদরের স্থান পাইয়া নটনটীর কণ্ঠের মধ্য দিয়া শ্রোতৃ-বর্গের মনে নব নব আনন্দ উপভোগের হিল্লোল বহাইয়াছে।

দীনেন্দ্রনাথের শিক্ষায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর কণ্ঠে স্থায়ী আসন লাভ করিয়া ও তাহাদের জীবনযাত্রার ও জ্ঞান আহরণের পথে আনন্দবর্ত্তিকা রূপে থাকিয়া বাঙলার গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

পরন্তু শিক্ষাকেন্দ্রটিও সেই উৎসব আনন্দের স্মৃতিমণ্ডিত হইয়া শিক্ষার্থীদের নিকট যথার্থই স্নেহবৎসল মাতৃরূপা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই ভাব থাকায় বিদ্যালয়ের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ আজীবন অক্ষুন্ন থাকিবে ও স্বীয় সন্তান সন্ততিগণের নিকট স্নেহার্দ্রভাষণে তাহাদের শিক্ষা ও ক্রীড়াভূমি এই আলমা মেটারটী (Alma Mater) আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত কীর্ত্তিত হইবে। এই বিদ্যাপীঠটিকে সাধারণ [illegible] হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা পরিবেষ্টনের প্রভাব, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন, সখ্যতা, সহযোগীতা ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া মর্ম্মের ও সামাজিক বৃত্তি সমূহের বিকাশ সাধনে সঙ্গীত ও ঋতুতে ঋতুতে উৎসব বিধান, অন্তঃপ্রকৃতির এবং বিশেষভাবে যে সময়ে শিশুর মন অত্যন্ত নমনীয় থাকে ও কিঞ্চিৎ আয়াসে স্বাভাবিক অনুপ্রাণতায় সাড়া দিয়া কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করে, সে অবস্থায় শিক্ষায় একটা বিশেষ ছাপ

দিবার জন্য, রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ও আদর্শ থাকায়, দীনেন্দ্রনাথের সহজ মিশিবার ক্ষমতা ও রসসঞ্চারের বিবিধ চেষ্টা সত্যই কবির মনোগত অভিপ্রায়ানুযায়ী রসসিক্ত করিয়া স্থানটিকে অভ্যাগতদের মনে প্রকৃতই মানসলোকের আভাস দিতে সক্ষম হয়। এ বিষয়ে দীনেন্দ্রের ব্যক্তিত্ব কি পরিমাণে সাহায্য করে, তাহা তাঁহার বন্ধুবর্গের অবিদিত নাই। অন্ততঃ তাঁহার শিক্ষাদানের ফলে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির সুরের বাহার রত্নাকরের অতল গর্ভে নিহিত রত্নের মত প্রবাদ বচন না হইয়া লোকের কণ্ঠে জ্যোতিপ্রদ ও দোদুল্যমান হইয়া উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করে এবং তাহা বহুল প্রচারিত স্বরলিপিতে নানা দেশবাসীর, এমন কি, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের সঙ্গীতকলাবিদের কণ্ঠেও, প্রসারিত ও শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। আধুনিক যুগে থাকিয়াও দীনেন্দ্রনাথ স্বভাবজ সঙ্কোচের ফলে যন্ত্র সাহায্যে তাঁহার কণ্ঠের আবৃত্তি ও গানের স্থায়িত্ব দিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা করেন নাই এবং নবীন রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলেও প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের বয়োধিক্য বশতঃ এই সকল যন্ত্রের সাহায্য লওয়া ততটা সম্ভবপর হয় নাই।

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের এক প্রসিদ্ধ অভিনেতা আক্ষেপ করিয়াছেন "[illegible] পট সনে নট সকলি হারায়।" কিন্নরসুলভ মনোহারিণী বৃত্তিগুলি মানবের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক স্ফুরণে আসে ও অনুকূল অবস্থা সমাবেশে প্রকাশ পায়। সুতরাং তাহার বিকলতায় দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর [illegible] পাওয়া সম্ভবপর হয় না; এবং তাহাদের অনুকৃতির অক্ষমতায় [illegible] তাহা বাহির করাও চলে না। অনেক সময়ে সে চেষ্টায় অহঙ্কার [illegible] মিশ্রিত হইয়া তাহাকে ভিন্ন রূপ দেয়। বর্ত্তমানে শাস্ত্রকীর্ত্তি [illegible] রেডিও ও সবাক চলচ্চিত্রের দ্বারা মানবের এই আকাঙ্ক্ষা [illegible] কথঞ্চিৎ পূরণ হইয়াছে বটে, কিন্তু নব নব উত্তেজনা ও রুচির [illegible] অবরোহে সেগুলির কোনটিরই দীর্ঘকাল জনপ্রিয়তা [illegible] যেমন ছাপাখানার কল্যাণে গ্রন্থকারদের আয়ু পাঠক-পাঠিকার [illegible] বাড়িয়াছে, তেমনি কালোয়াৎদের অবাঙ্মনসগোচর [illegible]

জীবন বাড়িয়াছে, তবু সে যান্ত্রিক লিপি অপেক্ষা সাঙ্কেতিক লিপি, মানে শব্দ ছবি অপেক্ষা স্বরলিপির সুবিধা এই যে, পরবর্ত্তী মনিষীরা অনুকরণ না করিয়া অধ্যবসায় দ্বারা পুনর্জীবিত করিতে পারেন। সে কারণে বঙ্গ-দেশবাসীমাত্রেই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বাণীর যথাযথ ঝঙ্কারের জন্ম রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রসিদ্ধ স্বরলিপিকারদের নিকট ঋণী থাকিবে।

এই শিষ্যপরম্পরার গুরুমুখী বিদ্যার প্রবাহকে প্রাচীন গ্রীকেরা "স্কুল" (School) বলিতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া আধুনিক ইংরাজেরা বালকদের শিক্ষালয়কে এই আখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা ও কলাকুশলতার বৈশিষ্ট্যকে সেইরূপ একটি স্কুল আখ্যা দিতে পারি। তাঁহাকে যুগপ্রবর্ত্তক মঠাধীস "গুরুদেব" ধরিয়া তাঁহার আশ্রম-নিসৃত শিষ্য-প্রশিষ্য কণ্ঠোচ্চারিত সাহিত্য ও সঙ্গীতের নব মূর্চ্ছনার গঙ্গাধারাকে শঙ্খনিনাদী ভগীরথ-কল্প দীনেন্দ্র প্রদর্শিত পথে সুদীর্ঘ কাল বঙ্গদেশকে অমৃত রচনাভিসিক্ত হইতে দেখিব, এমত আশা পোষণ করিতে পারি। তাঁর সকল সাঙ্গীতিক ভাবের এ সকল সুরের মূর্ত্ত আধার—বোলপুর ও কলিকাতার তরুণ-তরুণীদের সকলের "দিনুদা", কবির আদরের নাতিটি সম্বন্ধে কবি সময়ে সময়ে আদর করিয়া বলিতেন "আমার গানের জন্যই দানুর জন্ম হইয়াছে।" ইহা কবির স্নেহের কথা না প্রশংসার উক্তি হিসাবে বড় কম নহে। সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী রবীন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিতে লেখেন—

"সপ্ত সুরের সাতটি ঘোড়া
চালায় যে গো ইঙ্গিতে,
বিশ্বাকাশের সেই রবিরে
বাঙ্গালা দেশের সেই কবিরে
কে পারে কথার রঙ্গে
রঙ্গিতে
তারে কে সুর শুনাবে
সঙ্গীতে।"

আমরা বলি দীনেন্দ্রনাথই সেই কবিকে যখন তখন সুর শুনাইতে পারিয়াছিলেন। সুধু কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীত নয়, ভারতের নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী হিন্দু-সঙ্গীতের আর একটি বিভাগ দৃশ্য কাব্যের প্রেক্ষাগৃহে প্রযোজনায়, নাটকীয় কলাতে ও কবির মনোমত অভিনয় করিতে দীনেন্দ্রনাথ কতকটা সমর্থ হইয়াছিলেন।

কবির নিজের অভিনয়সঙ্গীদের মধ্যে কৌতুকাভিনয়ে অবনীন্দ্রনাথ ও গম্ভীর অংশে উঁহার ভ্রাতৃদ্বয় গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ বিশেষ যশস্বী ছিলেন। তাঁহাদের বাটিতে পারিবারিক অভিনয় মজলিসে একবার কবিকে খ্যাতনামা অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির সহিত রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিতে হয়। মুস্তফি মহাশয়ের অঙ্গভঙ্গি ও স্বরের কারুকার্য্য এত সূক্ষ্ম ও প্রচুর ছিল যে, সহযোগী অভিনেতাদের পক্ষে নিজ ভূমিকায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ রাখা কঠিন হইত। আমরা কবির নিজ মুখে শুনিয়াছি যে অতটা ষ্টেজ ফ্রি (Stage free) এক্টরের সহিত মঞ্চে নামিতে তাঁহাকে সদা সতর্ক থাকিতে হইত এবং তাহাতে তাঁহার নিজের অভিনয়-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত হইত। কবি স্বাভাবিক হাবভাবের পক্ষপাতী হইলেও বিশেষ ভাব ব্যঞ্জনার জন্য স্বরের ও বলিবার ধরণের এবং উচ্চারণের কতকটা কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন, অন্যথা নাটকের প্রাণস্বরূপ কথোপকথনের সুস্পষ্ট ছাপ দর্শকের মনে অঙ্কিত করা যায় না।" পুরাতন [illegible] ভূমিকায় যথাযথ স্বভাব অভিনয়ে, তাঁহাদের পরিবারে বহুকাল [illegible] বাবু মতিলাল চক্রবর্ত্তী "বৈকুণ্ঠের খাতায়" 'ঈশান' চরিত্রটিকে [illegible] মনোরম করিয়া প্রসিদ্ধি দান করেন যে, যখনি ঐ পুস্তক [illegible] পুনরভিনয় হইয়াছে, তখনই তাহাতে তাঁহার অবতরণ [illegible] খোলাপ্রাণ মতিবাবু একপ্রকার তিন পুরুষের [illegible] উপযুক্ত অভিনেতার সমাবেশ কবিকে নূতন নূতন নাটক রচনায় [illegible] সাহিত করে। তাঁহার বাল্যকালে কৃত "নব নাটকের [illegible] গুণু-দাদা ও জ্যোতি-দাদার উৎসাহে হয়। পরবর্ত্তী কালে ঐ [illegible]

অভিনেতা তাঁহাদের অভিনয় লীলার সঙ্গী হন। উভয়ের প্রতি কবির আন্তরিক প্রীতি ছিল। তন্মধ্যে মতিবাবু অন্যতম। তিনি নব নাটকে "কৌতুকের" ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। গগনেন্দ্রবাবুর অঙ্কিত মতিবাবুর চিত্র রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের "ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্যে" স্থান পাইয়াছে। অপরের নাম বাবু অক্ষয় চন্দ্র মজুমদার। নিমতলা ষ্ট্রীটে তাঁহার বাস ছিল। যদিও তিনি 'বড়'দের বন্ধু, তবুও পরিণত বয়স পর্য্যন্ত এ পরিবারের ছোটদের সহিতও তাঁহার সৌহার্দ্দ্য অটুট ছিল। তাঁহার চিত্র কোথাও রক্ষিত নাই; তবে সকলেই তাঁহাকে বড় অক্ষয় বাবু বলিতেন ও তাঁহার অভিনয়-চাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ছোট অক্ষয় বাবুর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাব্যকানন পরিভ্রমণে সহচর বিহঙ্গম। কি গম্ভীর, কি হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল ভূমিকা, উভয়েই, বড় অক্ষয় বাবু খুব স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দিতে পারিতেন। বাঙ্গালার স্থায়ী সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রবর্ত্তক রূপে রসরাজ অমৃতলাল বসু ও নটকুলশেখর অর্দ্ধেন্দুশেখর ওরফে মুস্তফী সাহেব সুপরিচিত এবং বিশিষ্ট অভিনয়-ভঙ্গীর জন্য খ্যাত। তথাপি সাধারণে নট ও নাট্যকাররূপে বাঙলার সাধারণ নাট্যশালার পরিপালক বলিয়া স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষকে অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা কেহই রবীন্দ্রনাথের নাটক লইয়া শিক্ষাদানে কোনও দিনই অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া দর্শকের প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হন নাই। আমরা মুস্তফী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, যখন তিনি তরুণ বয়সে জোড়াসাঁকো হাটার সখের থিয়েটারে "কিছু কিছু বুঝি"র অভিনয়ে কতিপয় ভূমিকা লন, তখন তাঁহার রঙ্গমঞ্চের ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান অক্ষয় বাবুর বঙ্গনাটকের "সধবেশে"র অভিনয় হইতে সংগৃহীত হয়। জোড়াসাঁকো বাড়িতে "বাল্মীকি প্রতিভার" অভিনয়ে দস্যুসর্দ্দারের ভূমিকায় গানে ও বাক্যব্যঞ্জনায় এমন হাস্যরস ফুটাইয়াছিলেন যে, ল্যান্সডাউন লাটপত্নী সে রাত্রের অভিনয়ে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেন ও বলেন "He is my

man" বলিয়া সাজঘরে (Green Room) যাইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করেন। তিনি "Bengal Theatre"এতেও দু'একবার বাহির হন। মজুমদার মহাশয় রঙ্গমঞ্চের বাহিরেও সরস বাক্য ভঙ্গিতে বেশ মজলিসি লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। শুধুই যে তিনি অন্য অভিনেতাদের অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন ও ঠাকুরবাড়ীর তরুণ অভিনেতা-দের সমাদৃত সহায়ক ছিলেন তাহা নহে, বর্ত্তমান বাংলা ভাষার কয়েকটি অতুলনীয় সম্পদ তাঁহার অভিনয় কুশলতাকে ক্ষেত্র দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ও তাঁহারই অভিনয় দ্বারা উচ্চ শিক্ষিত সমাজে উহা প্রচারিত হয়। পট, পরিচ্ছদ ও রঙ্গমঞ্চের সাহায্য না লইয়া, শুধু বৈঠকখানায় বন্ধু সমাগমে যে ভাঁড়ামি-বর্জ্জিত-বিশুদ্ধ-সাহিত্যিক-রসদ্বারা ভদ্র মহোদয়ের নাটকীয় স্পৃহা এবং গল্পরসের আনন্দ একাধারে উপভোগ্য ও চরিতার্থ করা যায়, তাহা কবি তাঁহারই ব্যঞ্জনায় সপ্রমাণ করেন। এই নব প্রকার একাত্মক অভিনয়ের কল্পনা রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতে রচিত পুরাতন "ভাণের" অনুসরণে লেখেন। বস্তুগত পার্থক্য তাঁহার নিজস্ব। বালকদের অভিনয় সাহায্যার্থ "মুকুট" এবং বিবিধ হেঁয়ালী নাট্য তাঁহার ভগ্নি স্বর্ণকুমারীর ও ভ্রাতৃজায়া জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহে রচিত হয়। সেইরূপ বালিকাদের জন্য পুরুষবর্জ্জিত নাটিকা "মায়ার খেলা" প্রণয়ন করেন। পুরুষ দ্বারা স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়ের তিনি বরাবর বিরোধী, তাহাতে অভিনয়ের মাধুর্য্য নষ্ট হয়। স্ত্রীবিরল নাটক "গোড়ায় গলদ" ও স্ত্রীবর্জ্জিত [illegible] নাটক "বৈকুণ্ঠের খাতা", অভিনয়পটু পুরুষ বান্ধবদের জন্য রচিত হয়। এই অভিনয় উপলক্ষে নাটোরের মহারাজা ৺জগদীন্দ্রনাথ রায় ও প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺হেমচন্দ্র বসু মল্লিকের সহিত কবির যে সখ্যতা হয়, তাহা পরে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া, তাঁহাদের জীবিত কাল অবধি অটুট ছিল।

বড় অক্ষয়বাবুর জন্য লিখিত "বিনি-পয়সার ভোজ" [illegible] "স্বর্গপ্রাপ্তি" এবং "হঠাৎ অবতার" আজও জনসাধারণের প্রীতি [illegible] স্বচ্ছ হাস্য ও আনন্দ বিতরণ করিতেছে। এগুলির অভিনয়ে বক্তাকে

এমনভাবে গতিবিধি ও কথাবার্ত্তা চালাইতে হয়, যাহাতে সহযোগী অভিনেতার অস্তিত্ব প্রকৃতপ্রস্তাবে না থাকিলেও দর্শকদের মনে তাহাদের উপস্থিতির ভ্রান্তি আনয়ন করিতে পারে। দর্শকের কল্পনা-শক্তিকে উদ্রেক করা প্রাচীন নাটক অভিনয়ে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। সেক্স-পিয়ার (Shakespeare)এর 'নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন'তে (A Mid-Summer Night's Dream) বটামের (Bottom) উক্তিতে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দেশে প্রচলিত যাত্রা পাঁচালিতেও ইহা বিদ্যমান। বালি ও জাভা দ্বীপে পৌরাণিক দৃশ্য অভিনয়েও সীন প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে খোলা ময়দানে এরূপ আমোদের কথা সিংহলের ডাক্তার আনন্দ কুমারস্বামী বলেন। অধুনা কলিকাতাবাসীরা দাক্ষিণাত্যের "কাথাকালী" নৃত্যাভিনয়েও ইহার আভাষ পাইয়াছেন। গ্রীক ড্রামায় হত্যা প্রভৃতি বীভৎস রসের অভিনয় রঙ্গমঞ্চে নিষিদ্ধ। কিন্তু কথোপ-কথনের ভিতর দিয়া দর্শকের মনে সে নিদারুণ ঘটনার মর্ম্মন্তুদ ছাপ দিবার ব্যবস্থা আছে। যদিচ ইংরাজি স্যারেডের (Charade) ছায়ায় হেঁয়ালি নাট্য রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা নিতান্ত অপগণ্ড দল ভিন্ন বড় একটা [illegible] স্থান নাই। যুবক-যুবতীর অভিনয়োপযোগী acting [illegible] চেষ্টা করেন নাই, তবে মানসিক ও সামাজিক প্রহেলিকা [illegible], পরিণত বয়সে যে সকল সামাজিক নাটক তাঁহার লেখনী-[illegible] হইয়াছে, তাহা উপরিলিখিত শ্রীমান শিশির ভাদুড়ি ও শ্রীমান [illegible]দের বিপুল চেষ্টা ও উৎসাহী তরুণদের সাহায্য ব্যতীত কখনই [illegible] দৃশ্যকাব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া সাধারণ রঙ্গালয়ে স্থান [illegible] রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ', যাহা পরে "শেষরক্ষা" আখ্যা [illegible] শিশির কুমারের প্রযোজনায় এত মনোরম হয় যে, ক্রমান্বয়ে ত্রিশ [illegible] অভিনীত হয়। শিশির কুমার 'চন্দ্রবাবু' সাজিতেন। ভবানীপুর সঙ্গীত সমাজ ও বহুবাজার ওল্ড ক্লাবের সুযোগ্য অভিনেতা ও গায়ক বাবু [illegible]কড়ি চক্রবর্ত্তিকে পাইয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চের পরিচালকেরা রবীন্দ্রনাথের

"চিরকুমার সভা" পুনঃ পুনঃ অভিনয়ে সাফল্য অর্জ্জন করেন। তিনকড়ি বাবু "অক্ষয়ের" ভূমিকায় ও অহীন্দ্রবাবু "চন্দ্রবাবুর" চরিত্রে কবির মনোমত রূপ দিতে সক্ষম হন। কবিও উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের 'গৃহ প্রবেশ'ও আদৃত হইয়াছিল। শিক্ষাকালীন শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমান দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাদানে রঙ্গালয়ের আচার্য্যদের বিশেষ সহায়তা করেন। পূর্ব্বযুগের অভিনেতাদের ইহা অপেক্ষা সহজ বহি লইয়া অকৃতকার্য্যের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের নাটকের স্ত্রী-চরিত্রগুলির রুচিসঙ্গত সম্যক প্রকাশ, সুনিপুণা সন্তর্পণশীলা অভিনেত্রী ব্যতীত একপ্রকার অসম্ভব। 'নাট্য-নিকেতন' প্রতিষ্ঠা ও 'সীতা'রঅভিনয় হইতে (ইং ১৯২৭) বঙ্গ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে একটি নব যুগের সূত্রপাত ও প্রফেসার শিশির কুমার ভাদুড়ি এম, এ, প্রমুখ অভিনেতাদিগকে ইহার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। তিনি নট, শিক্ষাচার্য্য ও নাট্যকার হইয়া পরে "রীতিমত নাটক" ও তাহার ছায়াচিত্ররূপ 'টকি অফ টকিসের' প্রযোজনা করেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে ও অভিনেত্রীদের অধ্যবসায়ে সামাজিক নাটকের অভিনয় কলা এখন উৎকর্ষতা লাভ করিয়া সাধারণের প্রীতিকর হইয়াছে [illegible] বহুকাল দর্শক সুধীজনকে আনন্দ দিতে থাকিবে।

শিশিরকুমারের অভিনয়ভঙ্গি ও সুস্পষ্ট উচ্চারণের রীতি [illegible] শেষভাগ প্রলম্বিত করিবার প্রথা এক্ষণে বাঙলার সর্ব্বত্র পরিচিত [illegible] কি, সুদূর পল্লিগ্রামে ও গণ্ডগ্রামেও উদীয়মান সখের নাট্যদের [illegible] ও শ্লাঘার বস্তু। তিনি নিজে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপনা [illegible] করিয়া, দেশের অল্পশিক্ষিতগণের রুচি সংশোধন মানসে [illegible] রস-পরিচায়ক চারুশিল্পের উন্নতি আনয়ন প্রয়াসী হইয়া, এই জীবনে আত্মনিয়োগ করেন। বাঙ্গালী নটনটী ও রঙ্গমঞ্চ পরিচালনকারী শিল্পী [illegible] অসমসাহসের সহিত মার্কিন ভূখণ্ডে ইংরাজীভাষী [illegible] সমক্ষে অভিনয় দেখাইয়া আসিয়াছেন। [illegible] রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য

এমেরিকা ও ইংলণ্ডে তাঁহার দেখা হয়। কবিও তাঁহাকে সাদর আপ্যায়ন করেন ও দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্ম তাঁহাকে আদেশ করেন। তিনি বলেন, তাঁহাদের মেরিট (merit) যেরূপ আছে, তাহাতে দেশের লোকের সেবায় নিয়োগ করিলে ঢের বেশী কাজের মত কাজ হইবে, বিদেশে শুধু তার অপচয় হইবে। উপরন্তু তিনি সেই সকল দেশে থাকিয়া যে ঐশ্বর্য্যের ঔজ্জল্য ও বিলাস দেখিয়াছেন, ও তৎপার্শ্বে এত ভীষণ দৈন্ত ও দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ও তাহাদের পোলিটিকাল ও ভারতীয়ের প্রতি মনোভাবের সহিত পরিচিত হইয়াছেন যে, জাতি হিসাবে পাশ্চত্যগণকে আর তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার কোন স্বদেশবাসী সেখানে থাকিয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ বা সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে। উপার্জ্জনের ও তাহা হইতে ব্যয় সঙ্কুলানের বিশেষ আশা তিনি করেন না। মৎপুত্র শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ এই ভ্রমণকারী দলে Stage Artist রূপে সংযুক্ত ছিলেন, এবং কবির সহিত দেখা করিবার সময় শিশির কুমারের সাথে ছিলেন। তাঁহারই মুখে কবির এই বাণীর কথা শ্রবণ করি। কবি তাঁহাকেও বিশেষ যত্ন করেন ও অঙ্কন বিছার উন্নতির জন্ম চেষ্টিত হইতে বলেন ও দেশেতেই যে তাহার ক্ষেত্র, তাদৃশ অর্থকরী না হইলেও এবং যথেষ্ট আছে, সে বিষয়ে মনোযোগী হইয়া বাড়ি ফিরিতে বলেন। ডাক্তার দিলীপকুমার রায় সঙ্গীতচর্চ্চার জন্ম পাশ্চত্য দেশে বহু ভ্রমণ করিয়াছেন ও বিদেশে কবিবরের সাক্ষাৎলাভ ও ঘনিষ্ঠ সংযোগের সুযোগ পান। তাঁহার সহিত কবির একটি কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব। 'তীর্থঙ্কর' পুস্তকের ২২৪ পৃষ্ঠায় দিলীপ কুমার লিখিতেছেন :—

কবি খুব মনদিয়া শুনিলেন, পরে ধীরে ধীরে এক এক করে, বলতে লাগলেন—

আমার পয়লা নম্বর প্রশ্নের উত্তরে গোড়ায়ই আমি বলে রাখতে চাই যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভালোবাসি—বাল্যকাল থেকেই—আর মনে করি ভালোবাসা উচিত। প্রতি সুন্দর সৃষ্টি পুরানো

হলেও রসিকের মনে আনন্দের সাড়া তুলবে, এই ত হওয়া উচিত। যাঁরা সত্যিকার ভাল হিন্দুস্থানী গান শুনেও বলেন—ও 'কী তা-না-না-না মেও মেও বাপু ও ভাল লাগে না' তাঁদেরকে আমি বলব:—"তোমার ভাল লাগে না এজন্যে তোমাদের সঙ্গে তর্ক করব না—কেননা রুচি নিয়ে তর্ক নিষ্ফল—কেবল বলব তোমরা এ কথা সগৌরবে বোলো না, লক্ষ্মীটি! কারণ ভালো জিনিষ ভালো না লাগাটা লজ্জারই বিষয়, গৌরবের নয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠশ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যখন সত্যই সঙ্গীতের একটি মহৎ বিকাশ, তখন সেটা যদি তোমাদের কারুর ভালো নাও লাগে তো সলজ্জেই বোলো—লাগল না, বোলো—ও রসের রসিক হবার কোনো সাধনাই করি নি বা করবার সময় পাই নি, নইলে ভাল লাগত নিশ্চয়ই।"

ইহা ত সাধারণভাবে বলিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা অন্তরতর ও কবি-জনোচিত গভীরতর অনুভূতির কথা ইতিপূর্ব্বে ১৩২৪ ভাদ্রের "সবুজ পত্রে" তিনি স্বীয় লেখনীমুখে ব্যক্ত করেন। তাহা হইতে পাঠকদের তৃপ্তির জন্য কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আমাদের মতে **রাগরাগিনী** বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে; সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, সে যেন সমস্ত জগতের। **ভৈরোঁ** যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; **পরজ** যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রা-বিহ্বলতা; **কানাড়া** যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ-বিস্মৃতি; **ভৈরবী** যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা; **মুলতান** যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি নিশ্বাস; **পূরবী** যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন; ভারতবর্ষের সঙ্গীতে মানুষের মনে বিশেষভাবে এই বিশ্ব রসটিকেই রসিয়ে তোলবার ভার নিয়েছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ ক'রে প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়। তাই যে সাহানার সুর অত্যন্ত ও গভীর যাতে আমোদ আহ্লাদের উল্লাস নাই, তাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিনী। নরনারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে

সেটিকে সে স্মরণ করাতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের সাধনা তারি বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তিবিশেষের বিবাহ ঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয়। * * *

তবু যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিনীর এলাকা একেবারে পার হোতে পারি নি। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই চলবে। কেননা আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধে না। * * *

তবে কিনা এও নিশ্চিত যে আমাদের গানে হার্মনি (স্বর-সঙ্গতি) ব্যবহার করতে হলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হবে। অন্তত মূল সুরকে সে যদি ঠেলে চলতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে স্পর্দ্ধা হবে। * *

অতএব আমাদের গানের পিছনে যদি স্বানুচর নিযুক্ত থাকে তবে দেখতে হবে তারা যেন না পদে পদে আলো হাওয়া আটকায়। *

—একহাতে রাজদণ্ড, অন্যহাতে রাজছত্র, কাঁধে জয়ধ্বজা এবং মাথায় সিংহাসন বয়ে রাজাকে যদি চলতে হয়, তবে তাতে বাহাদুরী প্রকাশ পায় বটে কিন্তু তার চেয়ে শোভন ও সুসঙ্গত হয় যদি এই আসবাবগুলি নানা স্থানে ভাগ করে দেওয়া হয়। তাতে সমারোহ বাড়ে বই কমে না। আমাদের গানের যদি অনুচর বরাদ্দ হয় তবে সঙ্গীতের অনেক ভারী ভারী মালপত্র ঐ দিকে চালান ক'রে দিতে পারি।"

—রবীন্দ্রনাথ—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গার্হস্থ্য জীবন

১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গ হঠাৎ একখানি পত্র পাইয়া বেশ একটু বিচলিত হইলেন। কারণটি আর কিছুই নয়, পত্রের লেখক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানাইতেছেন যে, পরবর্ত্তী ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে তাঁহার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভ-বিবাহ, এবং সেই বিবাহ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য বন্ধুদের সাদর আহ্বান করিতেছেন। এ বিবাহে তাঁহাদের কুলপ্রথামত কন্যা আসিয়াছিলেন যশোহর হইতে। তাঁহার বৌ-ঠানদের মধ্যে বড়, মেজ যশোহরের কন্যা; সেজ ও ন, হাওড়া সাঁতরাগাছির মেয়ে এবং সর্ব্বশেষটি ছিলেন কলিকাতা হাড়কাটা গলির গাঙ্গুলীর কন্যা। কবি স্বয়ং পাত্রী দেখিয়া যশোহর দক্ষিণডিহি নিবাসী শুকদেব রায় চৌধুরীর বংশসম্ভূত বেণীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবীকে মনোনীত করেন। বিবাহ-রাত্রির পূর্ব্বেই তাঁহার নূতন নাম হয় শ্রীমতী মৃণালিনী এবং সেই নামেই তিনি শ্বশুরবাড়ীতে আজীবন পরিচিত ছিলেন। মৃণালিনী দেবীর বিবাহের সময় বয়স ছিল ১১ আর কবির বয়স ২২। [illegible] তিনি কবির প্রতিযোগিনী ছিলেন না বটে, কিন্তু এমন একটা লাবণ্য-শ্রী মণ্ডিতা ছিলেন যে কবি আকৃষ্ট হন। বিবাহের আশীর্ব্বাদী স্বরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথের 'যৌতুক কি কৌতুক' রচিত হয়। তাহার শেষের দিকে একটা ছদ্মবেশী 'উৎসর্গ' বা 'উপসর্গ' আছে—

শর্ব্বরী গিয়াছে চলি'। কিজরাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতিক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
গন্ধ-হীন দু-চারি রজনী-গন্ধা ল'য়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথি' কেলি অসময়।
সঁপিল রবির শিরে বলি এই 'আশিষি তোমারে
অনিন্দিতা স্বর্ণ মৃণালিনী হো'ক্—
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার !' কুরূপার কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক্।"

ঐ মিলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কোনও কাব্য রচিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া তাঁর জীবনে অনেক উচ্ছ্বাসলীলা বহিয়া গিয়াছে। বিবাহের পর নব বধূকে বিদ্যাশিক্ষা ও গার্হস্থ্য শিক্ষা দানের ভার লন হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রী শ্রীমতী নীপময়ী দেবী। হেমেন্দ্রনাথের কন্যাদের সহিত বধূকেও লোরেটো গার্ল স্কুলের (Loretto) ছাত্রী করিয়া দেওয়া হইল। সেখানে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা, পিয়ানো ও সঙ্গীত প্রভৃতির চর্চ্চা চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষা, কলিকাতার অভিজাত পরিবারের আদবকায়দা ও সুচারু গৃহস্থালী শিক্ষা আরম্ভ হইল। যশোহরাগতা বধূদের একটা বিশেষ শিক্ষণীয় ছিল যশোহরের উচ্চারণ-ভঙ্গির সংশোধন। এ বিষয়ে তাঁহাদের স্বাভাবিক আগ্রহ ও পুরমহিলাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ভয় থাকায়, তাঁহারা দ্রুত অগ্রসর হইতেন ও শীঘ্রই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতেন। কেবল ধরা পড়িতেন "পাচের ফাদে"—অর্থাৎ আনুনাসিক উচ্চারণে। গৃহস্থালী ব্যাপারে বিশেষতঃ রন্ধনে তাঁহাদের সহজাত প্রতিভা থাকায় অচিরে যশস্বিনী হইতেন। ইহার প্রথম পাঠ, যদিচ পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিতে হইত, তাঁহাদের যশোহরাগতা শ্বশ্রূঠাকুরাণীরা, নিজ নিজ বাল্যাবস্থা স্মরণ করিয়া, মাছের ঝোলে নববধূর হাত পরীক্ষা করিতেন। চৈ দিয়া কৈ ভিন্ন রন্ধনে অপটুতা মা ও মাসীর শিক্ষাদানের গঞ্জনার কারণ হইত। রবীন্দ্রগৃহিণীর শ্বশ্রূ বর্ত্তমান না থাকিলেও, পরীক্ষার অভাব হয় নাই।

মহর্ষি একদিন বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়ীর রোজের ব্যঞ্জন ছিল 'ডাল—মাছেরঝোল—অম্বল', 'অম্বল—মাছেরঝোল—ডাল'। বড়ি ভাজা, পোর ভাজা, আলুভাতে ছিল ভোজের অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই কিন্তু শুধু ডাল-ঝোল-অম্বলে কুলাইত না। তখন ঐ বাড়ীতে বিভিন্ন প্রকার আমিষ ও নিরামিষ রন্ধন ও নানাজাতীয় মিষ্টান্ন পাক কন্যা ও বধূদের শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রজ্ঞা-সুন্দরী দেবী তাঁহার "আমিষ ও নিরামিষ আহার"এ তাহার পরিচয় দিয়াছেন। শুধু ঠাকুরবাড়ীর আহারে কেন, দশ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত বাঙালীর সামাজিক শুভ কার্য্যের আহার্য্যে সকল প্রকার সভ্যতার ছাপ পাওয়া যাইত। বিত্তশালীর বাড়ীর ভোজের নিমন্ত্রণের একটি পাতেই ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ছিল। বৈদিক যুগের আনন্দ নাড়ু, তিলের নাড়ু, বড়া, পুপ; খাঁটী বাংলার বাহান্ন ব্যঞ্জন; মাড়োয়ারীর পুরী-কচৌরী-পাঁপড়-বালুসাই মিঠাই-লাউকি-লাচ্চা; বসাকশেঠেদের আচার ও রকমারি মোহনভোগ (হালুয়া), রাধাবল্লভি, জৈন জহুরীর নানাপ্রকার বরফি ও পেঁড়া; খাস বাংলার ছানার মিষ্টি; মোগলের কাবাব-কোপ্তা-কালিয়া; ইংরাজের চপ্-কাটলেট্-কেক-বুঙ্গাল্-আইসক্রীম; ফরাসী সালাদ্ আইরিশ ষ্টু প্রভৃতির সম্মেলন ধনীগৃহে দেখা যাইত। রবীন্দ্রনাথের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ঋতেন্দ্রনাথ তাঁহার 'মুদির দোকান' পুস্তকে বৈদিক সাহিত্য হইতে লুচি-কচুরীর আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ যদি বিংশ শতাব্দীর বাঙালী ভোজের আহার্য্যগুলির ইতিহাস লইয়া গবেষণা করেন, তাহা হইলে বাংলার সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে অনেক কিছু তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক, উপরের তালিকার অনেকগুলি মৃণালিনী দেবীর [illegible] হইয়াছিল। সর্ব্বোপরি নারিকেলের নানাপ্রকার মিষ্টান্ন তাঁহাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়াছিল। তখনকার দিনে ঠাকুরপরিবারে ও তাঁহাদের আত্মীয়দের মধ্যে আমসত্ত, আচার, বড়ি, আমকাসুন্দি প্রভৃতি কেহ বাজার হইতে

খরিদ করিত না। এ সকল জিনিষ গৃহের বধূ ও কন্যারা বাড়ীতে তৈয়ারী করিতেন। তাঁহাদের যশোহরস্থ আত্মীয়েরাও ঐ সকল দ্রব্য গৃহে সযত্নে প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় তত্ত্ব করিতেন, আর পাঠাইতেন নলেন-গুড়ের পাটালি, কুলের বড়ে, ঘৃতকলম্বা লেবু, চইলতার মূল, দীর্ঘাকৃতি মানকচু। এ সকল উপঢৌকন ঠাকুরবাড়ীর সকলেই আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন ও ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। ঘৃত ও শর্করাযোগে এই মানকচুর মুড়কি ও মালপো প্রস্তুত হইয়া জলখাবারের মিষ্টান্নের রকমফের জোগাইত। আমরা শুনিয়াছি, এই মিষ্টান্নপাকেও কবি-জায়ার যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। নূতন ঝুনি রাই-এ তৈয়ারী তরল ঝাল কাসুন্দী, আলুভাতে ও শাকভাজার পারিপাট্য বিধান করিত। এটি ঠাকুরপরিবারের একটি বিশেষত্ব। পূর্ব্বে ইহার জন্য শুভ অক্ষয় তৃতীয়াতে ষোড়শোপচারে গঙ্গাপূজা করিয়া নূতন সরিষা ধোওয়া হইত। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দিনের পরে ঢেঁকি পূজা করিয়া সরিষা কোটা ও টগবগে গরম জল, মসলামিশ্রণ ইত্যাদি নানাবিধ কুলাচার প্রথা অর্থাৎ মেয়েলী 'রীত' আচরিত হইত। নমুনা স্বরূপ নূতন ভাঁড়ে করিয়া কুটুম্বগণের সহিত এই ঝালকাসুন্দীর আদান প্রদান হইত। ইহার প্রস্তুত-প্রণালীর কৌশলেও মৃণালিনী দেবী দীক্ষিতা হন, যদিও পৌত্তলিক আচার লোপ হওয়ায় তাঁহাকে আর রীতরক্ষা লইয়া ব্যস্ত হইতে হয় নাই। নববধূর পরিমাপজ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনের জন্য বাড়ীর দৈনন্দিন প্রধান অনুষ্ঠান পানসাজা ব্যাপারে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইত। রন্ধনে কিরূপ পারদর্শিনী হইবেন তাহা তাঁহার হাতের 'সাজাপান' দেখিয়া পুরমহিলারা ভবিষ্যৎ বাণী করিতেন। এই পানের মসলার প্রধান অঙ্গ ছিল কেয়াখয়ের। তাহাও ঠাকুরপরিবারে সকল বাড়ীতেই মেয়েরা প্রস্তুত করিতেন। শুধু নিজেদের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, গৃহদেবতার যাবৎ সেবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ব্যবহারার্থ বিশুদ্ধভাবে এই খয়ের প্রস্তুত হইত। প্রাচীনা গৃহিণীরা বলিতেন যে, শ্রাবণমাসের মধ্যে ইহা

প্রস্তুত না হইলে দেবতাকে দেওয়া যায় না, কারণ শ্রাবণ পর্য্যন্ত কেয়া কেয়াই থাকে, ভাদ্রে কেতকী হইয়া যায়। কেয়া ও কেতকীর এই যে অর্থভেদ তাহা কোন্ অভিধানে লেখে আমরা জানি না। অবশ্য শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই মহর্ষিপরিবারে এই বিশেষ পাট উঠিয়া যায়। পরে কেবল নিজেদের জন্যই কেয়াখয়ের প্রস্তুত হইত। পুরমহিলাদের শিল্পচর্চ্চার মধ্যে ছিল নানাপ্রকারের কেশরচনা, বেলফুল জুঁইফুলের সময় মাল্যরচনা ও গুড়গুড়ির মুখনলের জন্য বেলফুলের ঝুরি তৈয়ারী। ইহা ভিন্ন নানাবিধ উলের কাজ, ক্রুসের বোনা, সূতার টুপি ও জুতা, পুঁতির জুতা, দশ পঁচিশের ঘর, টাকার থলি বা গেঁজে আল-বোলার নল ঢাকা পুঁতির গেলাপ তাঁহারা তৈয়ারী করিতেন। মখমলের উপর সলমা-চুমকির কাজ করা টুপি ও জুতা নির্ম্মাণে পুরমহিলারা শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিতেন। গৃহসজ্জার জন্য দেয়ালগাত্রে বিলম্বিত সূচী-ছবি শিল্পের তখনও ফ্যাসান হয় নাই। ঠাকুরবাড়ীতে নূতন বধূ আসিলে এই সকল বিষয়ে তালিম দেওয়ার নিয়ম, সময় এবং ব্যবস্থা ছিল। তাহার দরুণ বাহিরের লোকের সাহায্য লওয়া আবশ্যক হইত না এবং রেওয়াজ ছিল না। এই নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁহাদের জীবন গঠিত হওয়ায়, শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবী ও শ্রীযুক্তা হেমলতাদেবী বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় হইতে পারিয়াছিলেন। সুন্দর আকৃতিতে মৃণালিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ না হইলেও, হৃদয়ের ঔদার্য্যে ও প্রকৃতির মাধুর্য্যে, শ্বশুরবাড়ীর শিক্ষায় এবং রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে কবির উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজি সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগিনী ছিলেন এবং ঐ তাঁহার কথা-সাহিত্য পাঠ তাঁহার অবসর বিনোদনের প্রিয়বস্তু ছিল। বাংলা সাহিত্যের আদর করিলেও, কোনও কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দেন নাই। শিল্প-কলায় তাঁহার যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। বিচিত্রতায় সম্ভোগ-ভবনে 'রাজা ও রাণী' অভিনয়ে তিনি নারায়ণীর ভূমিকায় এবং স্বর্ণকুমারী দেবী ও

মিসেস পি, কে, রায় প্রবর্ত্তিত সখী-সমিতি ও মহিলা শিল্পমেলায় কয়েকবার সু-অভিনয় করিয়া যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সকল বিষয়েই স্বামীর সহকর্ম্মিনী হইবার চেষ্টা করিতেন। বোলপুরে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর রবীন্দ্রনাথ যখন অর্থাভাবে ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়েন, তখন তিনি অম্লান বদনে নিরাভরণা হইয়া স্বামীকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি ছাত্রদের স্নেহময়ী মাতৃ-স্বরূপিনী হইয়া আহারাদির সুব্যবস্থা ও তাহাদের সকলপ্রকার তত্ত্বাবধান করিতেন।

গতানুগতিক ভাবে কাজ করা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সকল কাজেই তাঁহার 'ওরিজিন্যালিটি' বা মৌলিকতা। তিনি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধেও মনে মনে একটা আদর্শ খাড়া করেন। সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য বৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে তিনি পত্নীকে মিলাইয়া যাইতে দেন নাই।

তাঁহার প্রথম সন্তান মাধুরীলতার জন্ম হয় ৯ই কার্ত্তিক ১২৯৩ সালে। এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে শিশুপালনে পত্নীকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। যে সকল কার্য্যের ভার সম্পূর্ণ মেয়েদের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহার অনেক অংশ তিনি সানন্দে নিজ হস্তে লন। ক্রমে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ১৩ই কার্ত্তিক ১২৯৫ সালে, দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা ১৯শে মাঘ ১২৯৭ সালে, তৃতীয়া কন্যা অতসী ২৯শে পৌষ ১২৯৯ সালে এবং কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের লালনপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশমত হয়। রথীন্দ্রনাথের শিক্ষার সময়েই রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট অনুভব করিলেন যে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকিয়া প্রচলিত শিক্ষার বিধানে প্রকৃত মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে না। তিনি তাই, কলিকাতা হইতে সরিয়া গিয়া শান্তিনিকেতনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। রথীন্দ্রনাথ ও কয়েকটি বালককে লইয়া তাঁহার নিজ

আদর্শ মত শিক্ষাদান সুরু হইল। ফলে কোনও বিদ্যালয়ে না গিয়াও রবীন্দ্রনাথের সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষা পাইলেন ও শিক্ষার হেরফেরের হাত এড়াইলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' দেখিলে এ কথার ও তাঁহার আদর্শের যথার্থতা বুঝিতে পারিবেন।

শিশুপালনের মত গার্হস্থ্য জীবনের অন্যান্য অনেক কাজেই তাঁহার সাহায্য দানে মৌলিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। যখন কবিপ্রিয়া সহস্তে কোনও ব্যঞ্জন রন্ধনের বা মিষ্টান্ন পাকের আয়োজন করিতেন, কবি তখন তাঁহার পার্শ্বে টুল লইয়া বসিয়া প্রচলিত নিয়মে প্রস্তুত করিবার পরিবর্তে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন ও উপকরণাদির নানারূপ যোগ-বিয়োগের পন্থা নির্দ্দেশ করিতেন। তাহাতে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহা কখনও বা সুখাদ্য কখনও বা অখাদ্য। ইহাকেই কবি বলিতেন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরীক্ষা। নিজের উপরেও পরীক্ষা চালাইতে কবি বিরত থাকিতেন না। কখনও কেবলমাত্র ফলাহার, কখনও ভিজে কাঁচা মুগের ডালের উপরে স্যানাটোজেন ছড়াইয়া খাদ্যের ভিটামিন সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন, কখনও নিয়মিত অন্নের পরিবর্ত্তে অকারণে খালি ছাতু বা সুজির হালুয়া খাইয়া দিন কাটাইতেছেন, আবার কখনও মৎস্য মাংসে রকমারি আমিষাহার, কখনও শুদ্ধ নিরামিষভোজী, কখনও [illegible] সাত্ত্বিক হবিষ্যাসী। যখন বাবু চন্দ্রনাথ বসুর সহিত আহারে-[illegible] লইয়া মসীযুদ্ধ চালাইতেছেন, তখন তিনি আমিষত্যাগী। [illegible] উপকারিতা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কবি একদিন মনে করিলেন [illegible] তাহা রন্ধন না করিয়া, কাঁচা অবস্থায় বাঁটিয়া সরবৎ করিয়া খাইয়া [illegible] যেমন কথা তেমনি কাজ। এ সকল ব্যাপারে কবিজায়া স্বামীর সহকারিণী হইতে পারিতেন না, কেবল তাঁহার জন্য উদ্বেগই ভোগ করিতেন।

কবির এই সকল খেয়াল থাকিলেও, সময়-নিষ্ঠা ও নিয়ম-শৃঙ্খলায় বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত থাকায়, তাঁহার সকল কার্য্যেই [illegible] কি সাংবাদিকের কার্য্যে, কি বিদ্যালয়ের কার্য্যে, কি গার্হস্থ্য জীবনে উহা [illegible]

শৈথিল্য তিনি কোনদিনই সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার কথাতেই বলি—

"কাব্য যেমন, কবি যেন
    তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে,
সহজ লোকের মতই যেন
    সরল গদ্য কয় গো।"

তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সরল গদ্যের অভাব হয় নাই। তিনি লঘু পথ্যের সহিত গুরু চিন্তা (plain living and high thinking) সাদামাটা খাবারের সাথে উচ্চ চিন্তার অভ্যাস, এবং গৃহস্থালী ব্যাপারে আদর্শ (intelligent living) এর পক্ষপাতী। কথায়ও যা' কাজেও তা'; ঘরে-বাহিরে সুষ্ঠু আচরণে জীবন-ছন্দে বেশ একটু উপভোগ্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ই তিনি দিয়া আসিয়াছেন এবং আশপাশের সকলের কথাবার্তায়, হাবভাবে, বেশভূষায় ও চালচলনে তাহা দেখিতে ভাল-বাসেন। 'কবি'-র পরিচয়ে এটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে সে—

ভালোবাসে ভদ্র সভায়
    ভদ্রপোষাক পরতে অঙ্গে,
ভালোবাসে স্ফুল্ল মুখে
    কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে,
    মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাসতে হবে
    একেক সময় দিব্যি বুঝে
সামনে যখন অন্ন থাকে
    থাকে না সে অন্য মনে;
সঙ্গীদলের সাড়া পেলে
    রয় না ব'সে ঘরের কোণে।

'কণিকা'

শরীরের উপর নানাবিধ পরীক্ষা চালাইলেও কবির স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় নাই। এক অর্শ ভিন্ন অন্যকোনও রোগ তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারে নাই। বৃদ্ধ বয়সের কথা আলাদা। অর্শের প্রকোপ সময়ে সময়ে ভীষণ হইত, কিন্তু পরিণত বয়সে বিলাতে অস্ত্রোপচারের ফলে তাহাও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বল্পাহারী, এবং অন্য সর্ব্ববিধ খাদ্য অপেক্ষা ফলই কবির সমধিক প্রিয়। একবার বিলাত হইতে ফিরিবার পর তিনি বলিয়াছিলেন 'যে দেশে প্রকৃতি দেবী আম কাঁঠাল প্রভৃতি নানাবিধ ফলের প্রচুর ভাণ্ডার রাখিয়াছেন, সে দেশীয়ের পক্ষে ষ্ট্রবেরী, র‍্যাসবেরী খাইয়া ফলাহারের তৃপ্তি লাভ বিড়ম্বনা মাত্র।' তাঁহার দৈনন্দিন খাদ্যের মধ্যে চাকের মধুর চিরদিনই একটা স্থান ছিল ও নিত্য ব্যবহার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। শরীরের পুষ্টি বিধানে ইহা তাঁহার পিতৃদেবের গব্যঘৃত অভি-সিঞ্চিত পায়সান্নের স্থান অধিকার করে। তিনি নিজে তাদৃশ দুগ্ধভক্ত ছিলেন না ও পিতার মত প্রচুর গব্যরস জীর্ণ করিতেও সমর্থ ছিলেন না। পিতার ন্যায় ঘৃত সহযোগে অড়হর ডাল ও রুটির তিনি বড় পক্ষপাতী ছিলেন না।

দ্বারিকানাথ ঠাকুরের উইল অনুসারে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ড ও আবাস বাটি নির্ম্মাণের জন্য বিশ হাজার টাকা যাহা ছিল, নগেন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ায়, দেবেন্দ্রনাথ তাহার অধিকারী হন এবং নগেন্দ্রনাথের বিধবার সহিত আপোষনামা মীমাংসার ফলে উক্ত ভূমিখণ্ডে দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণ সত্ত্বাধিকারী হইলেন। এই জমিতে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে ও তাঁহারই তত্ত্বাবধানে একটি দ্বিতল বাটি প্রস্তুত করাইয়া মহর্ষি রবীন্দ্রনাথের সপরিবারে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এই বাটি রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর 'লাল বাড়ী' বলিয়া খ্যাত এবং পরবর্ত্তীকালে ইহারই নাম হয় 'বিচিত্রা-ভবন'। রবীন্দ্রনাথের রুচি অনুসারে কখনও ইংরাজি কেতায়, কখনও জাপানী ধরনে, আবার কখনও ভারতীয় কারিগরের দ্বারা নিজের পরিকল্পনা মত কারুশিল্পে ইহাকে

রূপ, শ্রী ও সৌন্দর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিত। লাল বাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বে কবি তাঁহাদের পৈতৃক বাড়ীর তেতলায় সপরিবারে বাস করিতেন। মহর্ষির উইল অনুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর এই লাল বাড়ীটি এবং পৈত্রিক ভদ্রাসনের পশ্চিমাংশের সর্ব্বসত্বে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ মালিকত্ব পাইলেন।

তখন হইতেই কবির নিজ সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন, জমিদারীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন, সাহিত্য সৃষ্টি প্রভৃতি যেমন চলিতেছিল, তেমনই ভাইপো ভাইঝি, ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী ইত্যাদির সহিত নানাবিধ আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া মেলামেশাও ঘনিষ্ঠতর হইতেছিল। তাঁহাদের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ সাধনে বা নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশে কোনও দিনই কবির উৎসাহদানের অন্ত ছিল না।

অধ্যয়ন রবীন্দ্র-জীবনের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। প্রতি মাসে থ্যাকার কোম্পানী তাঁহাকে নব প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা ও বহু নবাগত পুস্তক পাঠাইত। তিনি সেগুলি দেখিয়া ইচ্ছামত পুস্তক ক্রয় করিতেন, বাকি ফেরত দিতেন। এইরূপে নিজের একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠে। বোলপুরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তাঁহার এই বহুমূল্য গ্রন্থসংগ্রহ এবং আদিব্রাহ্ম সমাজের পুস্তকসংগ্রহের বহুলাংশ মহর্ষির অনুমোদনে তথায় প্রেরিত হইয়া বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পত্তন হয়। পরে কিন্তু বিদ্যালয়ের দারুণ অর্থাভাব দূরীকরণের নিমিত্ত তাঁহার গ্রন্থসম্ভারের অনেকাংশ রবীন্দ্রনাথ বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। পুরীতে সমুদ্র উপকূলে যে বাড়ী তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাও ঐ কারণে বিক্রীত হয়।

গতিপ্রবণ মন রবীন্দ্রনাথকে একজায়গায় স্থির থাকিতে দেয় না। তাই আজ খুলনায়, কাল কলিকাতায়, পরদিন শিলাইদহে, কখনও কটকে কখনও বা জমিদারীর অন্যান্য স্থানে, আবার তার মধ্যেই কখনও বোলপুরে, কখনও বোম্বায়ে, কারণে অকারণে, প্রায়ই তিনি চলিতেন। কাজেই তাঁহার সংসারও তাঁহার সঙ্গেই চলিত। এই দল ভ্রাম্যমান সংসার মেয়েরা প্রীতির চক্ষে দেখেন না। তাঁহাদের পরিভাষায় ইহা বেদের টোল।

স্বামীর এ অভ্যাসটিতে কবিগৃহিনীর বিশেষ উদ্বেগ, অশান্তি ও অসচ্ছন্দতার কারণ হইত, তত্রাচ তিনি নিরাপত্তিতেই তাহা প্রতিপালন করিতেন। রবীন্দ্রনাথের এই উপসর্গ অনেকস্থলেই সাময়িক স্বর্গ রচনা করিয়াছে। এ বয়সেও সেটি যে কত প্রবল তাহা সকলেই জানেন। আমাদের মনে হয়, শান্তিনিকেতনে যে ক্রমান্বয়ে 'উদিচী', 'উদয়ন', 'উত্তরায়ন', 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী' প্রভৃতি বাটীর ক্রমবিবর্ত্তন হইয়াছে ও সময়ে সময়ে বিভিন্ন গৃহে বাস করিয়া আকাশপ্রিয় ও আকাশমার্গী কবি যে বিভিন্ন কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বৈচিত্র্যপ্রিয় মনের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। অধিক কাল ধরিয়া একরকম ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা বা তাঁহার ভাষায় ক্রমাগত মন্দাক্রান্তা ছন্দ তাঁহার ভাল লাগে না। সেই জন্য ঘরের আসবাব পত্র—ফুলদানি, কৌচ-কেদারার বিন্যাসও তিনি বারে বারে পাল্টাইয়া থাকেন।

সংসারযাত্রা সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করিতে হইলে নিজের সকল দিক দেখিতে হয় ও জানিতে হয়। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ব করিতে মনস্থ করিলেন। ইলেকট্রো-আয়ুর্ব্বেদ, হ্যানিমান প্রবর্ত্তিত ও আধুনিক উন্নত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান, ডাঃ শুস্‌লারের আবিষ্কৃত টিস্যু রেমিডি (Tissue Remedis) বা বায়োকেমিক চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শিতা ও ব্যবহারিক প্রয়োগ-নৈপুণ্য অর্জ্জন করিলেন। নিজ পরিবারে, জমিদারীর দুস্থ প্রজাদের ও শান্তিনিকেতনের বালকদের চিকিৎসার ফলে, যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিলেন, তাহাই তাঁহাকে সুনিপুণ চিকিৎসকের [illegible] দিল। এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের পরিত্যক্ত একাধিক কঠিন [illegible] রবীন্দ্রনাথ সাহসভরে নিজ হাতে লইয়া সুচিকিৎসা দ্বারা [illegible] করিয়াছেন। তাঁহার এই খ্যাতি সাধারণে প্রচারিত না হইলেও, অনেকের নিকট ইহা সুবিদিত। শুধু চিকিৎসা [illegible] [illegible] [illegible] রবীন্দ্রনাথ কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। তাঁহার [illegible] [illegible] যখন বাসোয়ারায় গুরুতর পীড়িত হন, তখন রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে সেখানে

যাইয়া তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুশয্যাতেও আমরা দেখি যে পিতৃভক্ত রবীন্দ্রনাথ পিতার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া নিপুণ সেবা করিতেছেন ও মুমূর্ষু পিতাকে উপনিষদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। তাঁহার পত্নীর অন্তিম রোগের সময় কবি নিজে দিবা-রাত্রির অধিকাংশ সময়ে ব্যজনী চালনার দ্বারা পত্নীর স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে অক্লান্তভাবে নিযুক্ত, তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক পাখার প্রচলন হয় নাই। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার অসুখেও সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আলমোড়া শৈলে গিয়াছেন এবং মাতৃহীন রোগিনীর পরিচর্য্যায় সেখানে অহর্নিশি ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারই চিত্তবিনোদনের জন্য 'শিশু'র অধিকাংশ কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেছেন। তাঁহার আলমোড়া প্রীতি শুধু যে পত্রাবলী ও বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নয়; কুমায়ুন অঞ্চলে বিস্তৃত ভূখণ্ড লইয়া সেউ (Apple) ও ন্যাসপাতির (Pears) বাগিচা নির্ম্মাণে তাঁহাকে প্রণোদিত করে। কলিকাতায় ডিহি শ্রীরামপুর রোডে স্বামীগৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পীড়িতা হইলে, কবি উপস্থিত থাকিয়াও বিশেষ কিছু চেষ্টা করিতে না পারায়, ধীরভাবে ক্রমনিমজ্জমান তরণী নিরীক্ষণে অন্তরে মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের সেবাকার্য্যে বেতনভোগী শুশ্রূষা-কারিণীর সাহায্য গ্রহণে চিরদিনই তিনি বিরোধী। এরূপ সেবায় অনেক প্রকারে নিরস সেবাকার্য্যই চলিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাতে সেবার মাধুর্য্য ও মর্য্যাদা নষ্ট হয়; ইহাই তাঁহার মত। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথের মত স্নেহশীল স্বামী, পিতা, পিতৃব্য ও মাতুল মানুষের আদর্শস্থল।

ভ্রাতাদের সহিত তাঁহার আন্তরিক প্রীতির সংযোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই কুড়ি হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু এই বয়সের ব্যবধান পরস্পরের মিলনে কোনও দিনই বাধা জন্মায় নাই। এত বড় দাদারা

সকলেই তাঁহার সহিত একত্রে অভিনয় করিতেছেন, ইহা বাঙালী ঘরে প্রায় দেখা যায় না।

অন্য সকলের প্রতি তিনি যে স্নেহবিমুখ তাও নয়। তবে আমাদের দেশে যেভাবে স্নেহের অভিব্যক্তি হয় তাঁহাতে সেরূপ হয় না। সেজন্য অনেকেই তাঁহার ব্যবহারকে আন্তরিকতাশূন্য অভিনয় বলিয়া মনে করেন। কবি নিজেও সে কথা জানেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীলিপ কুমার রায়কে লিখিত তাঁহার একটি পত্র দিলাম। স্বশ্রেণীর স্বজন বৈরাগ্য কবির নমনীয় মনে যে আজীবন রেখাঙ্কিত করিয়াছিল, তাহার আভাষ পাওয়া যায়—

রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র

শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায়

কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, তোমার চিঠি পড়ে খুব খুসী হলুম। সাধারণে তো আমাকে অহঙ্কৃত এবং হৃদ্যতাবিহীন বলেই মনে করে। সেই জন্যেই জনসমাজে আমি যত প্রশংসা পেয়েছি তত প্রীতি পাইনি। আমি যদি স্বভাবতই কঠিনহৃদয় ও স্নেহ-সম্পদে কৃপণ হতুম তা হলে কবি হতেই পারতুম না। অন্তরে যার রসের অভাব সে কখনো রস-সাহিত্য সৃষ্টি ক'রতে পারে না। কিন্তু যখন অনেক লোকের একই রকম ধারণা হচ্চে তখন বলতেই হবে যে আমার মধ্যে একটা কিছু অভাব আছে যাতে ক'রে আমার দেশের লোক আমার হৃদয় স্পষ্ট দেখতে পায় না। সম্ভবত আমাদের দেশে হৃদয়াবেগ প্রকাশের যে বিশেষ রীতি সাধারণে প্রচলিত আমার তা অভ্যাস নেই। তার দুটো কারণ আছে। প্রথমত আমাদের পরিবারে একালের সমাজের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা ঘটতেই পারে নি। ছেলেবেলা থেকে আমি আমাদের পরিবারের কোণে কোণে অত্যন্ত লাজুক ও মুখচোরা ভাবেই কাটিয়েছি। আমাদের আত্মীয়ের পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ কেন না আমরা সমাজের বহির্বর্তী। এই জন্যে আমাদের দেশের আত্মীয়তা

প্রকাশের যে সব ধরণ আছে তাতে আমার হাত পাকে নি। এই সব কারণে দেশের জনসাধারণ যদি আমাকে ভুল বোঝে সে আমার ভাগ্যের দোষ। পূজ্যপাদ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। আমি জানি তাঁর কাছে ঘেঁসতে কেউ সাহস ক'রত না—আমরা কেউ কেউ—তাঁর কাছে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, কিন্তু তাঁর গা ঘেঁসা হবার যো ছিল না। কিন্তু আমার ঘরে চড়াও হয়ে উপদ্রব করতে না পারে এমন অপোগণ্ড ব্যক্তি তো কেউ নেই। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রকে কেউ উদ্ধত বা কঠিন-হৃদয় বলে নি। কেন না যাঁর কাছে কেউ সহজে আমল পায় না তাঁর অনুগ্রহের কণা পেলেও লোকে কৃতার্থ হয়। কিন্তু যার কাছে কোনো বাধা নেই তার কাছে দাবীর ষোলো আনা পূর্ণ ক'রতে না পারলে আট আনারও রসিদ পাওয়া যায় না।

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তারপরে ভারি রাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি,
এই সাধনায় যার কাছে পায়
কানা বেড়ালের ছানা,
লোকে তারে বলে, নয়নের জলে
"দাতা বটে ষোল আনা"।

[illegible] আশা করি তোমরা ভালো আছ।

স্নেহানুরক্ত
তোমারি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible] ১৩২৪

বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ছাত্রাবাসের ছাত্রদের দৈনন্দিন আহারে যোগ দিতেন। কয়েকমাস পরে সেখানে

তাঁহার পত্নী পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার চিকিৎসার জন্ত তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কবি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। নানাবিধ চিকিৎসা ও কবির প্রাণপাত সেবায় কোনও ফল হইল না। পরিশেষে সন ১৩০৯ সালে ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ৩০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলেন। কবির বয়স তখন একচল্লিশ বৎসর। এই শোক যে কিরূপ গভীর ভাবে কবিকে আঘাত দিয়াছিল, তাহা তাঁহার তৎকালিক বাহ্যিক আচরণে অন্তরঙ্গ আত্মীয়েরাও যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু পত্নীর উদ্দেশ্যে লিখিত ঐ সময়ের কবিতাগুলিতে তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে। এই কবিতাগুলির সংগ্রহ পরে 'স্মরণ' এ কাব্যে প্রকাশিত হয়। এরূপ বিরহের কাব্য বঙ্গ-ভাষায় বিরল। অনেক কবিই নিজেদের বেদনা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় করেন এবং তাহা পাঠকের হৃদয়ে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের একটি শোকাবহ ঘটনার কারুণ্য সঞ্চারিত করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ'-এর কবিতাগুলি মেঘদূতের বিরহের মত বিশেষকে নির্ব্বিশেষ করিয়াছে। যে-কোনও প্রিয়াহারা বিপত্নীক ইহাতে নিজ প্রাণের সাড়া লইবেন ও শোক সহ্য করিবার শক্তি সঞ্চয় করিবেন। 'জীবনসঙ্গিনী' লোকান্তরে চলিয়া গেলেও প্রতিনিয়তই আমরণ জীবিতের সাথের সাথী থাকেন।

আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচো
যেন আমি বুঝি মনে অতিশয় সংগোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমার জীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো।

ইহার পর সন্তানদের প্রতি মাতা ও পিতা উভয়েরই কর্তব্য রবীন্দ্রনাথকে একা প্রাণপণে পালন করিতে হইল। তাঁহার বড় মেয়ে বেলার (মাধুরীলতার) সহিত কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর তৃতীয় পুত্র শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর বিবাহ দেন। ইনি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-

হইতে কৃতিত্বের সহিত এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মজঃফরপুরে ওকালতি করিতেছিলেন। বিবাহের পর শ্বশুর মহাশয়ের পরামর্শে ও আনুকূল্যে ইনি বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসেন ও কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টারদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। মাত্র কয়েক বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় ১৩২৪ সালে মাধুরীদেবী লোকান্তর প্রাপ্ত হন। পত্নীবিয়োগের ৮।১০ বৎসর বাদে শরৎচন্দ্র ব্যারিষ্টারী ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অবসর জীবন যাপন করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকার (রাণীর) সহিত ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বিবাহ হয়। ইঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ। সত্যেন্দ্রকে ডাক্তারি বিদ্যায় কৃতবিদ্য করিবার মানসে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিলাত পাঠান। বিবাহের কিছুদিন পরে রাণী ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাকে লইয়া কবির আলমোড়া বাসের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই ১৩১০ সনে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কোনও সন্তানাদি ছিল না।

১৩১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্যা মীরার (অতসীর) সহিত বরিশালের নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (পরে কৃষিবিদ্যার জন্য 'ডাক্তার' উপাধি প্রাপ্ত হন) বিবাহ হয়। বিবাহের পর কবি কন্যা-জামাতাকে বরিশালে অতসীর শ্বশুর বাড়ীতে পৌছাইয়া দেন। কিছুদিন পরে তাহারা সকলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার জন্য নগেন্দ্রনাথকে এ্যামেরিকায় পাঠাইলেন। ডিগ্রি লইয়া ফিরিবার পর জামাতা নগেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সংসারভুক্ত হইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতেন। শ্রীমতী অতসীর নন্দিতা নামে একটি কন্যা ও নীতীন্দ্র নামে একটি পুত্র হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় জার্ম্মেনীতে মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় শিক্ষার সময়ে ১৩৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র দৌহিত্র নীতীন্দ্রের অকাল মৃত্যু হয়। ১৩৪৩ সালে তাঁহার দৌহিত্রীর

সহিত গুজরাটী অধ্যাপক ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালনীর বিবাহ হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কন্যাদের সর্ব্বপ্রকারে সুখী করিবার যতই চেষ্টা করিয়াছেন, ততই বিফলমনোরথ হইয়া দারুণ বেদনা ভোগ করিয়াছেন। ইহাই নিয়তির পরিহাস।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্রনাথ বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় মুঙ্গেরে বেড়াইতে যান। কবি তখন কলিকাতায়। অকস্মাৎ কনিষ্ঠপুত্রের বিসূচিকা রোগ হওয়ার তার পাবামাত্রই মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে কোনও যাত্রী-গাড়ী না পাওয়ায় বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া মাল গাড়ীতে রওনা হইলেন। কিন্তু এত করিয়াও পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল না। ১৩১৩ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ মাত্র বার বৎসর বয়সে সমীন্দ্রনাথ প্রাণত্যাগ করিলেন। আজীবন উপনিষদ চর্চ্চার ফলে ও ভগবৎ অনুগ্রহে রবীন্দ্রনাথ এই আকস্মিক বিপদেও অবিচলিত থাকিয়া অনন্যসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় তৎকালে দিয়াছেন ও আজীবন দিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ১৯০৪ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষিশিক্ষার জন্য ১৯০৬ খৃঃ এ্যামেরিকায় যান। এ্যামেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এস-সি উপাধি পাইয়াছেন। তিনি ১৯১০খৃঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের পরিবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শেষেন্দ্র ভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা শ্রীমতী প্রতিমাদেবীকে বিবাহ করেন। ইহাই মহর্ষিপরিবারের প্রথম বিধবা বিবাহ। বিবাহের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বৌমাকে নানা ভাবে শিক্ষা দিয়া নিজের মনের মত গড়িয়া তোলেন। তখন তিনি ঘরে-বাহিরে রবীন্দ্রনাথের কার্য্যের প্রধান সহকারী। সেবায় যত্নে তিনি রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কন্যাদের স্থান অনেকাংশে পূরণ করিয়া সংসারে সুখশান্তি আনয়ন করিয়াছেন। 'শ্রীনিকেতন' [illegible]

সংযোগ কল্যাণপ্রসূ হইয়াছে। তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। তবে একটি মাতৃহীনা গুজরাটি ব্রাহ্মণকন্যাকে শিশুকাল হইতে লালন পালন করিয়াছেন। বাৎসল্য রসের চর্চ্চা না হইলে যে রমণী-জীবনে সম্পূর্ণ সার্থকতা আসে না, তাহা উপলব্ধি করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই নাতনিটিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। প্রতীক অর্চ্চনা সম্বন্ধে প্রবাসীতে প্রকাশিত কোন মহিলাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে প্রকাশ যে, ঠাকুর স্থাপন করিয়া বাৎসল্য রসের দ্বারা উপাসনা করিলে, একটা মস্ত ফাঁক পড়িয়া যায়—জীবন্ত বালকের উৎপাত সহ্য করা ও নিজের দায়িত্ববোধ উপলব্ধি করা। যে 'পুপের' সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের 'সে' গল্প রচিত হয়, ইনি সেই পুপে, যাঁর পোশাকী নাম "নন্দিনী"—ইহার সম্বন্ধে ১৯২৫ সালে কবি লিখিয়াছিলেন—

"পৃথিবীতে আমার প্রেয়সীদের মধ্যে যিনি সর্ব্বকনিষ্ঠা তাঁর বয়স তিন। ইনিয়ে বিনিয়ে কথা ব'লে যেতে তাঁর একমুহূর্ত্ত বিরাম নেই।" স্বশ্রেণীর একজন শিক্ষিত যুবকের সহিত ইহার বিবাহ হয়। রথীন্দ্রনাথ নিজেদের জমিদারীতে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া মেটালিক অনুসন্ধান ও প্রজাবর্গকে উন্নত প্রণালীর কৃষিবিদ্যার্জ্জনের জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি বোলপুর শ্রীনিকেতনে তাহার চর্চ্চা করেন ও বিশ্বভারতীর কর্ম্ম-সচিবরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনি Metropolitan Engineering Co. নামে একটি অপিস ও কারখানা কলিকাতায় খোলেন। মোটর গাড়ীর মেরামত ও ক্রয় বিক্রয় তাঁহার কার্য্য ছিল। ঐ কারবারে লোকসান হওয়ায়, পিতার আদেশে তাহা উঠাইয়া কবি-প্রবর্ত্তিত Rural uplift ও কবির রচনাবলী দেশবিদেশে প্রচার ও বোলপুর কেন্দ্রে Technical Engineering শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় সর্ব্বতোভাবে আপনাকে নিয়োগ করিয়াছেন। সস্ত্রীক রথীন্দ্রনাথ পিতার সহায়রূপে এশিয়া, য়ুরোপ ও উত্তর-দক্ষিণ এ্যামেরিকার নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন।

যশস্বী মানুষের যশ ক্রমে আসল মানুষটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। তাহাতে সাধারণ লোক তাঁহার মুখের বাণীটাই অধিকভাবে স্মরণে রাখে ও আলোচনা করে; কিন্তু যে উৎস হইতে সে বাণীর উৎপত্তি, তাহার প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর ও অবকাশ অল্পলোকের থাকে। সাহিত্যিক মাত্রেই সাধারণ মানবশ্রেণীর উচ্চস্তরে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে আবার কবিপ্রতিভাযুক্ত জন পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য পুঞ্জের ফলে কিয়ৎ পরিমাণে ভগবৎ-অনুভূতি বিশিষ্ট ও তৎপ্রকাশে ব্যাকুল থাকায়, তাঁহাদের রচনাকে গুণগ্রাহী জন ঐশী প্রেরণা বলিয়া ধরিয়া লন। এই সত্য যদি কবিরা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া ব্যক্ত করেন, তবে সাধারণে তাহাকে ভগবৎ অনুগৃহীত ব্যক্তির দম্ভ বলিয়া উপহাস করে। যাঁহারা সাধন পথে থাকেন তাঁহারা দৃষ্টান্ত হইতে উৎসাহ ও বল সঞ্চয় করেন। তরুগুল্মলতার মাটির প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিশেষ বোধ আছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু আসল জ্ঞানের পরিচয় তাহাদের স্বকীয় জীবনবর্দ্ধনকারী রসাহরণ বিদ্যায়। স্বীয় বিকাশের জন্য বল সঞ্চয়ের ক্ষমতা যদি বা সামান্য লোকের না থাকে, তাহা হইলেও উৎসাহের অভাবটা তাহাকে লজ্জা দেয়, এবং গুণগ্রাহীশূন্যতা তাহার সামাজিক অস্তিত্ব বোধকে ক্ষুণ্ণ করে। সেই জন্য পাণ্ডিত্যাভিমানীগণ কোনও মনীষীর জীবনী আলোচনা করিতে গেলে দ্বি-ধারার সৃজন করেন। কিন্তু সমগ্র মানবটিকে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হন। এ যেন সুধাকর আর জ্যোৎস্নার প্রভেদ। কবির জীবনটাও শুধু কাব্য জীবন নয়; তাঁহার দেহ, মন, আশা, চেতনা, প্রেরণা, অনুভূতি, সামাজিক পরিস্থিতি, সামাজিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাত ও বিভূতি প্রকাশ—সমগ্রটায়ই এবং সমগ্রতাতেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ জীবন্ত বিবেচনা করি। তাই, এই চরিতকথায় রবীন্দ্রের জীবনের অনেক ঘটনাবলীর এতাদৃশ বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। কিন্তু পরিচয় সুযোগ বর্জ্জিতের পক্ষে আমাদের অক্ষম লেখনীর এ প্রয়াস অকূল সাগরের একটি তরঙ্গ মাত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ

কবির বিশ্বভারতী সম্বন্ধে কিছু বলিব। দেশের শিক্ষাবিস্তারের প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের বংশগত। তাঁহার পিতামহ দ্বারিকানাথ স্বয়ং ত্রিবেণীতে একটি ইংরাজি স্কুল স্থাপন করিয়া একশত পঞ্চাশ জন ছাত্রের শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করেন এবং রামমোহন রায়ের ইংরাজি স্কুল ও বেদান্ত বিদ্যালয়ের সকল কার্য্যে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন। হিন্দু কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় দ্বারিকানাথ অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা কি ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দ্বারিকানাথ ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীর অধীনে একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা নানাকারণে সফল হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ও বংশবাটিতে বাঁশবেড়িয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় অক্ষয়কুমার দত্তকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে তাঁহার দ্বারা পুস্তকাদি রচনা করাইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহর্ষির আন্তরিক আগ্রহে ও চেষ্টায় 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়' (Hindu Charitable Institution) মিশনারীদের কবল হইতে হিন্দুসন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে স্থাপিত হয়। যখন কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের খনামধন্য বণিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্রনাথ দত্ত উন্নত প্রথায় কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপিত করেন, মহর্ষি তাঁহার

সহযোগীতা করিয়াছিলেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথ মনোনিবেশ করিতেই তিনি বুঝিলেন যে তাহা হইতে জাতির কোনও স্থায়ী মঙ্গল হইবে না। ১৮৯২ খৃঃ "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে এ বিষয়ে তিনি দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব তাঁহার ভাষাতেই বলিতেছি:—"সকল বড় দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানব জীবনের পূর্ণতা সাধন। এই লক্ষ্য হইতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সঙ্কীর্ণ প্রয়োজন সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি, তখনকার কোনো কোনো পুরানো দপ্তরে দেখা যায় প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে কর্ত্তৃপক্ষ তিরস্কার করেচেন। এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েচে যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে—আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈত্রিক মূলধন যেন কাণা কড়ি নাই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব ভাব জাগায়। মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তাহ'লে আমাদের শিক্ষার এই দীন ভাবকে ঘোচাতে হবে।"

"আমাদের একটা আদর্শ আছে সেটা কেবল পেট ভরাবার বা টাকা করবার নয়।" এই কথাটা জানতে ও মানাতে, শেখাতে রবীন্দ্রনাথ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পুরাকালে গুরুগৃহে থাকিয়া পাঠের যে ব্যবস্থা ছিল, দ্বিজবটু উপনয়নান্তে গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষা লাভ করিত, মানুষ হইবার পক্ষে তাহাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট ও একমাত্র পন্থা। কেবল বিদ্যালয়ের কাজ হইলে না, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম চাই। বাহিরের নানাপ্রকার বিক্ষিপ্ত-বিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একটি শান্তিক্ষেত্র চাই।

রবীন্দ্রনাথের হাতের কাছে এইরূপ একটি উপযুক্ত শান্তিক্ষেত্র পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একবার তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বীরভূমের সিংহবাবুদের বাটিতে নিমন্ত্রণে যাইবার পথে বোলপুর ষ্টেশন হইতে রায়পুর যাইবার সময় ভুবনডাঙ্গা গ্রামের নিকট এক বিস্তৃত প্রান্তরে দুটি ছাতিম গাছের তলে বিশ্রাম করেন। এই ধূসর মাঠে দুটি গাছ ভিন্ন সবুজের চিহ্ন আর কিছুই ছিল না। এই স্থান তিনি নির্জ্জন সাধনার জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। ইহা রায়পুরের সিংহবাবুদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। ১৭৮৪শকে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের নিকট হইতে ২০ বিঘে ভূমি সংগ্রহ করিয়া এইখানে একটি বাটি 'শান্তিনিকেতন' নির্ম্মাণ করাইলেন। এই বাটির চতুর্দ্দিকে উহার ভূমি ফলফুলের বাগানে পরিণত হইল। রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার মালী রামহরিদাস বিলাত গিয়াছিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট কিছুদিন ছিল এবং সে সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজার গোলাপবাগের সর্দ্দার মালী হইয়াছিল। এই রামদাসের উপর বোলপুরে উদ্যান রচনার ভার পড়িল। মহর্ষির পরিকল্পনা ফুটাইয়া তুলিতে রামদাসের নির্দ্দেশ মত বিদেশ হইতে ফল ও ফুলের গাছ ও বীজের সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রদেশ হইতে উর্ব্বর মৃত্তিকাও রেলে করিয়া আনীত হইল। এইখানে একটি কাঁচের মন্দির বহু ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের মেজে শ্বেত পাথরের তৈরী, আর চারিদিকে নানারঙ্গীন কাঁচের, প্রাচীর এবং অনেকগুলি দরজা। দরজাগুলি খুলিয়া দিলেই চারিদিক একেবারে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। মন্দিরের নিত্য ব্রহ্ম উপাসনার জন্য একজন পুরোহিত নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ সালে মহর্ষি একখানি ট্রাষ্টডীড করিয়া এই 'শান্তিনিকেতন' আশ্রমে কতকগুলি বিধি নিষেধ পালনের নিয়ম সহ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ উৎসর্গ করেন এবং প্রতি বৎসর তাঁহার দীক্ষার দিন ৭ই পৌষ এখানে উৎসব ও একটি মেলা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করেন। এই আশ্রমে একটি ভাল গ্রন্থাগার ও ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ট্রাষ্টডীডে এইরূপ নির্দ্দেশ থাকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি ব্রহ্ম বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ সানন্দে তাহা অনুমোদন করিলেন এবং বিদ্যালয়ের সাহায্য কল্পে মাসিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখে শান্তিনিকেতনে মাত্র ৫।৭টি ছাত্র লইয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ স্থানে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তখন কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

এই বিদ্যালয়ের সহিত অধ্যাপক ও শিক্ষাপরিদর্শকরূপে সময়ে সময়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় শিবধন বিদ্যার্ণব, জগদানন্দ রায়, সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতচন্দ্র সেন, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রভৃতি এবং নেপাল চন্দ্র রায়, পিয়ার্সন সাহেব, এণ্ডরুজ সাহেব মহাশয়দের অনেকেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও আছেন।

শরীরচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা নিজে উপলব্ধি করার ফলে ও বালকদের জাপানী আত্মরক্ষা-প্রণালী যুযুৎসু শিখাইবার জন্য জাপানী ব্যায়ামবিদ তাকাগাকিকে জাপান হইতে সঙ্গে লইয়া আসেন ও বোলপুরের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পোষণ করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রধান কীর্ত্তি 'শান্তিনিকেতন' ও 'বিশ্বভারতী' রবীন্দ্রনাথ চিরদিন স্কুলমাষ্টারকে এড়াইয়া আসিয়া, এইখানে স্কুল-মাষ্টারিতে ধরা দিলেন। আমাদের যুগে দুইজন ধনী সন্তান, জন্মলক্ষ্মী হইয়াও, শিক্ষাদান নৈপুণ্যে অভিজ্ঞ শিক্ষকদেরও [illegible] প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। একজন বোলপুর বিদ্যালয়ের [illegible] রবীন্দ্র-নাথ, আর একজন রাণী ভবানী স্কুলের [illegible] [illegible] মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষা-প্রণালীর ও শিক্ষাদান-পদ্ধতির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

অধ্যাপক 'মানসী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে মুক্ত আকাশের নীচে গাছের তলায় বালকদের পাঠের ব্যবস্থা। এখানে যতদূর সম্ভব ছাত্রেরা মুক্তির স্বাদ পায়। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এখানে তাহাদের হৃদয়ের নিবিড় যোগের যথেষ্ট অবসর। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীর সঙ্গেও তাহাদের যোগের ব্যবস্থা আছে। সেই সকল পল্লীতে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সেখানকার বালকদের শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দিতে যায়। ইহা ভিন্ন নিকটে কোথাও আগুন লাগিলে সে-আগুন নিবাইতে যাওয়া ছাত্রদের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। ইহার নিমিত্ত তাহাদিগকে অগ্নি নির্ব্বাপনের উপায় ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী নিত্য অভ্যাস করিতে হয়। এইখানে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের চিন্তাশীল, আত্ম-কর্ম্মক্ষম, সংযমী ও স্বাবলম্বী করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। এইখানেই আনন্দের মধ্য দিয়া শিক্ষার সাহায্যে মানুষের সকল সহজাত সদ্বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি ও পূর্ণ বিকাশ সাধনে রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট হন। শিক্ষকদের সহিত আলোচনা ও বালকদের সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ ও তাহাদের পরিদর্শন তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। অশেষ ধৈর্য্যের পর কিঞ্চিৎ সফলতা দৃষ্টে বিদ্যাপীঠটির পরিসর বৃদ্ধিতে তিনি যত্নবান হন। বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালীতেও বালকদের সম্পূর্ণ সহযোগীতার ও স্বাধীনতার অবসর দেওয়া হইয়াছে। সকল প্রকার ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। বালকেরা যাহাতে চিত্রে, সাহিত্যে, শিল্পে অনেক কিছু সৃষ্টি করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হয়। শিক্ষক সমভিব্যাহারে মধ্যে মধ্যে তাহাদের গ্রামান্তরে ও বনভূমিতে লইয়া যাওয়া হয় ও উদ্ভিদ সংগ্রহ, উদ্ভিদ চেনা ও তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে উৎসাহিত করা হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'শান্তিনিকেতন' পরিচালিত হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থ কবি ইংরাজি প্রবেশ, সংস্কৃত প্রবেশ, ছুটির পড়া, পাঠ সঞ্চয় প্রভৃতি কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে, প্রার্থনার পরে রবীন্দ্রনাথ যে সকল

উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই 'শান্তিনিকেতন' নামক গ্রন্থের কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু কেবলমাত্র বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার গরিমা রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ মনে করেন নাই, বরং তাহাকে তিনি অতি উচ্চ স্থানই দিয়াছেন। দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া তাহাদের শিক্ষাদান রীতি ও তাহার ফলাফল সম্যক বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন যে, প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের ভাব বিনিময় না হইলে আধুনিক যুগে বিশ্বসভায় বাঙ্গালীর স্থান হইবে না। অন্য যেখানেই অসহযোগ থাকুক, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতীচ্যের সহিত অসহযোগের অর্থ নিজেদের বিপুল ক্ষতি। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিলেন। এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম তিনি 'বিশ্বভারতী' রাখিলেন। ১৩২৬ সালের ১৮ই আষাঢ় ইহার কাজ আরম্ভ হইল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তখন সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন। পরে ১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ (১৯২১ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর) তারিখে প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আচার্য্য ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে 'বিশ্বভারতী' রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হইল। কবি কি উদ্দেশ্যে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা কবির নিজের লেখা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"মানব সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালির উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোকটিকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনও জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপ খানি যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।"

"একথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে ভারতবর্ষ নিজেরই মানস শক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে [illegible]

শিক্ষা, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে তাহা কালের দ্বারাও ঘটিতে পারে।"

"ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। * * * ভারতবর্ষে যে-মন আজ হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, খৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে-মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ ও সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মত গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোন জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।"

"দ্বিতীয় কথা এই যে শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষী-দিগকে আহ্বান করিতে হইবে। যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্য্যে নিবিষ্ট আছেন, তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে। সেই উৎস নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবল মাত্র কেরানীগিরি, ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোন শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি দেশের মাটির উপর নাই। তাহা পরগাছার মত পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষের যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে, আপন প্রতিষ্ঠানকে চতুর্দ্দিকবর্ত্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীগণের সঙ্গে জীবিকার যোগ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।'

কবি আরও বলেন,

"আমাদের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবল মাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্য সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল আশ্রয় স্বরূপই অবলম্বন করে তাহার উপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে।

"বিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গড়বার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেইজন্য হতাশ হবারও হেতু নেই। বীজের

যদি প্রাণ থাকে, তা'হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা'হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।"

এই 'বিশ্বভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ সিলভঁ্যালেভি উইনটারনিট্জ, কার্লো ফর্মিকি প্রমুখ বহু বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকবর্গের অধ্যাপনার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বিশ্বভারতীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য তিনি চিত্রশিল্পশিক্ষার্থ 'কলাভবন' প্রতিষ্ঠা এবং সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের এবং গোপালন ও তৎসংক্রান্ত ব্যবসায়ের এবং কুটীর-শিল্পের উন্নতি বিশ্বভারতীর অঙ্গীভূত করিবার জন্য লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের নিকট বোলপুর হইতে কয়েক মাইল দূরে স্থিত সুরুল গ্রাম ক্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ সেখানে ১৯২২ খৃঃ 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্য 'বিশ্বভারতী'র অন্তর্গত 'শ্রীভবন' প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। পল্লী পুনর্গঠন কার্য্যও শ্রীনিকেতনে আরম্ভ হইয়াছে। নোবেল পুরস্কারের সমস্ত অর্থ ও কবির সমস্ত বাংলা পুস্তকের স্বত্ব রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন। অভিনয় বক্তৃতা প্রভৃতি উপায়ে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য কবিকে বহুদিন ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। তাঁহারই ব্যক্তিগত গুণের ও তাঁহার সদুদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বিশ্বভারতীর কার্য্যে সহায়তা করিতে কয়েকজন উদারচেতা দাতার নিকট হইতে অর্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে। পল্লী সংগঠন ও উন্নত প্রণালীর কৃষি চর্চার জন্য এল্‌মহার্ষ্ট সাহেব তাঁহার এমেরিকান বান্ধবী মিসেস ষ্ট্রেট্‌ এর নিকট হইতে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং সুরুলে কার্য্য আরম্ভ করেন। ইসলামীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্ম্মকথা সাধারণে প্রচারের জন্য হায়দ্রাবাদের মহামান্য নিজাম বাহাদুর এক লক্ষ টাকা দান করেন। পরে আরও ২৫ হাজার টাকা

দেওয়ায় 'নিজাম ভবন' প্রতিষ্ঠিত হইয়া উপযুক্ত অধ্যাপকের সাহায্যে শিক্ষাদান কার্য্য চলিতেছে। চীন ও ভারতের পরস্পরের সংস্কৃতির আদান প্রদানের নিমিত্ত চীন দেশ হইতে যে ত্রিশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে 'চীন ভবন' এর প্রতিষ্ঠা হয়। শান্তিনিকেতন পদ্ধতিতে শিক্ষা-বিস্তার কল্পে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে কবি যে অর্থসংগ্রহ করেন তাহাতেই 'হিন্দি ভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়।

পৃথিবীর নানাস্থানে রবীন্দ্রনাথ যে সকল হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এদেশে অনুষ্ঠিত তাঁহার কতকগুলি প্রসিদ্ধ বক্তৃতার উল্লেখ করি—

১৮৮০—সত্য বক্তৃতা, ১৮৮৭—হিন্দুবিবাহ, ১৮৯৪—ইংরাজ ও ভারত-বাসী, ১৯০৮—পূর্ব্ব ও পশ্চিম, ১৯১২—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, ১৯১৮—Centre of Indian Culture, ১৯১৯—Message of the Forest, ১৯২১—শিক্ষার মিলন ও সত্যের আহ্বান প্রভৃতি বিখ্যাত বক্তৃতার দ্বারা নিজ জন্মভূমির অধিবাসীগণকে অনেক কিছু দিয়াছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাহা তাঁহার এক বিরাট কীর্ত্তি এবং বিশিষ্ট মনীষী ও দার্শনিক বলিয়া তাঁহার আসন অচল-প্রতিষ্ঠ করিয়া দিয়াছে। অবশ্য তাহাতেও কিছু কিছু কবিত্ব সৌরভ বর্ত্তমান আছে। তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী, পাণ্ডিত্যে এবং জগতের ও মানবের হিতচিন্তায়, শুধু জ্ঞানগর্ভ নয়, মনোরম ও সুখপাঠ্য অমূল্য সম্পদ। মোটামুটি আমরা বলিতে পারি, তদ্দ্বারা 'বিশ্বভারতী'র সহিত বিশ্ববাসীগণের যোগসূত্র বেশ ভাল করিয়াই স্থাপিত হইয়াছে। কতকগুলি স্থানের নির্দ্দেশ দে নিয়ে দিলাম, তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন—

কেম্ব্রিজ এবং মার্কিনদেশে হার্ভার্ড (Cambridge and Harvard) —১৯১২ খৃঃ, ইলিনয় (Illinois)—১৯১২, শিকাগো—১৯১৩, যুক্ত-রাষ্ট্র—১৯১৭, বার্লিন, মিউনিক, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফোর্ট, হামবুর্গ—১৯২১,

টেকস্যাস—১৯২২, পিপিং (China)—১৯২৪, বেলগ্রেড, ফ্লোরেন্স, তুরীণ—১৯২৬, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিব্বার্ট বক্তা ও অধ্যাপক—১৯২৭ হইতে ১৯৩০।

'বিশ্বভারতী'র জন্য রবীন্দ্রনাথ যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। প্রাচীন জগতে তক্ষশীলা নালান্দা ছিল—সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াও জাতীয় সংস্কৃতি পুনর্জীবিত করিয়া, পরাধীন বিজীত জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষ করার আশা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এই বিশ্বভারতী। পল্লী সংস্কার ইহার একটা আনুসঙ্গিক ব্যাপার, স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য। একদিন এই ভারতীয় বিশ্বভারতীর যশোদুন্দুভি এমন করিয়া বাজিবে যে, দিগদিগন্ত হইতে এই পীঠস্থানে শিক্ষার্থী আসিতে পারিলে ও শিক্ষালাভ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য ও গৌরবযুক্ত বোধ করিবে

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের জমিদারী রাজসাহী জেলার কালীগ্রাম পরগণা। এই পরগণার পাতিসহরে তাঁহার প্রধান কাছারী। ইহা তাঁহার পিতৃ-পিতামহ হইতে প্রাপ্ত এবং তাঁহার পিতামহ দ্বারিকানাথের বিস্তৃত জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত পরগণার অন্যতম। দ্বারিকানাথ যখন সাবালক হইয়া তাঁহার পিতা রামলোচন ঠাকুরের সম্পত্তি হাতে পাইলেন, তখন তাঁহার পিতার ক্রীত একমাত্র পরগণা বিরাহিমপুর ও তাঁহার পিতামহ নীলমণি ঠাকুরের যশোহর জেলার কয়েকটি তালুকের অবিভক্ত অংশ, মাত্র এই ছিল তাঁহার জমিদারী। তখন বিরাহিমপুর পরগণা ও তাহার প্রধান কাছারী শিলাইদহ যশোহর জেলার মধ্যে ছিল। পরে তাহা নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ব্যবসায়ে ও সরকারী চাকুরীতে যখন কমলার কৃপায় দ্বারিকানাথের অজস্র অর্থাগম হইতে লাগিল, তখন চঞ্চলাকে কথঞ্চিৎ নিশ্চলা করিবার মানসে, তিনি জমিদারী বিস্তারে মনস্থ করিলেন। ক্রমে বাংলার প্রায় সকল জেলায়, বিহারের একাধিক জেলায় তাঁহার জমিদারী ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার পিতৃব্য রামবল্লভ ঠাকুরের স্বোপার্জ্জিত উড়িষ্যার জমিদারী এবং ভদ্রাসন বাটির অংশও দ্বারিকানাথের হস্তগত হইল, পরে তাহাতেও কতকগুলি পরগণা যুক্ত হয়। তিনি যখন প্রথমবার বিলাত যান, তখন বহুবিস্তৃত জমিদারীর বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকা। [illegible] দ্বারিকানাথের ত্রয়োদশবর্ষীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথের অকালে পরলোক গমন করেন। সে সময়ে দ্বারিকানাথের পত্নী মৃত্যুশয্যায় [illegible] কিছু পরে

তাঁহারও লোকান্তর হইল। এই ঘটনার দুই তিন মাসের মধ্যে তাঁহার হৌসের একখানি মূল্যবান জাহাজ ডুবিল, তখন দ্বারিকানাথ বলেন, “লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন, অলক্ষ্মীকে এখন আটকাইবে কে?” দূরদর্শী দ্বারিকানাথের মনে আশঙ্কা হইল যে অলক্ষ্মীর দৃষ্টি দুঃসময়ের সূচনা করিতেছে। তাঁহার পুত্রদের ও পোষ্যবর্গের যাহাতে চিরদিন সচ্ছল-ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা আশু কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অশান্তিকর অভিজ্ঞতার কথা স্মরণে আসিল। তিনি এ্যালেকজাণ্ডার কোম্পানীর একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন। যখন সেই কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়, তখন ঐ কোম্পানীর সমস্ত দেনা পরিশোধের গুরুভার একা তাঁহাকেই বহন করিতে হয়। সে সময়ে অংশীদারের সসীমদায়িত্বের (limited liability) কোনও ব্যবস্থা আইনে ছিল না। অংশীদারদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিত্তশালীর নিকট হইতে উত্তমর্ণেরা অগ্রেই নিজেদের সমস্ত প্রাপ্য আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন। অংশের তারতম্যে দায়িত্বের কমবেশী হইত না। এ কারণে ১৮৪০ খৃঃ দ্বারিকানাথ একটি ন্যাসপত্র সৃষ্টি করিয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর ও চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়কে ট্রাষ্টী নিযুক্ত করেন। তাহাতে নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলি তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া পুত্রপরিজনদের ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও অন্যান্য কার্য্যের ভার দিয়া যান। এই অর্পণনামায় পুত্রদের সম্পত্তিতে জীবনস্বত্ব ও পৌত্রদের মালিকান স্বত্ব দান করিয়া, অন্ততঃ দুই পুরুষের জন্য সম্পত্তির স্থায়িত্ব বিধান করেন।

সম্পত্তির তালিকা

১। বিরাহিমপুর পরগণা, ২। কিসমৎ তালুক সাদকী, ৩। তালুক কালীগ্রাম, ৪। তালুক সাজাদপুর (পাবনা জেলায়), ৫। মৌজা সাঁৎরা পাণ্ডুয়া, ৬। মৌজা বালিয়া, ৭। মৌজা হরিহরপুর, ৮। মৌজা [illegible]।

কলিকাতার ভদ্রাসনে তাঁহার জনকরামমণির যে অংশ ছিল তাহা তিনি রামমণির উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া সমস্ত ভদ্রাসনের মালিক হন। ইং ১৮৪৩ সালে তিনি একখানি উইল ও কডিসিল করিয়া তাঁহার ভদ্রাসন বাটি দেবেন্দ্রনাথকে, নবনির্ম্মিত বৈঠকখানা বাটি গিরীন্দ্রনাথকে এবং নগেন্দ্রনাথের বাটির জন্য ভদ্রাসনের অন্তর্ভুক্ত একখণ্ড জমি ও নগদ বিশ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। উক্ত ন্যাসপত্র বহির্ভূত সমস্ত জমিদারী, অন্যান্য সম্পত্তি, এবং কারঠাকুর কোম্পানীর মূলধন দশলক্ষ টাকা, তিন পুত্রকে সমান অংশে দিয়া যান। ইহা ভিন্ন আত্মীয় স্বজন ও পরিচারকবর্গকে দিবার জন্য অনেকগুলি মরণোত্তর দাতব্যের ব্যবস্থা (Legacy) এই উইল ও কডিসিলে থাকে। এই উইল ও কডিসিলের একজিকিউটার নিযুক্ত করেন তাঁহার তিনপুত্রকে ও তাঁহার বন্ধু ডোনাল্ড ম্যাকলাউড্ গর্ডনকে। দ্বারিকানাথের মৃত্যুর পর গর্ডনসাহেব, দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ যথারীতি প্রবেট্ লন। নগেন্দ্রনাথ তখন বিলাতে। অর্পণনামাভুক্ত সম্পত্তিগুলির কাগজপত্রে, হিসাবের খাতায়, ও মকর্দ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে যদিচ ট্রাষ্টীদের নাম ব্যবহৃত হইত, কার্য্যতঃ কিন্তু পরিচালনা দ্বারিকানাথের অন্যান্য জমিদারীগুলির সহিত একত্রে হইবারই ব্যবস্থা ছিল। দ্বারিকানাথের মৃত্যুর পরেও, ট্রাষ্টীদের নামে থাকিলেও, সকল সম্পত্তির সঙ্গে উহা পুত্রেরাই দেখিতেন।

দ্বারিকানাথের মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পরে তাঁহার সাংসারিক দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার বিপুল ঋণ পরিশোধের জন্য সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইল। উত্তমর্ণেরা দ্বারিকানাথের পরিবারের প্রতি যথেষ্ট সদাশয়তা দেখাইলেন। প্রথমেই তাঁহারা স্থির করিলেন যে, দ্বারিকানাথের পুত্রেরা যেন ঋণের দায়ে [illegible] কলিকাতার ভদ্রাসন সম্পত্তির উপর তাঁহাদের পাওনার জন্য কোনো দাবী দাওয়া থাকিবে না, ইহা একবাক্যে স্বীকৃত হইল। [illegible] স্থির হইল যে, পাওনাদারদের পক্ষে আমাকাক্কের [illegible]

রিসিভার স্বরূপ কার্য্য করিবেন। ভ্রাতা রমানাথ সাগ্রহনেত্রে সে ভার লইলেন, কিন্তু পারিশ্রমিক লইতে অসম্মত হন। পরে দেবেন্দ্রনাথ রিসিভার নিযুক্ত হইলেন। উত্তমর্ণেরা ইহাও স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের নিযুক্ত রিসিভার সম্পত্তিগুলি ক্রমশঃ বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন এবং তজ্জন্য যতদিন অপেক্ষা করা আবশ্যক ততদিন তাঁহারা অপেক্ষা করিবেন। দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টায় একদিকে যেমন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণশোধ হইতে লাগিল, অপরদিকে উপরোক্ত ট্রাষ্ট সম্পত্তি দায়ী না হইলেও তাহার আয় হইতেও ঋণ শোধের ব্যবস্থা হইল। দ্বারিকানাথের পুত্রেরা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা রাখিয়া, বাকী টাকার দ্বারা ঋণ শোধ করিতে লাগিলেন। এখন যেমন দেখা যায় যে, সম্পত্তি কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডসের হস্তে অর্পিত হইলেও সম্পত্তির অধিকারী বা তাঁহার আত্মীয় কোর্ট অব্-ওয়ার্ডসের অধীনে বেতনভুক্ত ম্যানেজাররূপে সম্পত্তির শাসন ও সংরক্ষণ করেন, সেইরূপ দ্বারিকানাথের পুত্রেরা বিনাবেতনে ট্রাষ্টীদের পক্ষে জমিদারী পরিচালনা করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চৌদ্দ বৎসরে দ্বারিকানাথের পরিত্যক্ত [illegible] মহাজনদের দাবীগুলি সমস্ত পরিশোধ হইয়া গেল। দ্বারিকানাথ যে [illegible] অর্পণনামা করিয়াছিলেন, বিধাতার করুণায় তাহা সিদ্ধ হইল [illegible] ঐ অর্পিত সম্পত্তির আয়ের দ্বারা তাঁহার পুত্র পৌত্রেরা নিজেদের সর্ব্ববিধ ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও পরের জন্য, জাতির সংস্কৃতির [illegible] বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ, [illegible]ন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে ধনার্জ্জন করিয়াছেন তাহা উপরন্তু, চূড়ার উপর ময়ূর পাখা। রবীন্দ্রনাথও যদি পিতামহের গড়গড়ায় কুণ্ডলীকৃত দীর্ঘ আলবোলায় সুগন্ধি অম্বুরী-তামাক সেবন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে এবং নির্ব্বঞ্ঝাটে দিন কাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে বাহির হইতে ধনাগমের চিন্তায় তাঁহাকে কিছুমাত্র বিব্রত হইতে হইত না; কিন্তু আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র 'বিশ্বভারতী'রূপ বিরাট শিশুর পুষ্টি ও

তুষ্টির জন্ত তাঁহাকে অনবরত ধনসংগ্রহের নানারূপ উপায় চিন্তা করিতে হইয়াছে।

দ্বারিকানাথের ছত্র-ছায়ায় বাস করিয়াই দেবেন্দ্রনাথ অন্ত কোনও প্রণালীতে উপার্জ্জন না করিয়াও, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা ও প্রসারকল্পে নানাস্থানে দেউল, মন্দির ও তৎসংশ্লিষ্ট পুরোহিত, আচার্য্য, পরিব্রাজক প্রভৃতির পোষণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচার আজীবন বহুব্যয়ে করিয়া আসিয়াছেন। তদুপরি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে বহুতর হিতানুষ্ঠানে লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার মুক্তহস্ততা রক্ষার জন্ত যেরূপ নিজের ও পারিবারিক ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়, সেইরূপ পিতার ও ভ্রাতৃগণের ঋণও অল্পে অল্পে শোধ করিতে হয়, তাহার ভারও আসিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমবর্দ্ধমান পরিজনের জন্ত তিনি প্রত্যেক পুত্রের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উপযুক্ত মাসোহারা বরাদ্দ করেন এবং কন্যা জামাতৃবর্গের জন্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুতরাং দ্বারিকানাথের পৌত্র-প্রপৌত্রদিগকে চমৎকারা অন্ন চিন্তায় পিষ্ট হইতে হয় নাই। এই সম্পত্তির আয়ের দ্বারা সচ্ছলতা থাকায়, দ্বারিকানাথের বংশধরেরা সহজাত প্রতিভার সাবলীল চর্চ্চায় জাতির সংস্কৃতিতে বিশেষ কিছু দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন যে, "পিতামহের অর্থ ও তজ্জনিত খ্যাতি লোপ পাইয়াছে; অগ্নি নিভিয়া গিয়াছে, মাত্র কিছু ছাই পড়িয়া আছে।" ইহাতে [illegible] কায়ক্লেশে তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে হয়। [illegible] বস্তুত সে ছাইটুকু না থাকিলে তাঁহাদিগকে [illegible] ভারবাহী কেরাণীর জীবনে পর্য্যবসিত থাকিতে হইত। দ্বারিকানাথ [illegible] বিপুল ঋণভার পরিশোধের পর যেটুকু অবশিষ্ট [illegible] কলিকাতার অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে [illegible] দিনে যাঁহাদের আয় বার্ষিক পঁচিশ হাজার [illegible] ছিল, তাঁহারাই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের উপরে [illegible]

অনেকেরই বিলাসলীলা বারুণি-বাগান-বারাঙ্গনায় প্রকটিত হইত। সে তুলনায়, দ্বারিকানাথের বংশধরেরা ধনে মানে যশে বহু ঊর্দ্ধে ছিলেন। তাঁহাদের বিলাসভঙ্গী দুঃখীর দুঃখমোচনে, সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পে বিকশিত হইয়া ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যেও তাঁহাদিগকে একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে এবং মানসিক আভিজাত্যে তাঁহারা দেশের আদর্শ হইতে পারিয়াছেন। ইহার অভাবে যে রবীন্দ্রনাথের মত দেদীপ্যমান প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি একেবারে নিষ্প্রভ হইত, তাহা আমরা মনে করি না; হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারে বিধবা কন্যার মত তাহা স্বকীয় জীবন প্রদীপের সাহায্যে সংসারে স্নিগ্ধ রশ্মি বিতরণের ব্যবস্থা একটা করিত, তবে সে অবস্থায়, 'Craik's Pursuit of Knowledge under Difficulties' পুস্তকের মত 'The Bloom of Genius in front of Penury' বৃহত্তর গ্রন্থ হয়ত লিখিত হইত; আর ঈশ্বরের কৃপায়, শ্মশানক্ষেত্রে রোপিত পঞ্চবটীর তুল্য কেবল অস্তিত্বের প্রভাবে বহু পক্ষী ও পান্থকে সুশীতল ছায়াদানে সক্ষম হইত। তিনি যেরূপ জীবনচাঞ্চল্য ও উদ্ভাবনী বৃত্তির অধিকারী, Vital force বা প্রাণশক্তিবিশিষ্ট, তাহাতে কাব্য-কলহংস না হইয়া একটা কোনও সায়রে তিনি অনায়াসে, ঈশপের 'golden goose' বা হিরণ্ময়-অণ্ড-প্রসূতি মরালী হইতে পারিতেন। এই স্বাচ্ছন্দ্যতার অভাবে [illegible] বহু সাহিত্যিকের দুরদৃষ্ট বশতঃ সাহিত্যচর্চ্চা ক্ষণস্থায়ী ও [illegible] প্রতীয়মান হইয়া ভাবে ও ভাষায় মলিনতার ছাপ ও ছোপ রাখিয়া গিয়াছে। গদ্য-সাহিত্যে দীর্ঘকালব্যাপী রবীন্দ্ররচনাবলী যে [illegible], ঊর্জ্জস্বতা ও আনন্দোচ্ছল চাঞ্চল্যে বাংলা ভাষার, বাংলা-দেশের এবং বাঙালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে, তাহা ভগবানের [illegible]; কবির অবকাশ ও নিশ্চিন্ততায় প্রসূত বলিয়াই তাহা এত সমৃদ্ধ।

সে যাহা হউক, দেবেন্দ্রনাথ ঋণ পরিশোধের পরেও ট্রাষ্টীদের পক্ষে চালনা করিতেন। তাঁহার উপদেশ মত তাঁহার পুত্রেরা আত্ম-

পুত্রেরা ও জামাতৃবর্গ এক একজন জমিদারীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা এই কাজের জন্য আলাদা পারিশ্রমিক পাইতেন। নগেন্দ্র-নাথের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া যে মোকদ্দমা করেন, তাহার আপোষ নিষ্পত্তির ফলে নগেন্দ্রের অংশে দেবেন্দ্রনাথের পূর্ণ স্বত্ব হয় এবং উক্ত বিধবা মাসিক বৃত্তি পান। পরিশেষে দেবেন্দ্রনাথের পুত্রপৌত্রেরা আদালতের সাহায্যে মহর্ষিকে উক্ত ট্রাষ্ট সম্পত্তিতে মালিক বলিয়া স্বীকার করেন এবং গিরীন্দ্রনাথের পৌত্রদের সহিত উক্ত জমিদারী বণ্টন করিয়া, নয় ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগের সম্পূর্ণ মালিক হন। দেবেন্দ্রনাথের উইলের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ দ্বারিকানাথের ট্রাষ্ট সম্পত্তির যে অবিভক্ত তিন আনা তের গণ্ডা অংশ পাইয়াছিলেন, তাহাই সরিকদের সহিত বিভাগ করিয়া জমিদারী ও ইজারা সত্বে কালীগ্রাম তালুকের ষোল আনার মালিক হইয়াছেন। মহর্ষির জীবদ্দশায়, মানে উপরোক্ত বণ্টনের পূর্ব্বে, রবীন্দ্রনাথ কিরূপে জমিদারীর সংস্রবে আসিলেন ও জমিদারী পরিচালনা করিলেন তাহা এবার বলি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন জমিদারী পরিদর্শনের গুরু দায়িত্ব হইতে মহর্ষির নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি দ্বিজেন্দ্র-নাথের পুত্রদের উপর সে কার্য্যের ভার দেন। তাঁহাদের কার্য্য-প্রণালী কিন্তু মহর্ষির মনঃপুত না হওয়ায় ১৮৯০ খৃঃ রবীন্দ্রনাথের ভার পড়িল।

রবীন্দ্রনাথের তখন প্রথম যৌবন—তখন তিনি কবিতায় মনপ্রাণ অর্পণ করিয়া ভাবরাজ্যেই বিচরণ করিতেছিলেন, সংসারের কোন ধার ধারিতেন না। তাঁহাদের "খামখেয়ালী সভা"র উন্নতির জন্য তখন তিনি যথেষ্ট আয়োজন করিতেছেন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে 'আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া'—গুরুজনের আদেশ বিচারের বহির্ভূত, তাই পিতৃ আদেশে নিজের খেয়াল প্রভৃতি শৌখীন মনোবৃত্তিকে দূরে রাখিয়া সংসারবুদ্ধি ও পুরুষানুক্রমে লব্ধ বৃত্তিতেই মনকে গণ্ডীবদ্ধ করা আবশ্যক স্থির করিলেন।

উপরে যে 'খামখেয়ালী সভা'র কথা বলিলাম, সেটি একটি অভূতপূর্ব্ব পদার্থ, কবির খেয়ালের পরিচায়ক। সাধারণতঃ যে-ভাবে সভাসমিতি গঠিত হয়, ইহাতে সেরূপ কিছুই ছিল না। বিধি, উপবিধি, কার্য্যবিবরণাদির কোন উপদ্রব ছিল না। কালিকলম কাগজের ব্যবহার বর্জ্জিত হইয়াছিল। ইহার আহ্বানলিপি সেলেটে পেন্সিল দিয়া লিখিয়া সভ্যদের দর্শনার্থ তুলসীরাম দ্বারবানের হাতে প্রেরিত হইত। ইঙ্গ-বঙ্গসমাজভুক্ত কয়েকজন নব্য ব্যারিষ্টার ইহার সভ্য থাকায়, কলিকাতা হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরীতেও ঐ শ্লেটের গতিবিধি দেখা যাইত। অধিবেশনের যেমন কোন নির্দ্দিষ্ট দিন ছিল না, তেমনি অধিবেশনে আলোচনার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ও ছিল না। সঙ্গীত, কবিতা, রহস্যালাপ ও পানভোজনাদিতে পরস্পরের আনন্দবর্দ্ধন করা হইত। মধ্যে মধ্যে সভ্যেরা ছদ্মবেশে (fancy dress) আসিতে অনুরুদ্ধ হইতেন। সভ্য-সংখ্যা ২৫জনের অধিক ছিল না, বাছিয়া বাছিয়া সদস্য নির্ব্বাচন করা হইত। সদস্যদের মধ্যে এক একজন এক একদিন আতিথেয়তার ভার গ্রহণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ ইহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। কাগজ-পত্রের মধ্যে একখানি মোটা বাঁধান খাতা সভাগৃহে রক্ষিত হইত। হেঁয়ালী, চিত্র, কবিতা, সঙ্গীত-চিন্তা যাহার যাহা খুসি লিখিতেন। ইহাই সদস্যদের মধ্যে অবগতির জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইত। ইহার নাম ছিল "খেয়ালখাতা'। পরবর্ত্তীকালে ভারতী-পত্রিকা বন্ধ হইবার দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে এই 'খেয়ালখাতা' হইতে মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানযুগে ছাত্রদের বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট নানাবিধ সাহিত্যিক প্রচেষ্টার অন্যতম হস্তলিখিত সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের খেয়ালখাতার কথা মনে পড়ে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের অগ্রদূত ছিল 'খেয়ালখাতা'। আধুনিক কালে রোটেরি ক্লাব প্রভৃতি ভ্রাম্যমান সঙ্ঘকে 'খামখেয়ালী সভা'র উত্তর পুরুষ বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ভাবরাজ্যে যেমন সম্রাট্—সংসারের কর্ম্মশক্তিতেও তিনি তেমনি অনন্যসাধারণ। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। যে ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কীয় কিছুই তাঁহার জানা ছিল না। প্রথমে তিনি বিশেষ ভীত হইয়া পড়েন। কিন্তু শেষে তিনি সাগ্রহে সে ভার নিজ স্কন্ধে লইলেন। তখন তাঁহাকে কলিকাতার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া জমিদারীতে গিয়াই বাস করিতে হইল। ৩০ বৎসর বয়সে অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজহস্তে জমির জরীপ কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া জমির প্রকার ভেদ, অধিকারী ভেদ, নিরিখ নির্দ্ধারণ প্রণালী, জমি সংক্রান্ত আইন কানুন, জমিজমার হিসাব, সেরেস্তার কাজ এ সমস্তই তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইল। তাহার ফলে এই হইল যে, তিনি একজন পাকা জমিদার হইলেন এবং তিনি তাঁহাদের জমিদারীর কার্য্য-প্রণালীতে যে সকল দোষ ও শৈথিল্য ছিল তাহার আমূল সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিলেন যে রাজশক্তি পরিচালনা করিতে হইলে কঠোর হস্তে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করিতে হইবে, কোমলতার প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। একদিকে তিনি প্রজার সুখ সুবিধার উন্নতি, অভাবমোচন ও অভিযোগের যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন, প্রজার ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দূর করিবার ও সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান গুলি ও স্থানীয় কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া প্রজাদের প্রাত্যহিক জীবনের সকল [illegible] সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিলেন, অনেক স্থলে রুগ্ন প্রজাদের চিকিৎসার ভার সহস্তে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার এ বিষয়ের কথা আমরা পরে যথাস্থানে বলিব। অন্যদিকে প্রয়োজন হইলে বিদ্রোহী প্রজাদের [illegible] জমিদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করিতে [illegible] চাষিদের অবৈধ প্রাপ্তি ও অত্যাচার-স্পৃহাকে [illegible] করিয়াছিলেন। আমরা সেই সময়ে তাঁহার কোন কর্ম্মচারীকে [illegible]

শুনিয়াছি যে, আপনারা কলিকাতায় কেবল প্রভাত রবিকে দেখিতে পান, কিন্তু মধ্যাহ্নে মার্ত্তণ্ডের পরিচয় পাইতে হইলে একবার জমিদারীতে আসিবেন।

চাষী প্রজার দুঃখের প্রতি সহানুভূতি তাঁহার লেখনীমুখে অনেক প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার একাধিক ভদ্র প্রজার মুখে কিন্তু শুনিয়াছি যে তিনি একজন জবরদস্ত জমিদার। কোনও প্রকার অনুগ্রহ প্রার্থনায় কদাচিৎ কর্ণপাত করিতেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারেও ঐ সকল ক্ষেত্রে কঠোর-পন্থী হইতেন। শব্দ ও অর্থ গণনায় বিশেষ প্রভেদ নাই। মহর্ষি নিজে যখন জমিদারী দেখিতেন, তখন তাঁহার প্রশংসায় প্রজারা ছিল মুখর। তাহারা বলিত 'আমরা রামরাজত্বে বাস করি'। রবীন্দ্রনাথের অপ্রতিহত-ভাবে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনের মধ্যে সে রামরাজত্বে দু'একটি দুর্ম্মুখের অভাব হইল না। উপরোক্ত উক্তিপরম্পরা তাহার নিদর্শন। জমিদারদের স্বার্থ ও সীমানা, প্রজার যোত ও দখলীয় ফসল লইয়া যে পরস্পরের মধ্যে মামলার সৃষ্টি ও অর্থনাশ হইয়া থাকে, তাহা নিবারণকল্পে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি জমিদার-সভার পরিকল্পনা করেন। সে বিষয়টিকে আকার দিবার ভার অনুজ রবীন্দ্রনাথের উপর দেন। ফলে, জমিদারগণের সহিত পত্র ব্যবহার করার পর একটি জমিদারী পঞ্চায়েত নামীয় সমিতি স্থাপিত হয়। এখনকার ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা Conciliation Board, কিন্তু প্রজাতে জমিদারে বাকী খাজনার আপোষে নিষ্পত্তির কিছু ব্যবস্থা তাহাতে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন জমিদার-পঞ্চায়েতের সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে সভ্যগণের মতদ্বৈধ হেতু উহা উঠিয়া যায়।

তিনি একদিন এক সময়ে অধিকাংশ পুরাতন কর্ম্মচারীদের বিদায় দিয়া তাঁহাদের স্থানে আধুনিক স্কুল কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। এখনও তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে দ্বারিকানাথের বংশধরদের সকল জমিদারী শাসিত ও

পালিত হইতেছে। আর বোধ হয় বঙ্গদেশে এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত জমিদারী অতি অল্পই আছে। সরকারী রিপোর্টে জমিদার রবীন্দ্রনাথের কার্য্য-প্রণালীর প্রশংসা এক সময় বাহির হইয়াছিল। কিন্তু জমিদারীর কঠোর নিরস গুরুতার তাঁহার সাহিত্য প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। পদ্মার বিস্তৃত জলরাশি ও মুক্ত বায়ু তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিপুষ্টি সাধনে সহায়তাই করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সাধনার যুগ। এইখানেই সোনার বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস চিরদিন তাঁর প্রাণে যে বাঁশী বাজায়, এইখানেই তাহার সূত্রপাত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথ

ব্যবসার ক্ষেত্রে পিতামহ দ্বারিকানাথের অসাধারণ প্রতিপত্তি অক্লান্ত-কর্ম্মী জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে সেই দিকে আকৃষ্ট করে। তিনি প্রথমে স্বপাট, পরে নীল ও অবশেষে 'সারোজিনী' নামধেয় বাষ্পচালিত ছোট যাত্রী-জাহাজের ব্যবসায়ে লাভ ও ক্ষতি গণনা করিতে করিতে প্রচুর ঋণ-ভার সঞ্চয় করিলেন এবং সারাজীবন ধরিয়া তাহারই পরিসমাপ্তি করিলেন। রবীন্দ্রনাথও জ্যোতিদার পদাঙ্ক অনুসরণে মনস্থ করিলেন। কমলার চরণাশ্রিত হেমনলিনীর আকর্ষণে বাংলার কলকণ্ঠ পাপিয়া 'ভারতী'-র কমল কুঞ্জ হইতে উড়িয়া আসিয়া পাটের ক্ষেতে বাসা বাঁধিবার আয়োজন করিল, কিন্তু প্রতিকূল বায়ুতে সে আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল। "যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়" বলিয়া কবি রবীন্দ্রনাথ একদিন যাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তিনি আজ হয়ত সেই অভিমানেই নিজের সম্পত্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবসায়ীরূপে পাইয়াও অভিনন্দিত করিলেন না। ইহা বাংলাদেশের ও বাঙালী জাতির সৌভাগ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। হয়ত সেখানে প্রশ্রয় পাইলে কবির অনধিকার চর্চ্চার প্রসার বৃদ্ধি পাইত। উত্তরকালে কবির গুণে চঞ্চলা সেদিন কবিকে অভিনন্দিত করিতে বাধ্য হইলেই সেদিনও তিনি একা আসিতে সাহস করেন নাই। সরস্বতীর অঞ্চল ধরিয়াই দেখা দিলেন। যাহা হউক রবীন্দ্রনাথ বিফলমনোরথ হইয়া পাটের ব্যবসা তুলিয়া দিয়া 'আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা ধরার ব্যবসা'তে আবার একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ

করিলেন। বাণিজ্যের প্রতি কবির মোহ তখনও তুনির্ব্বার। তাঁহার সে সময়ের মনোভাব কতকটা এই রকম :—

কোন বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহ আমায় ধনী
তাহা হ'লে সেই বাণিজ্যের
ক'রব মহাজনী।

*　　*　　*

যাবই আমি যাবই ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমার যদি না পাই তবু
আর কারে তো পাবই।

(ক্ষণিকা)

শুধু পাট নয়, কোমল আলু ও কঠিন ইষ্টক দুইই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আকৃষ্ট করিতেছিল বটে, কিন্তু আশাবৈতরণীর নদীর পারে যাইতে কোনও সাহায্যই পাওয়া গেল না। তাঁহার ব্যবসার প্রবৃত্তির একেবারে নিবৃত্তি লাভ হইল না; কিছুদিনের জন্য সুপ্ত থাকিয়া তাহা শিল্পানুরাগ ও [illegible] প্রেমের মধ্য দিয়া আবার জাগিয়া উঠিল। বঙ্গভঙ্গ ও বয়কট আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে দেশে যখন কোনরূপ উত্তেজনা নাই, তখন [illegible] দেশীয় শিল্পের প্রতি দেশবাসীকে অনুরাগী করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে এক [illegible] স্থাপন করিলেন এবং রবীন্দ্রনাথও সানন্দে তাহাতে যোগ দিলেন। [illegible] মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর পাবনা, শান্তিপুর, [illegible] ও [illegible] স্থান হইতে নানাবিধ বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য লইয়া এই [illegible] কাজ চলিত। দেশীয় কারুশিল্পীদের উৎসাহ বর্দ্ধন ও [illegible] কাজের উৎকর্ষতা বিধান দ্বারা তৎপ্রতি দেশীয় লোকের [illegible] ছিল ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। ব্যবসাটা ছিল [illegible]। [illegible]

বিভাগ ইহার আদর্শ। দেশীয় শিল্পের প্রাণসঞ্চারের যে আকাঙ্খা লইয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ প্রভৃতি চৈত্রমেলার পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিতে যত্নশীল ছিলেন, তাহার ধারাই রবীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথে পরিদৃশ্যমান। প্রধান কর্মী বলেন্দ্রনাথের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে ঐ ভাণ্ডার বন্ধ হইয়া গেল। শোকভার ও ঋণভার দুইই রবীন্দ্রনাথকে বিপন্ন তো করিলই, উপরন্তু চলতি ব্যবসা গুটাইয়া লইবার সমস্ত দুঃখ ক্লেশ ও দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথকে বহন করিতে হইল।

আবার বঙ্গভঙ্গ যুগে 'বিলাতী পণ্য বর্জ্জন' আন্দোলনের সময়ে কুটির-শিল্পকে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের জীবিকার অবলম্বনীয় করিবার উদ্দেশে তৎকালীন কলিকাতার ৬নং ওয়ার্ডে 'জোড়াসাঁকো পল্লী শিল্পশালা' রবীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার দুইটি বিভাগ, একটি তাঁতশালা ও আর একটি মণিহারী দোকান। জমিদারী হইতে তাঁতী আনাইয়া ইঁহারা নিজেদের বাটির অন্তর্ভুক্ত জমিতে একটি তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে পল্লীর মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক যুবককে শিক্ষানবিশ গ্রহণ করেন। নিকটস্থ একটি বাটীতে পল্লী শিল্পশালার মণিহারী বিভাগ স্থাপিত হয়। তাহাতে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ও ইঁহাদের জমিদারীর কারুশিল্পজাত ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযোগী বিবিধ দ্রব্যসম্ভার রক্ষা ও সুলভ মূল্যে পল্লীবাসী ক্রেতাদের বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। তখন জাপান হইতে কিছু কিছু দ্রব্য সবে আমদানী আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে চাকচিক্যপূর্ণ খেলো জিনিসে মধ্যবিত্ত লোকের রুচি বিকৃত হইয়া না পড়ে, সেইজন্য সৌখিনদের ব্যবহার্য্য অল্পসল্প বাছাবাছা দামী জিনিস তথায় আশ্রয় পাইত। এই প্রচেষ্টার ভিতর হইতে গগনেন্দ্র পরে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, তাহাই পরবর্ত্তীকালে লর্ড কারমাইকেলের অনুরোধে ও আনুকূল্যে সরকারী হোম ইণ্ডাষ্ট্রিস (Home Industries) স্থাপনে গগনেন্দ্রনাথকে প্রভূত সহায়তা করে। এই ব্যাপার সংক্রান্ত পল্লীবাসীদের নানাবিধ মিটিং বা অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত

থাকিয়া উৎসাহ লইতেন ও মূল্যবান পরামর্শ দান এবং কিঞ্চিৎ ব্যয়-ভার বহন করেন। কিন্তু এবারেও আশা মিটিল না। বঁধু আসিলেন না। আসিল 'পিতামহী ভাগ্যদেবীর প্রচুর পরিহাস'। ফলে যথেষ্ট অনটন, বহু বিপদ ও মনঃক্ষোভ রবীন্দ্রনাথকে বরণ করিয়া লইতে হইল। তাঁহার কুমায়ুন অঞ্চলের উদ্যানজাত আপেল ও পেয়ারা সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তাহারাও নাকি এক সময়ে পণ্যমধ্যে গণ্য হয়। এ কারবারে কবি কা'কে পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার খাতাপত্র দেখার সুযোগ না পাইলে বলা কঠিন। অনেকে বলেন, তাঁহার খরচা পোষায় নাই, আবার কেহ কেহ বলেন যে ফলের রস বৃথা যায় নাই; মঞ্জুষায় কিছু মধু সঞ্চিত হইয়াছে।

প্রখর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও এই সকল বিফলতা রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে মর্মান্তিকই হইল। তিনি আর একবার শেষ চেষ্টা করিলেন। এবার কিন্তু প্রণালীর বদল হইল। সরস্বতীলব্ধ মূলধনে লক্ষ্মীর আগমন-পন্থা প্রস্তুতের চেষ্টা চলিল। তাঁহার নিজ পুস্তক সমূহের প্রকাশকে ব্যবসায়ে দাঁড় করাইলেন। পুস্তকের বহিরাবরণের পারিপাট্য সাধন ও সচিত্র সংস্করণ, প্রচ্ছদপটের সুব্যবস্থা, কাগজের গুণানুসারে মূল্যের তারতম্য বিধান, বিভিন্ন আকারে ও বাঁধাইয়ে পুস্তক প্রকাশন, গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অল্পাধিক রদবদল ও কিছু কিছু যোগবিয়োগ দ্বারা সংস্করণের নবত্ব সাধন, এমনকি, গণিত বিজ্ঞানের সমবায় [illegible] (Permutation and Combination) নিয়োজন প্রভৃতি [illegible] উপায়ে বাংলা গ্রন্থের প্রতি জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণের পথ [illegible] উন্মুক্ত করিয়া ঐ ব্যবসাটিকে শিল্পকলায় পরিণত করিলেন। [illegible] পুরস্কারের খ্যাতিও তাঁহার এই ব্যবসায়ের মূলধনকে সমৃদ্ধি [illegible] করিল। এ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রচেষ্টা আশানুরূপ না হইলেও অনেকটা [illegible] মণ্ডিত হয়। ভাষান্তরিত গ্রন্থের [illegible] প্রতি খাঁটি ব্যবসায়ীসুলভ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অর্থাগমের পথ [illegible]

ম্যাকমিলান কোম্পানীকে পাইয়া চকের জোড়া ঘুঁটি ঘরে উঠিল। বঙ্গের বাণী চিত্তের বেণু ধরিয়া বিশ্বের ভারতী হইলেন।

পৈত্রিক ব্যবসা জমিদারীতে রবীন্দ্রনাথের যে কতটা নৈপুণ্য তাহা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। "ধাবড়া কোল" কলিয়ারীর মালিক রবীন্দ্রনাথ জমিদারী হিসাবেই তাহাকে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার খনির দ্রব্য মণির মূল্যে বিকাইলে, লোকের মুখে মুখে ন্যাকড়া-হরিশ, কয়লা-উমেশ, বালতি-নন্দীর ন্যায় কয়লা-রবির প্রসঙ্গও শুনা যাইত। বাঙালীর মধ্যে ইহা ব্যক্তি বিশেষের সাময়িক খ্যাতির পরিচায়ক। লোকের কথোপকথনে মাত্র ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বোম্বাই অঞ্চলে ইহাকে হেরেডিটারী অনার্স (Hereditary Honours) দেওয়া হয়। কুলমর্যাদা চাপা দিয়া ব্যবসা-সাফল্যটা বংশানুক্রমিক পদবীদ্বারা গৌরবান্বিত করা হয়। এমন কি, ইংরাজ সরকারের কয়েদীর দারোগার পদগর্ব্বটাও পুরুষানুক্রমিক পরিচয়ে স্থান পাইয়াছে, তাই আমরা লিমজি জেলর (Lempegy Jailor) নাম শুনি। গত শতাব্দীতে বিখ্যাত মতিশীলও বোতল-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি কিন্তু মুম্বাই-এর [illegible]ওয়ালা, টিনওয়ালা, বট্‌লীভাই বা গান্ধী প্রভৃতি ব্যবসায়িক প্রতিপত্তির ধ্বজাস্বরূপ কোন বংশগত পদবী প্রাপ্ত হ'ন নাই। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে

যুবক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সেবার বিভিন্ন দিক্ পূর্ব্ব দুই পরিচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। দেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ, মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে, মধ্যে মধ্যে এক একটি মাসিকপত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তদ্দ্বারা তিনি কেবল যে নিজের সুকুমার কলার প্রচারে ব্রতী ছিলেন তাহা নয়, তদপেক্ষা যাহাতে দেশের লোকের রসবোধ মার্জ্জিত, উন্নত ও প্রশস্ত হয়, এবং অন্যান্য জাতির চিন্তা-প্রণালী এবং গভীর ও গম্ভীর ভাবের চিন্তা ও কার্য্যাবলীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে তাহারা সক্ষম হয়, তজ্জন্য ধীরে ধীরে অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত প্রবন্ধ, সমালোচনা, কৌতুকরচনা, সংবাদ সঙ্কলন ও সঞ্চয় দ্বারা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া, তাহাতে নূতন নূতন ভঙ্গীপ্রদানে সর্ব্ববিধ ভাবের প্রকাশশক্তি দানে যত্নবান ছিলেন। যাহাকে বলে একটা সতেজ জাতিগত সাহিত্যিক জীবন বা চিন্ময় ভাবানুকূল আবহাওয়া (Intellectual life and atmosphere) তিনি সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী ছিলেন। মানুষের বিভিন্ন চেষ্টার ও [illegible] উপযোগী চিন্তা-বৈচিত্র্য লইয়া বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক সাময়িক পত্রাদি [illegible] বাংলা ভাষায় হইতেছিল। রাজনীতি, কৃষি, আয়ুর্ব্বেদ, [illegible] [illegible] শিল্প, নাট্যকলা, চিকিৎসাতত্ত্ব, আচার ও ধর্ম্ম, এবং বালক ও বালিকাদের উপযোগী পাঠ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বাঙালী লেখকের [illegible] ও [illegible] কুশলতা দিন দিন পরীক্ষিত হইতেছিল। নবাগত [illegible] [illegible] সংস্কারে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের এই চেষ্টা

বিশেষভাবে অনুভব করিয়া, সময়ে সময়ে বিশিষ্ট ভাবব্যঞ্জক ও চিন্তার দ্যোতক কাগজ বাহির করিয়া জনমত গঠন ও দেশের ভাবধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ভাষাতত্ত্বও মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিতেন। বর্ত্তমান যুগে সকল সভ্য জাতির মধ্যে খবরের কাগজ রাষ্ট্র-চালনার সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। কামান অপেক্ষা অনেক সময় দেখা যায় 'ঝরণা কলম' অধিক শক্তিশালী। সাময়িক পত্র সম্পাদন ও পরিচালন যেমন গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ তেমনই দূরদৃষ্টি, কার্য্যদক্ষতা ও তৎপরতার পরিচায়ক। সম্পাদকেরাও জননেতা হিসাবে বহু প্রভাবশালী বলিয়া গণ্য হন। যদিচ আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে এখনও সংবাদ-পত্রের প্রতি তত্টা সম্ভ্রমবোধ ও এই আয়ুধটির আক্রমণে এবং আত্ম-রক্ষায় নৈপুণ্য সম্যক্ উপলব্ধ হয় নাই, কিন্তু ইহা আনয়নের জন্য রবীন্দ্র-নাথ প্রমুখ মনিষীগণ উদ্গ্রীব ছিলেন। শুধু সৎসাহিত্য ও তাহার রসা-স্বাদনে জাতি বিলাসী হইয়া পড়ে, তাই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিভাকে একেবারে আত্মনিগৃহীত করিয়া সংঘাত ও সংযমের পথে চালিত করেন। নিজেকে নানাবিধ নীরস কার্য্যে, অবশ্য সাহিত্যিক বিভাগে, লিপ্ত করেন। এ হিসাবে এক একটি মাসিক পত্রিকাকে জাতীয় উন্নতি ও জাতির প্রধান সম্বল মাতৃভাষার এক একটি ছোট প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। কবিবরের পিতামহ স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ ঠাকুর যখন 'বেঙ্গল হরকরা' (Bengal Hurkura) এবং 'বঙ্গদূত' পত্রের মালিকত্ব (১৮২৯ খৃঃ) ক্রয় করেন তখন তাঁহারও জনমত গঠন ও প্রচলনের দিকে লক্ষ্য পড়ে। ইংরাজ বেতনভুক্ কর্ম্মচারী দ্বারা এবং কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর দ্বারা সকল কার্য্য নিজ অভিমতে করাইয়া লইতেন, সম্পাদকীয় আসন গ্রহণে নিজে পরাঙ্মুখ ছিলেন। রাজশক্তির নিকট প্রজাদের ব্যবস্থা বিষয়ে অভিমত ও অভিযোগ জ্ঞাপনই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অন্যরূপ থাকায়, তিনি স্বীয় স্বভাবজাত ললিতকলাচর্চ্চাজনিত রসানুভূতি স্বদেশ-বাসীকে বন্টন করিয়া তাহার সাহায্যে তাহাদের চেতনা, প্রেরণা ও কার্য্য-

কারিতা ভিতর হইতে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। ছাপাখানা সংক্রান্ত সম্পাদকের গতানুগতিক দৈনন্দিন সকল নীরস কার্য্যের বোঝা শ্রদ্ধার সহিত বহন করিতেন। এইরূপে বাগ্দেবীর আল্পনারঞ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপীঠ রচনা করিয়া কবি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। যাহাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সাহিত্য সাধনার সহিত বাঙ্গালী উত্তরকালে গৌরবের আসন প্রাপ্ত হয়, সে কারণে সমগ্র বঙ্গভাষীদের ও বাণীসেবকদের নিত্য-পূজা ও নৈমিত্তিক অর্চ্চনার উপযুক্ত, দৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত, বৃহত্তর ও প্রশস্ত বেদিকার উপর একটি প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণে জীবনের বহুবৎসর তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলা শব্দের ও ব্যাকরণের অনুশীলন উদ্দেশ্যে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলার তদানিন্তন প্রথিতনামা সাহিত্যরথীদের লইয়া "বিদ্বজ্জন সম্মিলনী" নামক সাহিত্য-সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সে সমাজ কিন্তু স্থায়িত্বলাভ করিল না। যখন সিভি-লিয়ান বিমস্ সাহেব ফরাসী এ্যাকাডেমী অফ লিটারেচারের [illegible] দেশে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করেন, তখন [illegible] আলোচনা আরম্ভ হয়। 'বঙ্গদর্শন'এ বঙ্কিমচন্দ্র বিমস সাহেবের প্রস্তাব মুদ্রিত করিয়া তাহার পোষকতা করিলেন। বিমস্ সাহেবের প্রস্তাব উপলক্ষে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সভাপতিত্বে জাতীয় সভার (National Society) এক অধিবেশন হয়। [illegible] রাজনারায়ণ বসু তাঁহার অধুনা প্রসিদ্ধ 'বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' পাঠ করেন। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কল্পনা জল্পনা চলিতে [illegible] কার্য্যে কিছু হয় নাই। বহু বৎসর পরে শোভাবাজারের [illegible] কুমার (পরে রাজা) বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের [illegible] সাহিত্যানুরাগী মিলিত হইয়া ১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ ([illegible] ১৮৯৩) রবিবার তাঁহার ভবনে ২।২নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে [illegible]

Academy of Literature' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা করেন। তাহার পরে রাজা বাহাদুরের নূতন বাসভবন (১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট) নির্ম্মিত হইলে, ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যালয় এইখানে স্থানান্তরিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র মূল ভিত্তি। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের গঠনকর্ত্তাদের নাম দেওয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

১। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, ২। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, পি, আর, এস্, ৩। এল্ লিওটার্ড, ৪। পণ্ডিত শ্যামলাল গোস্বামী, ৫। আশুতোষ মিত্র বি, এ, ৬। ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, ৭। ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এ, ৮। ব্রজভূষণ গুপ্ত বি, এ, ৯। কালী প্রসন্ন কবিরত্ন, ১০। গোপাল চন্দ্র দত্ত, ১১। সরোজ মোহন দাসগুপ্ত বি, এ, ১২। হরি মোহন কবিরত্ন, ১৩। নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ, ১৪। প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়, ১৫। গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৬। ব্রজ মোহন দাসগুপ্ত বি, এ, ১৭। অক্ষয় কুমার দাসগুপ্ত বি, এ।

ইহাদের মধ্যে মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও এল্ লিওটার্ড সহকারী সভাপতি, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদক এবং প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাধ্যক্ষ মনোনীত হন। কিরূপে 'Bengal Academy of Literature' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' পরিণত হইল, তাহার ইতিহাস বাঙ্গালী মাত্রেরই কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা সেই সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত 'পরিষদের জন্মকথা'* প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"সভার ঊনবিংশ অধিবেশনে (১০ই পৌষ রবিবার, ১৩০০ সাল, ইং ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৯৩) সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের একখানি বাংলা পত্র পাঠ করেন। পত্রের শিরোনামায় তিনি 'President, Bengal Academy of Literature,' না দিয়া

---

* সাহিত্য পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উৎসব সভায় শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত যে প্রবন্ধ পড়েন তাহা বঙ্গবাণীতে (১০ই শ্রাবণ মঙ্গলবার ১৩৪০, ২৫শে জুলাই ১৯৩৩ খৃঃ) প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি' রূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি প্রস্তাব করেন যে বাংলা ভাষায় পরিষদের (বর্তমান সভার, কেননা তখনও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নামকরণ হয় নাই) কার্য্য সম্পাদিত হওয়া উচিত। পত্রের শেষে প্রধান সাহিত্যসেবক প্রস্তাব করেন "যদি সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে, তবে মাতৃভাষা অনুশীলন না করিলে সে খ্যাতি লভনীয় নহে।" যাহা হউক, সভা রাজনারায়ণ বসুর প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। সভার দ্বাবিংশ অধিবেশনে (৭ই ফাল্গুন, রবিবার ১৩০০ সাল, ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪) মালদহ হইতে সুপ্রসিদ্ধ লেখক উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ; আই, সি, এস মহাশয় এই সভার বাংলায় নামকরণ করিবার প্রস্তাব করিয়া এক পত্র পাঠান। তিনি লিখিয়াছেন—

"Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাংলাতে ইহার নামকরণ হয় নাই। পদার্থটি যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সভ্যগণ অবশ্য স্বীকার করিবেন যে বিশুদ্ধ বাংলায় ইহার নামকরণ করা আবশ্যক।

প্রস্তাবিত পদার্থটিকে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' বলা যাইবে। পরিষদ শব্দটি ছাড়া ভট্টনারায়ণ ও কালিদাসের নজির দেখাইয়া এই Academy শব্দের আর একটি প্রতিশব্দও প্রস্তাব করেন। সেটি 'সদ্‌গোষ্ঠী'। পত্র-শেষে তাই তিনি লেখেন—"পরিষদ ও সদ্‌গোষ্ঠী দু'য়ের মধ্যে একটিও যদি মনোরম না হয়, সভ্যগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সমবেত বুদ্ধিবলে শ্রুতিকোমল বিশুদ্ধ আর্য্য ভাষায় আপনাদের মিলিত অস্তিত্বের নামকরণ করিবেন। অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জা বোধ হয়।" ১৩০০ সালের ৭ই ফাল্গুনের এই সভায় Bengal Academy of Literature-এর নাম হইল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্'। এই জাতীয় নামকরণের জন্য আমরা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু ও পণ্ডিত উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহাশয়দ্বয়ের কাছে ঋণী। Bengal

Academy of Literature নাম দিয়া সভা হইতে যে মাসিক খানি ইংরাজিতে ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় তাহার অষ্টম সংখ্যার (১৮৯৪ খৃঃ ১৭ই মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত) শীর্ষ দেশে বড় বড় অক্ষরে বাংলায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' কথাটি মুদ্রিত হইল। পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা ও তাহার নামকরণের এই ইতিহাস (Bengal Academy of Literature পত্রিকা হইতে এই অংশের উপকরণ সংগৃহীত) ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ Bengal Academy of Literature এর ভিত্তির উপর **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্** গঠিত হইল। এই দিনের অধিবেশনই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম অধিবেশন।'

পরিষদের প্রথম বর্ষে নিম্নলিখিত কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে লইয়া পরিষদের কার্য্য আরম্ভ হয়—সভাপতি রমেশ চন্দ্র দত্ত আই, সি, এস, সি, আই, ই; সহ-সভাপতি কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও এস লিওটার্ড। স্থির হইল, ইহার ভাষা বাংলা হইবে। লিওটার্ড সাহেব বাংলা জানিতেন না। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কাজ করিতে মনস্থ করিলেন, তখন লিওটার্ড সাহেব 'ইহার দুইজন সম্পাদকই বাঙালী হওয়া উচিত' বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন এবং স্বয়ং পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থানে সম্পাদক হইলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উত্তরকালে তাঁহার সহকারী ব্যোমকেশ মুস্তফীর ও অন্যান্য হিতৈষীর সদস্যের চেষ্টায় ও প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠান অচিরে গৌরব-মণ্ডিত হইল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানে প্রথম বৎসরেই ইহার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং পরেও অনেক বৎসর সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া ইহার জয়ডঙ্কা নিনাদে ব্যাপৃত ছিলেন। সভাপতির পদ গ্রহণে একাধিকবার অনুরুদ্ধ হইয়াও সে পদ গ্রহণে অসমর্থ, ইহাই চিরদিন জানাইয়াছেন। কারণ, তাঁহার পক্ষে একজনের কাজ এক স্থানে আবদ্ধ থাকা অসম্ভব। অথচ তিনি বুঝিতেন,

পরিষদের সভাপতির গুরুতর দায়িত্ব সম্পাদন করিতে হইলে কলিকাতায় তাঁহার উপস্থিতি ও নিত্য সংযোগ প্রয়োজন।

বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রসার বৃদ্ধির জন্য রবীন্দ্রনাথ আত্মনিয়োগ করেন। যাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে পরাশ্রয়,—'হউক সে রাজার আশ্রয়, তথাপি পরাশ্রয়' হইতে আনিয়া নিজের গৃহে স্থাপিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অগ্রণী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, এই এগারজন সভ্যের সাক্ষরিত রেকুইসিসান (Requisition) পত্রানুসারে সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী পরিষদের কার্য্যালয় কোন সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব আলোচনার জন্য ১৩০৬ সালের ৩রা ফাল্গুন তারিখে একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন পরিষদের সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সভায় শতাধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাব সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় যে অল্পসংখ্যক সভ্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁহারা সভাস্থল ত্যাগ করেন। অবশিষ্ট সভ্যগণের সকলের সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎপর দিন পরিষদের কার্য্যালয় ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের মোড়ে) ভাড়াটিয়া বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। যখন পরিষদ কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়, তখন অন্যান্য অনেকের সহিত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং পরিষদ গ্রন্থাগার হইতে বহু পুস্তক তিনি নিজ হস্তে তাঁহার গাড়ীতে রক্ষা করিয়া পরিষদের নূতন কার্য্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার গাড়ীকে অনেকবার যাতায়াত করিয়া পরিষদ স্থানান্তর কার্য্যে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। অন্যের ভূমির উপর আপনার উপযোগী অধিষ্ঠান ভবন নির্মাণ না করিলে পরিষদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, পরিষদের সদস্যগণ

সেই দিকে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নব মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত পরলোকগত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় তাঁহার "স্বস্তিবচনে" লিখিয়াছিলেন—

"জনম তোমার রাজনিকেতনে,
বিদ্যা বিত্তযুত 'বিনয়' ভবনে,
কোন অতীতের দিবা সন্ধিক্ষণে,
ভূমিষ্ঠ হইলে শুভ পরিষৎ।
আনন্দ সাগরে ভক্তগণ মগ্ন,
দৈবজ্ঞ দেখিয়া শুভ সিংহ লগ্ন
দেবগুরু যোগে সর্ব্বাস্থি ভগ্ন
গণিল তোমার কোষ্ঠী ভবিষ্যৎ।
তারপর নানা পূজা উপচারে,
বসন ভূষণ বিলাস সম্ভারে
তব ভক্তগণ পূজিল তোমারে
শৈশবে রাজার প্রাসাদ মাঝে।
অঙ্ক ভাগ্যদোষে পিতৃরিষ্ট বলে,
অষ্টম বরষে নব কুতূহলে,
জন্ম নিকেতন ত্যাজিয়া কৌশলে,
বাহির হইলে নূতন সাজে।
নবীন যৌবন পঞ্চদশ বর্ষে,
নূতন জীবনে অভিনব হর্ষে,
এস পরিষদ উজ্জ্বল আদর্শে
বঙ্গের প্রাঙ্গনে প্রদীপ জ্বালি'।
আজি এ পুণ্যদা পঞ্চদশী তিথি,
কৃত্তিকা রাজিত নক্ষত্রের বীথি,
দেখি সমুজ্জ্বল রোহিণীর সিঁথি
শশাঙ্ক অতিথি সশঙ্ক মনে ;—
বুধ দিনমণি বৃশ্চিক-সদনে,
সুরেন্দ্র বন্দিত মৃগেন্দ্র ভবনে,
তুলায় মঙ্গল শুক্র সম্মিলনে
রজনী রঞ্জন রোহিণী সনে।"

জ্যোতিষিক গণনার সুবিধার জন্য এবং অন্যান্য কারণে পরিষদের গৃহ-প্রবেশরূপ স্মরণীয় উৎসব লেখক অগ্রহায়ণী পৌর্ণমাসীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন।

ইহার জন্য দেশের লোকের নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে রবীন্দ্রনাথ সাধারণের দ্বারস্থ হইতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। পরলোকগত দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরিষদ্ গৃহের জন্য হালসি বাগানের ভূমিখণ্ড যে পঞ্চজনার হস্তে ন্যস্ত করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। সাধারণের নিকট সংগৃহীত অর্থে একতালা মাত্র নির্ম্মিত হইতে পারে দেখিয়া, সেই ভাবে কার্য্য আরম্ভ হয়। পরে লালগোলার মহারাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় নিজে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া পরিষদের দ্বিতল নির্ম্মাণ করাইয়া

দিতে স্বীকার করায় সেইভাবে পরিষদ্ মন্দির নির্ম্মিত হইল। পরিষদের কার্য্য ক্রমশঃ এতটা প্রসারতা লাভ করে যে কেবলমাত্র পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ ও প্রবন্ধ আলোচনায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে কর্ম্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা চলে না। তাই ইহার মুখপত্রস্বরূপ একখানি সাময়িক পত্রিকা 'সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা' নামে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। পরন্তু সাহিত্যিকদের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহাদের আলেখ্য, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, রচনার পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ঐতিহাসিক প্রস্তর, তৈজস, খোদিত লিপি, চিত্র, মূর্ত্তি, মুদ্রা প্রভৃতি বহুতর দ্রব্যাদির সংগ্রহে ও সংরক্ষণে একটি মিউজিয়ম (চিত্রশালা) গঠিত হয়। এই সকল বস্তু যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া জ্ঞান-বিস্তারে সহায় হয়, সেই ভাবে দ্রব্যগুলিকে সুবিন্যস্ত করিয়া রক্ষা করিয়া ও প্রণালী-বদ্ধ ক্যাটালগভুক্ত করিয়া নির্দ্দেশক কাষ্ঠফলক সমন্বয়ে এই নব নির্ম্মিত গৃহে সুন্দররূপে রাখা হয়। পরবর্ত্তী কালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি স্বনামধন্য স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিরক্ষা কল্পে তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুগণের উৎসাহে, এমন কি, বরোদার মহারাজা সায়াজি রাও গায়কোয়াড়ের পূর্ণ সহানুভূতিতে এই মন্দিরের সংলগ্ন রমেশ ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে উপরোক্ত ক্রমবর্দ্ধনশীল মিউজিয়মটি স্থাপিত হইয়াছে, এবং জনসাধারণের ব্যবহারার্থ একটি সুবৃহৎ সভাকক্ষ নির্ম্মিত হইয়া পরিষদ-হলের সমধিক ব্যাপ্তি দান করিতেছে। এই ভবন নির্ম্মিত হইবার জন্য যে অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হইল, তাহাও কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী একখানি স্বতন্ত্র দানপত্র (Trust deed) প্রস্তুত করিয়া দিঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রমুখ [illegible] হস্তে ন্যস্ত করেন। বলা বাহুল্য, এই অনুষ্ঠানটির সহিতও [illegible] উৎসাহ ও সংযোগ ছিল। দেশের লোকের অর্থে এই [illegible] নির্ম্মিত 'রমেশ ভবন' সম্প্রতি [illegible] হইয়া [illegible] ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ (ইং ১৯০৮ সালের [illegible])

পরিষদের নব নির্ম্মিত মন্দির-প্রবেশ উৎসব উপলক্ষে দেশের লোকের যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। সুদূর মফঃস্বল হইতে এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি অনুরাগী অনেক ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। উৎসব আরম্ভের বিজ্ঞাপিত সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই এরূপ জনসমাগম হয় যে নূতন মন্দিরের দ্বিতল গৃহে ও সিঁড়িতে দাঁড়াইবার স্থান মাত্রও ছিল না। ক্রমে ছোট বড় সকল লোকের এবং আবালবৃদ্ধ বাঙালী সাহিত্যানুরাগীর পদার্পণে মন্দিরের সম্মুখস্থ আপার সারকুলার রোড হইতে দ্বিতলের হল পর্য্যন্ত 'ন স্থানম্ তিল ধারণম্' হইয়া পড়িল। সেদিনের সে বিরাট সভায় দেশবাসীর উত্তেজনা ও উল্লাস যাঁহারা সচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার স্মৃতি জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। অন্য পরে কা কথা সে সময়ের ইংরাজী সংবাদপত্রে লিখিল যে ফুটবল প্রভৃতি আমোদপ্রমোদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য আহুত সভামণ্ডপে লোকের ভীড় হওয়া স্বাভাবিক ও সম্ভবপর বটে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের নামে এত লোক জমায়েৎ হওয়া অস্বাভাবিক ও বিস্ময়জনক। সেদিনকার আরব্ধ কার্য্য দ্বিতলে সুনির্ব্বাহ হইবার মানসে সভাপতি হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় নিম্নতলের অতৃপ্ত ও সংক্ষুব্ধ জনতাকে উপযুক্ত ভাষণে শান্ত করিবার জন্য উচ্চকণ্ঠ 'রবিবাবু'কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। তিনিও তখনকার 'নায়ক'-এর সম্পাদক সবক্তা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও দু-চার-জন সাহিত্যিকপ্রধান সমভিব্যাহারে সভাস্থল ত্যাগ করিয়া নিম্নতলে এক অতিরিক্ত সভার বৈঠক করিলেন। ৺পাঁচকড়ি বাবু ও ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় দুজনে জনতাকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করিলে রবীন্দ্রনাথ স্বভাব-সুললিত কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত অভিভাষণ পাঠ করেন—

"কিছুকাল হইল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় তাঁহার কোন একটি প্রবন্ধে পাণিনির ব্যাকরণ প্রভৃতি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে পুত্র শব্দের অর্থ ছিল, যে পূর্ণ করে সেই পুত্র।

পুং নামক কোন একটি নরক হইতে ত্রাণ করে, এই ব্যাখ্যাটি পরবর্ত্তী-কালে আমাদের পুরাণে স্থান পাইয়াছে।

* * *

পিতাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে বলিয়াই পুত্রের গৌরব। পুত্র পিতার অকৃতকর্ম্মগুলিকে সম্পন্ন করে, তাঁহার ভারকে বহন করে, তাঁহার ঋণকে পরিশোধ করিয়া দেয়। এই কারণেই কেবলমাত্র স্নেহ প্রবৃত্তির চরিতার্থ-তার জন্য নহে, কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য, অকৃতার্থতা ও অসমাপ্তি হইতে মুক্তিলাভের জন্যই পুত্রকে আমাদের দেশে দেবতার বিশেষ প্রসাদ-লাভের মতই গণ্য করিত।

* * *

এই সম্পূর্ণতাহীন খণ্ডতাশাপগ্রস্ত বন্ধ্যাদশা ঘুচাইবার জন্য আমাদের অভাগা দেশ কামনা করিতেছিল। কারণ, বন্ধ্যাত্ব মাত্রেই বন্ধন। যে ব্যক্তি নিজের ফল ফলাইতে পারিল না, সে নিস্কৃতি পাইল কই? আমাদের দেশের অভ্যন্তরে যে অভিপ্রায় রহিয়াছে, সেই অভিপ্রায় যদি চারিদিকে সফলতার বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া উঠিতে না থাকে, যদি তাহা কেবল শুধুই থাকিয়া যায়, যদি তাহা অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইতে থাকে, তবে এমন কোন কৃত্রিম উপায় নাই যাহার সাহায্যে দেশ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। যাহারা নিরন্তর কালের মধ্য দিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে দেশের সংকল্পকে সিদ্ধির পথে—মুক্তির পথে লইয়া যাইবে, তাহারাই দেশের পুত্র। দুঃখিনী বঙ্গভূমি সেই পুত্র কামনা করিতেছিলেন।

আমাদের দেশমাতাকে বহুপুত্রবতী হইতে হইবে। এই পুত্রেরা কেহবা দেশের জ্ঞানকে, কেহবা দেশের ভাবকে, কেহবা দেশের কর্ম্মকে অক্ষয়বিধান করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাহারা নানালোকের উদ্যমকে একস্থানে আকর্ষণ করিয়া লইবে, তাহারা নানা-কালের চেষ্টাকে একত্রে বাঁধিয়া চলিবে। তাহারা দেশের চিত্তকে নানা ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে এবং অনাগত কালের মধ্যে বহন করিয়া

চলিবে। এমনি করিয়াই দেশের বন্ধ্যা অবস্থার সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে। সে জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে—সকল দিকেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

এইরূপ পুত্রের জন্ম বঙ্গভূমির কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে—পুত্রেষ্টি আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেকদিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ইহা একটি বিশেষদিকে বাংলা দেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা বঙ্গদেশের আত্মপরিচয় চেষ্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, এককাল হইতে অন্যকালে বহন করিয়া চলিবে—তাহার এক নিত্য প্রসারিত জিজ্ঞাসাসূত্রের দ্বারা অল্পকার বাঙ্গালীর চিত্তের সহিত দূরকালের বাঙ্গালী চিত্তকে মালায় গাঁথা চলিবে—দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের, যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে। পুত্র পিতৃবংশকে, পিতৃকীর্ত্তিকে, পিতৃসাধনাকে এইরূপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া অতীতের সহিত অনাগতকে এক করিয়া মানুষকে কৃতার্থ করে—দেশ-পুত্রও দেশের চিত্তকে, দেশের চেষ্টাকে বৃহৎ দেশে বৃহৎ কালে ঐক্যদান করিয়া তাহাকে মহৎ করে, তাহাকে চরিতার্থ করে। 'সাহিত্য পরিষৎ'ও বাংলাদেশের চিত্তকে এইরূপে নিত্যতা দান করিয়া তাহাকে মহৎরূপে সত্য করিয়া তুলিবার আশা বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার অভ্যুদয়কে বাংলাদেশের পুণ্যফল বলিয়া গণনা করিতেছি।

আমাদের এই 'সাহিত্য পরিষদ্' এতদিন গর্ভবাসে ছিল। সে অঙ্গে অঙ্গে প্রাণে রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তাহার সুহৃদগণ তাহাকে নানা আঘাত অপঘাত হইতে সযত্নে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। তাহার দশমাস কাটিয়া গিয়াছে—আজ সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। * * *

অদ্যকার উৎসবে এই নবদেহপ্রাপ্ত সাহিত্য পরিষদের মুখ দেখিয়া সমস্ত দেশের স্নেহ ও আশীর্বাদ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এই আমরা

আশা করিয়া আছি। যে পর্য্যন্ত ইহার শৈশবের দুর্ব্বলতা কিছুমাত্র থাকিবে, সে পর্য্যন্ত বাঙালী ইহাকে পোষণ করিবে, এই অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রত্যাশা লইয়া আজ আমরা আনন্দ করিতে আসিয়াছি।”

এই সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়া, কলিকাতার মেয়েলি ছড়া প্রভৃতি গ্রাম্য সাহিত্যের এবং বাংলা শব্দদ্বৈত, বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ভাষার ইঙ্গিত প্রভৃতি ভাষাতত্ত্বের (Philology ও Phonetics) দিকে বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। বাংলা সাহিত্যিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য যখন **বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন** প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহভরে কাশিমবাজার গিয়া ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রথম সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেন। সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগেই প্রতিবৎসর বিভিন্ন জেলায় বাঙালী সাহিত্যিকগণের মেলন হয়; তবে অধুনা বাঙলার বাহিরে বাঙ্গালী বাসিন্দারাও বাংলাভাষীদের জন্য দিল্লী, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি বড় বড় বাঙালীকেন্দ্রে তৎ তৎ স্থানীয় লোকের আগ্রহে ও সাহায্যে **‘প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন’** করিতেছেন। ইহার প্রথম অধিবেশনেও রবীন্দ্রনাথ পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি না হইলেও কয়েক বৎসর ‘বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে’ উপস্থিত হইয়া নানাভাবে সারগর্ভ বক্তৃতা ও পরামর্শ দিয়া ইহার কার্য্যপ্রণালী ও কার্য্যে তিনি সহায়তা করিয়াছিলেন। বহুবৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ পুনর্ব্বার ১৩৩৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রের পীড়াবশতঃ তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় সাহিত্যশাখার সভানেত্রী তাঁহার প্রথিতযশা সহোদরা স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী মূল সভাপতির সভানেত্রীর কাজ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে নয়, চিন্তাশীল দার্শনিক বলিয়াও তিনি দেশে বিদেশে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছেন। ১৯২৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে যখন নিখিল ভারত দার্শনিক

সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়া একটি সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করেন। রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে পার্লামেন্ট অব্ রিলিজিয়নের যে অধিবেশন হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে একটি হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন তাহার মধ্যে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি কাশীতে 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনী'র প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। আগরতলা সাহিত্য সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ভরতপুর হিন্দি সাহিত্য সম্মিলনে তিনি হিন্দিতে বক্তৃতা দেন। নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনীর কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে তিনি বাংলায় ও ইংরাজীতে যে অভিভাষণ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহা পঠিত হয়। কলিকাতায় ইংরাজ কবি শেলীর শতবার্ষিক উৎসবে (১৩২৭) ও জার্ম্মান কবি গেটের শতবার্ষিক উৎসবে (১৩২২) সভাপতি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিক উৎসবে (১৩৩৪) রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি কল্পে বক্তৃতা করেন। বঙ্গভঙ্গ যুগে যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ (Bengal National Council of Education) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার একজন প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্ম্মী ছিলেন এবং বহু বৎসর তাহার কার্য্যধারার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। এই শিক্ষা পরিষদে পরীক্ষকরূপে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার যে প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার অভিনবত্ব সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল। এই সকল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি অপেক্ষা তাহার চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তি কতদূর বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য এই সকল প্রশ্নপত্র রচিত হয় এবং সেই কারণে পুস্তক দেখিয়া উত্তর দিবার ব্যবস্থা

ছিল। যখন বরোদা হইতে আগত হইয়া অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় কলিকাতায় ওয়েলিংটন্ স্কোয়ারে মল্লিক মহাশয়দের বাটিতে অবস্থান করিয়া ইংরাজিতে বন্দেমাতরম্ কাগজের অবতারণা করেন এবং জাতি-গঠনের অনুকূল শিক্ষার প্রচলন মানসে এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেন, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে খুব নিকট ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয়। তাঁহাকে রবীন্দ্রনাথ কি পরিমাণে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা তাঁহার প্রসিদ্ধ কবিতা 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' হইতে বুঝা যায়। এই সময়ে কলিকাতার নানাস্থানে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক আন্দোলনে ও বক্তৃতায় যোগ দেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিন চন্দ্র পাল তাঁহাকে সহায়করূপে পাইয়া দ্বিগুণ বল ও উৎসাহ লাভ করেন। পূর্ব্বেই 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' গঠন উপলক্ষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধন হয় এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জল্পনা কল্পনার মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। এই 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে'র প্রচেষ্টার ফলে অদ্য কলিকাতার অদূরবর্ত্তী যাদবপুরে School of Technical Education and Engineering আজও বিদ্যমান আছে, কিন্তু নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনা এই বিষয়ে উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু কবির এইদিকে লক্ষ্য ও একাগ্রতা থাকায় তিনি সেখানে নিজের স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সেই শান্তিনিকেতন বোলপুরে অন্তর্জাতিক মনীষীগণের সহায়তায় ও আনুকূল্যে ইংরেজ সরকার বাহাদুরের অনুমোদন, সাহায্য বা কটাক্ষপাত সত্ত্বেও করিয়া বৃহত্তর বিশ্বভারতী শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ

বিদেশে রবীন্দ্রনাথ

১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে যখন কায়স্থ পাঠশালার প্রবীণ অধ্যাপক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ হইতে বাঙলার বাহিরে বাঙালীদের মুখপত্র রূপে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে মনস্থ করেন, রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উৎসাহ দেন। এক্ষণে এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় ইহার কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হইয়াছে ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদকতায় "প্রবাসী" নামধেয় শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে উহা সর্ব্বজন-পরিচিত ও আদৃত। সূচনায় রবীন্দ্রনাথের "প্রবাসী" বলিয়া একটি কবিতা বাহির হয়, এবং আজীবন রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত লেখক ও হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে জড়িত ছিলেন। কবিতাটি এই—

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।"

এই বিশ্বপ্রীতিব্যঞ্জক ভাব রবীন্দ্রনাথের শুধু বাহিরের কথা নয়, অন্তরতম বাণী। তাঁহাকে এই মিলন আকাঙ্ক্ষা বরাবর দেশবিদেশের পরিচয় সংগ্রহ করিতে, ও নিজেকে ভিন্নদেশবাসীদের মধ্যে হাবভাব ও ভাষার বিলাসে মেলাইয়া ও বিলাইয়া দিতে প্রণোদিত করিয়াছে। তাঁহার জগদ্ব্যাপী খ্যাতির প্রসারতা ও গভীরতা এবং তাঁহার ভবিষ্যত জীবনের আশাতীত সফলতা এই বিশ্বপ্রীতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কোন মানুষ যদি নিজ জাতির কথা, কাহিনী ও গান সুবিন্যস্ত ভাষায় রচনা করিতে পারেন, তদ্দ্বারা তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির ইতিহাস এমন ভাবে বিশ্বজন সমক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে ধরিতে পারেন ও সজীব রাখিতে সক্ষম, যাহা ঐতিহাসিক গবেষণা বা রাষ্ট্রচালক পরিষদের আইনাবলী আলোচনার দ্বারা সংগঠিত হওয়া দুঃসাধ্য। সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ইয়েট্‌স্ (Yates) Keltic revival বা কেল্ট্ জাতীয় গাথা ও সংস্কৃতি প্রদানের জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। ফরাসী সভ্যতার পরিচায়ক নূতন ভাবব্যঞ্জনা ও রচনা-প্রণালীর জন্য আনাটোল ফ্রাঁস্ (Anatole France) তৎপূর্ব্বে ঐ আকাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিশ্রুত পুরস্কার লাভ করেন। আমাদের দেশের জাতীয় চরিত্র ও প্রকৃতি বুঝিতে হইলে দেশের মহাকাব্য (Epics) রামায়ণ মহাভারতের স্মরণাপন্ন হইতে হয়। শিল্পীশ্রেষ্ঠ আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ তাই বার বার তাঁহার ছাত্রদের সর্ব্বদাই 'পুরাণ' পাঠ করিতে বলিতেন ও উহার আলোচনায় উৎসাহ দিতেন। প্রায়ই লেখাপড়ায় পরাঙ্মুখ তরুণরা পিতামাতা কর্তৃক তাড়িত হইয়া অগতির গতি "আর্টস্কুলে" ভর্ত্তি হইতে যায়। অবনীন্দ্র সস্নেহে তাহাদের কোলে টানিয়া লইতেন ও বুঝাইতেন যে, মূর্খ নিরক্ষর শিল্পী দ্বারা পোটোর কাজ বা অনুকরণ চলিতে পারে, কিন্তু নিজের [illegible] ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, বা প্রকৃত শিল্পকলা জাতীয় স্মৃতি, বা [illegible] মুখোজ্জ্বলকারী কোন বৈশিষ্ট্য দ্বারা দেশের ও দেশবাসীর উন্নতি [illegible] শিল্পীদের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। [illegible] চাই,—এই সব শক্তি

করিতে হইলে শিল্পীকে শান্তভাবে দেশের প্রচলিত ভাবধারা ও বিশ্বাসের বস্তুর সহিত পরিচিত থাকিতে হয়। যাহা কথায় বর্ত্তমান আছে তাহা রেখায় ও বর্ণে পরিস্ফুট করার উত্তম শিক্ষার্থীর হাত ও ভাব খুলিবার পন্থা। সর্ব্বাগ্রে শিল্পীর ভাব সম্পদ প্রয়োজন, অভিব্যক্তির প্রশংসা হইবে টেক্‌নিকের উপর—তাহার আদর সাধারণের নিকট নয়, সমজদারের কাছে। মোটের উপর উচ্চ আদর্শ ও মহান ভাবের অধিকারী হওয়া ভদ্রবংশজাতের লক্ষ্য স্থিরভাবে থাকা উচিত, তবে মৌলিক কল্পনা ও তৎপ্রসূত ছবি জন্মাইবে। শুধু কারিগর হইয়া লাভ নাই, সামাজিক অবজ্ঞা অনিবার্য্য।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় ভবিষ্যত ও জাতীয় চরিত্র লোকপ্রিয় সাহিত্য রচনার দ্বারা এমন করিয়া গড়িতে পারিয়াছেন, যাহা কোন ব্যবস্থা পরিষদ গঠনমূলক নীতি বা পঞ্চসনা প্ল্যান এবং আনুসঙ্গিক আইনমালার দ্বারা প্রস্তুত করিতে অক্ষম, বা যাহা এ দেশবাসীকে বিশ্বসভায় শ্রদ্ধার আসন সংগ্রহে সাহায্য করিতে পারে। পাঠশালায় চানক্য পণ্ডিতের শ্লোক সমূহ যাহা রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠস্থ করেন, তাহাতে প্রথম পাঠ ছিল—

"বিদ্বত্তঞ্চ নৃপত্তঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

তাহারই সত্য নির্দ্ধারণ করিতে ও যত্নে প্রস্তুত নিজ রচনাবলীর যথার্থ মূল্য বিদেশীয় বা তাঁহার ভাষায় মানব সাধারণের কষ্টি পাথরে যাচাই করিতে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন।

পরীক্ষার ফলে, ইংলণ্ড আজ তাঁহাকে একটি বিশিষ্ট গণ্যমান্য প্রজা শুধু নয়, তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে ব্যগ্র। রাজা তাঁহাকে নাইট্ করিয়া "My cousin" দলভুক্ত করিলেন, আর অক্সফোর্ডের প্রাচীন বিদ্যালয় তাঁহাকে ডিলিটের মালা দিয়া বরণ করিলেন ও তাঁহার বার্দ্ধক্যে তাঁহার কুশল কামনায় সাগর পারে তাঁহাদের দূত ও প্রতিনিধি পাঠাইলেন। ভারত সংক্রান্ত রাষ্ট্র সচীব সার সেমুয়েল

হোম কবির জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার আয়ু ও স্বাস্থ্য কামনা করিয়া বলিলেন "By your manipulation of the English tongue you have forged a link between the two countries." ভারতবর্ষ ও গ্রেট্ বৃটেনের মধ্যে ইংরাজি ভাষার সুদক্ষ পরিচালনার দ্বারা আপনি একটি যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন, যাহা উভয় দেশকে স্নেহের বন্ধনে পরস্পরের সহিত মিলিত রাখিবে।

অন্যান্য দেশও প্রতিপন্ন করিল যে কবির সম্মান স্বাভাবিক ও তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার স্পৃহাটা সকল জাতের পক্ষে স্বাভাবিক। বর্ত্তমান যুগের ইহা একটি আশাপ্রদ লক্ষণ। অনেক স্থলে কবির জীবদ্দশায় শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু বর্ত্তমান কালে অনেকানেক দেশে জীবিত কবিকে, এমন কি, অন্য দেশের ও ভাষার হইলেও উৎসব ও উৎসাহ সহকারে জাতীয় জনসাধারণে অনুষ্ঠিত "Function" দ্বারা সম্মান-প্রদর্শন প্রচলিত আছে। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের (Norway) বৃদ্ধ কবি ইব্‌সেনকে (Ibsen)কে বিরাট সম্বর্দ্ধনার দ্বারা অর্চ্চনা করার কথা প্রথম আমাদের গোচরে আসে। Encyclopædia Britanica গ্রন্থে দেখা যায়, ইবসেনের এক বিরাটকায় ব্রঞ্জ-প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার দেশবাসীরা চাঁদা তুলিয়া খৃষ্টিয়ানা নগরে স্থাপিত করেন। আরও লেখা আছে— "On the occasion of his seventieth birthday in 1898 Ibsen was the recipient of the highest honours from his own country and of congratulations and gifts from all parts of the world" En. Br. এই দেশদেশান্তরে বাঙ্গালীর প্রতিভু রবীন্দ্রের অভিযান ফলে আজ তিনি এবং বাঙ্গালী জাতি বিশ্বমানবের। আমাদের দেশের রবিরও কিরণছটা ভূমণ্ডলের সেই সর্ব্বোচ্চ প্রান্ত হইতে, না হয় পার্শ্ববর্ত্তী ষ্টকহল্‌ম্ থেকে, ভূপৃষ্ঠে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অনন্ত আকাশমার্গে তাঁহার জয়পতাকা কি ভাবে উত্তোলিত হইয়া প্রত্যহ [illegible] সমীরে উন্মুক্ত হয়, তাহার কথা আমরা পরে বলিব।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পরে কবি কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেন। বক্তৃতা দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ভারতের রাজন্যবর্গের রাজ্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশ, ভারতীয় উপদ্বীপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও এশিয়ার পারস্য ও ইরাক হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়া কবি সে সকল দেশেও গিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আসন্ন জরায় প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে বিমানপোতে গতিবিধি করিয়া তিনি প্রকৃত অন্তরীক্ষচারীর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। পূর্ব্বে কেবল মনগগনে কল্পনাগঠিত সশব্দ হংসযুক্ত বিমানে উড্ডীন হবার আনন্দ পাইয়াছিলেন। বাঙালীর পক্ষে এ সাহসের পরিচয় শ্লাঘনীয়। আমেরিকার হার্ভাড ইউনিভারসিটিতে ও লণ্ডনে তিনি বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিদেশের নানারূপ সম্মানসূচক উপাধি কবিকে ভূষিত করিয়াছে। তাঁহার বহুদেশে প্রাপ্ত উপঢৌকন, অভিনন্দন, ও উপাধি নিদর্শন 'শান্তিনিকেতনে' একটি স্বতন্ত্র কক্ষে সজ্জিত করিয়া রাখা আছে। আমরা তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ এ পরিচ্ছেদের শেষে দিব। তিনি বিলাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিবার্ট লেকচারার মনোনীত হন। দার্শনিক পাণ্ডিত্যের ইহা খুব উচ্চ সম্মান। মানবধর্ম্ম (Religion of man) সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন। অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি আমেরিকা, জার্ম্মানি ও রাশিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। রুশদের নবজাগরণের অনেক কথাই এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিষয়, তাঁহার বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত "রাশিয়ার চিঠি"তে পাওয়া যায়।

কবি একাধিকবার ইয়োরোপ, এমেরিকায় গিয়াছেন। আর প্রথম হইতেই তাঁহার নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভিজ্ঞতা তাঁহার দেশবাসীকে জানাইয়া আসিতেছেন। এই ভ্রমণকাহিনীগুলি বাংলাভাষার এ বিভাগে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এ ভাবে বিদেশের কথা বাঙালী ইতিপূর্ব্বে জানে নাই। অনেক সময়েই প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত না হইয়া ব্যক্তি-বিশেষকে লিখিত কবির পত্রাবলীতে উহা প্রচারিত হয়। ইংরাজিতে অনেক

পত্র সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা শুধু চিঠি নয়, ঐ ভাষার সাহিত্যের চিরস্থায়ী অংশ। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী বাংলাভাষার মূল্যবান সম্পদ। উহা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইলে, উত্তর পুরুষের নিকট তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরশ তবু কিছু পৌঁছাইয়া দিতে পারা যাইবে। প্রৌঢ়াবস্থায় ইউরোপীয় অভিযানে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কালিকলমে অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র জার্ম্মাণী ও রাশিয়াতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। সেখানকার চিত্রশিল্পের বিশেষজ্ঞ সমালোচকরা প্রতিভার এই নব অবদানকে চিত্রকলার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে গণ্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া আদর করিয়াছেন। কবি বলেন যে, কবিতায় ও সঙ্গীতে তিনি তাঁহার দেশের লোকের নিকট স্বদেশীয় ভাষার সাহায্যে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, বিদেশীয় ভাষার অনুবাদে তাঁহার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাগুলি নষ্ট হয়। সুতরাং বিদেশীর নিকট তাঁহার সম্যক আত্মপ্রকাশের একমাত্র উপায়, তাঁহার চিত্র। কবি বলেন, এই চিত্রবিদ্যা তিনি বিশেষ ভাবে কোনও দিন শিক্ষা করেন নাই। চিত্রবিদ্যায় অক্ষম বলিয়াই তাঁহার চিরদিনের ধারণা ছিল। খেলার ছলে ও লেখা সংশোধনের মধ্য দিয়া তাঁহার এই বিদ্যা আয়ত্ত হইয়াছে। এই নূতন কলাবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৃদ্ধ বয়সে কবির উদ্যম ও অধ্যবসায় অনুকরণীয়। সুপরিণত বয়সেও মনের সরসতা রাখিবার জন্য তরুণদের সহিত মেলামেশার মত এই নূতন কলাবিদ্যার চর্চ্চাও কবিকে যথেষ্ট সাহায্য করে। দেখা যাইতেছে যে, কলালক্ষ্মী সুকুমার কলার সকলগুলিতেই অসাধারণ নৈপুণ্য কবিকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। বিদেশে ভারতীয় চিত্রকলার এবং ভারতীয় কারুকলার প্রতিষ্ঠাস্থাপনেও কবির সহজ সৌন্দর্য্য জ্ঞান যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

এই সকল দেশে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহার পদার্পণের পূর্ব্বেই তাঁহার আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। অধিকাংশ স্থলেই তিনি ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে সমাদরে দোভাষী দ্বারা ভাষান্তরিত করিয়া তাঁহার ভাব সম্পদ অধিবাসীবৃন্দকে অর্পণ

করেন তাহাতে সকল দেশের সঙ্গেই তাঁহার একটা অন্তরঙ্গ যোগ হয়।

কবি এই অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি করে শুধু নিজ দেশে বিদেশীয় পণ্ডিতদের (Savants) সাদর আহ্বান করিয়া ও অতিথি সৎকার করিয়া নিজের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি মনে করেন নাই। এই যোগসূত্র প্রসার মানসে, ও ইউরোপীয় মহাদেশের সংস্কৃতির প্রাচীন কেন্দ্র ইতালীদেশে ইহার একটি পাশ্চাত্য মিলন ক্ষেত্র, সাকার রূপে রক্ষা করিবার অভিলাষে একটি আবাস বাটি তিনি ক্রয় করেন। রোমক সভ্যতার এই কেন্দ্রে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিত, তাই মধ্যে মধ্যে তথায় অবস্থান করিতেন। হয়ত জীবনের শেষ অধ্যায় পশ্চিমে সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা ইহার মূলে ছিল, প্রায়ই তিনি বলিতেন 'রবি পশ্চিমেই অস্তাচলবিহারী হইয়া থাকেন'। জগতের কোলাহল ও কলরব হ'তে সময় সময় বিশ্রাম লাভের জন্য তিনি লালায়িত হইতেন, কিন্তু তাঁহার দুর্দ্দমনীয় মানব-সেবা প্রবৃত্তি ও তপস্যার আদর্শ তাঁহাকে নৈষ্কর্ম্ম-মুক্তি হইতে বিরত করিয়াছে। ইহার বহিঃপ্রকাশ তাঁহার ফিলেডেলফিয়াতে পঠিত 'ফিলসফি অফ লেসার' ('Philosophy of Leisure') বা বিশ্রামের উপযোগীতা ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নিবন্ধ। নব্য ইতালীর জাতীয় জাগরণ ও ফেসিষ্ট্ দর্শনের অভ্যুদয় তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তথাকার রাজমন্ত্রী ও সর্ব্বময়-কর্ত্তা মুসোলিনীর মনোভাব ও রাজনীতি সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ সাময়িক পত্রের স্তম্ভে ঘোষণা করায়, সুহৃদ বিরূপ হইলেন। ফলে, বোলপুরে অবস্থিত ইতালীয় অধ্যাপকদের বিশ্বভারতীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিতে হয়। কারণ, জাতীয় সংগঠন ও জাতীয় সম্মানরক্ষাকারী শাসন-কর্ত্তার আদেশ লঙ্ঘন করিবার উপায় অধ্যাপকদের ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অধিকৃত ইতালীয় ভূমিখণ্ড ও সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল, যেহেতু এতটা স্বাধীনচেতা প্রজা তাঁহারা পছন্দ করেন না। কাজেই রবির পশ্চিমে অস্তায়মান হবার আশা ও তথাকার সুহৃদগণীর সহিত সঙ্গ একপ্রকার বন্ধ হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কবির রচনা

কবির সমগ্র রচনার পরিচয় দিবার স্থান এ নহে। আমরা পরিশিষ্টে তাঁহার পুস্তকাবলীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময়যুক্ত একটি তালিকা দিতেছি। তবে এইখানে রবীন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কয়েকটি স্থূল কথা পাঠকদের স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ গীতি-কবি (Lyric Poet)। তিনি আড়াই হাজারেরও বেশী গান রচনা করিয়াছেন। তাহার ফলে, বঙ্গবাণীর ভাণ্ডারে বহু অমূল্য রত্ন সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকল বোধ হয় চিরদিন রবীন্দ্রনাথকে অমর করিয়া রাখিবে। বাংলার মাটি ও জল হাওয়ার গুণে [illegible] জয়দেব হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যান্ত অধিকাংশ [illegible] [illegible] গীতি-কবি।

ইংরাজি ঊনবিংশ শতাব্দির শেষার্দ্ধে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে [illegible] সাহিত্যিক দলের অভ্যুদয় হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন। শক্তি ও গাম্ভীর্য্য বিকাশের জন্য তাঁহার [illegible] সংস্কৃতানুসারিণী করিয়াছেন। তবে তাঁহার শেষ বয়সের রচনায় [illegible] অপেক্ষা চলতি ভাষার প্রয়োগ বেশী। আমরা "ক্ষণিকায়" [illegible] পাই যে, কবি চলতি ভাষার পক্ষপাতী হইয়াছেন, এবং [illegible] হসন্ত উচ্চারণ ও যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট নামের বহুল প্রয়োগে ছন্দের [illegible] বৈচিত্র্য সাধন করিতেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের শক্তি সম্বন্ধ [illegible] পংক্তির শেষের কথা মিলাইয়া দেওয়া কবির একটি নূতন সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি-রাণীর ভক্ত এবং ভাবগ্রাহী পূজারী। প্রকৃতির সহিত তাঁহার অন্তরের সম্বন্ধ গভীর আনন্দমূলক। প্রকৃতির সকল লীলাই তাঁহার মনকে নাচাইয়া তুলে। ঋতুমঙ্গল, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব লিখিয়া তিনি প্রকৃতির আনন্দ বারতা ঘোষণা করিয়াছেন। তবু মনে হয় যেন বর্ষার প্রতি তাঁহার সমধিক টান। বর্ষায় কবিতাগুলিতে কবি প্রাণ ঢালিয়া বাংলাদেশের রূপ বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বসন্তের কোমল মূর্ত্তি যেমন তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়া নব নব কুসুমে বিকসিত হইয়াছে কাল-বৈশাখীর জ্বলন্ত রুদ্র সত্যও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া ওজস্বিনী পাবক শিখারূপে তাঁহার রচনাবলি আলোকিত করিয়াছে। তাঁহার ভাষা ও ছন্দ সর্ব্বত্রই ভাবের উপযুক্ত বাহন।

বীর "বিবেকের" বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল :—

"সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালি,
সুখ বনমালী তোমার মায়ার ছায়া
করালিনী কর মর্মচ্ছেদ,
ঘুচাও মায়াভেদ, সুখ স্বপ্ন দেহে দয়া॥"

আবার সে যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ একাধারে অনুভব করিয়াছিলেন, কেমন ধরণীর নিত্য নব নব সাজে, জল বায়ু সূর্য্যালোক আত্মসাৎ করিয়া ফুলে ফলে আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা ও তাহার অস্ফুট বেদনের করুণ আকুতি, তৎসহ তিনি শুনিয়াছিলেন মেদুর আকাশে শঙ্করের ডমরু ধ্বনি ও তাণ্ডব তালে নটরাজের প্রলয় নাচনে কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও মঙ্গলের ইঙ্গিত। তাঁহার অতুলনীয় লেখনী অনবদ্য ভাবে এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে।

"বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা, বহু দিবসের সুখ দুঃখে আঁকা
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা সুন্দর ধরাতল।"

উপরন্তু শস্যশ্যামলা ধরিত্রীকে মর্ত্তবাসীর কিরূপ প্রগাঢ় ভাবে ভালবাসা প্রয়োজন তাহা অভিশপ্ত দেবযানির মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন ('কচ ও

দেবযানি' বা 'বিদায় অভিশাপ' দ্রষ্টব্য)। পার্থিব জীবন নশ্বর হইলেও যে কিরূপ উপভোগ্য তাহা যেন প্রকৃতি তাঁহার স্বল্পপঠিত গ্রন্থের প্রতি ছত্রে গস্পেল বুকে (Gospel Book) মেলিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' হইতে কিছু সোনার ধানের নমুনা তোলা যাউক।

"কী-গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যত দূর
শুনিতেছি এক মাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাম্বরের সর্ব্বপ্রান্ত তীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
'যেতে নাহি দিব', 'যেতে নাহি দিব'। সবে
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব'-নিব'
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার—'যেতে দিব না রে'।
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়,
চলিতেছে এমনি, অনাদি কাল হতে
প্রলয় সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে!"

যখন পাশ্চাত্য ভূখণ্ড মণ্টেস্কু ভলটেয়ার ও রুসোর নূতন চিন্তাধারায় মানবাধিকার, ও গণশাসনের ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছে, ডারউইন প্রভৃতি মনীষীদের নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আবিষ্কার ধীরে ধীরে সাহিত্য ক্ষেত্রে লবণাম্বুসে কে নবতর ভাবানুভূতির সৃষ্টি করিতেছে, প্রাচ্যের

জগতকে পাশ্চাত্য কবিরা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কাব্যামোদী সুধীবৃন্দ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিয়াছেন ;

"কোথা হাতে সেই কুলনাশা বাণী
অধরে কোথা সে মৃদুমন্দ হাসি
এ যে করে দেখি সুশানিত অসি
কালি মুণ্ড মালিনী"

(প্রাচীন সাধক সঙ্গীত)

সেই "লোলরসনা করালবদনা" বিশ্বপ্রকৃতির আভাষ পাইয়া টেনিসন গাহিলেন ;

"So careful of the type she seems, so careless of the single life.
Nature red in tooth and claw
Shrieked from every ravine."

আরও বলিলেন

"But what am I ?
An infant crying in the night :
An infant crying for the light :
And with no language but a cry."

কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রিয় রাজকবি আশার উদ্দীপনা দিয়া শেষ করিলেন

"O yet we trust that somehow good
Will be the final goal of ill."

[illegible] পুরাতনকে বিদায় দিয়া ঘন্টাধ্বনি সহ নবীনকে অর্থাৎ নব [illegible] বরণ করিয়া লও।

"Ring out the old, ring in the new
Ring happy bells across the snow
The year is going, let him go
Ring out the false, ring in the true."

(In Memoriam)

তুষারের ব্যবধান অতিক্রম ক'রে সুখময় ঘণ্টাধ্বনি বাদিত হউক। আমার শ্রবণ যুগলে অগ্রসর হয়ে আসুক। যে বৎসর এখন গমনশীল তাহাকে অবাধে চলিয়া যাইতে দাও। যা কিছু মিথ্যা, বিসর্জ্জন করে দাও বিদায় বাজনা দিয়া। যাহা সত্য, তাহারে গৃহে আন অভিবাদন বাদ্যের জয়ধ্বনি মধ্যে।

এ দেশের সাধক প্রায় সমসময়েই বলিয়াছেন

"ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দেখি লাগে ভয়
কিন্তু ভক্তে বিতরিছ বরাভয়
অকিঞ্চনে কয় সামান্যা ত নয়
এ যে ব্রহ্মময়ী উদয় হয়েছে সাকারে"

(দাওয়ানজীর গান)

কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল বাহিরের ঝড়ের দিকে নয়, আভ্যন্তরিক হৃদয়কন্দরে রিপুগণের তুমুল কোলাহলের প্রতি, যাহাকে বশীভূত রাখা মানবের চিরন্তন অধিকার। ক্রমে বিজ্ঞানের আলোকপাতে ইউরোপ বরাভয় প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মের নূতন প্রেরণা লাভ করিল, কিন্তু সংস্কারের অভাবে প্রকৃত শিবের সন্ধান না পাইয়া শবের পূজা করিয়া দক্ষযজ্ঞে ব্যাপৃত রহিল।

ইংলণ্ডে প্রয়োজনবাদী জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ ও বেন্থামের গরিষ্ঠ সংখ্যক গরিষ্ঠ হিতসাধন উপযোগী রাষ্ট্রচালনা বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অধিকসংখ্যক মনুষ্যের প্রচুরতম হিতসাধন' ও তদনুযায়ী সমাজ সংস্কৃতির নীতি ক্রমশঃ পূর্ণোদ্যমে বাক্যের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষিত হয় [illegible] ভবে চেষ্টা চলিতেছে। এই সকল ভাবের প্রাদুর্ভাব বাঙ্গালা ভাষার নবীন লেখকদের মধ্যে চাঞ্চল্য আনিয়াছিল। তাই কাশীরাম ও কৃত্তিবাসের লীলাক্ষেত্রে "বীরাঙ্গনা" ও "মেঘনাদের" আবির্ভাব হয় [illegible] বায়রণের—

'Fill high the bowl with Samian wine!
You have the Pyrrhic dance as yet

Where is the Pyrrhic phalanx gone ?
Of two such lessons why forget
The nobler and the manlier one ?
You have the letters Cadmus gave
Think ye he meant them for a slave"

Don Juan Canto III St. 86.

এই বীরত্বপ্রবোধক বায়রণীয় সুর তখনও রণিত হইতেছে। তাই দেশপ্রাণ রজনীকান্ত গুপ্ত আর দেশশাসক রমেশচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস ইতিহাসের বিবৃতি ও "আর্য্যকীর্ত্তির" ব্যাখ্যানে আত্মনিয়োগ করেন। বৃত্রাসুরের বধ সাধন করিয়া 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজার' আসরে ব্যবহারজীবী কবি হেমচন্দ্র 'সিঙ্গা' বাজাইলেন। শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিনি জাতীয় স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাইতে কাব্যের সহায়তায় হিরোয়িকস্ (Heroics) এর অবতারণা করিলেন। সেই "Isles of Greece" এর পুনরাবৃত্তি—

"Eternal summer gilds them yet
But all except their sun is set."

কেবল বিলাপিকা শুনাইতে লাগিলেন, তাহাই রবীন্দ্রনাথের কিশোর কল্পনাকেও নাড়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার মত্ততা তিনি অল্পকালেই কাটাইয়া উঠেন। চিরন্তন নিদাঘ এখনও এ দেশবাসীকে হাস্যোজ্জ্বল আলোকে ও হিরন্ময় রূপে উদ্ভাসিত করে, কিন্তু এক সনাতন সূর্য্য ব্যতীত আর সবই তাহাদের অস্তমিত। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কিন্তু উপায় নাস্তি"—

"The mountains look on Marathou
And Marathou looks on the sea
And musing there an hour alone
I dream'd—that Greece might still be free."

সুতুঙ্গ শৃঙ্গমালা মেরেথনের দিকে চাহিয়া আছে আর মেরেথনের বিস্তৃত প্রান্তর, অতীতের রণভূমি, ঐ নীল সমুদ্রের পানে তেমনি ভাবেই তাকিয়ে আছে। আমি চিন্তামগ্ন হয়ে এক জনহীন শিখরে ঘটিকাকাল একা একা অতিবাহিত করিলাম, মধুর স্বপ্নে বোধ হইতে লাগিল যে এখনও —এখনও গ্রীস্ হয়ত স্বাধীন হইতে পারে। তবু ভাল দেশপ্রেমিকের লজ্জানুভব আজিও কিছু অবশিষ্ট আছে, তাই আশা জাগিতেছে।

"A land of slaves shall ne'er be mine
Dash down yon cup of Samian wine."

তবে চূর্ণ কর ওই সেমিয়ার সুরায় পূর্ণ পাত্র, দাস পরিপূর্ণ এ ভূমি কভু, কভু না হইবে স্বদেশ মোর।

সেই বীরত্বব্যঞ্জক গাথার যুগে কিন্তু "পলাসীর যুদ্ধ" বর্ণনাকারীকে উদীয়মান তপনের প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে অস্তমান মোগল প্রভাকরের উদ্দেশেও একটি শ্রদ্ধাঞ্জলী, শেষ বাঙ্গালী বীর প্রভুভক্ত মোহনলালের হস্তে, পৌঁছাইয়া দিতে হয়। নবতর একচ্ছত্র বিশাল রাজ্যের দিকে ও জাতি বর্ণ ভাষা নির্ব্বিশেষে অখণ্ড দেশাত্মবোধের দিকে নব শিক্ষিত ইংরাজিনবীশগণের মন ও উদ্যম আকর্ষণ করিয়া আশার উদ্রেক করিতে উৎসাহিত করিল।

চক্রধারী চক্রী দ্বারকাধিপতির ভারত একীকরণ প্রস্তাব ও রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার সাবলীল বিহার সন্দর্শন মানসে, ডিপুটি প্রবর 'নবীন' তাঁর 'অবকাশ রঞ্জনের' কথা ভুলিয়া প্রাগৈতিহাসিক ভূমিতে সফর করিতে গেল 'কুরুক্ষেত্র রৈবতক প্রভাস' ভ্রমণে পরিশ্রান্ত তাঁহাকেই কাব্যগাথার মধ্য দিয়া পাঞ্চজন্য নিনাদে সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের কল্পনা প্রচার করিতে হইল। নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের যোগে মহাভারতের পরিকল্পিত ও ব্যাখ্যানীত অনুমোদিত জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়ে অখণ্ড রাষ্ট্রের একটি সমগ্র ঐক্য (Synthetic ideal) ছন্দবদ্ধ রূপে উপস্থিত করা তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। তাহাতে জাতীয় অনৈক্যের ও বৈসাদৃশ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, কাব্যের

অঙ্গীভূত হইল। সৃষ্টিতত্ত্বের ও মহাপুরুষাবির্ভাবের আধুনিক বিজ্ঞান-সঙ্গত হেতু প্রভৃতি তথ্য সুকুমার সাহিত্যের অঙ্কে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

তখন "সুরধুনীর" ঘাটে ঘাটে মোগল রাজলক্ষ্মীর বিদায় বিলাপ ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। "নীলকর" ব্যবসায়ীর প্রতাপে একদিকে যেমন ঘটিরাম ডিপুটি ও সুরাপায়ী নিমচাঁদের অভ্যুদয়, তেমনি নিরীহ ধুতি-চাদর-পরা বাঙ্গালী নবীন মাধব, পদ্মলোচন তোরাপ সর্দার ও সাধুচরণের পরিচয় বুকভাঙ্গা বাঙলাবাণীর প্রথম গুঞ্জনে পাওয়া যায়। লোক-চরিত্রে বাস্তবে জড়িত হইয়া দীনের বন্ধুর আগমনের এই সূচনা। বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না রাখিলে কে রক্ষা করিবে। মাছের বল জল আর জলের বলও যে মাছ তাহাই প্রথম ঘোষিত হইল। "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" আমাদের বাঙ্গালা মায়ের প্রথম অবগুণ্ঠন মোচন।

ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানের বর্ত্তিকাহস্তে অগ্নিময় বাণী-সংযোগে সুদূর মার্কিনে যখন স্বামী বিবেকানন্দকে আত্মশ্রদ্ধার ভেরী নিনাদে, শঙ্করের নেতিবাদ ও দুঃখবাদকে, নবমহিমা মণ্ডিত করিয়া, কর্ম্মযোগ ও দরিদ্র নারায়ণের সেবাদানের জন্য, তূর্য্যধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত করে, তখন সন্ন্যাসীর উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইল,

"ছাড়ি হিম শশাঙ্ক ছটায় কেবা বল চায় মধ্যাহ্ন তপন জ্বাল
প্রাণ যার চণ্ডদিবাকর স্নিগ্ধ শশধর সেও তবু ভাল।"

জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান সূর্য্যের উপাসনা সাহসী পুরুষের, যে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সকল প্রকার সাময়িক উত্তেজনা, দৈহিক ও মানসিক কষ্ট উপেক্ষা করিতে শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়াছে—ত্যাগব্রতী শ্রেষ্ঠতর মানবের জন্য। সাধারণের জন্য অন্যবিধ কর্ম্মের স্ফুরণ আবশ্যক। সকল দেশের লোকের জন্য তদুপযোগী শিক্ষাই তিনি প্রচার করিয়াছেন, বিদেশীকে রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রের আদর্শ ও মাধুর্য্য বুঝাইয়াছেন। বিবেকানন্দ স্বামীজী একজন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক ছিলেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতকে ভারতীয় গুরুবাদের মহিমার নিকট নতশির হইতে শিখাইয়াছেন।

"The Master as I saw him"এর ভাবে কি প্রকারে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন ও হইতে হয়, তাহা তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব দিয়া ভাব, বাক্য ও রচনার ত্রিভঙ্গিম ছন্দে বিশ্ববাসীকে মুক্তকণ্ঠে জানাইয়াছেন। সেই প্রায়-নিরক্ষর পল্লিবাসী গদাধর চট্টোপাধ্যায়, যিনি পরে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' বলিয়া পরিচিত হন, যুগাবতার সাধক শিরোমণির অফুরন্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎসধারার নিকট স্বামীজী কি পরিমাণে ঋণী ছিলেন, তাহাই পাশ্চাত্য জগতকে বেশ ভালরূপ বুঝাইয়াছেন। বাঙ্গালার খ্যাতনামা মাতৃভক্ত গায়ক পরমহংস দেবের শিষ্যদের অন্যতম ৺রামচন্দ্র দত্ত যখন সাশ্রুনেত্রে গাহিতেন

"বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা
দুঃখ নয় সে দয়া তব জেনেছি মা দুঃখ হরা।"

তাহা বাস্তবিকই মনে প্রাণে উপলব্ধি ও অজানা হইতে জানার বিশ্বাস ভূমিতে প্রোথিত করা বড় সহজসাধ্য নহে—করিতে পারিলে তাহা জীবনের সুন্দর পাথেয় ও পথ্য। প্রতীচির চিন্তাধারা যখন Empiric knowledge বা খণ্ড জ্ঞানের সমষ্টির পথে এই দিকে ধাবিত, তখন প্রাচ্য Intuitive knowledge বা অখণ্ড জ্ঞান ও নিয়মের দ্বারা সেই মহা-সত্যই উপলব্ধি করিতেছে। বিভিন্নমুখী স্রোতে আন্দোলিত পূর্ব ও পশ্চিমের উভয় ভাবধারার সহিত সম্যক পরিচিত রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে কিঞ্চিৎ পৃথক দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। মানুষের মঙ্গলের বীজ দুঃখের মধ্যে নিহিত বলিয়া তিনি মনে করেন। দুঃখকে যে-কোন প্রকারে এড়াইয়া যাওয়ার বা তাহাকে মায়া প্রপঞ্চ বলিয়া উপেক্ষা করার অনুমোদন তিনি করেন না। তাঁহার মতে দুঃখকে বাস্তব উপলব্ধিতে ধরিয়া তাহার সহিত বল বুদ্ধি বিক্রমে সংগ্রাম করা মানবের সহজাত অধিকার, আত্মশক্তির দ্বারা দুঃখকে পরাভূত করিয়া মানুষ মঙ্গলময়ের পথে অগ্রসর হইবে। ইহাই সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায়, এবং ইহাই তাহার পক্ষে শ্রেয়, এই মত তিনি পোষণ করেন। কবিও তাই বলিয়াছেন—

……… … …. ……………কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
প্রণম সে মহাকালে। আর্ত্ত জর্জ্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ তার পদতলে।
ছিন্ন সিক্ত হৃৎপিণ্ডের রক্ত শতদলে
অঞ্জলি রচিয়া থাক্ জাগিয়া নীরবে।
সেই মহাদুঃখ হবে মহত সহায়
তোমাদের। সেই দুঃখে রহিবেন ঋণী
ধর্ম্মরাজ বিধি, যবে শুধিবেন তিনি
নিজহস্তে আত্মঋণ, তখন জগতে
দেব নরকে দাঁড়াবে তোমাদের পথে।
দুঃখ হতে তোমা তরে করুন সঞ্চয়, অক্ষয় সম্পদ।

তথাপি ঋতুচক্রের পরিবর্ত্তনে প্রকৃতির রুদ্রভাব বা প্রাণীতে প্রাণীতে সংঘাতে ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া যে নূতনের প্রকাশ, তাহা লইতে হইবে সহজে, নতশিরে সশ্রদ্ধায়। তাহারই বরণের প্রতীক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত কর, কারণ মঙ্গলের জন্য তাহাই নিয়ম, বিধির সুবিধি। এ ধৈর্য্য মোহমুক্ত বৈজ্ঞানিকের, উদ্বেলিতহৃদয় কবির নহে। 'এ বিশ্ব বিরাট হত্যাশালা'।

'বিশ্বপত্রে বৃদ্ধ মহাকাল অহরহ
লিখে চলে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।" (বিসর্জ্জন)

এই কবির মনের বৈজ্ঞানিক প্রবণতার পরিচয় দেয়। তাই জীবনের শেষভাগে কবি তাঁহার "বিশ্বপরিচয়" জ্ঞাপন করিয়া আমাদের চমৎকৃত ও মোহিত করিলেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "জিজ্ঞাসা" বা শান্তিনিকেতনের খ্যাতনামা অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের বৈজ্ঞানিক পুস্তিকা-গুলির পর এরূপ সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তথ্যপরিপূর্ণ লোকপ্রিয় সাহিত্য বঙ্গভাষায় রচিত হয় নাই।

গীতাঞ্জলীর "আত্মত্রাণ" কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ এইরূপ ভাব দিয়াছেন—

"দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে, নাই বা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
আমার ভার লাঘব করে নাই বা দিলে সান্ত্বনা
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে
দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।"

আর "গীতালীতে" তিনি আরও মধুর করিয়া আত্মসমর্পণটা (Resignation) ফুটাইয়াছেন। তাঁহাকে Symbolic ও Mystic কবি বলিয়া চিনাইয়া দেয়,—

মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল,
আজ ঘিরিল তোমার পদতল
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়,
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়,
মোর ধৈর্য্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়।

সাঙ্কেতিক (Sombolish) ও প্রিয়তমে সম্পূর্ণ আত্মদানে নির্ভরশীল(?) কাঙ্ক্ষী সাধকেরই এরূপ বিনয়াবনতি শোভা পায়। অধ্যাত্মবল লাভের পর ইহা আসিতে পারে, বিবেকানন্দ স্বামীজী প্রারম্ভটাই বলিয়াছেন বলপ্রাপ্তের প্রত্যাশায় সাধকের সূচনা স্তরের ভাব ও কথা। গীতাঞ্জলিতে(?) দুঃখানুভূতির যোগে সাধনার আর একটি গীত এখানে উদ্ধৃত করিয়াছি।

"পরতে মালা ছিঁড়িল কাঁটা
বাজল বুকে ব্যথা
ঐ সংসারে ঐ [illegible]।

বেলা যখন পড়ে এল
ছাঁধায় এল ছেয়ে
দেখি তখন চেয়ে
তোমার গোলাপ গেছে, আছে
আমার বুকের ব্যাথা
হে সংসার হে লতা।"

সেই অনুভূতিটাকেই তাঁহার প্রত্যক্ষ দান ধরিতে হইবে। কৃষ্ণ কলঙ্কের তিলক পরিয়া ব্রজবিলাসিনী শ্রীমতী যেমন আপনাকে ধন্যা বিবেচনা করিয়াছিলেন। ইহাও মিষ্টিসিস্‌ম্‌ (mysticism)।

রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় কালে তরুণদের মধ্যে অনেক আলোচনা সমিতি ও দার্শনিক চর্চ্চার প্রবাহ ছিল, রাজনীতিক পর্য্যালোচনার ততটা উন্মেষ হয় নাই। উপরন্তু নব পন্থায় ব্রহ্মেরসাধন ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য লৌকিক রঙ্গ পরিহাস ও মনের নিত্য চাহিদা "হাসির হিল্লোল" একেবারে বর্জ্জন পূর্ব্বক, বৌদ্ধ শ্রমণদের কঠোর গাম্ভীর্য্য অনুকরণে, অনেক যুবককেই অস্বাভাবিক অকাল পক্কতা দান করে। যুবক রবীন্দ্রনাথ বহুকাল ধরিয়া এই সকল দার্শনিক খেপলা জালের গণ্ডির বাহিরে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিয়া, কাব্যের ইন্দ্রধনু রঞ্জিত স্বীয় স্বপ্নপুরীর শিখর হইতে শিখরে ভাব রাগ বাক তানে মসগুল হইয়া বিচরণ করেন। জীবনস্রোতের নির্ঝরিণীর কলতানে হেলিয়া দুলিয়া নিজের প্রাণের সরসতা ও ভবিষ্যতে অজস্র ও অভিরাম পুষ্পোদ্‌গমের সম্ভাব্যতাকে সযত্নে পোষণ করিয়াছিলেন। "হৃদয় যমুনার" তীরে রূপদক্ষ কবি ছন্দোময়ী "উর্ব্বসী" ও ভাবময়ী "তিলোত্তমা" 'মানসার' জন্য গঠনে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সর্ব্বদর্শন বিশারদ বঙ্কিমচন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণপাতে 'বঙ্গদর্শন' করিয়া প্রতিভার সোমধারা "প্রচারে" ধর্ম্মব্যাখ্যা ও 'লোকরহস্য' উদ্ঘাটনে, লোকশিক্ষা ও মনোরঞ্জন রচনাবলিতে দিক প্লাবিত করিতেছিলেন। কিন্তু, তাহা Augustus Kompteর Positivismএর অরুণ রাগে অনুরঞ্জিত হইয়া কিঞ্চিৎ

তীব্রতাও দান করে। শতাব্দীর সূর্য্য অস্ত গেলেও নবীন প্রভাকর পূর্ব্বগামী দিবাকরের অক্ষয় রশ্মির উত্তরাধিকারী হইয়া প্রাচ্য দিঙ্মণ্ডল হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-গগন আলোকিত করিলেন। প্রশস্ত আকাশে প্রভাত সমীরণে স্বুশ্রাবি চাতকের মত উড্ডীয়মান হইয়া রবীন্দ্রনাথ তখন নিজেকে কতকটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। সাধারণ লোকচক্ষুর সীমান্তে তাঁহার স্বরলহরী বঙ্গভাষাক্ষেত্রে পতিত হইয়া তাঁহার অস্তিত্ব কেবলমাত্র জ্ঞাপন করিতেছিল।—"A privacy of glorious light is thine."

কিন্তু, ধরণীর আকর্ষণে তাঁহাকে স্বভাববশে অল্পদিন পরেই "গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটীর পথে" আনিয়া ফেলিল, তিনি কবি ওয়ার্ডসওআর্থের ভক্ত হইয়া কাব্যকে বাগাড়ম্বরশূন্য, ভাব-গভীর সাদা বাঙ্গলা কথায় রূপান্তরিত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। "True to the kindred points of heaven and home." যতদিন না তিনি নিজের হংস-পুচ্ছের উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান হইলেন, ততদিন বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে তাঁহার ভাষা Dignity ও সম্ভ্রমরক্ষার্থে সংস্কৃতানুসারিণী ছিল। পণ্ডিত বোপদেব মোক্ষদাতা সচ্চিদানন্দ মুকুন্দকে স্মরণ করিয়া মানবকে [illegible] দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে 'পরোপকারার্থে' অর্থাৎ মুগ্ধদেরও যাহাতে বোধ জন্মায়, এরূপ শব্দের গূঢ় নিয়মাবলী দিয়া একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যে বোপদেবের কার্য্য করিলেন। ভাবে, ভাষায়, বিভক্তি পদে, বচন বিন্যাসে (Idiom) ও সাহিত্যে বাঙ্গলাকে সংস্কৃত বা বিদেশীয় প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া, [illegible] বাঙ্গালীর ও বঙ্গদেশের হৃদয়ের পরিচয় প্রদানে ব্যাগ্র হইলেন, এবং [illegible] "কণিকা" কণিকা করিয়া স্বর্ণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথে ও বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথে এত প্রভেদ। "শান্তিনিকেতনের" লেখক "কৌরব পাণ্ডবের"* রূপকর্ত্তা আর সবুজ পত্রের "ঘরে বাহিরের" বর্ণনাকারীর এতটা তারতম্য।

---

* শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক 'কুরুপাণ্ডবে'র পৃঃ [illegible]।

ক্রমান্বয়ে তাঁহার ভাষাকে স্বচ্ছ ও স্পষ্টতর করিতে রবীন্দ্রনাথ সতত প্রয়াসী ছিলেন। ভাবের আবিলতা দূর হইয়া বাঙ্গালী যাহাতে নিজস্ব চিন্তা জগতকে দিতে সমর্থ হয়, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য। প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ, প্রৌঢ় কেন বলি, বয়সের অনুপাতে ত কবির বয়স হয় না, তাঁহারা যে চিরযৌবনের ভাগ্য বহন করিয়া আসেন, ভাব হইতে ভাবান্তরে ও বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে তিনি যে মনকে বিশ্বভ্রমণ করাইতে পারেন, ও সেই কৌশলে জরাকে দূর করিয়া রাখিতে সমর্থ, তাই এখনও তাঁহার কলম সবেগে ও সচ্ছন্দ অনায়াস গতিতে চলিতেছে। শিশুদের সহিত মিশিয়া কলার ভেলা ভাসাইতে, রঙ্গীন ফানুস উড়াইতে, ও

"গাড়ী চালায় বংশীবদন,
সঙ্গে আছে ভাগনা মদন।"

ছড়া রচিতে আওড়াইতে ও বেসাতির তালিকা দিতে তিনি যেমন মজবুত, হাটের খবর লইয়া কথা জমাইতেও পশ্চাৎপদ নন।

ছন্দ ও ভাষা সংস্কারে সতত মনোযোগী রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতাকে অলঙ্কার ও অন্ত্যমিলের বাধ্যতা হইতে মুক্ত করিয়া [illegible] রবীন্দ্রনাথ পদ্যময় গদ্যে ও গদ্যরূপী কবিতায় কলনাদিনী স্রোতস্বতীতে নিজেকে শতধা করিয়া মেলিয়া দিয়া বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্র ও বাঙ্গালীর মনকে উর্বরতা দানে সক্ষম হইয়াছেন। এই শতাব্দের ঊষালোকে বঙ্কিমচন্দ্রের রসজ্ঞ সমালোচক স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার "গোচারণের মাঠের" দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা" শুনাইলেন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী "বেনের মেয়ের" সুখ দুঃখ কাহিনীতে উপন্যাস গ্রথিত করিয়া আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতিকে নিজের ঘরের কথা ও ভাষার সহিত পুনঃ পরিচয় করাইয়া দিলেন। এই আলিপনা দেওয়া প্রাঙ্গণে কথিত ভাষার ঘট হস্তে লইয়া রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ।

পরন্তু, নব দেশপ্রেমিক দেশাত্মবোধে মমতার সুর জাগাইয়া গাহিলেন :—

"জানি না তোর ধন রতন
আছে কি না রাণীর মতন
এই জানি শুধু ভরে মন
তোমায় ভাল বেসে
সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।"

৺রামধন শিরোমণি ও পরে ধরণীধর কথক কথকতা জমাইতে গদ্যে পদ্যে স্বভাব বর্ণনা করিয়া পৌরাণিক আখ্যান ও তত্ত্ব কথার অবতারণা করিতেন। তাহাতে সাধুভাষা সংস্কৃতভাঙ্গা বাঙ্গালাও যেমন থাকিত আবার মহিলাদের জন্য স্থলে স্থলে ঘরোয়া কথোপকথনের ভাষাও থাকিত, কিন্তু দেশে নিধুর টপ্পার প্রচলন, তাই শ্রোতা সংগ্রহের জন্য তাঁহাদেরও সুর লয় যুক্ত হালকা গান যোজনা করিতে হয়। অবশ্য যে দিনকার যেমন কথা তাহার সহিত যাহাতে ভাবের ঐক্য থাকে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতেন, এই সকল রচনাবলী কথিত ভাষায় প্রস্তুত ও ভাবব্যঞ্জক সরলতাপূর্ণ। কিন্তু পারসী ও আরবি কথার বুকনি দেওয়া "কাদেরকং" প্রণেতা রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের কবিতাবলী তখনকার শিক্ষিত সমাজে যেমন আদর পাইত তেমনি সঙ্গীত আসরেও ফার্সি গানেরই প্রথা বর্তমান থাকায় কালী মির্জা ও রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) প্রভৃতিকে বাঙ্গালায় মিয়াঁ কি মল্লার ও সরির টপ্পা ভাঙ্গিয়া মিলন বিরহাদি বর্ণনাসূচক বাঙ্গালা বাণীযুক্ত গানের উদ্ভব করিতে হয় ও "বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা" বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয়। সাধারণ বাঙ্গালীপ্রাণ তখন গানের জন্য লালায়িত, বিশেষতঃ যাহার বাণী বোঝা যাইবে ও প্রাণস্পর্শী হইবে। তাই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে প্লাবিত বঙ্গদেশে কবির দল ও পাঁচালিকারগণের [illegible] বাঙ্গালা গানের ও তৎসঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপভোগের জন্য

আকড়াই ও ফুল আকড়াই গঠিত হয়। কিন্তু বিশেষ ব্যয় ও পরিশ্রম-সাধ্য ও উচ্চদরের সঙ্গীতজ্ঞ-গায়ক বাদক বিচারক ও তৎসঙ্গে সমজদার শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশ ঘটান দু'চারজন ধনাঢ্য ব্যক্তির উৎসাহ ভিন্ন হইত না।

মধ্যযুগের ইউরোপে নারীকে উচ্চ সম্মান প্রদর্শন ও তাহার জন্য পুরুষের সকল প্রকার দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগ, যাকে বলে chivalry, সাহিত্যে ও সমাজে বিশেষ একটা ছাপ রাখিয়া যায়। এই ভাব আমদানী হইয়া বাঙ্গালাতেও প্রবাহিত হয়, তাই "বঙ্গসুন্দরী," "মহিলা" ও "রমণী" কাব্যের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও যে ইহা না পাওয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু "Captive Lady"র প্রণেতাকে গৌড়জনকে মধু বিলাইবার অছিলায় "ব্রজাঙ্গনাদের" ব্যাথায় অভিনব রূপ দিতে হইল। সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চ গঠনে উৎসাহী তরুণদের"সতী কি কলঙ্কিনী" বলিয়া রাসধারী যাত্রায় থিয়েটার উপযোগী রূপ দিতে হইল। নারীশিক্ষার ধুয়া ধরিয়া "রামা-রঞ্জিকা" রচিত হয়, কিন্তু তাহাতে পুরুষ উপদেষ্টা, বশ্যতাপন্ন কিঞ্চিত শিক্ষিতা নারীই যে সামাজিক ভদ্র আদর্শ ও সংস্কৃতি রক্ষায় পুরুষের সহায়, ইহারই প্রচার করা হয়। Chivalry প্রণোদিত পুরুষ ব্যবহার সম্বন্ধে কথা উহ্য থাকে, বর্ত্তমানে সাহিত্যে ও সমাজে ইহারই প্রতিক্রিয়া ফলে কিছু অশান্তি জন্মাইয়াছে।

বাঙ্গালার মাটির গুণে সেই "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর" যাবৎ বহমান, কানুকে অবলম্বন করিয়া বহুতর গান ও গীতিকাব্য জন্মিয়াছে ও আদর পাইয়াছে। সেকারণে রবীন্দ্রনাথকেও ঐ তথ্য প্রলুব্ধ করে। সুখের বিষয় শ্রোতার মন বহুকালের সেচনে সিক্ত ছিল, তাই সাদা কথায় রচিত তাঁর গীতগুলি অধিক জনপ্রিয় হয়, ভাবের অভিনবত্ব বা গভীরতা সেরূপ সহানুভূতি জাগাইতে সক্ষম হয় নাই, তাঁহার পূর্ব্বগামীদের ও জলে আঁক কাটা হইয়াছিল।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী করুণ রস পরিবেশক একাধারে নট ও নাট্যকার গিরিশ-চন্দ্রের বাঙ্গালী জনসমাজের নাড়িজ্ঞান ছিল, তাই দর্শকের ক্রমান্বয়ে নূতনত্বের ক্ষুধা মিটাইতে পৌরাণিক ভাণ্ডার হইতে ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের জীবনচরিত হইতে ধর্ম্মভাবের দ্বন্দ্ব, ধর্ম্মযাজকদের কষ্ট ও লাঞ্ছনা, ও ধর্ম্মের নামে অন্যায় ও উৎপীড়নের কথায় নাটকীয় ভাব যোজনা করেন। কিন্তু ছন্দবদ্ধবাক্য অপেক্ষা, কথোপকথনের গদ্যতেই অধিক সফলতা লাভ করেন। ক্রমে তাঁহার নাটক ও গীতাভিনয়ের অপেরাগুলি যাত্রার আসর অধিকার করিয়া আধুনিক যাত্রাকে পটহীন থিয়েটারে পরিণত করিয়াছে, এমন কি বাক্যাবলী বলিবার ভঙ্গি পর্য্যন্ত। কৃষ্টির দিক হইতে ইহা ক্ষতি, কিন্তু প্রাণের স্ফুরণের দিক হইতে নব্য বাঙ্গালার লাভ বলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথও কাহিনীর জন্য ভক্তমাল, অবদানশতক, বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা, রাজস্থান, মহাবস্তুবদান, এমন কি, উপনিষদ্ হইতে আহরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নীতিমূলক তর্জ্জনি নির্দ্দেশক সাহিত্য, সাধারণের প্রাণের দোলায় স্থান পায় নাই। গিরীশের তুলনায় রবীন্দ্র-নাথের দুঃখ-ব্যঞ্জনা ও বর্ণনা এত সূক্ষ্ম ও অভিনব যে তাহাকে ধমনির বেদন অপেক্ষা স্নায়বিক ঝিল্লির প্রদাহ বলা যায়। জনপ্রিয় হওয়া এখনও সময়সাপেক্ষ, কারণ দেশে তাদৃশ উচ্চকল্প শিক্ষার বিস্তার ত হয় নাই এবং অনতিকাল মধ্যে হইবার সম্ভাবনাও নাই।

পরদুঃখকাতর রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবের সমস্যায় আংশিক মনোযোগী তাই বাস্তবিক কাল্পনিক ও প্রবীণ ব্যবহারজীবীর মত আনুমানিক ঘটনা-পঞ্জির মধ্যে পড়িয়া কোনও বিকারপ্রাপ্ত চিত্ত কী দুঃখ ও মনোকষ্ট ভোগ করে ও করিতে পারে, তাহার ছবি দিতে তিনি সুনিপুণ তুলিকা চালাইয়া-ছেন। তাঁহার পুস্তকে দৈহিক কষ্ট তাদৃশ করুণ [illegible] নাই, [illegible] বঙ্কিমের মত ছেয়াত্তরের মন্বন্তরের [illegible] চিত্র না সংগ্রামান্তে বিকলাঙ্গের বা জরাগ্রস্তের হাস কষ্ট আঁকেন নাই, [illegible] বিলাপ বাহুল্যে দয়ার উদ্রেক করিতে তিনি নিশ্চেষ্ট, কিন্তু [illegible]

জলপ্রপাতের মত বহু নিম্নে স্থিত পাষাণ বক্ষে কারুণ্যের প্রস্রবণ উৎক্ষেপ করিয়াছেন। চিত্তের গভীরতম ট্রাজেডির দিকে দেশবাসীর মনকে তিনি টানিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয় স্পন্দন
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।"

তাঁহার স্বাভাবিক মনের গতি কিন্তু 'গীতিমালায়' প্রকাশ পাইয়াছে—

"যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন বাঁশীতে
জননীর মুখ তাকানো হাসিতে
সেই সুরে আমারে বাজাও
বাজাও আমারে বাজাও।"

সাম্প্রদায়িক গান হিসাবে ভাবের জটিলতা সত্ত্বেও সুধু বাহনের গুণে [illegible] রচিত বলিয়া বাউল গানের প্রচলন খুবই ছিল, এবং আছে। এই অকৃত্রিম উৎসের সন্ধানে পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ধাবিত হন। জোড়া-সাঁকোর বাড়ির যোড়া স্তম্ভের স্তবকের আড়ালে তাঁহার হীন নিম্নস্তরের সামাজিক লোকের সহিত মিশিয়া তাহাদের ভাব ও ভাষা সঙ্কলনের সুবিধা হয় নাই। তাঁহার দীর্ঘকাল শিলাইদহ ও বোলপুরে বাস হেতু তাঁহার প্রাণের সে অভাব মিটিয়াছে। তিনি ভিখারী বৈরাগী ফকির ও বাউলের নিকট এই শ্রেণীর বহু গান সংগ্রহ করেন। দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব মিশ্রণে যে সুন্দর কাব্য ও গান হয়, যাহা কথা ও সুরের বিশিষ্ট লোককে মর্ম্মস্পর্শী করা যায়, অথচ কোন বিশিষ্ট দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত না হওয়ায় সর্ব্বশ্রেণীর লোকের পক্ষে সহজে ব্যবহৃত হইতে পারে, যাকে বলে Thoroughly democratic, তাহাই তিনি আবিষ্কার করেন। ফলে, তাঁহার কতকগুলি পদ্য রচনা "বাউল" নামে প্রকাশিত

হয় ও "বৌঠাকুরাণীর হাটের" নাটকীয় রূপে ধনঞ্জয় বৈরাগীর অবাধ বিচরণ ও "ফাল্গুনীতে" অন্ধ বাউলের আবির্ভাব।

তিনি নিজে ইহাদের ভাবে এতটা মুগ্ধ হন ও Spiritual expression এর জন্য ইহাদের ভাবভঙ্গি এত অনুকুল বিবেচনা করেন যে জোড়াসাঁকো বাড়িতে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে সাহায্যদানার্থে যে "ফাল্গুনী" অভিনয় হয় তাহাতে কবি স্বয়ং বৃদ্ধ বয়সে পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া অন্ধ বাউলের ভূমিকায় নাচিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আভিজাত্যের ও কৃত্রিমতার গণ্ডিতে তাঁহার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিত, তাই শান্তিনিকেতনের তরুচ্ছায়ে যখন বর্ষান্তে নীল আকাশে মহামায়ার আগমনের শ্বেত নিশান, এবং বঙ্গের প্রান্তরে ধবল কাশফুলের দোলন দেখা যায় ও দূরগামী ধবল বলাকামালা কাদম্বিনী-কোলে শোভা পায়, পলিতকেশ "ঠাকুরদা" সাজিয়া বালক-দলের অগ্রণী হইয়া তাহাদের সহিত সাদা কথার যোগে একটি নাটিকা অভিনয় করিতে কবি বড়ই ভালবাসিতেন। তাই, তাঁহার পরিণত কালের রচিত "শারদোৎসব" ও বালকের ক্রোড়ে দেওয়া "মুকুটে" ভাবে ভাষায় কথার গাঁথুনি ও বাঁধুনিতে ও নাটকের গঠনে, অঙ্ক বিভাগে আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা যায়। তুলনায় দেখা যায়, ভারতের ভাব-ধারা, ভারতের বাণী তাঁহার রচনাকে পাশ্চাত্য প্রভাব অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্ট করিয়াছে। ভাবে কালিদাসের ও বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের প্রভাব ত আছেই, প্রসাদী সঙ্গীতের অর্থালঙ্কার ও হসন্তবহুল শব্দের [illegible] প্রভাব অল্পবিস্তর রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। তবে, 'রাজা', 'ডাকঘর' ও তৎপরবর্ত্তী রূপক নাটকগুলি যে মেটারলিঙ্কের নাটকগুলির [illegible] স্বীকার করিতেই হইবে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্কিমযুগের সাহিত্যিক হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার সাহিত্যিক আদর্শে ও সাহিত্যিক জীবনে [illegible] যুগের যথেষ্ট প্রভাব ছিল একথা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে উক্ত ভারতীর

বিশেষ অধিবেশনে "বঙ্কিমচন্দ্র" সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই প্রবন্ধ ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসের 'সাধনা' পত্রিকায় (সাধনা ৩য় বর্ষ ১৩০০—১৩০১ প্রথম ভাগে ৫৩৬ হইতে ৫৬৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়)। ঐ প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

"পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম, তাহা আনন্দ উচ্ছ্বাসের সহিত আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। দুই কালের সন্ধিস্থলে যাহারা না দাঁড়াইয়াছে, তাহারা সেই প্রবল প্রভেদ কিছুতেই অনুমান করিতে পারিবে না। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয় বসন্ত, সেই গোলেবাকাওয়ালী, সেই সব বালক ভুলানো কথা ; কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আমাদের প্রথম বর্ষার মত আসিল এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দ বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। এত কাব্য নাটক উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিক পত্র, কত সংবাদ পত্র, বঙ্গভূমিকে জাগ্রত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল।

"তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালাকে কেহ শ্রদ্ধা সহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষা তখন অত্যন্ত দীন মলিন ভাবে কাল যাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইত না। শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

পূর্ব্বে অভ্যাস বশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত, তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়-

বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না। "বঙ্কিম যেদিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, সেদিন হইতে এ পর্য্যন্ত আর সে আসন পূর্ণ হইল না। সাহিত্যের প্রতি এখনকার সমালোচনার কোনও প্রভাব নাই। সেইজন্য এখনকার সাহিত্য বিস্তর স্বেচ্ছাচারিতা এবং ইতর ভাবের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনা আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল, সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন।"

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কবি নিজে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ধনীসন্তান হইলেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ও দারিদ্র্যের সুখ দুঃখের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও গভীর সহানুভূতি। তবে তাঁহার রচনায় দুঃখের চিত্র সমধিক সমুজ্জ্বল। কৈফিয়তে কবি বলেন যে—

সুখে আছি লিখতে গেলে
লোকে বলে প্রাণটা ক্ষুদ্র।
আশাটা এর নরক বিরাট
পিপাসা এর নরক রুদ্র।

*　　*　　*

একটু খানি হেসে খেলেই,
ভরে যায় এর মনের জঠর;

*　　*　　*

কবিকেই তাই ছন্দে বন্ধে
বানাতে হয় দুঃখের দলিল।

কবির অনুভূতিও বিবিধ এবং বিচিত্র এবং তাঁহার প্রকাশভঙ্গিও অপরূপ। তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, ভোগের মধ্য দিয়া সংযম ও ত্যাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রূপসাগরে ডুব দিয়া অরূপ রতন তুলিয়াছেন। তাঁহার রচনায় প্রত্যক্ষ প্রকাশে সংজ্ঞা অস্পষ্ট,

পরোক্ষ ব্যঞ্জনায় তাহা সুসমৃদ্ধ। অনেক রচনায় রূপকের পূর্ণ প্রভাব। তাঁহার রচনার পরিণতি রূপকের মধ্যেই এবং Mysticদের ভাবসম্পায়। সেই কারণেই তিনি বস্তুতান্ত্রিক কি মায়িক, ইহা লইয়া তাঁহার সমালোচকরা চিরদিনই বিতণ্ডা করিয়াছেন ও করিবেন।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি বিশিষ্ট ভাব তাঁহার **জীবন দেবতা**। কবি মনে করেন যে তিনি যন্ত্র মাত্র, জীবনদেবতাই তাঁহার অন্তরে থাকিয়া "যন্ত্রী" ভাবে লহর তুলিতেছেন। রসানুভূতি ও প্রেরণা সাহায্যে তাঁহার জীবনকে পরিপুষ্টি ও পরণতির দিকে লইয়া যাইতেছেন। ইনি ভগবান নন। ইনি কবির মনোরাজ্যের অধিপতি, বাহিরের চেতন পুরুষ নন, তাঁহার অন্তরবাসী প্রচ্ছন্ন পুরুষ। হিন্দু চিন্তানুসারে ইঁহাকে হৃষিকেশ বলা যায়। ইঁহার নিয়োগে কবি কার্য্য করিতেছেন।

"আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি—
আমার হৃদয় পানে চাইনি
গোপন রহি গভীর প্রাণে
আমার দুঃখ সুখের গানে
সুর দিয়েছ যে তুমি
আমি তোমার গান ত গাই নি।"

[illegible] পরেও বিপত্নীক রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন—

"তোমার সে ভালো লাগা মোর
চোখে আঁকি
আমার নীবনে তুমি বাঁচো ওগো বাঁচো
তুমি আছি মোর মনে আমি হয়ে আছ।"

এই যে অসীমকে সীমার মাঝে অনুভব করার প্রণালী ইহাকে ইংরাজিতে Mysticism বলে। সাধন ভজনে রত ব্যক্তির পক্ষে সদাই

কাম্য "ভাবে ভাবে হৃদয় ভবনে ভাবয়েহহং ভবন্তম * ইষ্টদেবকে নিজের মধ্যে অনুভব করা ও বাহিরের সকল বস্তুতে তাঁহাকেই দর্শন করা। ইহারই অপর পিঠ স্বোহং জ্ঞান, তৎসৎ বা তত্ত্বমসি।

রবীন্দ্রনাথ এই কথাই জোর করিয়া বলেন যে মানুষ দেশ, কাল, শিক্ষা, সাধনা, সভ্যতা, আচার ও প্রাদেশিক সংস্কারের আবেষ্টনে যতই বিচ্ছিন্ন হউক না কেন, মানুষের অন্তরে অন্তরে একটা রসের যোগ আছে যাহাতে মানুষমাত্রের সহিতই মানুষের সহানুভূতি জাগে। এই যোগ আছে বলিয়াই বিভিন্ন বিদেশীয় শিল্প ও সাহিত্যের রস গ্রহণে সে আকৃষ্ট ও সমর্থ হয় এবং সাধারণ মানুষের সুখে দুঃখে আনন্দ ও কষ্ট বোধ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প ও সাহিত্য যতটা স্বদেশের ও স্বজাতির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সাধারণ মানবতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততই তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত। ইহা তাঁহার বিশ্বমানবতা ও নৈর্ব্যক্তিক নির্বিশেষ রচনার ভিত্তি।

---

* নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্ব হেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরেনারকং নাপনেতুম্
রম্যা রামা মৃদুতনুলতা নন্দনে নাপি রন্তুম্
ভাবে ভাবে হৃদয় ভবনে ভাবয়েহহং ভবন্তম্
(মুকুন্দমালা)

বঙ্গানুবাদ—জগতের দ্বন্দ্ব সুখ দুঃখ হতে পরিত্রাণের জন্য [illegible] চরণবন্দনা করিনা। ঘোর কুম্ভীপাক নরক হইতে ত্রাণের জন্য [illegible] কিম্বা সুন্দরী রমণীযোগে স্বর্গের সুখভোগের নিমিত্ত অভিলাষী নই। [illegible] করি যাতে ক্ষণে ক্ষণে আমার অন্তরনিলয়ে প্রতি ভাবের মধ্যে তুমি [illegible]।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা—রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার দেশবাসী একটি সমিতি গঠন করেন, সেই সমিতির সভাপতি ছিলেন মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ধনরক্ষক ছিলেন ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী এবং সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র দত্ত। এই সমিতি বঙ্গসাহিত্যের মুখপাত্র স্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করেন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে জাতি কি ভাবে কবির সম্বর্দ্ধনা নির্ব্বাহ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় নিম্নে দিলাম। ১৩১৮ সালের ১৪ মাঘ (১৯১২ সালের ২৮শে জানুয়ারি) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিমন্ত্রণে কলিকাতার টাউন হলে একটি বৃহৎ সভায় রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা কার্য্য সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে জনসঙ্ঘে টাউন হল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। গণ্যমান্য সাহিত্যসেবক এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে, বিজয়নগররাজের অমাত্য, আপনা রাও কতিপয় ইংরাজ মহিলা ও ভদ্রমহোদয় সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট কয়েকজন জাপানী বাঙলা ভাষা শিখিতেছিলেন, তাঁহারাও উপস্থিত ছিলেন এবং তন্মধ্যে একজন বাঙলায় একটি ছোট বক্তৃতার দ্বারা কবিকে অভিনন্দিত করেন। নাটোরের মহারাজা পরলোকগত জগদীন্দ্রনাথ রায় মহোদয় সভার পক্ষ হইতে ধান্য, দূর্ব্বা, অক্ষত সিদ্ধার্থ, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, দধি, মধু, ঘৃত, পুষ্প,

গোরোচনা, সজ্জিত বহুমূল্য অর্ঘ্যপাত্র কবিবরকে প্রদান করেন ও সুললিত ভাষায় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। পরিষদের সভাপতি এবং সেই সভার সভাপতি পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় সভার পক্ষ হইতে কবিবরকে একটি স্বর্ণসূত্র মাল্যে ও বিকশিত পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া একটি স্বর্ণপদ্ম উপহার প্রদান করেন। এই স্বর্ণপদ্মটী সে বৎসর ভারতীয় কলা-প্রদর্শনীতে পুরাতন বৌদ্ধ কলার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া প্রশংসা লাভ করায় সম্বর্দ্ধনা সমিতি কবিবরকে উপহার দিবার জন্য ৫০০৲ টাকা মূল্যে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরিষদের সম্পাদক পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রাচীন পুঁথির আকারে শুভ্র হস্তিদন্ত ফলকে লাল অক্ষরে উৎকীর্ণ অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়া, হস্তিদন্তের পত্রগুলি সুবর্ণখচিত কিংখাপে মুড়িয়া কবিবরকে উপহার দেন।

অভিনন্দন—কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় করকমলেষু—

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন নব শতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন: অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদগণ শূন্যে প্রবাহিত হইলেন, অন্তরীক্ষে বিশ্বদেবগণ প্রসাদ-পুষ্প বর্ষণ করিলেন, ঊর্দ্ধ ব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয় মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল, বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনা গানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনীষীগণ স্বহস্তরচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর [illegible] শোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সাহিত্য নূতন [illegible] স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার

অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল। সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল। সেই স্পন্দন প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুম সম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামিগণের স্নিগ্ধ নেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল, অনুগামিগণের শুদ্ধ নেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগদেবতার সেবানগণের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণী-মন্দিরের মণি-মণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ, রত্নবেদীর পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্ত-হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দ সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপানির অঙ্গুলি প্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রী সমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রী কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ব রক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়ন-কালে মর্ত্তোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাসিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃতকণিকার বিতরণে তোমার সহ-কারিত্ব গ্রহণ দ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছিল। পঞ্চাশৎ-সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামা জন্মদা তোমাকে স্নেহ-পীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছে।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক মধুর ভাষায় বিনয়নম্রভাবে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন—"আজ আমার দেশজননীর আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া যদি আমি

নীরবে প্রণাম করিয়া বসিতে পারিতাম, তবেই আমার পক্ষে ভাল হইত। আজ আমার কিছু বলিবার শক্তি—নাই—আমার কণ্ঠ অবরুদ্ধ, আমার ভাষা প্রতিহত। এত বড় সম্মানের সম্মুখে নিজের ক্ষুদ্রতা অত্যন্ত পীড়াদায়করূপে আমাকে সঙ্কুচিত করিতেছে। এতদিন যে তপস্যা করিয়াছি, তাহার সিদ্ধি যখন আজ রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে অসঙ্কুচিতভাবে গ্রহণ করিতে পারি, এমন শক্তি নিজের মধ্যে অনুভব করিতেছি না। এই সঙ্কোচ অনেক দিন হইতেই আমাকে বেদনা দিতেছে। কেবল একটি কথা চিন্তা করিয়া আমি মনের মধ্যে বল পাইয়াছি, আমি নিশ্চয়ই জানি, আজ আপনারা যে সম্মানদান করিলেন, সে সম্মান আপনারা বঙ্গ সাহিত্যকেই দিলেন, আমি তাহার উপলক্ষ মাত্র। এমন একদিন ছিল, সাহিত্য যখন কোন ধনী বংশকে, কোন রাজসভাকে অবলম্বন করিয়া পালিত হইত। আজ সেই তাহার সঙ্কীর্ণ ও কৃত্রিম আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সাহিত্য সমস্ত জাতির চিত্তে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আজ তাই বাঙ্গালী বাঙ্গালা সাহিত্যকে আপনার চিরদিনের হৃদয়ের ধন জানিয়া তাহাকে আদর জানাইবার আয়োজন করিয়াছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে সেই সমাদরের বাহনরূপে আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহার চেয়ে গৌরবের কথা আমার পক্ষে আর কিছুই নাই। আপনাদের এই মাল্য, চন্দন, এই অর্ঘ্যপত্র আমি নতশিরে বহন করিয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরে তাহা নিবেদন করিয়া দিব। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।" এতদুপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে ২০শে মাঘ তারিখে একটি আনন্দ সম্মিলনে কবিবরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেইদিন সঙ্গীতযন্ত্র, কণ্ঠসঙ্গীত ও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। কবিবর একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার মধ্যে বলেন যে, যে মানুষ প্রেম দান করিতে পারে, ঐশ্বর্য্য তাহারই। যে মানুষ প্রেম লাভ করে, তাহার কেবল সৌভাগ্য। প্রেমের ক্ষমতা যে কত বড়, তাহা আমি বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি। * * * আজ চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল সাহিত্যের সাধনা করিয়া আসিয়াছি—সুদ

চুক যে অনেক করিয়াছি এবং আঘাতও যে বারম্বার দিয়াছি, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমার সেই সমস্ত অপূর্ণতা, আমার সেই সমস্ত কঠোরতা বিরুদ্ধতার উর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আপনারা আমাকে যে মাল্যদান করিয়াছেন তাহা প্রীতির মাল্য ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। এই দানেই আপনাদের যথার্থ গৌরব এবং সেই গৌরবেই আমি গৌরবান্বিত। * * * * আপনাদের প্রদত্ত এই সম্মানের উপহার আমি দেশের আশীর্ব্বাদের মত মাথায় করিয়া লইলাম—ইহা পবিত্র সামগ্রী, ইহা আমার ভোগের পদার্থ নহে—ইহা আমার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবে, আমার অহঙ্কারকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে না। দেশের সাহিত্যিকেরা এবং পরিষদের ছাত্রসভ্যরা কবিকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কবিতার অর্ঘ্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

দশবৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠীতম জন্মদিন উপলক্ষে কবিকে জার্ম্মাণ পণ্ডিতেরা অভিনন্দিত করেন। সেইবার ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তাহার ৬১ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে কবিবরকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ দ্বিতীয়বার সম্বৰ্দ্ধনা করেন। টাউনহলে অভ্যর্থনার পরে তিনি বিলাত যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় তাঁহার চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁহাকে কয়েকদিনের জন্য বিরত হইতে হইল। ভগ্নস্বাস্থ্য রবীন্দ্রনাথ সিলাইদহে পদ্মার উপরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি অবসর বিনোদনের জন্য গীতাঞ্জলি, খেয়া, নৈবেদ্যের কতকগুলি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ আরম্ভ করেন। এই অনুবাদ তাহার প্রথম অনুবাদ নয়। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার কতকগুলি রচনার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া তিনি "Modern Review" পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। পরে বিলাত যাইবার পথে ষ্টিমারেও অনুবাদ চলিতে থাকে। বিলাতে কোনও বিশেষজ্ঞের দ্বারায় তাঁহার অস্ত্রোপচার করা হয়। তাহার ফলে কবির স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। তথায় অবস্থানকালে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রথেনষ্টাইনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। রথেনষ্টাইন

পূর্ব্বে তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলেন কিন্তু কবি বলিয়া জানিতেন না। রবীন্দ্রনাথ একজন কবি শুনিয়া, তিনি তাঁহার কবিতা দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কবি তাঁহার হাতে অনুবাদগুলি দিলেন। দুই তিন দিন পরে রথেনষ্টাইন ইহার অত্যধিক প্রশংসা করিলেন। রথেনষ্টাইন টাইপ করিয়া ইয়েটস্, ষ্টপফোর্ড, ব্রুক, এবং ব্র্যাণ্ডলির নিকট ইহা পাঠাইয়া দেন। তাঁহারাও ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। রথেনষ্টাইন বাটিতে কয়েকজনের সমক্ষে কবি ইয়েটস্ ইহা পাঠ করেন। সে মজলিসে মে সিনক্লেয়ার নেভিনসন, এণ্ড্রুজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই মুগ্ধ হইলেন। ইংরাজি গীতাঞ্জলি কবি ইয়েটসের সম্পাদকতায় রথেনষ্টাইন-অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি সহ গ্রেটবৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল।

বিশ্বসাহিত্য আয়ত্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখিলেন—তিনি যে ভাব রাজ্যের রাজা, তাহা বিশ্বসাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—সম্পূর্ণ নূতন। যদি য়ুরোপীয় কোন দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি অবিসংবাদী সম্রাটরূপে রচিত হইতেন। অদৃষ্টক্রমে তিনি বাঙ্গালী, নগণ্য তাঁহার ভাষা, পৃথিবীর এক কোণে সীমাবদ্ধ, বাঙ্গালীকে কেহ জানে না চেনে না। বাঙলা কেহ পড়ে না। তিনি যে ইংরাজি গীতাঞ্জলি য়ুরোপের সমক্ষে ধরিলেন, য়ুরোপ নূতন জিনিস পাইল—পড়িল—মোহিত হইল। সমালোচকদের মুখে প্রশংসা ধরে নাই। য়ুরোপীয় সুধীবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়া ১৯১৩ সালে সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ তাঁহারই প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই নোবেল প্রাইজ এর বিশেষ বিবরণ পাঠক পরিশিষ্টে দেখিবেন। 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' এই মহাবাক্য সার্থক করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব[illegible] হইলেন। নোবেল প্রাইজের সংবাদ দেশে আসিলে, তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য অনেক গণ্যমান্য লোক, [illegible] প্রায়

৫০০, স্পেশাল ট্রেনে বোলপুরে গিয়াছিলেন। কিন্তু এ মিলনে কবি ও ভাবুকের মধুর মিলন হইল না। কবির এ উপলক্ষে নূতন গান রচনা—

"এ মনি-হার আমায় নাহি সাজে।
এ যে পরতে গেলে লাগে, ছিঁড়তে গেলে বাজে।"

* * *

লোকের কানে কেমন কেমন ঠেকিল। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন "আমাকে সমস্ত দেশের নামে যে সম্মান দিতে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা অসঙ্কোচে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নেই। * * * আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন, তা আমি ওষ্ঠের কাছে পর্য্যন্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। এর মত্ততা থেকে আমার চিত্তকে আমি দূরে রাখতে চাই। * * * দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁছেছে, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয় নাই এবং এতকাল তা আমি নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কি জন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম, তা এখন পর্য্যন্ত আমি নিজেই ভাল করে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলেম, তিনি সমুদ্রের পশ্চিমতীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্য যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন, সে কথা আমি জানতুম না। তাঁর প্রসাদ আমি লাভ করেছি এই আমার সত্য লাভ * * এই সম্মানের যদি কোনও মূল্য থাকে সে সেখানকার গুণিজনের রসবোধের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশের কোন আন্তরিক সম্বন্ধ নাই। নোবেল প্রাইজের দ্বারা কোন রচনার গুণ বা রস বৃদ্ধি করতে পারে না।" দেশের লোক সম্বর্দ্ধনায় এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে ক্ষুব্ধ হইল। রবীন্দ্রনাথ যাহাই বলুন, তাহারা জানিত যে এ কথায় সায় দিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ এদেশেও গুণীসমাজে চিরদিন সমাদর লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আদর তিনি পাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে জেনারেল এসেমব্লি হলে এক প্রকাশ্য সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধপাঠের সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্ব তাঁহার সমাদর করেন। বঙ্কিমযুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার নবজীবনের প্রথম বর্ষে "ভাই হাত তালি" প্রবন্ধে তরুণ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। "তুমি না লাগিলে তিনি এখনও আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন — — আর তুমি লাগিলে" ? ? (পরিশিষ্ট ছ দ্রষ্টব্য) তবে বিরুদ্ধ কেহ থাকিবে না, এ সৌভাগ্য জগতের কয়জন কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে, আমরা জানি না। কালিদাসের দিঙ্ নাগাচার্য্য ছিলেন। কবি বররুচি প্রভৃতির সমালোচনার অভাব ছিল না। সেক্‌স্‌পিয়ার যে নিজে কিছু রচনা করিতে পারিতেন না এ মতবাদ তাঁহার সময় হইতে আজও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং কিটসের "এডিনবরা রিভিউ" এবং "জেফরি" ছিল। কবি পোপের বিরুদ্ধবাদীদলের যে অভাব ছিল না, তাহা আমরা তাঁহার 'ডানসিয়াডে' বহু পরিচয় পাই। কবি রবীন্দ্রনাথেরও বঙ্গবাসী পঞ্চানন্দ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বা "রাহু" ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যে দেশে যথেষ্ট আদর ছিল, তিনি নিজেও তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাহা না হইলে তিনি কোন্ সাহসে চিত্রাঙ্গদার মত চটি বহি রেশমে বাঁধিয়া ৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; আর দেশে যদি তিনি কেবল অপযশ ও অপমানই পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী প্রথম সংস্করণ একখণ্ড পুস্তকে তাঁহার তৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত কাব্য ও গীতের সংগ্রহ ১০৲ টাকা মূল্যে কাহার নিকট বিক্রয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ দেশের আদরের [illegible] ও আদরের ছিলেন, তাই অপ্রিয় সমালোচনার "অঙ্কে অভিমানী [illegible]" ন্যায় তাঁহারও অভিমান-সাগরে তরঙ্গ উঠিয়াছিল।

এই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয় চিরন্তন লজ্জা হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে তাঁহাকে 'D. Litt.' উপাধি প্রদান করিয়া এই পলাতককে নিজের অধিকারে ডাকিয়া লইলেন। রবীন্দ্রনাথও কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ে সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া নিজের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। উত্তরকালে কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ে তিনি রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ও কমলাস্মৃতি লেকচারার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং বঙ্গসাহিত্য মৌলিক রচনায় অগ্রণী "জগত্তারিণী" পদক লাভ করেন। এই সময়ে গভর্ণমেণ্টেরও চক্ষু কর্ণ খুলিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে ১৯১২ সালে Andrews সাহেব সিমলা গভর্ণমেণ্ট হাউসে বক্তৃতা দেন। তদুপলক্ষে তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল Lord Hardinge বক্তৃতা মধ্যে রবীন্দ্র ঠাকুরকে উল্লেখ করিয়া 'Poet Laureate of Asia' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আর সরকার বাহাদুর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 'Kt.' (নাইট) উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ঐ ভূষণ তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা ব্যাপারের পর কিরূপে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা এখন ইতিহাসের কথা। ঐ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে যে পত্র লেখেন তাহা এই—

Your Excellency—

The enormity of the measures taken by Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised Governments, barring some conspicuous exceptions recent and remote. Considering that such treat-

ment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, for less moral justification. The accounts of the insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers,—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our government which could so easily afford to be magnanimous, as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings.

And these are the reasons which have painfully compelled me to ask your Excellency with due deference and regret to relieve me of my title of knighthood which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor for whose nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours faithfully,
Rabindranath Tagore.

এই পদত্যাগ এবং তাহার কারণ সম্বলিত পত্রখানি সম্বন্ধে বৃটিশ পারলেমেণ্টে মন্ত্রণা-গৃহে কোন সভ্য প্রশ্ন উৎথাপিত করায়, তৎকালীন ভারত-দপ্তরের সচীব Mr. James Montague, Secretary of State for India যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা Hansard's Parliamentary Debates-এ প্রকাশিত হয়; আমরা তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের বার বৎসর পরে হিজলীর ঘটনায় কবি কতদূর মর্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শাসক সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুর উদাসীনতা ও অমানুষিক আচরণ যে একরূপ রাজশক্তির স্বাভাবিক পরিণাম, ইহাই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে উপলব্ধি করিতে বলেন, এবং সে তাহাকে বিস্ময় পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর সহিষ্ণু হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন; কারণ, ইহাই লৌকিক নৈরাশ্যের স্থানে ভগবানের কৃপা ও আধ্যাত্মিক বল সঞ্চার করিবে।

রবীন্দ্রনাথের সম্মান তালিকা

President

Philosophical Congress, Dec. 1925
Bengal Provincial Conference, Calcutta, 1917
Rammohan Centenary, 1933
Banga Sahitya Sammelan, Benares, 1923
Hindi Sahitya Sammelan, Bharatpur, 1927
Lucknow Music Conference, 1926
All-India Students' Conference, Lahore, 1935

Bangiya Sahitya Sammelan, Bhawanipur, 1930 (Absent)
Prabartak Sangha, Chandernagar (Mandir Pratishtha) 1928
Visva-bharati, 1921 (President till 1941)
Brihattama Bharat Parishad
3rd Annual Meeting of Abhay Asram, 1926
Hijli Incident Protest Meeting, 1931
Communal Award Protest Meeting, 1936
Brahmo Samaj Centenary, 1928
Gujerat Literary Conference, Ahmedabad, 1920

Vice-President

New Education Fellowship, London, 1935 (Indian Centre-Santiniketan)
Bangiya Sahitya Parishad

Chancellor

National University, 1917.

Degrees & Distinctions

Calcutta University—
D. Lit. Honoris Causa, 1913
Jagattarini Medal, 1921
Kamala Lacturer—(Religion of Man) [illegible]
Ramtanu Lahiri Professor, 1932-34
Andhra University, Waltair—
Sir Alladi Krishnaswami Lecturer, [illegible]
Oxford University—
Hibbert Lecturer (Religion of Man), [illegible]
Doctor of Literature (Honoris Causa)

Lecturer

Berlin University, 1921
Munich University, 1921
Paris University
Illinois University, 1921
Texas University-Fort Worth, 1922
Iowa University, 1917

Belgrade University, 1926
Chicago University, 1913
Yale University, 1916
Yale University Medal, 17. 12. 1915
Frankfort University, 1921
Strasburg University, 1921
Florence University, 1926
Turin University, 1926
Harvard University, Cambridge, 1910
Peking University, 1924
Dacca University—
D. Litt. Honoris Causa, in absentia, Feb. 1936
Lecturer (The Philosophy of Art), 1926
Hindu University, Benares, D. Litt. Honoris Causa, 1935
Osmania University, Hyderabad
D. Lit. Honoris Causa, in absentia, 1st March 1938
Calcutta Sanskrit College Kavisarvabhouma, Honoris Causa, Sept. 1931
Nobel Society. Nobel Laureate, 1913

TITLES

GREECE—Commander of the Order of the Redeemer, Nov. 1926
CHINA—Order of Chen Tun, May 1924
GREAT BRITAIN—Knt. Bachelor, June 1915, Renunciated 1919.

Hony. Memberships

Hony. Fellow, Indian Research Institute, Calcutta
Hony. Member,
Royal Asiatic Society of Bengal, 1935
Bangiya Sahitya Parishad.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা বাল্য হইতেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। হিন্দুমেলায় তিনি একবার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। সে কবিতায় কবি হেমচন্দ্রের প্রভাব পরিস্ফুট। আমরা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের পিতা অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি সেদিন পার্শীবাগানে হিন্দুমেলায় উপস্থিত ছিলেন, কোন্ সাল তাহা তাঁহার স্মরণ নাই। কবির বয়স তখন ১৩।১৪ বৎসর হইবে। সভাপতি রাজনারায়ণ বসু হিন্দিতে বক্তৃতা করেন। একজন পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট এই বলিয়া পরিচিত করাইয়া দেন যে, "ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ" লিখিয়া কবি তখন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা একখানি চৌকা কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়া হিন্দুমেলার উপহার বলিয়া বিতরিত হইয়াছিল। অতুলবাবু ঐ কবিতা হইতে যে কয়েকছত্র তাঁহার স্মরণ ছিল তাহা আবৃত্তি করেন। আমি তাহা নোট করিয়া রাখিয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও পার্শীবাগানের সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনিও অতুলবাবুর বিবরণ সমর্থন করেন। অধিকন্তু [illegible] কবিতাটির কিয়দংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিবার পর তাঁহার [illegible] হেমেন্দ্রনাথ বেশ উচ্চ কণ্ঠে উহা পাঠ করিয়া শুনান। [illegible] সালের জানুয়ারী মাসের প্রবাসী পত্রিকায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের নিকট রক্ষিত পুরাতন অমৃতবাজার পত্রিকার ফাইল

১২৮৭ সালের ১৪ই ফাল্গুন (১৮৭৫ খৃঃ ২৫শে ফেব্রুয়ারী) হইতে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা বলিয়া একটী দীর্ঘ কবিতা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তখন ইংরাজি বাংলায় অমৃতবাজার পত্রিকা লেখা হইত। পরিশিষ্টে তাহা উদ্ধৃত হইল :—দেখিতেছি অতুলবাবুর নিকট সংগৃহীত ছত্র কয়টি ইহার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ১৮৭৫ সালের পূর্ব্বে 'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ' সম্ভবতঃ প্রচারিত হয়, হয়তো হস্তলিখিত লিপি হইতে কোন প্রকাশ্য সভায় বালক কবি কর্ত্তৃক উহা পঠিত হয়। আমরা তাহার কোন মুদ্রিত প্রতিলিপি পাই নাই।

একদিন রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছিলেন :—

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাইবে গান।

মাতৃভূমির জন্য, মাতৃভাষার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এ কথা সত্য। দেশের দুর্দ্দশায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, কিন্তু সেই দুর্দ্দশা নিবারণ কল্পে যে পন্থা সে সময়ে নির্দ্ধারিত ছিল, তাহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই,—কেবল সভা-সমিতি, কেবল শূন্যগর্ভ বক্তৃতা, কেবল সরকারের কাছে বিরাট কান্না, কেবল আবেদন ও নিবেদনের থালা বহিয়া নত শির হওয়া, দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মন যখন বড়ই ব্যথিত, তখন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ধ্বনিত হইল,—

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন্
চরণ তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন
উড়িছে বালি ছুটিছে ঘোড়া,
বর্শাহাতে, ভরসা প্রাণে চলেছি নিশিদিন।"

পরিবেষ্টনের অবস্থা অনুকূল হইলে, আরব অশ্ব ছুটাইয়া তাহার গতির সহিত মনের বেগের সামঞ্জস্য কতটা রক্ষিত হইতে পারিত, তাহা একবার

দেখা যাইত। এইরূপ উৎসাহহীন, কর্ম্মহীন, রাজকীয় আলস্যময় জীবন দুর্ব্বহ। রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবনের সার্থকতা এই "বর্শাহাতে, ভরসা প্রাণে চলেছি নিশিদিন" নিজের শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া আশাপূর্ণ হৃদয়ে অবিরাম গতিতে চলিতে থাকা।

রবীন্দ্রনাথের মতে, দেশবাসীর প্রতি কবির কর্ত্তব্য গুরুতর। "ছিন্নবাধা বালকের মত" কেবল বাঁশী বাজানই কবির একমাত্র কাজ নয়। তাঁহার মতে কবিকে দেশবাসীর—

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা।
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

এই কারণে "নৈবেদ্য" রচনার সময় হইতে দেখি, তিনি নানা ভাবে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তাহাদের বলিতেছেন যে, অন্যায় যে করে তার অপেক্ষা অন্যায় যে সহে সে বেশী দোষী।

বঙ্গ-ভঙ্গ যুগে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে রবীন্দ্রনাথ কায়মনোবাক্যে তাহাতে যোগ দিলেন (১৯০৫ খৃঃ)। তিনি বলিলেন।

"তা বলে ভাবনা করা চলবে না
বারে বারে ঠেলতে হবে হয়ত দুয়ার খুলবে না"

আরও গাহিলেন।

"একলা চল একলা চল একলা চল রে।
তোর রক্তমাখা চরণ তলে পথের কাঁটা একলাই দলবে"

বিধাতার আশীর্ব্বাদে জাতীয় জীবনে যে উৎসাহের বন্যা দেখা দিয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব্ব এবং বিস্ময়কর। যাঁহারা সেই বন্যার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা জীবনে বোধ হয় সে দৃশ্য ভুলিতে পারিবেন না। ৩০শে আশ্বিন ১৩১২ সালে বঙ্গ বিভক্ত হইবে সরকার ঘোষণা করিলেন। তাহার পূর্ব্ব হইতেই কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে প্রতিবাদ সভা আহুত হইল, এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মন্তব্য গৃহীত হইল। বাঙ্গালী তখন কেবলমাত্র মৌখিক বক্তৃতা করিয়া ক্ষান্ত

থাকে নাই, তাহারা এই জন্ত অন্তান্ত দেশে প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে দুর্ব্বল প্রজাশক্তি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, জাতি তাহা গ্রাহ্য করিয়া লইল। টাউনহলের একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ব্যবস্থা নির্দ্দেশকালে সভাপতি বলিলেন যে, ইংরাজ জাতির মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে হইলে,তাহার একটি মাত্র কোমল স্থান আছে। সেইখানে আঘাত করিতে হইবে, সেটি তাহার পকেট-নার্ভ (ট্যাঁক-স্নায়ু)। সরকার যদি জোর করিয়া বঙ্গ-ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে জাতির কর্ত্তব্য হইবে সমস্ত ইংরাজি দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া। সেজন্য যতদিন নিজেদের ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য নিজেদের শিল্পের সাহায্যে গড়িয়া তুলিতে না পারা যায়, ততদিন ইংরাজ ভিন্ন অন্যান্য জাতির নিকট সে সকল দ্রব্য কিনিতে পারা যায়। দেশে যাহা প্রস্তুত হইতেছে তাহা নীরেস হইলেও তাহা আদর করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।" দেশে সর্ব্বত্র বিলাতি দ্রব্য বয়কট (বর্জ্জন) প্রস্তাব সাগ্রহে ও সোৎসাহে গৃহীত হইল। স্থির হইল বঙ্গ-ভঙ্গের দিন কলিকাতার বাঙ্গালীরা ভাগীরথীতে স্নান করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিবে এবং বঙ্গ-ভঙ্গ অস্বীকারের প্রতীকস্বরূপ পরস্পরের হাতে মিলন সূত্র বা রাখি বন্ধন করা হইবে। দেবতার ভোগ, রোগীর পথ্য ও পাঁচ বৎসরের অনধিক বালক বালিকার আহার প্রস্তুত ভিন্ন সে দিন অন্য কিছু পাক হইবে না। বাংলার সর্ব্বত্র আর একটি নূতন 'অরন্ধন' পর্ব্ব অনুষ্ঠান প্রচারিত হইল। সহরের দোকান বাজার ও থানাদি সব বন্ধ থাকিবে। দেশে সর্ব্বত্রই একই দিনে অনুরূপ ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইবে স্থির হইল। রবীন্দ্রনাথের এই উপলক্ষে রচিত

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান"

প্রভৃতি "রাখি-সঙ্গীত" মুদ্রিত হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সুরলয়ে সুগঠিত হইয়া জাতীয় সঙ্গীতরূপে ব্যবহারে আসিল। সহরে ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ নানালোকের চেষ্টায় কয়েকটি 'বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়' গঠিত হইয়া পল্লীতে পল্লীতে রাজপথে ঐ গানের সাহায্যে ভিক্ষা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল।

রবীন্দ্রনাথও নিজপল্লীতে যুবকদের লইয়া নগ্নপদে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া 'আমরা আজ দ্বারে দ্বারে ফিরব তোমার নাম গেয়ে' গান গাহিয়া অর্থ সংগ্রহে বাহির হইয়াছিলেন। এই সকল অভিযানে কবির নিত্য সহচর ও সহায়ক ছিলেন তাঁহার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র সুকণ্ঠ দিনেন্দ্রনাথ। বঙ্গ-ভঙ্গের দিন প্রাতে রবীন্দ্রনাথ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ৺গগনেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ, ৺সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহাদের পল্লীর ভদ্রলোকদের লইয়া প্রাতে শোভাযাত্রা করিয়া গঙ্গাস্নানে যান ও ফিরিয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের হাতে রাখিবন্ধন করিয়া দেন। দোকান পাট বন্ধ থাকিলেও দোকানীরা তাহাদের দোকানের সম্মুখে ও গৃহস্থরা তাহাদের বাটির সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল। কবি বলেন, হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায় লইয়া বাঙালী। সেইজন্য গঙ্গাস্নান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মেছোবাজার ষ্ট্রীটে (অধুনা যাহার নাম কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট হইয়াছে) ও বড়িপাড়া মুসলমান পল্লীতে সদলবলে [illegible] মুসলমানদের হাতে রাখি বাঁধা হউক। তাহারাও সোল্লাসে [illegible] যোগদান করে। মুসলমান তখন হিন্দুর সহিত মিলিতে সঙ্কোচ [illegible] করে নাই। কেহ কেহ তাহাদের ধর্ম্মনিষিদ্ধ বলিয়া রাখি [illegible] করিলেও, হিন্দুদের শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিল। [illegible] স্মরণ আছে, কবি একজন পাহারাওয়ালার হাতে রাখি বাঁধিতে [illegible] সে জোড়হাত করিয়া বলে যে সে মুসলমান, সেইজন্য রাখি [illegible] পারিল না বলিয়া তাহার অপরাধ যেন মার্জ্জনা করা হয়। [illegible] বৈকালে বাগবাজারে নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসুর [illegible] যুক্ত বাটিতে ভিক্ষা দিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা হইয়াছিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বে দলে দলে নগ্নপদে জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থ দিবার আগ্রহে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চতুর্দ্দিক হইতে বিভিন্ন পাড়ার গানের দল তথায় আসিতে লাগিল। ঐ বাটি হইতে সমস্ত বাগবাজার ষ্ট্রীট ও চীৎপুর রোড পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ তারকনাথ পালিত (পরে স্যর), কুমার মন্মথনাথ মিত্র, কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবু নিবারণচন্দ্র দত্ত, কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ, বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ কলিকাতার তদানিন্তন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জনতার মধ্যে নগ্নপদে রুমাল লইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই অর্থের ঝুলিতে এক পয়সা দুই পয়সা হইতে হাজার টাকার নোটও পাওয়া গিয়াছিল। এই হাজার টাকা কে দিয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। রাত্রি দশটার পর এই অর্থ-সংগ্রহ সভা ভঙ্গ হয়। দেখা গেল একবেলায় প্রায় ৭৭০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়া 'জাতীয় ভাণ্ডার' (National fund) এর সৃষ্টি হইল। সামান্য রোজগারী মুটে, মজুর, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান প্রভৃতিও তাহাদের দৈনন্দিন আয়ের অংশ দিতে ব্যগ্র হইয়াছিল। অভিজাত সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সম্প্রদায়, বণিক ও শ্রমিক সম্প্রদায়, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের এইরূপ অসংকোচ সহযোগীতা ও অবাধ মিলন ইতি-পূর্ব্বে এদেশের কোনও জাতীয় প্রচেষ্টায় দেখা যায় নাই। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য্য করা যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল (লেখকও তন্মধ্যে একজন), তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে কি অদ্ভুত কর্ম্মশক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন। দ্বিপ্রহরের কয়েকঘণ্টা বাদে প্রাতঃকাল হইতে সমস্তদিন স্থানে স্থানে সভায় বক্তৃতা করা, তারপর রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত নেতৃবৃন্দের সহিত পল্লীসমিতি গঠন, পল্লীসমাজের পত্তন, নানারূপ কুটীর-শিল্পের আয়োজন, জোড়াসাঁকোর ৭নং মদনমোহন চ্যাট্যার্জ্জি লেনে তাঁত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন, ক্লান্তির চিহ্নও দেখা যাইত না।

এই সময়েই জাতীয় সমাজের নিয়মাবলী উপলক্ষ করিয়া জাতীয়

জীবনের সকলদিকের সাফল্য লাভের জন্য যে সকল ব্যবস্থা কবি ও নেতৃবৃন্দ করিয়াছিলেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাশীলতা ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির বিশেষ পরিচয় ছিল। দুঃখের বিষয় আজ সেগুলি দেখিবার কোনও উপায় নাই। যাঁহাদের নিকট তৎকালীন ইতিহাসের অনেক উপাদান রক্ষিত ছিল, তাঁহারা পরবর্ত্তীকালে রাজরোষের ভয়ে সেগুলি অগ্নিতে সমর্পণ করেন। এই সময়েই পূর্ব্বোল্লিখিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়, এবং এই পরিষদের ব্যবহারার্থ ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পাশিবাগানস্থ বাটি রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ও ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ষ্টেটের Executorদের নিকট হইতে মিঃ টি, পালিত ব্যারিষ্টার (পরে স্যার তারকনাথ পালিত) ক্রয় করেন। জাতীয় কার্য্যে উহা ব্যবহৃত হইবে বলিয়া, কলিকাতার জমি ও বাটির মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পূর্ব্বের খরিদ-মূল্যে বিক্রেতারা ছাড়িয়া দেন। উত্তরকালে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় তারকনাথ পালিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে উক্ত বাটি সমর্পণ করিলে, তথায় অধুনা সুপরিচিত Science College ও বিজ্ঞান আগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

জানিনা, পরলোকে কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের আত্মা তাঁহার বাটিতে বাঙ্গালী যুবকগণের বিজ্ঞান আলোচনার এই সুযোগে কি পরিমাণ তৃপ্তি পাইয়াছেন, কারণ তাঁহার জীবদ্দশায় এই বিজ্ঞান আলোচনাক্ষেত্রে বীজ বপন মানসে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের পরিকল্পিত ও অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান সভার (Indian Association for the Cultivation of Science) বিজ্ঞানাগার গঠনের জন্য তিনি বহুবর্ষ ধরিয়া ক্রমান্বয়ে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দানের সমষ্টি করিলে প্রায় [illegible] টাকা হয়।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রতিযোগীতায় ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী প্রথম র‍্যাংলার (Wrangler), তথাকার ভারতমজলিসের এবং পরে Cambirdge Unionএর সুযোগ্য সভাপতি, যাঁহার চিন্তাশীলতা, উদার মত ও বাগ্মিতা দেখিয়া তৎকালীন রাজনীতি ও অর্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক

পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্য Mr. Henry Fawcett "ভারতের ভাবী গ্লেডষ্টোন" বলিয়া আখ্যাত করেন, সেই Mr. A. M. Bose, দেশে প্রত্যাগত হইয়া বহু হিতকর অনুষ্ঠানের মধ্যে যিনি সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইবার প্রাক্কালে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের পূর্ত্ত শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপনায় তিনি নিযুক্ত থাকিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে লেজিস্‌লেটিভ্ কাউনসিলে দেশের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন, সেই মৈমনসিংহের সুসন্তান, দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবন, ভারতীয় কংগ্রেসের উৎসাহী কর্ম্মী ও সভাপতি মৃত্যুশয্যাশায়ী, মৃত্যু প্রতীক্ষায় শায়িত শান্তমূর্ত্তি ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসুকে ষ্ট্রেচারে করিয়া তথায় বহন করিয়া আনা হয়।

পাশিবাগান অঞ্চলের সেই বাটির সুমুখে রাস্তার অপর ধারে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক বৈঠকের জন্য জাতীয় ভবন (Federation Hall)এর ভিত্তি ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর দিবসে সগৌরবে তাঁহা দ্বারা স্থাপিত হয়। এই উপলক্ষে আনন্দমোহন বসু ও এ্যাটর্ণী ভূপেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় সঙ্ঘ গঠনের জন্য যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, যদিও পরবর্ত্তী কালে বঙ্গভঙ্গ রহিতের পর, মিণ্টোমর্লি রিফরমস্ এর ফলে, সমগ্র বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বসু বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে সেক্রেটারি অফ্ ষ্টেট্‌স্-এর কাউন্সিলের সচিব হইয়া দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছিলেন, এমন কি Montague Chelmsfordএর সহযোগী হইয়া ভারতীয়ের স্বত্বাধিকার সাব্যস্তের বিখ্যাত রিপোর্টের মাননীয় স্বাক্ষরকারী ছিলেন, তথাপি তিনি বাঙ্গালীর জাতীয় সৌধ (Federation Hall) সাকার রূপে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। ফেডারেশন হলের ভূমিতে আজ মহিলাদের উন্মুক্ত বায়ুসেবনের জন্য জোড়িক্ পর্দ্দা পার্ক বিরাজিত।

এই বঙ্গভঙ্গের যুগে রবীন্দ্রনাথের, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মনীষা একত্রে মিলিয়া দেশের ভাবস্রোতকে সর্ব্ব বিষয়ে পুষ্ট

করিল। রবীন্দ্রনাথের প্ররোচনায় রামেন্দ্রসুন্দর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখিলেন। অল্পদিন পরেই সরকার সে ব্রতকথা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাউলের গান লিখিয়া রামেন্দ্রসুন্দরকে না শুনাইলে রবীন্দ্রনাথের তৃপ্তি হইত না। রবীন্দ্রনাথের বাউলের গানে দেশ ভরিয়া গেল। লোকে সেই গান লইয়া পাগল হইয়া উঠিল। এই সকল গান 'সোনার বাংলা', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি দেশাত্মবোধক কবিতা ও সঙ্গীতের সংগ্রহ পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলিরও পাঠ ও রক্ষা সরকার নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই যুগে যে নিরস্ত্র নৈবুজ্যের বাণী প্রচার করেন ও যে পথ নির্দ্দেশ করেন, তখন তাহার পরীক্ষা হয় নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে কিছু কিছু পরীক্ষাও হইয়া জাতীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে।

জাতির মঙ্গলের জন্য সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণপাত চেষ্টায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বাঙ্গালীর **বীমা অফিস** প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বেঙ্গল ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্ক-এর প্রতিষ্ঠার এই সময়। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালীর 'বয়কট' প্রস্তাবের সুযোগ লইয়া অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীরা নিজেদের লাভের অতিপুষ্টি সাধন করিয়াছিল। জাতির উৎসাহ ও ভাবধারা তাদৃশ স্থায়ী মঙ্গলপ্রসূ হইল না, ভাবনা [illegible] গেল, ব্যক্তিগত স্বার্থ সংঘাত সকল মঙ্গল চেষ্টাকে অকালে বিনষ্ট করিল। ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল—টিকটিকি বিভাগের [illegible] উপরে পতিত হইল।

জোড়াসাঁকো থানায় চুরির ডায়েরী করিতে গিয়া [illegible] শুনিয়া আসিলেন কনেষ্টেবল্ দারোগাবাবুর নিকট রিপোর্ট [illegible] 'সি' ক্লাশের ১২নং আসামী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [illegible] কলিকাতায় আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের তখন [illegible] বাল্যকালে তাঁহারাও এক গুপ্ত সভা করিয়াছিলেন—[illegible] ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। মড়ার খুলি ও তরবারি স্পর্শ করিয়া বৈদিক মন্ত্রে সে সভার সদস্য হইবার শপথ গ্রহণ করিতে হইত। [illegible] একটা

সাঙ্কেতিক ভাষাও ছিল। সভার নাম হইয়াছিল 'হাঞ্চুপামুহাফ্'। সহজ বাংলায় ইহার অর্থ 'সঞ্জীবনী সভা'। বঙ্গভঙ্গ যুগে যদি সে সভা থাকিত, আর তাঁহারা যদি সে সভার সভ্য থাকিতেন তাহা হইলে সে সভা লইয়া কি বিয়োগান্ত নাটকেরই না সৃষ্টি হইত 'অনুশীলন সমিতি' তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথকে যখনই কিন্তু দেশের কাজে আহ্বান করা হইয়াছে, তিনি নিভৃত নিবাসে আত্মস্থ হইয়া কাল যাপন করিতে ভালবাসিলেও, কখনও দেশের ডাক উপেক্ষা করেন নাই। আর পরিণত বয়সে যে তাঁহার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে কিন্তু বাক্য উত্তপ্ত হয় না, 'অবস্থা ও ব্যবস্থা', 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম', 'সফলতার সদুপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রকটিত আছে। জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত রবীন্দ্রনাথের চিরদিন একপ্রাণতা দেখা যায়। তবে তিনি কোনদিনই নেতা হইতে অগ্রসর হন নাই। বরং তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—তিনি জননায়ক নয়, তিনি মাত্র কবি।

কংগ্রেস ও প্রাদেশিক সম্মিলনের একজন চিহ্নিত কর্ম্মী না হইলেও বিভিন্ন প্রকারে তিনি যোগ দিয়াছেন। কলিকাতা টিভলি গার্ডেনে (Tivoli Gardens) নিখিল ভারত সভার ষষ্ঠ অধিবেশনে (ইং ১৮৯৮) স্যার ফিরোজ শা মেহতার সভাপতিত্বে যে বৈঠক হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছি। যে বার কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতার টাউনহলে হয়, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে বন্দেমাতরম্ গায়কদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' সেই সময়ে রচিত।

১৩০৪ সালে নাটোরের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ, সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথের ইংরাজি অভিভাষণ জনসাধারণকে বাংলায় বুঝাইয়াছিলেন। সেই অধিবেশনে তিনি ও তাঁহার মতাবলম্বী কয়েকজন বাংলায় সব কাজ করেন। পরদিন তাহার উত্তরে দেশপ্রসিদ্ধ Mr. W. C. Bonnerjee আপত্তি করিয়া বলেন যে, "The Chasas and Bhoosas

of Bengal"এর নিকট ইংরাজিও যাহা, রবীন্দ্র প্রভৃতির বাংলাও তাই। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথও তখন রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরাজি বক্তৃতা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সকলেই জানেন যে বরিশালে এমার্সন ও কেম্পলীলার লগুড় মাহাত্ম্যের পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয়, এবং তিনি অনেকস্থলে বাংলায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার বাংলা বক্তৃতাগুলি সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। নাটোরে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শব্দতূণীর হইতে চোখা-চোখা বাক্যবান সজ্জিত করিয়া মহারথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভূমিকম্প আসিয়া সব ওলট্ পালট্ করিয়া দিল। সভা ভাঙ্গিয়া গেল। বঙ্গভঙ্গের পর কিন্তু এ সকল বিষয়ে পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল।

১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথ পাবনার প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতিরূপে বাংলায় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৭ সালে কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেসের অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোনীত হন। কিন্তু কিছুদিন পরে পদত্যাগ করিলেও তিনি প্রবীণা রাজনীতিক অ্যানি বেসান্তকে সভানেত্রী পদে বরণ করিয়া সভারম্ভের পূর্ব্বে ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া সভার উদ্বোধন করেন।

১৯৩১ সালে হিজলীতে রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী বন্দীদিগকে লইয়া যখন গোলযোগ হয়, তখন কলিকাতাবাসীরা এক সভা আহ্বান করেন ও রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি-পদে বরণ করেন। আমরা ১৩৩৮ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসী (৩১শ ভাগ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪) হইতে দেশবাসীর প্রতি এই উপলক্ষে তাঁহার বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

চট্টগ্রাম ও হিজলীর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ

চট্টগ্রাম ও হিজলীর ভীষণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে বিরাট সভা হয়, তাহাতে আনুমানিক একলক্ষ লোক উপস্থিত হইয়া

ছিলেন। ঐ সভায় সভাপতি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন :—

"প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষদের কৃত কোন অন্যায় ও ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীব গুলি চালানো ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা-কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে। এতবড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদভ্রান্তিজনক ; কিন্তু যখন ডাক পড়িল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা দ্বারা চিরদিনের মত নীরব ক'রে দিয়েছে।

যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং এখন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দাম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘট্‌ল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজার রক্ষার দায়িত্ব যাদের 'পরে, সেই সব শাসনকর্তা এবং তাদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়বুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

এই সভায় আমার এই আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই ব'লে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা তার ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন

স্বীকার করে নিতে বাধ্য করানো রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন শক্তি? একথা ভুললে চলবে না যে, প্রজার অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমি আজ উগ্র উত্তেজনা বাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন এই কথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই আপন লজ্জা লাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে, সে ঊর্দ্ধে আমাদের ধিক্কার বাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছিতেই পারবে না। একথাও মনে রাখতেই হবে যে, আমরা নিজের চিত্তে সেই গভীর শান্তি যেন রক্ষা করি, যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্য্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর কঠিনতর দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। উপসংহারে শোকসন্তপ্ত পরিবারদের নিকট একথাও জানাই যে, এ কথা সম্পূর্ণ অবসান হলেও, দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্য উজ্জ্বল দীপ্তি দান করবে।"

সর্ব্বজন-পরিচিত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ভারতীয় কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নিগৃহীত নেতা ও কলিকাতা সহরের এককালীন মেয়র ও সহরবাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক ছিলেন। তিনি বিশেষ অনুরোধ করায়, হিজলি ঘটনা প্রতিবাদকল্পে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণের যে ইংরাজি ভাষায় রূপ দিয়াছিলেন, তাহা ১৯৩১ সালে অক্টোবর সংখ্যা মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাঁহার ইংরাজি উক্তিগুলির সহিত পাঠকদের কিঞ্চিৎ পরিচয় জ্ঞাপন উদ্দেশে উহা পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাজনীতিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একজন চিন্তাশীল সহৃদয় সুলেখক বলিয়া

প্রসিদ্ধ। তবে সময়ে সময়ে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন লইয়া অনেক বাক্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। দেশবাসীর বিপদের দিনে, কখনও ইংরাজিতে কখনও বা বাংলাতে তাঁহার নিভৃত কুঞ্জ হইতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়াছে, এমন কি শাসক সম্প্রদায় কি বিভিন্নদলস্থ রাজনীতিবিদ মনীষী-গণ নত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মস্থলে উপযোগীতা বা তাঁহার যৌক্তিকতা অবলম্বন না করিলেও তাঁহার মর্ম্মকথা এবং স্পষ্টবাদিতায় অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। প্রত্যক্ষ কর্ণধার হইয়া তিনি কখনও কার্য্য করেন নাই, তবে পরোক্ষে প্রভাব-বিস্তারেও কখনও কার্পণ্য করেন নাই। তাঁহার আলোচনা ও সমালোচনা মতদ্বৈধের বহু উপরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জনসঙ্ঘকে আশীষ বাণীর মত উৎসাহিত করিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আচার ও ধর্ম্মে রবীন্দ্রনাথ

শ্রদ্ধাস্পদ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "আমার বোম্বাই প্রবাস" নামক গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠায় একটি ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা মুসলমান ধর্ম্মের একটি শাখা সুফী নামে অভিহিত। এদেশে ইহার প্রচলন খুবই সামান্য এবং গোপনীয় বলিয়া সাধারণ লোক ইহার সহিত ততটা পরিচিত নয়; কিন্তু ধর্ম্মচর্চ্চার ব্যাপারে কেবলমাত্র জ্ঞানচর্চ্চায় প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী সাধক তৃপ্ত থাকিতে পারে না। আচারের কঠোরতা ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাসে দেখা যায়, প্রতিভাশালী সাধকের ব্যক্তিত্ব পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সাধন-প্রণালীতে বিভিন্ন রূপ ও অভিব্যক্তি দিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধন-পথের শেষার্দ্ধে ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাইলেও, তৎ-পদাঙ্ক অনুসরণকারী প্রতিভাবান পুত্রের ব্যক্তিগত সাধনায় ও মতে ভক্তিপ্রাণ রক্ষণশীল পিতাকে এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে। একাধারে কবি এবং মিস্টিক্ হওয়ায়, যে অঙ্কুরে মহর্ষি কেবলমাত্র পত্রোদ্গম আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা [illegible] সম্ভারে লোকের চক্ষু ও মনে তৃপ্তি বিধায়ক শোভাবর্দ্ধন [illegible]। সত্যেন্দ্রবাবুর উক্তি উদ্ধৃত করিলে পাঠক আমাদের [illegible] একটি বহুদিনের প্রচলিত দৃষ্টান্তের সহিত পরিচিত হইবেন [illegible] আশায় নিম্নে কতকটা তুলিয়া দিলাম—

"সিন্ধুদেশের বহুসংখ্যক মুসলমান সুফীপন্থী। [illegible] সুফীধর্ম্মের অনেক প্রভেদ; এমন কি, গোঁড়া মুসলমানেরা সুফীদের [illegible] বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। সুফীমতে ঈশ্বর [illegible]

নাই, জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিকৃতি, পরমাত্মাই উহার চরম গতি। সাদি, হাফেজ প্রভৃতি বড় বড় পারস্য কবি এই ধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। এ ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম,—কবি ইহার পুরোহিত,—আধ্যাত্মিক মদিরা, নৃত্যগীত ইহার পূজোপচার,—সুমন্দ বায়ুসেবিত, পুষ্পসুবাসিত, বিহঙ্গ-কলনাদিত সুরম্য উদ্যান কানন, ইহার ভজনালয়। ভাবুক তার প্রত্যেক বাক্যে অর্থাৎ সে সকল কবিতায় ও গানে গূঢ় অর্থ দেখিতে পান, ইন্দ্রিয় সুখকর সামান্য পদার্থ সকল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এক অপূর্ব্বরাগে রঞ্জিত হয়। সিন্ধুদেশে সুফী সম্প্রদায়ের দুই শাখা জালালী ও জামালী। জালালীরা কতকটা শাক্ত ধরণের লোক—তারা অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান ইত্যাদি দুর্ব্যসনপরবশ, বল্লভী বৈষ্ণবদের মত পুষ্টিমার্গবিহারী। জামালীদের অন্য ভাব। গুরুভক্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, উপোষণ, ভজন-পূজন ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সাধনে তারা অনুরত।"

ভগবৎ প্রেমে সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন বলিয়া ফকিরদের দেওয়ানা বলে। দেওয়ানা হাফেজের অনেক কবিতা মাশুক বা প্রিয়তমকে লক্ষ্য করিয়া রচিত। সুতরাং সাধন-পদ্ধতি কতকটা রণছোড়জি কৃষ্ণের একক অদ্বৈত মূর্ত্তির উপাসকের প্রণালীর অনুরূপ বা রামানুজী সম্প্রদায়ের মত। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সহিত দুর্ব্বল মানবের সম্বন্ধ একাধারে নাথ, রক্ষক এবং সেবকের সেবাগ্রহণদ্বারা তাহাকে কৃতার্থমনা করা, তবে যোগস্থাপন ভগবানের ইচ্ছাধীন। তাই মীরাবাঈ বলিয়াছিলেন—'শ্রীবৃন্দাবনে নন্দলালাই একমাত্র পুরুষ আর সকলেই নারী।' এবং ভজন করিয়া গাহিতেন—

"আমায় চাকর রাখ, চাকর রাখ, চাকর রাখ জী
দয়াল আমায় চাকর রাখ জী।
তোমার ফুলবাড়িতে রইব চাকর
দেখব ফুলের মেলা,
আর ঘুম ভেঙে রোজ দেখব আমি
তোমায় সকাল বেলা।"

মহর্ষিও সেইভাবে নিজের জীবন গঠন করেন এবং সাধারণ জীবকে,

এমন কি কাননের ফুল, তরুলতা ভগবানের প্রিয় অনুভব করিয়া তাহাদের হিতকামনা ভগবানের প্রিয়কার্য্য হইবে স্থিরবিশ্বাসে তাঁহার সাধনায় রত ছিলেন এবং ব্রাহ্মদের নিত্যস্মরণীয় বীজমন্ত্রে "তস্মিন প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" সন্নিবেসিত করেন, কিন্তু সমাজের কাজ হইতে প্রত্যক্ষভাবে যখন নিজেকে বিচ্যুত করিয়া অবসর গ্রহণ করেন, তখনও তাঁহার স্থাপিত সমাজের ও মণ্ডলীভুক্ত ব্রহ্মান্বেষীদের হিতচিন্তা কোনদিনই পরিত্যাগ করেন নাই। নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ও সময়ে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার নিজস্ব অনুভূতির জন্য এবং প্রিয়তমের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে আকুল হইয়া থাকিতেন, বহিঃ-প্রকাশের তখন কোনরূপ প্রেরণা ছিল না, সে সংযোগ একটি বৈষ্ণবী পয়ার দ্বারা আমরা ব্যক্ত করিতে পারি—

"লোকে বলে ছাড় ছাড়
কেমনে ছাড়িগো তায়
পায়ের নূপুর হইয়ে
বাজিব সদা রাঙা পায়।"

খৃষ্টীয় মিসটিকদেরও (Mystic) এইরূপ ভাব। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি এই ভাব সাধনার অনুকূল হইলেও তিনি তাঁহার অন্তর সাধনার ধন প্রাপ্তির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ব্যক্ত করেন নাই বা করিতে পরাঙ্মুখ 'রেখেছ গোপন প্রভু থির মনের নীরে'। তিনি রজোগুণের সাধক, তাই তাঁহার বন্দনা প্রভুকে অর্পণ করেন নৃত্যগানে প্রভুর চরণতলে। [illegible] [illegible] ভেদ করার জন্য তাঁহার নিখিলের আহ্বান তিনি নিত্য শুনিতে পাইয়া থাকেন—

"পূর্ণচন্দ্রে লিপি তব, হে পূর্ণ, পাইয়াছি [illegible]
বসন্ত দোলের নৃত্যে দক্ষিণ বায়ুর আলিঙ্গনে।"

তাঁহার একান্ত কামনা—

"আমার আহ্বান যেন অন্তর্ভেদী তব অন্তর হ'তে
উত্তারি আনিতে পারে নির্ঝরিত রস-সুধা স্রোতে

ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে নৃত্যচ্ছন্দ মন্দাকিনী ধারা
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায় প্রাণহারা।"

রবীন্দ্রনাথ আজীবন আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত, সুতরাং ধরিতে হইবে তাঁহার ধর্ম্ম ও আচার ঐ সমাজের নির্দ্দেশিত মতাবলম্বী। উপরন্তু তিনি তথাকার আচার্য্যপদ বহুকাল অলঙ্কৃত করিয়াছেন এবং ইং ১৮৮৪ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ২৭ বৎসর আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন এবং ঐ সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা ১৯১১ সালের সংখ্যা হইতে ১৯১৫ সালের সংখ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার সুদক্ষ চালনে ও সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। তত্রাচ তাঁহার মতামত ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার ব্যক্তিগত মত ও ভাব আদি সমাজের প্রবর্ত্তিত মতাবলীর সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, ইহার কারণ আমরা কতকটা উপরে নির্দ্দেশ করিয়াছি। দেবেন্দ্রনাথের মনোভাব ও একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম এবং উপাসনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে সময়ে সময়ে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু তিনি নামরূপের মধ্যদিয়া 'ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলম্' যে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে কঠোর গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ উপনিষদীয় ভাব ও ভাষার ফাঁকে ফাঁকে যেন 'নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা', ইংরেজের কবিতা, মেঘদূত, কুমারসম্ভবের শ্লোক, পৌরাণিক মহাভারতীয় উক্তি এবং শ্রীমদ্ ভাগবতীয় ভাবের প্রত্যুক্তি তাঁহার অমৃতরস আস্বাদনে পুত্রবিত্ত হইতে প্রিয়তর ব্রহ্মের অহরহ ব্যাপিয়া সংযোগের প্রয়াস, এবং কোমল প্রকৃতির পরিচয় আমরা বিশেষ করিয়া পাইয়া থাকি। তিনি যে জ্ঞানপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রেমপথের যাত্রী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অসতর্ক মুহূর্ত্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসগুলি হইতে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক নহেন—ধর্ম্ম মানেন। তাঁহার ভগবান 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। নানাকর্ম্মের মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া জীবনে পূর্ণ

পরিণতি লাভ করিতে তিনি যত্নবান। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।" তিনি "সুন্দরের হাতে চান আনন্দে একান্ত পরাভব"। তাই বলেন—

"ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী—
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল কোলাহল আনি মোর গান হানি।"

আবার অন্য প্রয়োজনও 'পূরবী'তে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্রদর্পে খল খল ওঠে অট্ট হাসি
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে, মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিত হাস্য
বিকসিত লাজ;
সেদিন কবিরে ডাক বিবাহের যাত্রা-পথ-তলে,
পুষ্পমাল্য মাঙ্গল্যের সাজি ল'য়ে সপ্তর্ষির দলে,
কবি সঙ্গে চলে।"

তারপর 'নটরাজের ঋতুরঙ্গশালা'র দ্বার উদ্ঘাটন হয়। তাঁহার বাঁধন খোলার শিক্ষা আরম্ভ হয় "মহাকালের বিপুল নাচে"। তাই তিনি লোককে ডাকিয়া বলেন,—

"প্রাণের মুক্তি মৃত্যু রথে
নূতন প্রাণের যাত্রা পথে
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূত্রে
নিত্য-বোনা চিন্তা-জালে;
শুনবি রে আয় কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে
নদীর মুক্তি আত্মহারা—
নৃত্য ধারার তালে তালে।"

সাবেকী কবিগণের মত তারপর একটু আত্মপরিচয় বা ভণিতা দিয়াছেন—

"রবির মুক্তি দেখনা চেয়ে
আলোক জাগার নাচন গেয়ে
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।"

তাঁহার দয়িত তাঁহার কাছে শুধু বাঁশি লইয়া আসেন না, তরবারিও রাখিয়া যান—

"এযে মালা নয় এযে তোমার তরবারি
ভেবেছিনু চেয়ে নেব চাইনি সাহস করে।"

পরে কিন্তু সে সাহস তাঁহার আসিয়াছিল, তাই অম্লান বদনে শুনাইলেন,—

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য কর দহন দানে।" (গীতালি)

* * * *

"সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত
খড়্গ তোমার, হে বজ্রপাণি
চরম শোভায় রচিত।" (গীতিমাল্য)

[illegible] ইন্দ্রিয়ই চবিতার্থ করা প্রয়োজন, তাই—

"বক্ষে তোমার বাজে বাঁশী
সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথা
শান্তি সুমহান॥"

বলাকায় ইহা আরো সুস্পষ্ট, অধিকতর ক্রিয়াশীল (more active) ও প্রকৃত শক্তিবাদী—

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণ-সজ্জা
ব্যাঘাত আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অচল রব
বক্ষে আমার দুঃখে বাজে
তোমার জয়-ডঙ্ক
দেব সকল শক্তি লব
অভয় তব শঙ্খ।"

Cf. মার্কণ্ডেয় চণ্ডিতে দেবতার আয়ুধ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা—

"দৈত্যানাং দেহ নাশায় ভক্তানামভয়াচ
ধারয়স্ত্বায়ুধা নিতং দেবেনাঞ্চ হিতায় বৈ।"

এই অভয় আশ্বাস গ্রহণ ও সংগ্রামের জন্য সহিষ্ণুতা প্রয়োজন [illegible] কবি টেনিসন লেখেন—

"God is law, say the wise, O Soul
and let us rejoice,
For if He thunder by law
the thunder is yet His voice.
Speak to Him then, for He hears
and spirit with spirit may meet
Closer is He than breathing
and nearer than hands and feet."

অষ্টাদশ শতাব্দিতে Pope কিন্তু একটা সর্বশক্তি [illegible] নাই, তবু কাছাকাছি গিয়াছিলেন আর সর্ব্ব [illegible] লিখিয়া গিয়াছেন—

"All are but parts of one stupendous whole
Whose body Nature is and God the Soul

* * * *

All discord, harmony not understood
All partial evil, universal good."

আর সাধারণ মানুষ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উদার ভাবে জীবন যাপন করিবে, ইহাই সাধু ব্যক্তির আদর্শ রাখিতে হইবে, সকল সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ব অবলোকন পূর্ব্বক, তাহারই মধ্য দিয়া জগতস্রষ্টার সহিত যোগ রক্ষা করা তাহার ধর্ম্ম—

"Slave to no sect, who takes no private road
But looks through Nature up to nature's God."
(Pope's Essay on Man)

এই সত্য উপলব্ধি ও বহিঃপ্রকাশ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে বিশেষভাবে স্থান পাইলেও, তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে প্রদত্ত ভাষণে ও ঐ সমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অঙ্কেও কিছু কিছু পাওয়া যায়, যদিচ অনেক স্থলে আদি ব্রাহ্মসমাজের Creed and faith বিশ্বসনীয় মত ও উপাসনা-প্রণালীর সহিত ঐক্য হয় না। তাঁহার গানগুলি এক্ষণে তথাকার উপাসনার অঙ্গ। নানা ছন্দে নানা সুরে কেবল তাঁহারই গানে সমাজ ছাইয়া গিয়াছে। অতএব মহর্ষি-প্রবর্ত্তিত অপৌত্তলিক উপাসনা-প্রণালী পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মণ্ডলী তাহাতে ঐশ্বর্য্যে ও আভিজাত্যে লাভবান ও সমুন্নত হইয়াছে, ইহাও নিঃসংশয়ে বলা চলে। এই গীত-মালিকা অবলম্বনে কবি স্বয়ং এমন নয়, বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা পাইয়াছেন, এবং সুফীদের মত তাহাদের নিজস্ব সাধনার অঙ্গ করিয়াছেন।

কবির ভাষাতেই বলি :—

"গান গাওয়া মোর সেই মিলনের খেলা
তোমার গানের ছন্দে আমার স্বপন পাখা মেলা
আজি আমার সুরের মাঝে
দূরের ডানার শব্দ বাজে
মেঘের পথিক গানে আমার এল প্রাণের কূলে
বিরহেরি আকাশ তলে নিল আমার তুলে।"

তাহাই যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহা যথেষ্ট বিনয় সহকারে তিনি নিম্নলিখিত গানে বলিয়াছেন :—

"রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী
বেলা শেষের তান
পথ চ'লতে শুধায় পথিক
কী নিলি তোর দান ?"

কবি উত্তর দিতেছেন—

বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়
তাঁরি গলার মাল্য করে
করবো মূল্যবান।

(গীতিমাল্য—'উপহার' নামক কবিতা)

ইহার পরেও, পুনরায় তিনি বার্দ্ধক্যে 'প্রণতি' জ্ঞাপন করিতে, নিম্নলিখিত উচ্ছ্বাস দিয়াছেন, যাহা তাঁহার দেশবাসীর ও স্বসমাজীয়গণের নিত্য আরাধনায় বিশেষ উপকারে লাগিবে—

"আজি যবে দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাবো দান
তব জয় গান।
কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠেনি জ্বলি
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টীকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।
এবার তোমার আগমন
হোমহুতাশন জ্বেলেছে গোপনে
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে
আমার আহুতি দিন শেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে
লহ এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি 'পরে
স্পর্শ রাখিয়ো স্নেহভরে
তোমার ঐশ্বর্য মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে
করিয়ো আহ্বান
সেথা এ প্রণতি মোর
পায় যেন স্থান।"

কবির বাল্যকালে রচিত পারমার্থিক কবিতা জানিয়া মহর্ষি একদিন

হাসিয়াছিলেন, কিন্তু ভরা-যৌবনে কবির মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত নিম্ন-লিখিত গানটি শুনিয়া মহর্ষিদেব প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সে সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা ও সাহিত্য বুঝিত, তাহা হইলে কবিকে তাহারা নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করিত, কিন্তু যখন রাজার দিক হইতে সে সম্ভাবনা নাই, তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্ম্মচারীকে চেক্ বহি আনিতে বলেন ও কবির হাতে একখানি ৫০০৲ শত টাকার চেক্ দিয়া তিনি তৃপ্তি লাভ করেন। গানটি এই—

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত,
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত,
জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ ,
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাহি আর।
সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার
কাল পারাবার করিতেছ পার
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু আছ তাই আমি আছি,
তুমি প্রাণময়—তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমা' আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর ;
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই
কোন বাধা নাই ভুবনে।"

উপনিষদের অবিকল প্রতিধ্বনি থাকায় মহর্ষির এই গীতটি এত ভাল লাগিয়াছিল। নিম্ন প্রদর্শিত গানটি কিন্তু তাঁহার প্রাণের কথার সায় দেওয়ায় সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়াছিলেন ও স্বীয় আত্মচরিতে গৌরবের আসন দিয়াছেন—

"পরিপূর্ণ জ্ঞানময়!
নিত্য নব সত্য তব, শুভ্র আলোকময়
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত আকাশে।

রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি
চাহিয়া উদয় দিশি, উর্দ্ধমুখে করপুটে
নব সুখ নব প্রাণ নব দিবা আশে।
কি দেখিব কি জানিব
নাজানি সে কি আনন্দ
নূতন আলোক আপন মন মাঝে!
সে আলোকে মহাসুখে
আপনি আলয় মুখে
চলে যাব গান গাহি;
কে রহিবে আর দূর পরবাসে।"

এটা রবীন্দ্রনাথের রচনা হইলেও ঠিক তাঁহার মনোভাবের গান নহে, প্রচলিত হিন্দু ধারণার অনুরূপ। "নূতন আলোক আপন মনমাঝে" উচ্চস্তরের বেদান্তের ভাব এবং "Hail holy light offspring of heaven may I express the unblamed" পাশ্চাত্যগণের মনোভাব যাহা মিলটন্ ঐ সুললিত উক্তিতে ব্যক্ত করেন। এদেশের স্থির প্রতীতি —এ ধাম যতই ভোগসম্পদে আনন্দদায়ক হউক, সাধকের প্রীতিবর্দ্ধক না হইয়া তাঁহার মনকে বাড়ি ফিরিবার জন্য ব্যস্ত রাখে। 'পুনরপি মরণং পুনরপি জননং জননীজঠরে পুনরপি গমনং' এ দেশের [illegible] সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত করে। ইউরোপেও "Vale of Tears," [illegible] Chordia', 'Eldolore' হইতে অব্যাহতি ও পরিত্রাণের [illegible] সাধুরা মিলেনিয়াম 'Millenium' এর প্রতীক্ষা করি[illegible] 'Home-comming-এর জন্য ব্যস্ত থাকেন। এই 'Home [illegible] পাশ্চাত্য Mysticরা 'Nostalgia' নাম দিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের Philosophyর কিছু কিছু [illegible] মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। অধিকন্তু তিনি এ [illegible] জীবনকে প্রায়শ্চিত্তের কারণ বা 'Land of Penitence' [illegible]

অনিচ্ছুক। তাঁহার মতে অভিজ্ঞতা ও সহনশীলতাই মানবকে উন্নততর জীবনের বা ব্রহ্মলোকের উপযোগী করে, সুতরাং যাইবার ত্বরাটা তিনি অশোভন মনে করেন। অধিকার-প্রাপ্তিটাই পরম লক্ষ্য থাকা উচিত। "First deserve, then desire'. ভগবানে মতি রাখিয়া ভোগের শক্তি, জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জ্জন করার মধ্যেই আত্মবিকাশের অবসর, বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া আত্মবিকাশটাই যেন তাঁর আকাঙ্খা। তাহার প্রেরণা প্রত্যেকের পক্ষে স্বতন্ত্র, স্থির চিত্তে সেই অন্তরের মানুষের যাহা প্রেয় ও শ্রেয় বোধ হইবে তাহা ধরিয়া চলাই ধর্ম্ম—

"আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।"

ব্যর্থতা ত স্বাভাবিক এবং জাগতিক ব্যাপারে আবশ্যক, তাই—

"দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।" (গীতাঞ্জলি)

এই সকল পুরুষকারবাদী আত্মান্বেষীরও মাঝে মাঝে একটু Nostalgia আসিয়াছিল। 'বাড়ি ফেরার' দিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন :

"ছিন্ন ক'রে লও হে মোরে
আর বিলম্ব নয়
ধুলায় পাছে ঝরে পড়ি
এই জাগে মোর ভয়

* * *

যে টুকু এর রং ধরেছে
গন্ধে সুধায় বুক ভরেছে
তোমার সেবায় লও সেটুকু
থাকতে সুসময়
ছিন্ন করো ছিন্ন করো
আর বিলম্ব নয়।"

ইহার ভিতর নিখিলবাসী মানবের সাধারণ কামনা ও আতঙ্কই যেন বিদ্যমান। "হে ঠাকুর, আমায় পড়ো ক'রো না, পরবশ ক'রো না, হাত পা চোখ কান থাকতে থাকতেই যেন যেতে পারি।' উপরে উদ্ধৃত গীতটি ইহারই পোষাকী রূপ—যেন দুঃখের রাত আসিবার পূর্ব্বে অস্তায়মান দিনমণি পূর্ণ গৌরবে ও বর্ণ ছটায় যশের সুতুঙ্গ শিখরেই অবলুপ্ত হয়।" সাধারণে আক্ষেপ করে যে ইহা অকাল মৃত্যু, কিন্তু ইহা কবিরই কামনা। উপরন্তু এই কবিতাটির শেষভাগে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মবিশ্বাসের একটি স্তরভূমির সন্ধান আমরা পাই—অমূর্ত্তের উপাসনা কল্পনা আর নাই—

"এ ফুল তোমার মালার মাঝে
ঠাঁই পাবে কি জানিনা যে
তবু তোমার আঘাতটি তার
ভাগ্যে যেন রয়।"

কিন্তু, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশেষত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি পণ্ডিত-গণের আধুনিক বিজ্ঞান অনুমোদিত তাহার ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াসে তাঁহার আস্থা ছিল না, তাহা তাঁহার—তাঁহাদের অভ্যুদয়কালীন রচনাদি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজি শিক্ষার উহা যে একটা Reaction বা প্রতিক্রিয়া, এইরূপই আভাষ যেন তাঁহার বক্তব্য। আচারের গণ্ডি দিয়া সনাতনী হিন্দুরা যে "অচলায়তন" গড়িয়া তুলিয়াছেন, [illegible] ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই সর্ব্বথা যত্নবান—

"যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালুরাশি
বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাহি গ্রাসি
পৌরুষেরে করেনা শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৫ কল্প প্রথমভাগ, জ্যৈষ্ঠ, [illegible] ৪০ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রের এক ভায়ের বিবাহ সম্বন্ধে যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

মাননীয় বসুমতী-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, (৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)

আপনি আপনার গত সপ্তাহের বসুমতী পত্রে কুচবিহারের রাজকুমারীর সহিত শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের বিবাহ প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার নেতা, পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এ বিবাহে সম্মতি আছে ইহা অনুমান করিয়া বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

জ্যোৎস্নানাথের বিবাহ লইয়া যখন সংবাদপত্রে আন্দোলন উঠিয়াছে, তখন আমি বাধ্য হইয়া আপনার ও আপনার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে এই অসবর্ণ বিবাহে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের বা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বা তাঁহার পরিবারবর্গের কাহারও সহানুভূতি বা অনুমোদন নাই। অধিকন্তু ইহাতে মহর্ষিদেব অত্যধিক ব্যথিত। আমি এ বিষয়ে আর অধিক না বলিয়া জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল গত ১২ই এপ্রিল মহর্ষিকে যে পত্র লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

* * * *

'কুচবিহারের মহারাজার কন্যার সহিত বিবাহে সম্মত হইয়াছি বলিয়া মহাশয় আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। * * * মহাশয় হিন্দুসমাজের সহিত যোগ রাখিবার মানসে বিবাহাদি সামাজিক সংস্কার সম্বন্ধে যেরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত ছিলাম। সুতরাং জানিতাম যে এরূপ প্রস্তাবে আপনার পক্ষে সহানুভূতি প্রদর্শন করা সম্ভবও নহে, সুযুক্তিও নহে। * * * সাধারণে অবশ্যই জানে যে আমি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, তাহা ছাড়া তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে আমার পরিবারের কেহই, এমন কি আমার পিতামাতাও এ বিবাহের সহিত কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখিতেছেন না, তখন তাহারা ইহার জন্য পরিবারের আর

কাহাকেও দায়ী করিতে পারিবে না। * * * আমাদের পরিবারের সহিত সেরূপ ঘনিষ্ঠ সামাজিক বন্ধন রক্ষিত হইবার আমি আশা রাখি না, কারণ তাহাতে কতক পরিমাণে পরিবারের ক্ষতির কারণ হইতে পারে।

* * * * * *

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল।"

আদি ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী

কলিকাতা। (বসুমতী হইতে উদ্ধৃত)

ইহার পূর্ব্বেও মহর্ষির কোনও পুত্রকন্যার সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পরিবারস্থ কাহারও বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় মহর্ষির বর্ণবিচার সমর্থন কেশবচন্দ্রকে মর্ম্মাহত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে পূর্ব্বাপর প্রচলিত ভৌগোলিক ব্যবধান অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান সময় ও অবস্থায় শ্রেণী নির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণের বিবাহ-প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মহর্ষি মনে করিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতির সহিত অনুলোম বা প্রতিলোম বিবাহ তিনি অকর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিতেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইহা [illegible] মতদ্বৈধের হেতু।

যখন তাঁহার পৌত্র বলেন্দ্রের বিধবা পত্নীর বিবাহ দিবার জন্য বলেন্দ্রের শ্বশুরপক্ষ আয়োজন করেন, তখন মহর্ষি সে বিবাহে [illegible] করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া বলেন্দ্রের স্ত্রীকে উত্তর-পশ্চিম [illegible] কলিকাতায় নিজ বাটিতে লইয়া আসেন। তথায় আজীবন তিনি [illegible] বিধবার প্রচলিত আচারে দিন যাপন করেন। [illegible] পিতার এই বাসনা পূরণার্থ স্বয়ং এ দৌত্যকার্য্যে [illegible] করেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এরূপ [illegible] ফেলিয়া কেবল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যার বিবাহে এবং মহর্ষির [illegible] পর তাঁহার

পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিবাহে তাঁহার পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্য্য-প্রণালী রক্ষণশীল (conservative) পিতার উদার মতাবলম্বী (liberal) পুত্র দেখিয়া বলিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ পিতা অপেক্ষা সামাজিক আচরণে ভিন্ন প্রগতিশীল হইয়া তাঁহাদের শাখার বৈশিষ্ট্য খর্ব্ব করিয়াছেন।

ধর্ম্মে বল, সমাজে বল— কিছুরই কোন বিশিষ্টতা তিনি গ্রাহ্য করেন না। তিনি চলা এবং আগে চলার পক্ষপাতী, তা যেখানেই হউক। যাযাবর জাতির কাছে গতির মর্য্যাদাই পরিস্ফুট, স্থিতির কিছুই মূল্য নাই। এ যাযাবর সংস্কার ইউরোপে বদ্ধমূল—হিন্দুর নিকট গতি ও স্থিতি, উভয়েরই মর্য্যাদা আছে। তাই হিন্দুর স্থিতির দেবতা বিষ্ণুর অঙ্কে সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার দেবী চঞ্চলা লক্ষ্মী বিরাজমানা। রবীন্দ্রনাথের কাছে গতি জীবন, স্থিতি জড়ত্ব। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে ইউরোপের শিষ্য এবং কার্য্যকলাপে এখানে শিষ্য বিদ্যা গরীয়সী। কাজেই কবি গাহিয়াছেন—

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।
বর্শা হাতে ভরসা প্রাণে চলেছি নিশিদিন॥"

আমরা কিন্তু এ সম্বন্ধে একজন চিন্তাশীল সমালোচক কি বলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

" . . . এটা জড়ত্বের পরিচায়ক, ওটা প্রাণের পরিচায়ক—এসব নিতান্ত সাধারণ পাশ্চাত্য বুকনি, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যপুষ্ট বাঙ্গালীর মুখে শোভা পায় না। যে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা জড় ও জীবনের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ঘুচাইবার জন্য একান্ত সাধনা করিয়াছিল, বিধি-ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া কর্ম্মকাণ্ডে ছক দিয়া জীবনটাকে একটা বিরাট যজ্ঞাহুতিতে পরিণত করিয়াছিল, রবিবাবুর বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসকে তুচ্ছ মনে করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছিল 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়!' উপনিষদের বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত গীতার

পৌরাণিক যুগ পর্য্যন্ত কর্ম্মকথা প্রচার করিয়া আসিয়াছিল সেই ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার শেষ কথা এখনও বলা হয় নাই। নানা ঐতিহাসিক কারণে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা সাধারণ্যের মাঝখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিচিত্র আচার ও বিধি-ব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে হোমাগ্নি জ্বালিয়া রাখিয়াছে; জগতের নাগরিকগণের কলকোলাহল সেখানে পৌঁছায় নাই। হয়ত, সে বাহিরের কোনও সংবাদ রাখে নাই; কিন্তু সে ঐ আচার ও বিধি-ব্যবস্থার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একদিন ভারতবর্ষের স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা দীক্ষার ভার ভারতবাসীকে লইতে হইবে। তখন আচার ও বিধি-ব্যবস্থা অনায়াসেই রূপান্তরিত হইবে। ওগুলা তো বহিরাবরণ। পুরাতন আচার ও বিধি-ব্যবস্থার দিন ফুরাইলে কিন্তু নূতন আচার ও বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কখনও স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার চরম বাণী উদ্গীরিত হইবে না।"

অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত।

পায়ে-পায়ে-চলা পথের মহিমা প্রায় সকল সভ্য জাতিই স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বানুসৃত পন্থা সময়ে সময়ে সংকীর্ণ, পিচ্ছিল ও কষ্টকর হইলেও দুর্গম কাননে দিক নির্ণয়ের অসুবিধা হইতে মানবকে বাঁচায়। প্রত্যেককেই নিজ নিজ বুদ্ধি ও শক্তির বলে চলিতে হয়। জনারণ্যে সংসারের গতিতে অনেক সময় ভাবিবার সময় বা পথনির্দ্দেশক [illegible] সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না এবং পাইলেও সকলের পক্ষে নিজের শক্তির আলোড়ন করিয়া নূতন পথ আবিষ্কার করাও সুসাধ্য নয় [illegible] নিঃসংশয়ে যাত্রা করিয়া পরিণামে [illegible] সন্ধানও সুনিশ্চিত [illegible] মনীষীগণের উদ্ভাবিত পূর্ব্বাচরিত পথে বহুকাল জনসঙ্ঘের [illegible] অধিক-সংখ্যক ব্যক্তির অনুমোদনের একটা ছাপের জোরেই [illegible] গন্তব্যপথে অনেকটা অকুতোভয়তা ও একপ্রকার নিশ্চয়তাও [illegible] দিয়া থাকে। কবির মতে গতানুগতিক অনুসরণে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের অবকাশ থাকে না, সেইজন্য স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী কবি, তাহাকে একপ্রকার

শৃঙ্খল বিবেচনা করেন ও মুক্তিকামী মুক্তিপ্রয়াসী আত্মার দূরগত লক্ষ্যের অন্তরায় স্থির করিয়া, বলিতে উদ্যত হন—

"ডুবেলা মরার আগে আমি মরব না গো মরব না"

বা

"ছড়িয়ে গেছে সূতা ছিঁড়ে, তাই খুঁটে কি মরব কিরে ?

আমি ভাঙ্গা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি বেড়া ঘিরব না আর ঘিরব না।"

ব্যাপক ও সমষ্টিভাবে মনকে সকল বিষয় অনুধাবন করিতে শিক্ষিত করিয়াও দেখেন যে শৃঙ্খল পায়ে পায়ে জড়াইয়া থাকে এবং তাহা ভাঙ্গিবার অনতিকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং বহুদূর অবধি তাহাকে বহিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়। তাহাতে কত না প্রতীক্ষা ও ধীরতার আবশ্যক। চেষ্টার দাপটে শিকল ছিঁড়েনা, অনেকস্থলে টন্‌টনানি ও ঝন্‌ঝনানি বাড়ে। শামুকের কঠিন খোলা ভেদ করিয়া বহিরাকাশের সহিত তাহার যোগ কখনও কখনও সম্ভবপর হয়, সহজাত অধিকার-বলে। সাপেরও মধ্যে মধ্যে নির্ম্মোক ত্যাগ স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে সামাজিক সংস্কারের আবরণ কথঞ্চিৎ ত্যাগ বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা তাদৃশ সহজ ও স্বাস্থ্যকর নহে, কারণ সঞ্চিত স্মৃতির মধ্যে যে মানবতা নিবদ্ধ, তাহার অস্তিত্বকে সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি প্রসারিত করা তাহার শ্রেয় কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং আবাল্য অর্জ্জিত সংস্কারই তাহার স্বাতন্ত্র্য ও বিভেদ রক্ষা করিবার উপায়। জগৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব, মনস, জ্ঞান ও কার্য্য, পশুভাব, নরভাব ও দেবভাবের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য বলিয়া পূর্ব্বাপর স্থিরীকৃত হইয়া আছে। সেই, তাঁহার উপাসনাতত্ত্বে হৃদয়ের প্রশস্ততা আনয়ন ও নিজেকে মনের সাহায্যে দেহাত্মভাবের অতীত অবস্থায় অবস্থান জন্য সাধকদের সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে কতক সংস্কার অর্জ্জন ও কতক সংস্কার বর্জ্জনের ব্যবস্থা ও উপায় নির্দ্ধারিত আছে। মোটের উপর, দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের মাপকাঠিতে তাঁহাদের শেষ বিচার হয়। তবে চলিবার পথেও সাধকের চিত্তবৃত্তির

পরিপোষণের জন্য সংস্কার ও আবেষ্টনের কমবেশী অদল বদল করিবার বিধি আছে। যথাযথ বিধি ও তাহার ক্রমের উল্লঙ্ঘন করা সাধকের নিজের বিবেক ও ধারণাশক্তির বৃদ্ধির উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু ইহা ব্যক্তিগত। সমষ্টিগত হিসাবে যোগ্যতর ব্যক্তিকেও কনিষ্ঠের পদচারণ-ক্ষমতা অনুসারে নিজের পদক্ষেপকে খাট করিয়া লইতে হয়, নতুবা এক-সঙ্গে চলার ব্যাঘাত ঘটে। হয়ত এইখানেই তাঁহাদের ঔদার্য্য। তাই হয়ত নিরাকার পরমব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া এবং ঋষিতুল্য পিতার নির্দ্দেশ অনুসারে ও উৎসাহে বর্দ্ধিত রবীন্দ্রনাথ সাধন-পথের শেষ সীমায় দেখেন "রসো বৈ সঃ"। তাহারই প্রকৃত উপলব্ধি করিতে যাইয়া বহুর মধ্যে একের ক্রিয়া বৈচিত্র্য ও রসের অনুপ্রাণতায় চমকিত হইয়া কল-বাহিনীর নদীর মত রৌদ্রসমুজ্জ্বল নৃত্য ভঙ্গিতে বহুতর ক্ষুদ্র বৃহৎ সামাজিক উপলখণ্ড নিজের মনমোহন লিপি-কুশলতায় ঢাকিয়া অঝোর ধারায় শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রূপসায়রে পরম স্নেহময়ের মুখচ্ছবি অবলোকন করিয়া শতছিদ্র মর্ত্তজীবনের অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার স্বরূপকে পরিচ্ছিন্ন আবেষ্টনে নিবিড়ভাবে পাইয়া আনন্দস্বরে বলিয়া উঠিয়াছেন—"হৃদয় আমার চায় যে দিতে শুধুই নিতে নয়।" [illegible] বাঙ্ময় অর্চ্চনায় আর পরিতৃপ্তি হয় না, সকল ইন্দ্রিয়ের [illegible] প্রাণের সহিত অঙ্গাঙ্গী মিলনের কাতরতায় শুনাইলেন···

> "মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও,
>
> শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়।"

এ যেন গঙ্গার পূজা গঙ্গার জলে। প্রভুর মন-[illegible] কিঙ্কর, মাত্র গুছাইয়া আগাইয়া দিয়া, তাঁহার [illegible] নেশায় বিবিধ উপচারের সন্ধান লইতে হয়: অর্ঘ্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, প্রণাম, প্রদক্ষিণ—কোনটিই যেন বাদ না পড়ে। [illegible] কোথায় কোন অংশে ত্রুটি না হয়। স্তব, [illegible]

কথা, ছন্দ, গানে, উঠাবসায়, যতবার পারা যায় উল্টাইয়া পাল্টাইয়া 'মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে'। কবিবর বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—

"অন্তরে যা দিবার ছিল
মিলিছে এক হয়ে
চরণে তব গোপনে তার গতি।
বাহিরে তুমি নিলে না মোরে
দিবস গেল বয়ে
তাহাতে মোর যা হয় হোক্ ক্ষতি।
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল
ভরিল তব ডালি
গন্ধভরা বন্দনাতে
দিয়েছি ধূপ জ্বালি।
প্রদীপ ছিল মলিন শিখা
ধোঁয়াতে ছিল কালী
দীপ্ত হয়ে উঠিছে তার জ্যোতি।
ব্যথার মম তোমারি ছায়া
পড়িছে মোর প্রাণে,
বিরহ হানি' তোমারি বাণী
মিলিছে মোর গানে।
অলখ স্রোতে ভাবনা ধার
তোমার তটপানে
এপার হ'তে বহিয়া মোর নতি।
যে বীণা তব মন্দিরেতে
বাজেনি তানে তানে
চরণে তব নীরবে তার গতি॥"

রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত নিছক অপৌত্তলিকতার গণ্ডি যেন রসাস্ফূর্তিবিশিষ্ট হৃদয়বান কবিকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। তাই, বোধহয় "অশেষের সখার প্রণয় ডোরে তুমি ধন্য ধন্য হে" মুখে বলিলেও কবি সম্ভ্রমবোধের শান্তিশয্যা কোথাও কলহান্তরিতা বা খণ্ডিতার মানের কোঠায় ইষ্টের প্রাণেশ্বরের প্রতি অনুরূপ সম্ভাষণের অনুরূপ সম্ভাষণ প্রয়োগ বা অবহেলার দোষারোপে ব্যথা নিবেদন করিতে সক্ষম হন নাই। "কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে হেরিতে দেয় না" বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এ যেন খৃষ্টীয় প্রচারকের অনুতাপবিদ্ধ সাধনার মত। নিজের পরিচ্ছিন্নতা, মূঢ়তা, দুরদৃষ্টতা, অবাধ্যতা ও বদ্ধতাজ্ঞাপক আরাধনা। বৈষ্ণবের দীনতায় রঞ্জিত হইলেও বেদান্তের 'অয়মেব স্ব—'এর প্রশস্ত ও উচ্চতর ভূমির উপর হইতে ইহা উক্ত নয়, কাজেই মর্ম্মসখার লীলামাধুর্য্য এবং মান অভিমানের তাদৃশ স্থান নাই। বিরহের তীব্র জ্বালা যেন তেমন

পরিস্ফুট হয় নাই। মিলনের কল্পনা ও প্রোষিত ভর্তৃকার ভাবি আনন্দই প্রবল। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের সুযোগ নাই—

"নাথ তুমি এস ধীরে
সুখ দুখ হাসি নয়ন নীরে।
রহ আমার জীবন ঘিরে
সংসারে সর্ব্বকাজে।
ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ
জাগি অহরহ—"

বলিলেও পুরুষকারবাদী কর্ম্মযোগী রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই ভজন বিলাসী বা তাহাদের পক্ষপাতী নহেন। প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতিকে তিনি কতকটা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। কোনও বৈষ্ণবভাবাপন্ন মহিলাকে তাঁহার লিখিত পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাংলাদেশে আমরা শাক্ত কিংবা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মুখ্যত রস সম্ভোগ করতে চাই। হৃদয়াবেগের মধ্যে তলিয়ে যাওয়াকেই সাধনার সার্থকতা মনে করি। এ'কে আধ্যাত্মিক বিলাস বলা যেতে পারে। সব রকম বিলাসের মধ্যেই বিকারের সম্ভাবনা আছে।

* * *

মানুষের মধ্যে যে-দেবতার আবির্ভাব তার সঙ্গে ব্যবহারে পূর্ণ মানুষ হতে হবে। মাদুরার দেবতা মানুষেরই গায়ের অলঙ্কার হরণ করে নিয়ে মানুষের দেবতাকে বঞ্চিত করে। ঠাকুরকে এই রকম অলঙ্কার দিলে হৃদয়ের তৃপ্তি হয় মানি, কিন্তু ঠাকুরকে কেবলমাত্র হৃদয় তৃপ্তির উপকরণ করলে তাঁকে ছোট করা হয়, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধকে সংকীর্ণ অসম্পূর্ণ করা হয়।

* * *

তোমার ভালবাসা যেখানে জ্ঞানে কর্ম্মে ত্যাগে তপস্যায় যোগে [illegible] পূর্ণ সেইখানেই তোমার পরিত্রাণ। যে-সেবা সর্ব্বাঙ্গীনভাবে সত্য এবং

যে-সেবায় তোমার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ সত্য হ'তে পারে সেইখানেই আনন্দ—সে-আনন্দ দুঃখকে স্বীকার ক'রে, তাকে এড়িয়ে নয়।"

(দ্রষ্টব্য—প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৮)

তাই, স্বজাতীয়গণকে উদ্বুদ্ধ করিতে 'গীতাঞ্জলী'তে তারস্বরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে, কেন আছিস ওরে—
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে।
রাখরে ধ্যান থাকরে ফুলের ডালি
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক্ ধূলা বালি।
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে
তাঁরি মতন শুচিবসন ছাড়ি, আয় রে ধূলার পরে।"

বৈষ্ণব প্রবর্ত্তিত ধুলোটের-আনন্দমেলা-উৎসব হইতে ইহা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

বিংশ শতাব্দীর মানবতা-পেষনকারী যন্ত্র সভ্যতার বিরুদ্ধে কবি 'রক্তকরবী'—হোমযাগে বিশ্ববাসীকে অস্তরূপ প্রাণানন্দদায়ক জনহিতকর কার্য্যে মঙ্গল শঙ্খের তূর্য্য নিনাদে আহ্বান করিয়াছেন। বিরাট কর্ম্ম মানুষের গৌরবজনক ও তাহার আশ্রিত জনগণ তাহার বিরাটত্ব ও মহান কার্য্যের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া সার্থকতা অনুভব করিতে পারে যদি তাহার সূক্ষ্ম নীতিবোধ এবং অন্তরের শৃঙ্খলা-সৌন্দর্য্যের আকাঙ্খা সজ্জন ও অবাহত থাকে। বাধ্যতামূলক অন্যায়ের তীক্ষ্ণ শর তাহাকে সহজ উদাসীনতার মধ্যে উত্ত্যক্ত না করে। এই অন্তরের ধর্ম্ম রবীন্দ্রনাথকে সর্ব্বদাই চালিত করে; তাই সাধনাবিলাসী কোন মহিলাকে তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা জানাইয়াছেন ও কর্ম্মের মহৎ-তত্ত্বের উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন—

"যে গভীর উপলব্ধির ভিতর দিয়ে তুমি গিয়েচ সেটা আমার জানতে ভালই লাগচে। আমার মনে পড়চে আমিও একসময়ে অত্যন্তই যে

সাধনাকে অবলম্বন করেছিলুম তার মধ্যে ভাবরসের অংশই ছিল প্রধান—সংসার থেকে হৃদয়ের যে তৃপ্তি যথেষ্ট পাওয়া যায়নি সেইটেকেই অন্তরের মধ্যে মথন ক'রে তোলবার চেষ্টায় ছিলুম। কিছুদিন সেই রস-স্রোতে গা-ঢালান দিয়েচি। কিন্তু সত্য তো কেবলি রসো বৈ সঃ নন, তাই একসময়ে আমার ধিক্কার এল—সেই নিমজ্জন দশা থেকে তীরে ওঠাকেই মুক্তি ব'লে বুঝলুম। ভাবের মধ্যে সম্ভোগ, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে তপস্যা। এই তপস্যায় সেই মহাপুরুষের আহ্বান, যাঁকে ঋষি বলেচেন 'এস দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা।' তিনি কেবল বিশ্বরস এবং বিশ্বরূপ নন কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মে যোগ দিতে গেলেই বিশুদ্ধ হ'তে হয়, বীর্য্যবান হ'তে হয়, জ্ঞানী হ'তে হয়। বিশুদ্ধ কর্ম্মে সত্য সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হন—জ্ঞানে, রসে, তেজে—পূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা সত্যকর্ম্মে, বিশ্বকর্ম্মে।"

(দ্রষ্টব্য—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮)

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথের জীবনে, লেখায় ও গীতাবলীতে যে দ্বৈত ভাবের ইঙ্গিত করিয়াছি এবং তাঁহার ধর্ম্মালোচনা ও কাব্যালোচনার গঙ্গা-যমুনাধারা মিলিত হইয়া যে উর্ম্মিমালার উৎক্ষেপ করিয়াছে, সে-দোলনের পরিচয় লাভ করিতে হইলে পাঠকের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তিনি বোলপুরে একটি নাটক অভিনয়কালীন উহার রচনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের সারকথা আমাদের শুনাইয়াছেন। তাই নিম্নে তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি : এটা সম্পূর্ণ কস্‌মিক্ কনসাস্‌নেস্ (Cosmic consciousness) বা জগতের উৎপত্তি, লয়, উত্থান, পতন ও ক্রিয়া বৈচিত্র্যের রূপক। তিনি কল্পনায় কবি জীবাত্মা হইয়া ভগবৎরসের ব্যাখ্যাতা। কারণ মানুষমাত্রেই এক ধারে জ্ঞানপন্থী ও রসোপন্থী হইয়া ভোগের মধ্য দিয়া সত্যের উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহাই জীবনের লক্ষ্য ও সার্থকতা।

(বিচিত্রা, আষাঢ়—১৩৩৪ হইতে উদ্ধৃত)

"নৃত্য গীত ও আবৃত্তি যোগে 'নটরাজ' দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তি-

নিকেতন অভিনীত হইয়াছিল। নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদ-ক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। 'নটরাজ' পালাগানের এই মর্ম্ম।"

সময়ে সময়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকের আগ্রহ ও পরধর্ম্ম অসহিষ্ণুতার আঁচও তাঁহার লেখায় পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ হইলেও সুপ্ত অজগরের, বিরাট সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজের, চৈতন্য উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে কিন্তু সমাধানে সহায়তা করে নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্বের ধারে ও ভারে হয়ত তাহা পরবর্ত্তীকালের সাহিত্যের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া হরেস মার্শেল, জুভেনালের সাহিত্যিক ব্যঙ্গের অবদানের মত অমরতা লাভ করিবে। কিন্তু ভিন্ন সাম্প্রদায়িকগণ তাহাতে তাঁহার এদেশীয় আধ্যাত্মিক ভাব ও পৌরাণিক জ্ঞান সম্বন্ধে বিজ্ঞতা অপেক্ষা অজ্ঞতারই পরিচয় আস্বাদন করিয়াছেন। চিরসহনশীল হিন্দুপল্লীর দীর্ঘনিশ্বাসের তুল্য ক্ষোভপ্রকাশটা তাঁহারা নীরবেই কেবল করিয়াছেন, তাহা লইয়া প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হন নাই। [illegible]দের কথা ধর্ত্তব্য নহে, মধ্যযুগের ক্ষত্রিয়-সৌজন্যে যেমন দূত সর্ব্বদেশে অবধ্য।

রবীন্দ্রনাথের পত্রমর্ম্ম যাহা অরবিন্দ-আশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রচার করেন ও তাঁহার 'তীর্থঙ্কর' পুস্তকে ২৮৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন :—

"আমার যখনই ক্ষিদে পায় তখন আমার গাছে যদি ফল না থাকে তবে তোমার গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে আমার স্বভাবতই ইচ্ছে হয়। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমারক্ষা করা সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক এই জন্যেই ফল পেড়ে খাওয়াটা চুরি। এই চুরি

সম্বন্ধে সমাজ আমাদের মনে যে সংস্কার দৃঢ়বদ্ধমূল করে দিয়েচে সেটা নিজের ব্যবস্থারক্ষা সহজ করবার উদ্দেশে।

যদি কোনদিন বৈজ্ঞানিক বা সামাজিক কারণে দ্রব্যসামগ্রীর বিশেষ মূল্য না থাকে, তাহ'লে চুরি সম্বন্ধে সংস্কার আপনি চলে যাবে। বস্তুত চুরি না করার নীতি শাশ্বত নীতি নয়, এটা মানুষের ঘরগড়া নীতি, এ নীতিকে না পালন করলে সমাজে যদি অশান্তি না ঘটে, তবে পরের দ্রব্য নেওয়া চুরিই নয়। এই কারণে তুমি দিলীপকুমার যদি আমি রবীন্দ্রনাথের লিচু-বাগানে আমার অনুপস্থিতিতেও লিচু খেয়ে যাও, তুমিও সেটাকে চুরি বলে অনুশোচনা কর না, আমিও সেটাকে চুরি বলে খড়্গহস্ত হইনে। ব্যভিচার সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে।"

"মেয়েরা যখন বাধ্য হয়ে পুরুষের অনুগত থাকত, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বিবাহ ছাড়া যখন তাদের অন্য উপায় ছিল না, তখন বিবাহের হাটে যে জিনিসের দাম বেশি সেটা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হত। আধুনিক কালে স্ত্রীলোকের সে বাধাও অল্প অল্প করে কেটে যাচ্ছে। সন্তান-সমস্যাটাও এখন প্রবল নয়, নিবারণের উপায়গুলো সহজ।

* * *

স্ত্রী-পুরুষের ও বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের দৈহিক শুচিতারক্ষাসম্বন্ধীয় সংস্কার যে সকল আর্থিক ও সামাজিক কারণের উপর এতোদিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই কারণগুলো ক্ষীণ হলে বা বিলুপ্ত হলে এই [illegible] উপদেশের জোরে থাকতেই পারে না।

* * *

ব্যভিচার সম্বন্ধেও এই কথাটাই খাটে। এর মধ্যে যে [illegible] সামাজিক অর্থাৎ এতে যদি সমাজের অশান্তি ঘটে তবেই [illegible] মানুষকে সাবধান হতে হয়, যদি না ঘটে তাহ'লে ব্যভিচার [illegible] না—ভয় দেখিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য তাকে যে কালিমা [illegible] রাখা হয়েছে সেটা খসে গেলে দেখা যায় ওর উপরে নরকের ছাপ [illegible]

(২রা ফেব্রুয়ারী, [illegible])

"আমাদের যে-কোনো কাজে সত্যের স্খলন দ্বারা বঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতার সৃষ্টি হয়, বা মৈত্রীর (বৌদ্ধ পরিভাষা) স্খলনদ্বারা সংসারে হিংসা, বেদনা, অশান্তির প্রচার হয় সেইটেই নৈতিক হিসাবে মন্দ। স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধের নৈতিক বিচার করবার বেলা এই কথাটাই স্মরণ করতে হবে। এর মধ্যে asceticism বা বৈরাগ্যের কথাটা নীতির দিকের কথা নয়—সেটা শারীরিক বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসাতত্ত্বের কথা। স্ত্রী-পুরুষের যেখানে অসত্য অশান্তির যোগ, সেইখানেই সেটা ব্যভিচার—যেখানে সে আশঙ্কা নেই, সেখানে সন্ন্যাসীর কথায় কান দেবার প্রয়োজন দেখিনে।

(মাঘ, ১৩৩৪)

"স্ত্রী-পুরুষের দেহ-সম্ভোগ নিন্দনীয় নয়, তার প্রয়োজন সুতীব্র, সহজ অবস্থায় তাকে দমন করাই অন্যায়—কিন্তু অন্যান্য ধর্মকর্মের মতো সে নিতান্ত অপরিবর্জনীয়—বস্তুত ধর্মের দিকে সুবুদ্ধির দিকে তাকিয়ে জীবনে আমরা এ সম্বন্ধে আত্মদমন বহু দুঃখে বহুবার করে থাকি। না যদি করি তাতে আত্মশ্লাঘার কারণ নেই। যৌন প্রেমের পরিপূর্ণতার জন্য দেহমনের সম্মিলন আবশ্যক, কিন্তু যৌন প্রেমের উপরেও মানব প্রেম—[illegible] মানব প্রেমের বিরুদ্ধ।

* * *

[illegible] আমি ধর্মনীতি বলিনে—কিন্তু মানবনীতি আছে, [illegible] জিনিষটা কলুষিত—তাতে বলে ছলনা কোরো না, [illegible] সতীর অসতীর ব'লে কোনো ঐকান্তিক পদার্থ নেই, [illegible] আছে।

* * *

[illegible] সমাজে সত্য ততক্ষণ চুরি যেমন অন্যায়, তেমনি [illegible] বিবাহ বন্ধন সমাজে প্রচলিত ততক্ষণ যৌননীতিকে সংযমকে মানতে হবে।"

(জুলাই, ১৯৩০)

—রবীন্দ্রনাথের পত্রমর্মর 'তীর্থঙ্কর' হইতে উদ্ধৃত—

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর পূর্ণ হয়। সেই উপলক্ষে বোলপুর শান্তিনিকেতনে ব্যাপকভাবে কবিবরের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে জয়ন্তী যোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হওয়ায়, জন্মাষ্টমীকে 'শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী' বলা হইত। জয়ন্তী যোগ ও অষ্টমী তিথি না পাইলেও মানুষের জন্মোৎসব সম্বন্ধে জয়ন্তী শব্দের প্রয়োগ বাংলার বাহিরে 'শিবাজী জয়ন্তী', 'তিলক জয়ন্তী' প্রভৃতিতে দেখা যায়। সেখানে জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ উৎসবের এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সেই দৃষ্টান্তে এবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের নাম দেওয়া হয় 'শ্রীরবীন্দ্র জয়ন্তী'। কলিকাতায় এই উৎসবকে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' বলিয়া প্রচার করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু রবীন্দ্র-ভক্তের বোলপুরে সমাগম হয়। সেখানে প্রাতঃকালে আম্রকুঞ্জে যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী স্বরচিত কবিতায় কবিকে অভিনন্দিত করেন এবং অথর্ববেদ হইতে সংগৃহীত মন্ত্রের দ্বারা কবি-আবাহন, কবিকে অর্ঘ্যদান ও কবির [illegible] হয় এবং মধ্যে মধ্যে কবির রচিত দু'চারিটা গান গীত হয়। [illegible] চারিটি ভদ্রলোক ও একটি মহিলা কবির জন্য উপহার আনিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে যিনি কবি, তিনি স্বরচিত চীনভাষায় কবিতা সুর করিয়া পড়িয়া কবিকে উপহার দেন। যিনি চিত্রকর তিনি একটি সংস্কৃত চিত্র উপহার দেন। বৃক্ষরোপণ ও প্রপা (জলসত্র) উৎসর্গ করিবার পরে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করেন ও স্বরচিত নূতন কবিতা পাঠ করেন। 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গান হয়, পরে জন্মোৎসবান্তে এই অনুষ্ঠান

সমাধা হয়। এই উপলক্ষে কবির যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

* * *

"অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ও শোষণসম্ভূত আমাদের এই বর্ত্তমান দুঃখকষ্ট যাহাতে প্রশমিত করিতে পারা যায়, সেইরূপে জাতিসমূহকে পরস্পরের মিলনমূলক সহযোগিতার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

* * *

সহযোগিতার এক অভিনব ধারা যে বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার সুলক্ষণ চারিদিকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের বর্ত্তমান সংগ্রামে ভারতকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বিশ্বমানবের স্বাধীনতার সহিত ভারতবাসীর স্বাধীনতা চিরসম্বন্ধ সূত্রে জড়িত থাকিবে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির সমষ্টি এবং তাহাদের পরিপূর্ণ চিন্তাধারাই বিশ্বমানবতার অঙ্গ। আর বিশ্বমানবের স্বাধীনতার অর্থ তাহাদের প্রত্যেকের অভ্যুদয়।"

কবি এই উপলক্ষে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনি জননায়ক নন। শিক্ষকতা বা অন্য নানা কাজে লিপ্ত থাকিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে কবি ভিন্ন আর কিছুই নন, ইহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই অনুষ্ঠানের মন্ত্রসংগ্রহ মুদ্রিত হইয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিতরিত হয়। এই উপলক্ষে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একখানি পুস্তিকা "রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী" বা রবীন্দ্রনাথের জীবনের সত্তর বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনা ও "রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী" যাহাতে তাঁহার সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হয়, প্রকাশিত করিয়া উপস্থিত লোকদিগকে বিতরণ করেন। পরে ইহাই বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। এই পুস্তিকায় যে সকল ভুল আছে তাহা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৩৩৯ সালের বৈশাখ মাসের ও আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধে সংশোধন করিয়াছেন। এই পুস্তিকা এবং উক্ত প্রবন্ধ হইতে কোনও সংবাদ ও তারিখ এই প্রবন্ধে গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য

আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। ঐ ২৫শে তারিখে কলিকাতার ও বাংলার নানাস্থান এবং বাংলার বাহিরে ভারতের কোনও কোনও প্রদেশের অনেক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হয় এবং বিভিন্ন দিক হইতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ও কোথাও কোথাও তাঁহার জীবনের আলোচনা হয়। এই উপলক্ষে, কলিকাতা বাগবাজারে লক্ষ্মীদত্ত লেনে যুবকদের 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' নামক যে সমিতি আছে, তাহা শ্যামবাজারে এ ভি স্কুল হলে একটি উৎসব সভার আয়োজন করেন এবং অনুরুদ্ধ হইয়া লেখক এই জীবনীর কতকাংশ সেই সভায় পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ কলিকাতার ৭৭ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে কবিবরের সত্তর বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ করিয়া কলিকাতা নগরীতে তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা এবং তাহার আনুসঙ্গিক উৎসব অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৩৩৮ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট গৃহে পরামর্শের জন্য একটি সাধারণ জনসভা আহ্বান করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে এই 'রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্বোধন সভা'র সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন যে "আমি ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন সভায়' সমগ্র দেশের মধ্যে হইতে আমাকেই কেন সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করা হইল [illegible] উহা আমার নিকট একটা বিস্ময় বলিয়াই মনে হইতেছে. আমি [illegible] গৃহকোণজীবী মানুষ. কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি [illegible] উদ্যোক্তাগণ মনে করিয়াছেন যে, আমি বয়সে কবির অপেক্ষা [illegible] বৎসরের বড় এবং একই সময়ে আমরা উভয়েই বঙ্কিমের [illegible] অনতিক্রমণীয় প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং আমাদের উভয়কে বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের উদীয়মান শক্তিরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হোক্ বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্ব্বাদ রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর ফলপ্রসূ হইয়াছিল এবং তাঁহার আবির্ভাব একটি যুগান্তের অবতারণা

করিয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথ আজও ক্রমশঃ ঊর্দ্ধলোকে আরোহণ করিতেছেন। ৩০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি কেবল চীন হইতে পেরুতে বিস্তৃতিলাভ করে নাই, টেরাডেল্ ফুগো হইতে আলাস্কা এবং কামাস্কাট্‌কা হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধলোকে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধতম লোকে আরোহণ করিয়াছেন এবং সেই জগতের সমস্ত রহস্য কবির নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

সাহিত্য-জগতের এমন কোন বিভাগই নাই যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেন নাই কিন্তু গীতিকাব্যে জগতে তিনি যে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অপরিমেয়। তাঁহার বচনাবলী জীবন্ত, তাঁহার বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ এবং তাঁহার ব্যঙ্গ তীব্র হইয়াছে। তিনি প্রাচীন কবিদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন। তাঁহার ব্যাকরণজ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞান আমাদের অধিকাংশকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি একাধারে বংশমর্য্যাদা, বিশ্রামের অবসর, আশ্চর্য্য নিপুণতা এবং উচ্চশ্রেণীর মানবিক ক্ষমতা ও মনোমোহন দৈহিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। যে জীবন তিনি বাছিয়া লইয়াছেন তাহা যেন প্রকৃতিই তাঁহাকে দান করিয়াছেন, এবং যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তিনি শৈশব হইতেই প্রকৃতির শিক্ষা ও সমাজের সাহায্যের মধ্যে পাইয়াছেন। তিনি কেবল তাঁহার নিজের জন্যই খ্যাতি অর্জ্জন করেন নাই, তাঁহার নিজ দেশ ও নিজ জাতির যশঃও তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন। হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজশেখর আদর্শ কবির যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে।*

রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ-জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি তাহার পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে সম্মান করিয়াছে। ইউরোপের নৃপতিবৃন্দ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা দিয়াছেন, তিনি যেখানেই

---

* রাজশেখরের 'কাব্য মিমাংসা' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে তাহার বিশেষ বিবরণ যাহারা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা 'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় দেখিবেন।

গিয়াছেন, সেইখানেই জনমণ্ডলী তাঁহার কথা শুনিবার জন্য, তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য ও তাঁহার প্রতি প্রশংসাজ্ঞাপনের জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। বহুদূরের স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দেশবাসী তাঁহার জন্য কি করিয়াছেন? তাঁহারা ব্যগ্রভাবে কবির গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন, এবং তাঁহার গ্রন্থপাঠে যতদূর উপকার হইতে পারে তাহা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু দেশবাসী সেই উপকারের কি প্রতিদান দিয়াছেন? আমরা যদি তাঁহার প্রতিভাপ্রসূত দান সমূহকে গ্রহণ ও উপলব্ধি করি, তাহাতেই তাঁহার প্রতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে।

‘ভারতবর্ষ’ ১৯ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৮ সাল, ১৩৮-১৬৯ পৃষ্ঠা—

এই সভায় প্রথম প্রস্তাব ঃ—“কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততিতম বৎসর পূর্ণ হওয়ায় এই সভা তাঁহাকে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ ও সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে,” প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত করেন ও তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, “এই উপলক্ষে লোকের স্মরণ রাখা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার দুইটি প্রতিষ্ঠান ‘শান্তিনিকেতন’ ও ‘শ্রীনিকেতন’ এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। অনেকে বলেন যে এই প্রতিষ্ঠান দুইটি স্বপ্ন মাত্র, কিন্তু লোকের জানা উচিত যে ইহা বিশ্বকবির স্বপ্ন। সুতরাং তাঁহার সপ্ততিতম জন্মতিথি উৎসবে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি যাহাতে যোগ্য সম্মান [illegible] তাহা সকলেরই দেখা উচিত। ইহা অসম্ভব নহে যে দেশবাসীগণ কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠান দুইটির যোগ্য সমাদর না হওয়ায়, কবির মনে একটি ক্ষোভ আছে। সুতরাং এই উপলক্ষে দেশবাসীর উচিত তাহাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালন করা।”

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সাহিত্যব্রতীদের সেবায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথকে আমরা নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনি আবাল্য একজন অকপট সাহিত্যসেবী ও বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সুহৃদ। ইহাই তাঁহার মুখ্য পরিচয়, ইহাতেই তাঁহার প্রকৃত আনন্দ। কিন্তু কেবলমাত্র সাহিত্যসেবায় এ আনন্দ পর্যাবসিত হয় নাই, সাহিত্যব্রতীদের প্রতি তাঁহার সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধ হইয়া যখন দারিদ্র্যদশায় পতিত হন এবং দেশের লোকের নিকট তাঁহার অবস্থা জানাইলেন তখন রবীন্দ্রনাথ স্থির থাকিতে পারেন নাই। তিনি স্বতঃপরতঃ কবিবর হেমচন্দ্রের দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হইলেন। আমরা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ প্রণীত 'হেমচন্দ্র' তৃতীয় খণ্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"চারিদিকে কবিবরের দারিদ্র্য অপনোদনের চেষ্টা হইতে লাগিল। 'বান্ধব' সম্পাদক রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 'হিতবাদী' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত, 'অনুসন্ধান' সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি অনেকেই কবিবরের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।"

ঐ পুস্তকের ২৪৩ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীকে লিখিত রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের একখানি পত্রে দেখা যায়. * *

"একটা আনন্দ সংবাদ দিই—এইমাত্র রবিবাবুর এক পত্র পাইলাম যে, স্বাধীন ত্রিপুরার সেই মাননীয় মহারাজ হেমচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত হইয়া হেমচন্দ্রকে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত ত্রিশ টাকা হারে মাসিক বৃত্তি ও নগদ দুইশত টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ভাই! এত চেষ্টা, যত্ন ও

পরিশ্রম বুঝি এইবার সার্থক হইল। আপনি বুঝিতে পারিতেছেন যে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ইহার মূলাধার। তাঁহার এই প্রকৃত কবিজনোচিত ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছে।" * *
১৭শে আষাঢ় ১৩০৬।

এ সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিবারে একটা কর্ত্তব্য আছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া রবিবাবু তাঁহার পিতাকে জানাইয়া ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথকে বলিয়া কবিবর হেমচন্দ্রের জন্য একটা মাসিক অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত কবিবর হেমচন্দ্রকে লিখিত তাঁহার পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ওঁ ৬ দ্বারিকানাথ ঠাকুরের লেন
জোড়াসাঁকো
কলিকাতা।

বহুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন :—

আমার পিতাঠাকুর অপনাকে তাঁহার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাইতে বলিয়াছেন এবং প্রতি মাসে আপনার সাহায্যার্থে ২০৲ কুড়ি টাকা নিয়মিত পাঠাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। প্রতি মাসের ২০শে তারিখে এখান হইতে টাকা প্রেরিত হইবে। গত মাসের টাকা অত্রসহ পাঠাই—অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসে ১০৲ টাকা করিয়া দিবেন এবং সেও এই সঙ্গে পাঠাইবেন। আপনার পুত্র আপনার গ্রন্থাবলী হইতে সংকলন করিয়া যে বাল্যপাঠ্য গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, আমার নিকট তাহার একখণ্ড প্রেরণ করিলে বিদ্যালয়ে তাহা প্রচার করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইব। প্রচলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। আমরা যে সামান্য টাকা পাঠাইলাম, আমার পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদী স্বরূপ গ্রহণ করিলে অনুগৃহীত হইব।
ইতি ৩রা শ্রাবণ, ১৩০৬।

অনুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরলোকগত রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনার পর দারুণ শিরোরোগে পীড়িত হইয়া কুমিল্লা হইতে কলিকাতায় আসেন, তখন তিনি পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথকে দিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দীনেশচন্দ্রের জন্য নিয়মিত মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর দীনেশচন্দ্রের পুত্রকে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার একজন ছাত্র করিয়া তাহার শিক্ষার সমস্ত ভার লইয়াছিলেন। তিনি কিরূপে চন্দননগরের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, হিতবাদির সহকারী সম্পাদক, "শ্রীবৃদ্ধ" উপনামে অভিহিত, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিজে পত্র লিখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের শান্তিনিকেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেকথা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীর পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার "আগন্তুক" গল্প "সাহিত্যে" যখন প্রকাশিত হয় কবি তাঁহাকে ডাকাইয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন ও [illegible] হাত পাকাইতে অনুরোধ করেন। বয়সের হিসাব করিয়া বলেন, "তুমি মোটে ২' বছরের আমার ছোট, তবেত আমরা একবয়সী," [illegible] আজীবন আত্মীয় ও 'ঘরের ছেলের' মত দেখতেন। যে সময়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হিতবাদির সম্পাদকের সহকারী হন, তাহার বহু পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ 'Hitabadi Ltd.'এর যে অংশীদার ছিলেন তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছিলেন।

এখানে একটা কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সচরাচর সাহিত্যসেবী বলিতে যাহা বুঝায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাহার অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি বিজ্ঞানের নানা বিভাগে ও উদ্ভিদ্‌রাজ্যে জৈবশক্তির আলোচনায় আজীবন চেষ্টা করিয়া কতকগুলি অমূল্য সত্যের আবিষ্কার দ্বারা মানবের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। এক সময়ে বহুবৎসর ইউরোপে গিয়া

সেখানকার বৈজ্ঞানিকদের এই সকল সত্য বুঝাইবার জন্য অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য অর্থকষ্টও সময়ে সময়ে ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার কার্য্যোদ্ধারের জন্য অর্থের কথা না ভাবিয়া অবিরত ভাবে প্রচারকার্য্যে যত্নবান থাকেন। তাঁহার অর্থের অভাব যাহাতে না ঘটে সেজন্য দেশবাসী তাহার চেষ্টা করিবে।

স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজা যখন তাঁহার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের হস্তে কয়েক সহস্র মুদ্রা দেশের কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানের জন্য দিয়াছিলেন, তিনি তখন সমস্ত টাকাই আচার্য্য বসুর মহৎ উদ্দেশ্যের পোষকতায় ব্যয় করেন। বলা বাহুল্য যে ত্রিপুরাধিপতি ইহাতে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আর্থিক সাহায্য ভিন্ন সাহিত্যিক প্রচেষ্টাতেও যখন যে-কোন সাহিত্যিক তাঁহার নিকট কোন সাহায্যপ্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার নানা কার্য্য এবং সংকীর্ণ অবসরের মধ্যে সময় করিয়া সে সাহায্য দিয়া মিত্রতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তাহার ফলে ঐরূপ সাহিত্য প্রচারে তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল। যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সুন্দর সংস্করণ 'পদরত্নমালা' নামে প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সহকর্মী হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পদাবলীতে ব্যবহৃত অনেক শব্দের যথার্থ অর্থ বহু গবেষণায় নিরূপণ করিয়াছিলেন। যুবক রবীন্দ্রনাথের অনন্য প্রতিভা ও [illegible] মজুমদার মহাশয়ের বৈষ্ণব ভাবোচিত রসাস্বাদনের সহিত [illegible] পদনির্ব্বাচনে সাহায্য করে ও আজীবন পরস্পরের মধ্যে [illegible] করে। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ঐ পদাবলীর সংগ্রহ ও পাঠ নির্দ্ধারণে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন।

সংঘারাম গঠনকারী ভগবান তথাগতের শিষ্যেরা চারিটিগুণের বড় প্রশংসা করিয়াছেন—সাম্য, মৈত্রী, মুদিতা ও উপেক্ষা। রবীন্দ্রনাথের মৈত্রী ও মুদিতার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরের সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদানকে মুদিতা বলা হইত। এক্ষেত্রে তাহাতে উপেক্ষাও যোগ দিল। "কড়ি ও কোমলের" তীব্র সমালোচনা, এমন কি কিছু কিছু ব্যক্তিগত আক্রমণ 'মিঠে কড়া' নামধেয় কবিতা সংগ্রহে 'রাহু' কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়, ইহাই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ছদ্মনাম ছিল। কিন্তু তিনি অনুতপ্ত হইয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা লইয়া উপস্থিত হইলে, কবি তাঁহাকে সাদরে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া এবং পূর্ব্বকৃত কটাক্ষ উপেক্ষা করিয়া যথাসাধ্য সাহিত্যপ্রচারে আনুকূল্য করিলেন। পরের দোষে সহনশীল ও তাহা মন হইতে মুছিয়া ফেলাকে বৌদ্ধ-সাধনায় উপেক্ষা বলে; মানুষকে বা তাহার সদ্‌গুণকে উপেক্ষা করা দোষাবহ এবং কবি নিজেও আমাদের জাতির উন্নতির কামনায়, অসাড়তা বা নির্লিপ্তভাব যাহাকে Indifference বলে, সকলকে স্বতঃপরতভাবে দমন করিবার জন্য প্রবোধিত করিয়াছেন, এবং সেজন্য কবি বা মহাপুরুষের স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া উৎসব-অনুষ্ঠানের তিনি পক্ষপাতী। কারণ, সাময়িক হইলেও তদুপলক্ষে জাতির একতা সম্পাদন ও শ্রদ্ধা পরিচর্য্যা তদ্দ্বারা সমাজ পুষ্টিলাভ করে। তাই কলিকাতায় 'শিবাজী' উৎসবের প্রচলন হয়, এবং তাঁহার ভাগ্নী শ্রীমতী সরলাদেবী যখন বীরাষ্টমী ব্রতের দ্বারা বঙ্গীয় যুবকদের শারীরিক উৎকর্ষতা প্রদর্শনের একটি সুযোগ ও ক্ষেত্র কল্পনা করেন, ও লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক যোগদানকল্পে কলিকাতায় আগমন করেন। কবি তাঁহার রচনার দ্বারা সে অনুষ্ঠানের জয় কামনা করেন। তাঁহার লিখিত শিবাজীর উদ্দেশে বিখ্যাত কবিতাটি এই উপলক্ষে রচিত হয়। ইংরাজ ঐতিহাসিকের গুণে বাল্যকাল হইতে শিবাজীকে মারাঠা দস্যু বলিয়া জানিতাম। তাঁহার প্রকৃত দাবীটা রবীন্দ্র-লেখনীতে পাইলাম। তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে বিলাত আপীলের জন্য টাকা

সংগ্রহে তিনি এক সময়ে ব্যস্ত ছিলেন।

যখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি গার্হস্থ সংস্করণ 'সরল কৃত্তিবাসী রামায়ণ' নাম দিয়া প্রকাশিত করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন।

অন্যান্য যে কত সাহিত্যিক ঐ বিষয়ে তাঁহার সৌজন্যের নিকট ঋণী তাহার ইয়ত্তা নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম বর্ষ হইতে কয়েক বৎসরের পত্রিকাগুলির পুনর্মুদ্রন রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধার আর একটি নিদর্শন। এই কারণেই, যখন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রকাশিত করেন এবং যখন উঁহার সম্পাদকতায় শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাশ ''রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত', 'কলিকাতা কমলালয়' ইত্যাদি অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তখন রবীন্দ্রনাথ প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন সমালোচনা লিখিয়া অনেক নূতন সাহিত্যব্রতীদের বঙ্গীয় পাঠক সমাজের সহিত প্রথম পরিচয় স্থাপনে যত্ন করিয়াছেন। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইহাদের অন্যতম। ডি, এল্ রায়ের প্রবর্ত্তিত নূতন ছন্দে তাঁহার 'মন্দ্র' নামক কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' নবপর্য্যায়ে তাহার সমালোচনা করিয়া তাঁহার গুণপণার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ 'সাহিত্য' পত্রে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র যে সমালোচনা ডি, এল, রায় পরবর্ত্তীকালে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বিচলিত হয়। পরে সে ভাবের অপনোদন উভয়ের সহৃদয়তার গুণে হইয়াছিল। তরুণ সাহিত্যিক ও সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডি, এল, রায়ের পুত্র মণ্টুকে (শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে) রবীন্দ্রনাথ পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহারে নানা কথার আলোচনা ও

উপদেশ দিয়াছিলেন। পত্র লিখিলে তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়ার সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই কৃপণতা করেন নাই। সেই সৌভাগ্য প্রাপ্তির জন্য অনেক মহিলা তাঁহাকে সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া যথাযথ উত্তর পাইয়া কৃতার্থ-মনা হইয়াছেন। বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত পত্রগুলি সংগৃহীত হইয়া সুবিন্যস্ত ভাবে মুদ্রিত হইলে, এই বিভাগে বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

সাহিত্যক্ষেত্রে তরুণ সাহিত্যিকদের কোন নূতন প্রচেষ্টা বলিয়া রবীন্দ্র-নাথ কোনদিন উপেক্ষা করেন নাই। অনেক সময় তিনি তাহার বিশেষ আদরই করিয়াছেন। যখন শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাশ নূতন ভাবে ও নূতন ছন্দে কবিতা "শনিবারের চিঠি"তে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, রবীন্দ্র-নাথ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া সেই কবিতার পাঠ শুনিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি সহৃদয়তা ও সস্নেহ দৃষ্টি তাঁহার আর একটি বিশিষ্টতা। সাহিত্যিকদের অবাধ মেলামেশা ও পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময়ের দ্বারা সামাজিকতা বৃদ্ধি চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের নিকট স্পৃহনীয় ছিল; ইহার ফলেই 'বিদ্বজ্জন সমাগম,' 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ও কার্য্যে তিনি চিরদিন উৎসাহ দেখাইয়া আসিয়াছেন।

প্রৌঢ়ের নিত্যসহচর আত্মাভিমানপুষ্ট বাক্য ও কার্য্যের বিলাস, শুভ্রসাহীন উৎসাহ ও মেড়োপড়া সটেপড়া সমশীতল হৃদয়বৃত্তি তাঁহাকে কবলিত করিতে পারে নাই। বরং তাঁহার অন্তরের রসপ্রস্রবণ ও সঙ্গলিপ্সা সকলকেই উত্তরোত্তর কেন্দ্রাভিমুখী করিয়াছে। তাই বৃদ্ধ বয়সাবধি তিনি নির্জ্জনতার অবকাশ পান নাই। তাঁহার প্রকৃতিতে অপরের ইচ্ছায় কোন কার্য্য করা বা সঙ্গদান সম্ভবপর নহে, তাই তাঁহার শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অপরের সঙ্গে যোগ রাখা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহাদের বাটিতে অনুষ্ঠিত 'বিদ্বজ্জন সমাগমের

বার্ষিক বৈঠকের ও মিলন ক্ষেত্রে আমোদের আয়োজনের বিবরণ আমরা চ পরিশিষ্টে দিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কবি অকর্ত্তা, অগ্রজদের সহযোগিতায় কার্য্য করিয়াছেন। কলেজ রিউনিয়নের সময় তাঁহাকে গাহিতে বলায়, স্বতঃস্ফূর্ত্ত গানে জবাব দেন—

"আমায় গাহিতে বোল না,
একি শুধু হাসি খেলা,
শুধু প্রমোদের মেলা,
মিছে কথার ছলনা।"

সাহিত্যিকগণের বার্ষিক সংযোগের ব্যবস্থা করিয়া যখন কাশিম-বাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বঙ্গবাণীর সেবকদের বহরমপুরে সাদর আহ্বান করেন ও তিনদিন ধরিয়া বৈঠক হয়, কবি তাহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য ছিল, সাহিত্যিক প্রচেষ্টার গতি দিবার দিকে, কাজেই বর্ষপঞ্জী, গবেষণা, বক্তৃতা, জন-সাধারণের বাংলা সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করান ও নূতন পন্থা নিরূপণ ও নির্দ্দেশ করা, মোটের উপর, বাংলা সাহিত্যের গরিমা ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সকল প্রদেশের ছোট বড় লেখকদের একীকরণ, [illegible] ভাবে, পানভোজন ও আতিথেয়তার উপভোগ, স্থানীয় ঐতিহাসিক দ্রব্য সন্দর্শন ও সংগ্রহরূপে ছিল আনুসঙ্গিক। কিন্তু বৎসরে বৎসরে এরূপ মিলনে কাজের দিক দিয়া অনেক অগ্রগতি হইলেও, অন্তরের সৌহার্দ্দ্য ও সখ্যতার রসানুভূতি বা সাহিত্যের মাধুর্য্য আস্বাদনের তাদৃশ সুযোগ হয় না। তাই প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার অন্য প্রকার আয়োজন হয়। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের কলিকাতা ভবন 'দীনধামে' তাই, সহরের গণ্যমান্য সাহিত্যসেবী-গণকে প্রতি মাসের পূর্ণিমা রজনীতে আলাপ পরিচয়, সুরচিত [illegible] রসরচনা, আবৃত্তি ও কিঞ্চিৎ জলযোগের মধ্যে পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধনে সহযোগিতা করিতে উক্ত কবিবরের সুযোগ্য পুত্র ৺ললিতচন্দ্র মিত্র আহ্বান করেন। 'নায়কের' নায়ক ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নাটোরের মহারাজা

৺জগদীন্দ্রনাথ রায় ও কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার ইভ্‌নিং ক্লাবের 'অর্কেষ্ট্রা' দল লইয়া সোৎসাহে যোগদান করেন। ক্রমান্বয়ে সহরের সকল পল্লীতে নানাস্থানে, কি বিত্তশালী কি মধ্যবিত্ত সাহিত্যজীবির ভবনে, কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈঠক হয়, তাহাতে বিচুরের খুদকুঁড়া মুলামুড়ি বা চিঁড়েভাজা ও চা মিষ্টান্নাদি উপভোগে ছোট বড় সকলেই আনন্দ লাভ করেন। এই পূর্ণিমা মিলনে, ডি, এল, রায়ের অকাল মৃত্যুতে বিষাদ আনয়ন করে ও হাসির গানে আবৃত্তিতে ও কীর্ত্তন গানে তাঁহার স্থান পূর্ণ না হওয়ায় তাহার অভাব সকলের মনে বহুদিন জাগরুক ছিল। ললিত-চন্দ্র মিত্র মহাশয় এই উপলক্ষে ডি, এল, রায়ের ছন্দে তাঁহার কয়েকটি প্রসিদ্ধ গানের তালিকা প্রস্তুত করেন। পরে ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত সতীশ ঘটক প্রভৃতি অনেকেই এই পন্থাবলম্বী হন। হাসির গানে ও হাস্যরসাত্মক কবিতায় উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা কিছু কিছু যোগান দেন। 'পূর্ণিমা মিলন' বন্ধ হইয়া গেলে, মাসিক "ভারতবর্ষের' প্রবীণ সম্পাদক ও প্রসিদ্ধ গল্পলেখক রায় বাহাদুর ৺জলধর সেন ও কতিপয় তরুণ সাহিত্যি-কের চেষ্টায়, এই ভ্রাম্যমান বৈঠক কৌমুদী সংযোগ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বপূজ্য আধুনিক বিশ্রামবিধায়িনী অবকাশরঞ্জিনী Sabbath বা রবি দিবসের নামে রাখিয়া 'রবিবাসরে' পুনর্জ্জীবন লাভ করে। বঙ্গসাহিত্য গগনের রবিরও উহাতে মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হয়, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার নিশীথ আয়োজনে তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত না, হয়ত তাহাই আকস্মিক। কিন্তু এইরূপ মেলামেশার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এবং তাঁহার কলিকাতার পূর্ব্ব বাসভবন, ভদ্রাসনের পশ্চিমস্থিত লালকুঠির নিম্নতলের হলটির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া ও চিত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া এবং একপ্রান্তে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ও বেদীর ব্যবস্থা করিয়া নাগরিক সাহিত্যামোদীদের সহিত শান্তিনিকেতনের প্রবাসী তরুণ সাহিত্যিক ও কলাবিদগণের নিয়মিতরূপে মেলামেশা, কাব্য চিত্র সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার কলায় পুষ্ট একটি সাহিত্যিক জীবনের অনুকূল পরিবেশের কল্পনায়,

'বিচিত্রা' নামধেয় একটি স্থায়ী বৈঠকের সৃষ্টি করিলেন ও স্বয়ং পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বপ্রকারে আতিথেয়তার ভার লইলেন। যাঁহারা বোলপুরে গিয়াছেন, তাঁহারা কবির অতিথিবাৎসল্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছেন কিন্তু ভদ্রাভদ্র সাধারণের ভাগ্যে তাহার রসাস্বাদন ঘটে নাই।

তাঁহার উৎসাহে নবীন লেখকেরা নিজেদের ছোট ছোট রচনা লইয়া আসিতেন, তাহা পাঠ ও আলোচনা হইত। কবি নিজেরও নূতন লেখা আগ্রহভরে পাঠ করিতেন ও সকলের স্বাধীন মত গ্রহণ করিতেন। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী (বীরবল), কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেব প্রভৃতি তরুণ সাহিত্যিকেরা এই অধিবেশনগুলির জন্য আগ্রহান্বিত থাকিতেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, ৺শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ বন্ধুরাও যোগ দিতেন। এই বৈঠকে কবির প্রসিদ্ধ নাটিকা [illegible] অভিনীত হয়। তাহাতে লক্ষ্ণৌ কলাভবনের অধ্যক্ষ [illegible] শিশুসাহিত্যের সুলেখক অসিতকুমার হালদার ([illegible] গোয়ালার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেন। [illegible] কেহও ছিলেন। গীতাংশ ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের [illegible]

গত শতবর্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়ি, [illegible] তথা হইতে নূতন ভাব সম্বলিত এমন কি [illegible] বিস্তার লাভ করে। প্রাচ্যশিল্প উন্নতি বিষয়ে [illegible] নাথ ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ যে সকল নূতন পন্থা [illegible] রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিলেই তাঁহাদের নিকট তাঁহার [illegible] লইতে যত্নশীল হইতেন এবং তথা হইতে নূতন শিল্পী [illegible] হইতে সংগ্রহ করিয়া বোলপুরের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে লইয়া যাইতেন। [illegible] হইতেই শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুকে কবি লইয়া গিয়া শান্তিনিকেতনে প্রাচ্য

অঙ্কন-পদ্ধতির চর্চ্চার জন্য একটি শিল্পশিক্ষা-বিভাগ ও কলাভবনের প্রতিষ্ঠা করেন। তথাকার পুরাতন ছাত্র শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দেকে কিছুদিন অবনীন্দ্রনাথের নিকট রাখিয়া অঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া সঙ্গে করিয়া জাপানে ও বিলাতে লইয়া যান। ইংলণ্ডে তিনি যশের সহিত A. R. C. A. পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত কলিকাতা স্কুল অফ আর্টের অধ্যক্ষরূপে বঙ্গবাসীগণকে শিল্পশিক্ষাদানে নিযুক্ত আছেন। উপরোক্ত অসিতকুমার হালদার ও বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র শিল্প অনুশীলনার্থে কবির সহিত জাপানে বাস করেন।

ফলে, শান্তিনিকেতন বর্ত্তমানে একটি শিল্পশিক্ষার ও প্রগতির বিশেষ কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে এবং কলিকাতার গুণী ও বিদ্বজ্জন সমাজের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। বিচিত্রার আনুকূল্যে যে তরুণ ও সাহিত্যসেবীদের একটি আত্মগোষ্ঠী গড়িয়া উঠে, তাহাদের ভাবপ্রকাশের জন্য 'বিচিত্রা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা মুখপত্ররূপে সহরে প্রচারিত হয়। এখনও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সম্পাদকতায় সৎসাহিত্য প্রচারে উক্ত পত্রী আছে, কিন্তু কবির প্রতিষ্ঠিত বিচিত্রা ক্লাবের সহিত এখনও অবিচ্ছিন্ন যোগের কথা বলিতে পারি না।

গগনেন্দ্রনাথের 'বিরূপ বজ্র' ব্যঙ্গ চিত্রাবলী ও তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত বাংলা গদ্য লিখিবার নূতন ভঙ্গী ও শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা কবিকে যথেষ্ট আমোদ দেয় ও তাঁহার সন্তোষ অর্জ্জন করে। অবনীন্দ্রনাথের জামাতা ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যখন 'কান্তিক প্রেস' নামক ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন ও পুস্তক প্রকাশের কার্য্যে ব্রতী হন, কবি তাঁহার ব্যবসার উন্নতির জন্য ও ছাপা সম্বন্ধে ও প্রকাশ কার্য্যে নূতন পন্থা গ্রহণার্থে উপদেশ দেন ও তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ লইতেন। কবি নিজের রচনাবলী আমূল সংশোধন করিয়া ভাবানুসারে গ্রথিত বিভিন্ন খণ্ডে একটি বিশুদ্ধ নূতন সংস্করণ তাঁহা দ্বারা প্রস্তুত ও প্রকাশিত করান। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় পণ্ডিত তারাশঙ্করের কৃত সংস্কৃত

কাদম্বরীর বঙ্গানুবাদ আধুনিক ভাবে পুনর্মুদ্রনের উপদেশ দেন। মণিবাবুও লেখক হিসাবে কবির সাহচর্য্যে বিশেষ উপকৃত হন এবং ছোট ছোট গল্পে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া কিছুকাল "ভারতী"র সম্পাদকতা করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যু কবিকে বিশেষ ব্যথিত করে।

কলিকাতা ঠাকুরবাড়ীর আভিজাত্যে যেমন একটা বৈশিষ্ট্য তেমনই তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চার বৈচিত্র্য, অনন্যসাধারণ গুণগ্রাহিতা এবং সর্ব্বোপরি জ্ঞানী ও গুণীদের পরিপোষণও তাঁহাদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গলার আদিযুগের ছাপাখানা সংবাদপত্র ও শাস্ত্র ও সঙ্গীত বিষয়ক বহুগ্রন্থ প্রকাশ ঠাকুরপরিবারের আনুকূল্য ও বদান্যতার নিদর্শন। গত শতাব্দিতে গ্রন্থকার বা লেখক অপেক্ষা গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক হওয়া অধিক মান্যের ছিল। প্রাগভিক্টোরিয়ান যুগে এ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া বিলাতে ও ইউরোপে সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা প্রায়ই রচয়িতার মুরুব্বী বা Patron of Letters পরিচয়ে শ্লাঘা বোধ করিতেন। রোমীয় যুগে সম্রাট অগাষ্টাস বা মেসিনাস্ এরূপ সুখ্যাতির জন্য প্রসিদ্ধ। তাই সকল রাজসভায় একজন করিয়া রাজকবি থাকিতেন, এবং ধনী ব্যক্তিদেরও একজন বিদ্বান ও বিজ্ঞ পারিষদ্ থাকা অত্যন্ত আবশ্যক হইত। সেক্সপীয়ারের টেম্পেষ্ট বা রুটিকা নাটকেও ইহার নিদর্শন পাইবেন। এদেশেও সভাপণ্ডিত ও রাজ-পণ্ডিতের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং কবিরঞ্জন, কবিকঙ্কন ও রায় গুণাকর প্রভৃতি উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়া বাঙ্গলার ভাষা পয়ার ও পদকর্ত্তারা [illegible]-দের যশোবৃদ্ধি করিয়াছেন। অনেক সময় গ্রন্থকারের নাম উহ্য থাকিত এবং যিনি প্রধান উদ্যোগী বা গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক তাঁহারই নামে গ্রন্থ প্রচারিত হইত; কারণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উৎকর্ষতা ও [illegible] গ্রন্থকে যতটা আদরণীয় করিবে, বিশেষ পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার [illegible] সমর্থনকারী সাব্যস্ত হইলে, তাহার আদর আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং লোকে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে। এরূপ [illegible] পৃষ্ঠপোষকের নামধারা পুস্তক পরিচিত হইত। রাজা রামমোহন রায়ের [illegible] খণ্ডন

করিতে হইলে, স্বর্গীয় (নন্দলাল) উমানন্দন ঠাকুরের মত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রয়োজন। তাই তাঁহার নামে ২০ মাঘ ১২২৯ সাল ইং ১৮২৩খৃঃ "পাষণ্ডপীড়ন" বাহির হয়, এবং রাজাও "পথ্যপ্রদানে" তাহার প্রত্যুত্তর করেন। উভয় পক্ষেরই আশ্রিত পণ্ডিতশ্রেণী ছিলেন যাহারা লিখিয়াছেন বা গ্রন্থ প্রণয়নে সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ আশ্রিত রচয়িতারা নিজেদের নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কিরূপে আশ্রয়দাতাদের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করিতেন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সংস্কৃত কাব্যে মাঘের শিশু-পাল বধকাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, মাঘ নামক কোনও অপুত্রক রাজা স্বীয় কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন মন্ত্রিবর্গকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সকলেই উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, একখানি সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারে যেরূপ চিরস্থায়ী কীর্ত্তি অর্জ্জিত হইতে পারে, এমন আর কিছুতেই নয়। রাজা তাহা শুনিয়া তৎকালের প্রধান প্রধান কবি ও পণ্ডিতদের আহ্বান করিয়া শিশুপাল বধ বিষয়ে একটি কাব্য রচনা করিতে আদেশ দেন এবং উক্ত কাব্য সম্পূর্ণ হইলে পণ্ডিতগণকে পুরস্কৃত করেন। তৎকালে সংকলন গ্রন্থের খুবই প্রচার ছিল। যৌথ চেষ্টায় যে একখানি ধারাবাহিক কাব্য হয়, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই কাব্যখানি। কে যে Editor-in-Chief বা সম্পাদকপ্রধান ছিলেন তাহার আভাস পাই না বটে, কিন্তু রাজশ্রী নামাঙ্কিত হইয়া কাব্যখানি সাহিত্যে অমর হইয়া আছে। ইহার সম্পাদন কিরূপ হইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকাশ—

"তাবদ্ভাঃ ভারবের্ভাতি যাবৎ মাঘস্যনোদয়ঃ
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ কচ ভারবী॥"

যতদিন মাঘের উদয় না হইয়াছিল ততদিন ভারবীর দীপ্তি ছিল। কিন্তু নৈষধ কাব্যের প্রকাশে ভারবীই বা কোথায় গেল, মাঘই বা কোথায় গেল? নৈষধে গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু অপর দুইখানিতে গ্রন্থের নামা-ঙ্কিত, গ্রন্থকারের পরিচয়ে পরিচিত। এই শ্লোকে আর একটু ইঙ্গিত

আছে। মাঘমাস হইতে রবির দীপ্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং অন্য জ্যোতির আভা রবির বৃদ্ধির সহিত ম্লান হইতে থাকে। উপরোক্ত শ্লোকের প্রত্যুত্তর স্বরূপ অন্যত্র আমরা আবার ইহাও দেখিতে পাই—

"নৈষধে পদলালিত্যং, ভারবেরর্থ গৌরবং
উপমা কালিদাসস্য মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ ॥"

অর্থাৎ পদলালিত্যের জন্য নৈষধ (শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত কাব্য) অর্থ গৌরবে ভারবী (কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ কাব্য) ও উপমার জন্য কলিদাস প্রসিদ্ধ, কিন্তু মাঘে (শিশুপালবধ কাব্যে) এই তিন গুণই আছে।

সৌভাগ্যক্রমে বাংলা কাব্যক্ষেত্রে উপমায় সিদ্ধহস্ত একা রবীন্দ্রনাথে উপরোক্ত তিন গুণের একত্র সমাবেশ পাই। আর মাঘমাসে রবির দীপ্তির যে ইঙ্গিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে আছে, তাহাও অন্যপ্রকারে স্মরণীয়। আকাশে কণ্যাগামী তপন তুলোত্তীর্ণ হইয়াও তাদৃশ তেজবান হয় না পরন্তু মৃয়মানই থাকে। মাঘমাসে মকরপৃষ্ঠে রবি ক্রমবর্দ্ধমান তেজের আধার হয়। আমাদের ধরার রবিরও এই ব্যবস্থা ছিল। তাঁহার পিতৃপ্রবর্ত্তিত ৭ই পৌষের মেলা ও ১১ই মাঘের উৎসব সুসম্পন্ন করিবার জন্য, বাংলার শারদোৎসবের পরই, লোকচক্ষুর অন্তরালে কবিকে নবতেজে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা, দার্শনিক প্রবন্ধ, গান রচনা ও সুরযোজনায় এবং গায়কদের শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হইত। পরে মাঘোৎসবে নিজেদের ভদ্রাসনে, সমাজে এবং [illegible] স্থানে প্রতি বৎসর পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে নিবন্ধের দীপ-শলাকা [illegible] সুরের আতসবাজি ফুলঝুরিতে, দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেন। [illegible] যে এগার বৎসর তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন [illegible] কথাই নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনে ও রচনায় [illegible] অবিচ্ছিন্ন প্রভাব বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষী মাত্রেই অনুভব করিবে।

"দ্বারিকানাথ ঠাকুর ইংরাজিতে কিংবা বাংলায় কিছুই [illegible] অনেক লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন এবং [illegible] বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি ইংরাজিতে [illegible]

ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এখনকার দিনের ধারণা অনুসারে সাহিত্যিক বলা চলে না। তাঁহার পিতা ৺রামলোচন ঠাকুরও সাহিত্য ও সঙ্গীত রসের একজন সুবিচারক হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন, অথচ কখনও কিছু লিখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের এই পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে ভাব-রসের যথেষ্ট সমাবেশ ও সাহিত্যবোধ ছিল। তথাপি কাহাকেও আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যিক বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না।

পাণিনী তাঁহার (৪।২।৫৯) সূত্রে "তদধীতে তদ্বেদ" ঠক্ প্রত্যয় বলিয়াছেন। এই অর্থে কেবল ঠক্ নয় যথাসম্ভব অন্য প্রত্যয়ও হয়। ইহাই ইক্ প্রত্যয়। পাণিনীর মতানুসারে দেখা গেল বেত্তি (অর্থাৎ জানা) ও অধীতে (অর্থাৎ অধ্যয়ন করা) দুইই বুঝায়। সুতরাং ইক্ প্রত্যয়ান্ত সাহিত্যিক শব্দে সাহিত্যরসজ্ঞ ও সাহিত্যপাঠক উভয়কেই বুঝাইবে। পূর্ব্বকালে গদ্য ও পদ্য রচনা উভয়ই কাব্য বলিয়া আখ্যাত হইত, এবং লেখক বলিলে যিনি লিখেন, অর্থাৎ লিপিকার বা নকলনবীশ তাহাকেই বুঝাইত, বর্ত্তমান অর্থে সাহিত্যস্রষ্টাকে বুঝাইত না। সাহিত্যিক কথার বঙ্গভাষায় প্রচলিত অর্থ ব্যাকরণ সঙ্গত কি না সন্দেহ। ঠক্ প্রত্যয়ে পৌরাণিকে, বৈয়াকরণিকে রচয়িতা বুঝাইত না। বুঝাইতে হইলে ব্যাকরণকার, পুরাণকর্ত্তা প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হইত। বৈদিক্, তান্ত্রিক, শব্দে ইহা সুস্পষ্ট। যে তন্ত্র জানে, তন্ত্র পাঠ করে বা তাহার অনুশাসন অনুসারে স্বস্ত্যয়নাদি অনুষ্ঠান করে তাহাকেই তান্ত্রিক বলে। তন্ত্রপ্রণেতাকে তন্ত্রকার বা তন্ত্রকর্ত্তা বলা হয়। আনুষ্ঠানিক শব্দে ইহা আরও সুস্পষ্ট—আচারণকারীদের বুঝায়, পদ্ধতিকার বা প্রণেতা নয়। ভবদেব ভট্ট অনুষ্ঠানগুলি লিপিবদ্ধ করিলেও আনুষ্ঠানিক নহেন। গ্রন্থকর্ত্তাদের সেবানিরত ও রচনার প্রচার কার্য্যে যাঁহারা আনুকূল্য বা সহায়তা করিতেন, তাঁহাদেরও সাহিত্যিক আখ্যা দেওয়া হইত। পরন্তু, যাহারা কিছু রচনা না করিয়াও সাহিত্যিক চিন্তায় দিনযাপন করিতেন এবং সংস্কৃতসাহিত্যের রসাস্বাদন করিতেন, তাঁহাদেরও শ্রেণীনির্দ্দেশ কালে

সাহিত্যিক বলা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগ হইতে ছাপাখানা সুলভ হওয়ায় ও ইংরাজী শিক্ষিত গ্রন্থকর্তার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় এবং জনসাধারণের মধ্যে পুস্তকক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, উপরন্তু, সভা-সমিতি গঠিত হইয়া তাহাদের প্রচারিত মুখপত্র ও পুস্তিকার প্রচলন হওয়ায় ব্যক্তিবিশেষের অর্থানুকূল্য বা নামের ভার দিবার অপেক্ষা তিরোহিত হয়। আমাদের এই দুই উদাহরণ উপরে দেওয়ায় কেহ যেন মনে না করেন যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বা ততোধিক গ্রন্থ অপরের লিখিত। যেমন আধুনিক কালে জুনিয়াস (Junius) ওমরখায়াম (Omar Khyam) বা সেক্সপীয়ার (William Shakespeare) বলিয়া কোন লোক ছিল কিনা, গবেষণাকারীরা ধার্য্য করিতে পারেন নাই। একটি মার্কিন মহিলা Dalia Bacon ১৮৫৭ সালে Philosophy of Shakespeare's plays unfolded লিখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন ঐ নামে এক নট ছিলেন কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নের উপযোগী বিদ্যা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একদিন হাসিয়া বলেন, "রিসার্চএর ক্ষমতা অদ্ভুত, একদিন শুনিবে 'রবিঠাকুর' বলিয়া কোন লোক ছিল না। বোলপুর অঞ্চলের অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তি (তাঁহার সেক্রেটারির নাম) ঐ ছদ্মনামে লিখিত।"

রাজা বিক্রমাদিত্যের নামে অব্দ, বিক্রম সম্বৎ চলিতেছে এবং কালিদাসের মত নয় জন প্রধান পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষক বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি। তিনি নিজেও গুণগ্রাহী সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাদি নাই। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই মৌলিকতার জন্য সর্ব্বত্র সমাদৃত ও খ্যাতাপন্ন। তাঁহার সকল রচনা, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধাবলী, এমন কি সমালোচনা তাঁহার নিজের বিশিষ্ট লিখন ভঙ্গীতে চিরপরিচিত ও চিরাদৃত থাকিবে। প্রত্যেকটিতে তাঁহার নিজের ছাপ অঙ্কিত, তাহা অননুকরণীয়।

তাঁহার গানের প্রত্যেকটির সুর তাঁহার নিজের দেওয়া, তাঁহার হাতের ছবি বা চামড়ার উপর তোলা নক্সা তাঁহারই চিত্রাঙ্কনের

(Design) নূতনত্বের সাক্ষ্য চিরদিনই বহন করিবে, সন্দেহের লেশমাত্র তাহাতে স্পর্শ করিতে পারে না। এমন কি তাঁহার ইংরাজি ভাষায় উপস্থিত মত বক্তৃতা ও ইংরাজি লিখিবার ক্ষমতা শুধু যে আমাদের প্রত্যক্ষ তাই নয়, তাহার বস্তু ও বিন্যাস রবীন্দ্রনাথকে চিনাইয়া দিবে। গীতাঞ্জলীর ইংরাজি অনুবাদ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার সময়ে কোথাও কোথাও সন্দেহ উত্থিত করে, কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিপরিচিতিও দীর্ঘকাল কেবল বাংলা রচনায় রত থাকায় তাঁহার বিদেশী ভাষায় দখলের সংবাদ এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই জানিতেন না। পুস্তকের পর পুস্তকের অবিরাম স্রোতে সে ভ্রান্ত ধারণার তিল-মাত্র আর অবশিষ্ট রহিল না। তিনি যে একজন সুদক্ষ ও প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিশালী ইংরাজি গদ্য লেখক তাহা এক্ষণে সর্ব্বজনবিদিত ও তাঁহার রচনার সৌরভে পৃথিবীর সর্ব্বদেশ আমোদিত।

আমরা অন্যান্য পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যিকস্রষ্টার ভাবেই দেখিয়াছি; এখানে এই পরিচ্ছেদে সাহিত্য ব্যতিরেকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সৌজন্য, সামাজিকতা, পরকে সাহায্য করার চেষ্টা ও বিশেষভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের, আর্ট ও আহিতাগ্নিদের পরিপালক ও পোষ্টা রূপেই দেখিবার প্রয়াসী হইয়াছি। এইখানেই যেমন তাঁহার মাঘ বা বিক্রমাদিত্যের সহিত গুণের সাদৃশ্য, তেমনি সহজ মিশিবার ও সখ্যতা স্থাপনের ক্ষমতায় তিনি বিখ্যাত পেট্রন অফ্ লেটার্স-মেসিনাসের (Mæcenas) অনুরূপ। ইঁহার পুরানাম C. Cilnius Mæcenas। ইনি খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে রোমের প্রসিদ্ধ সম্রাট অগাস্টাস্-এর (Augustus) বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। সামান্য রকম সাহিত্য রচনায় পটু থাকিলেও, সকল গুণশীল ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষক বলিয়া তাঁহার সমধিক খ্যাতি ছিল। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার নাম সে কারণে প্রবাদবাক্য তুল্য ব্যবহৃত হয়। তাঁহার ভোজনাগার তরুণ সাহিত্য রচনাকারীদের জন্য সর্ব্বদা অবারিতদ্বার থাকায়, তাঁহার সামাজিকতা ও অতিথিবাৎসল্যের সুনাম সম্রাটের

যশকেও অতিক্রম করে। রবীন্দ্রনাথ নিজে খ্যাতাপন্ন লেখক হইয়াও অন্যান্য সমজিবীদের যে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত তুলনা পাওয়া যায় ভর্তৃহরির কথায় ভট্টিকাব্যের প্রারম্ভে,—

"অভূন্নৃপো বিবুধ সখঃ পরন্তপঃ
শ্রুতান্বিতো দশরথ ইত্যুদাহৃতঃ।"

দশরথ নামে নৃপতি স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন এবং পণ্ডিত-মণ্ডলীর সখা ছিলেন।

বঙ্গের রাজা আদিশূরকে 'বিবুধ সখঃ' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি এদেশে উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে উচ্চতর শ্রেণীর পণ্ডিত বেদবিৎ ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভূমি দান করত বঙ্গবাসী করান। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, দেশের সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঐ উচ্চ সংস্কারাপন্ন লোকেদের বসবাস ও বৈবাহিক আদান প্রদানে এখানকার ব্রাহ্মণকুল উন্নত ও যাগযজ্ঞে শিক্ষিত হইবে। তাঁহাদের পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিত, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের আদি পুরুষ এবং যশোহর পীঠাভোগ কুশারী-বংশের আদি পুরুষ বিধায়, [illegible] বংশ প্রবর্ত্তক। মহাভারতীয় কৃষ্ণের উপাখ্যান লইয়া 'বেণী সংহার' নামে এক নাটক প্রণয়ন করিয়া তিনি রাজাকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ করেন। সেই যুগেই মুখোপাধ্যায় বংশীয়দের আদি পুরুষ, [illegible] শ্রীহর্ষ, উপরোল্লিখিত নৈষধ কাব্য, অর্থাৎ নিষধের রাজা [illegible] নলের নানা বিপর্যায় অতিক্রমে শেষে [illegible] প্রেমের [illegible] ঘোষিত করিয়া যে চরিত্রকথা সৃজন করেন, তাহা [illegible] শুনাইয়া তুষ্ট ও অভিনন্দিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের শুধু লেখায় নয়, তাঁহার [illegible] অনুগামী দেশের সৃষ্টি করিতে পারিতেন যাহা [illegible] অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ [illegible] ক্ষেত্রে একাধারে পুশকিন (Pushkin), [illegible] ([illegible]) ও

র‍্যাবি (Rabbi) রূপে * বাণীমন্দিরের তীর্থযাত্রীদের আশা ও আনন্দের প্রতীক হইয়া বিরাজিত আছেন। আমরা দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মময় জীবনে দেখি, বৈষম্যের আবেষ্টনে একটি অপরাজেয় প্রকৃতির অভাবনীয় স্ফুরণ; আর রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে ও সমসাময়িকদের উপর প্রভাব বিস্তারে দেখি, একটি স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে অভাবনীয় রহস্য-জটিল প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি ও বিচিত্র বিকাশ। পিতা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বহুকাল ধরিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসুদের গোষ্ঠীপতিত্ব প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন, আর পুত্র ললিতকলার সাম্রাজ্যে সাহিত্যজিজ্ঞাসুদের গোষ্ঠীপতিত্ব Venerable Patriarch-এর মত আজও কৃতিত্বের সহিত করিতেছেন।

তবে পিতামহ বা পিতার ন্যায় বিরুদ্ধ ভাবাপন্নকে স্বদলভুক্ত করিতে কখনও প্রয়াসী হন নাই। তাঁহার পক্ষে তাহাদের সঙ্গ অবাঞ্ছনীয়; দলভারী করার বা অর্থসংস্রব রাখার তিনি পক্ষপাতী নন, কারণ তাহাতে দলপতিকে হীন করে ও প্রকৃত সখ্যতার ব্যাঘাত জন্মায়।

তিনি দীর্ঘজীবন ব্যাপিয়া বহু পুস্তকের ভূমিকা, সমালোচনা, পুষ্পাঞ্জলি, মঙ্গলাচরণ, মুখবন্ধ বা শুধু আশীর্ব্বাণী প্রদান প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন। এমন কি, আধুনিক কালের সকল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, সাময়িক পত্র, শিশু সাহিত্য প্রচার তাঁহার শুভেচ্ছা পাথেয়রূপে গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকেই জয়যাত্রা সুরু করিয়াছে। নিজের শরীর ও সময়ের অস্বচ্ছন্দতা সত্ত্বেও তিনি এ ভাবে জ্ঞানমন্দিরের বহু সেবককে অকাতরে উদ্যম ও উৎসাহদান করিয়াছেন। ইহার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বড় অল্প নহে। বিলাতে অবস্থান কালে অনেকগুলি ইংরাজী পুস্তকের সমালোচনা বিলাতীয় সাময়িক পত্রে লিখিয়াছেন। এদেশীয় গ্রন্থকারদিগের রচিত ইংরাজি পুস্তকের অনেকগুলিতে তাঁহার লিখিত ভূমিকা দেখা যায়। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক অধ্যাপক স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ (Sir Satbapalli Radhakrishnan) এ বিষয়ে তাঁহার লেখনীর বদান্যতা

* নাম পরিচিতির জন্য পরিচ্ছেদের শেষে টীকা দ্রষ্টব্য।

লাভ করিয়াছেন। এগুলি কোন উৎসাহী যুবক একত্র সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে একখানি নানাবিষয়িনী সুখপাঠ্য প্রবন্ধমালা হইতে পারে।

যখন বিলাতে মিষ্টার H. G. Wells আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকদের মিলন সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে P. E. N. (Players, Playwrights, Editors, Novelisto) Society প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাহার ভারতীয় শাখা বোম্বাই সহরে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং রবীন্দ্রনাথ তাহার সভাপতি মনোনীত হন। সে সভার কার্য্যে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। বিদেশী সাহিত্যিকদের প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগ কখনও উপেক্ষা করেন নাই। গ্যেটে শতবার্ষিকী, শেলী শতবার্ষিকীর কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জাপানী কবি নগুচিকে অভিনন্দন ইহার আর একটি নিদর্শন। কিন্তু জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণে কবির স্পষ্ট প্রতিবাদিতায় এই মৈত্রী অন্তর্হিত হয়। C. F. Andrews এবং Pearson সাহেবের প্রতি কবির এই সহজ শ্রদ্ধা কিরূপে গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

তাঁহারই সাদর আহ্বানে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী অধ্যাপক [illegible] ভারতে আসিয়া অনেকদিন তাঁহার অতিথিরূপে অবস্থান [illegible] ইহা ভিন্ন বহু ইউরোপীয় অভ্যাগতগণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার বিশ্ব[illegible] পরিচালিত সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বজাতীয়দের উপযুক্ত [illegible] বিরাট অতিথিশালায় থাকিয়া তাঁহার সঙ্গ ও সৌজন্য [illegible] উত্তর-ভারত, বোম্বাই, সিংহল ও দাক্ষিণাত্য হইতেও [illegible] শান্তিনিকেতন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিদ্যাভবনগুলি দেখিবার [illegible] গেষ্ট হাউসে (Guest House) অবস্থান করিয়া, [illegible] যত্ন ও সৌজন্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। [illegible] পুষ্পভাণ্ডে রাজরোষে নিপীড়িত নির্ব্বাসিত [illegible] ইতালীয়, পোল ও ইহুদি সাহিত্যিকগণের [illegible]

অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়দের মান রক্ষা করেন। সেইরূপ সহানুভূতি সংগ্রামকালীন স্বাধীনতাপন্থী চীনেদের প্রতি জ্ঞাপন করিয়া ভারতের সহিত তাঁহাদের যোগের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। ইহাতে মানবতার হৃদয়ের দাবীর জয়ই ঘোষণা করে।

Pushkin (*Vide* Short Stories from Russian Authors by R. S. Townsend London 1924)

Post-revolutionary Russia and its writers do not come within the scope of this book. The transition between the pre-and post-revolutionary periods is represented by Maxun Gorky, who is still the man of the day at the present time. Pushkin, so to speak, represents the majestic entrance to the temple of Russian Literature. Altogether, one of Russia's greatest poet and prosaist, Aleksandr Sergvervich Pushkin (1799-1837) was,—as Dostoevsky has appropriately called him,—a universal mind and soul, and has from the outstart of Russian literature given a universal significance to its national ideas. In a fantastic ghost story the back ground is strongly realistic and is told with an entrancing power of imagination, yet with sufficient psychological motives to make it real. Pushkin's genius was of a composite nature. There is an all-pervading atmosphere of inner truth in his works which has ever since been characteristic of Russian Literature, terminating with Leo Nikolævitch Tolstoy (1828-1910). Greatly influenced as Pushkin was by the genius of Shakespeare and Byron he was a

romantic poet in the western sense himself, with at the same time a deeply national vein. He gave Russia her modern literary language in verse and prose and created perfect models in poetry, drama, novels and short story. He was Peter the Great of Russian Literature.

Maecenas (*Vide* Chambers's Twentieth Century Dictionary) n. a. Roman Knight who befriended the poets Virgil and Horace; any rich patron of art or literature.

Rabbi (*Vide* Fowler's Oxford Dictionary) Hebrew-- a high priest with specialised episcopal functions. An authority on laws and doctrines amongst the Jews.

Patriarch (*Vide* Chambers's Dictionary) One who governs his family by paternal right (Biblical). One of the early heads of families from Adam downwards to Abraham, Jacob, and his sons (Eccl). In Eastern Churches, a dignitary superior to an Archbishop.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব

রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের উল্লেখ এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যে সকল গুণে মানুষ মানুষকে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার হৃদয় কাড়িয়া লয়, বিধাতা সে সকল গুণই রবীন্দ্রনাথকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিরাণীর স্বহস্ত-লিখিত পরিচয়-পত্র প্রিয়দর্শন কমনীয় মূর্ত্তি সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রূপের জন্য সে পরিবার সমগ্র বাংলাদেশে খ্যাতাপন্ন ; কিন্তু সে পরিবারেও রবীন্দ্রনাথ "গণ্য সুন্দর সুন্দরের মাঝে।" রসরাজ অমৃতলাল বসু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, পাঠদশায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখিয়া গ্রীক আদর্শের পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যের কথা তাঁহার মনে উদয় হইত। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অপেক্ষাও, সু-অবয়ব বিশিষ্ট, হাড়চওড়া, দীর্ঘচ্ছন্দ রবীন্দ্রনাথে, এই পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য আরও একটু প্রস্ফুট ভাবে বিকশিত। সৌভাগ্যক্রমে সুদীর্ঘ ৮১ বৎসর বয়সেও রবীন্দ্রনাথ জীর্ণ শীর্ণ বিকলেন্দ্রিয় নন। তাঁহার চোখের দিব্যজ্যোতি এখনও অম্লান ও অমিততেজের পরিচায়ক। তাঁহার প্রতিভা আজও হীনপ্রভ হয় নাই। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ, সৌষ্ঠবমণ্ডিত অবয়ব ও প্রতিভা-সমুজ্জ্বল বদন জনতার মধ্যেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চক্ষু ফিরাইতে ফিরিতে চায় না, নয়ন ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়।

"মহিলা"র কবি লিখিয়াছেন—

"স্বভাব না জানি যার,
আগে মুখ দেখি তার,
প্রকৃতি পটের পরে আকৃতি দর্পণ।
মুখ দেখে বুঝা যায় বুকই কেমন।", ইত্যাদি।

(৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)

মণীষার আধার রবীন্দ্রনাথকে সুন্দর সুতনু দেখিয়া, তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা ও চিন্তাশীলতা বুঝা গেলেও, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী মনের গতি ও কল্পনার ঐশ্বর্য্য অনুমান বা অনুধাবন করা সাধারণ নয়নের সাধ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের বহিঃ-সৌন্দর্য্য তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্য্যের সম্যক পরিচয়ের জন্য মনকে স্বতঃই ব্যগ্র করিয়া তোলে। তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য হইলেই, তাঁহার কথোপকথন ভঙ্গীর অপূর্ব্ব মনোহারিত্বে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। কথোপকথন কালে, তাঁহার নয়নে বদনে ভাবের বৈচিত্র্য, তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর, তাঁহার বাক্যে নানা রসের, অবতারণা, কৌতুকপ্রিয়তা এবং তৎসহ স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা ও সৌজন্যের সমাবেশে, সর্ব্বশুদ্ধ হৃদয়ের একটা তরুণোচিত সরসতা শ্রোতার উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার কণ্ঠস্বরের ব্যাপকতা ও ক্রীড়া-নৈপুণ্য অনন্যসাধারণ। বৈচিত্র্য, চাঞ্চল্য, ও জটিলতা লইয়াই জীবন প্রকাশ পায়, এবং এই সকল উপাদানের বিশেষ সংমিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিপূর্ণ; সুতরাং বিশ্লেষণ করিয়া [illegible] নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক,

"বাহিরে থাকুক মধুর মূর্ত্তি
সুধামুখের হাস্য,
তরুণ চোখে সরল দৃষ্টি
করব না তার [illegible]

কিন্তু তাঁহার নয়নের ভঙ্গী ও ওষ্ঠের সূক্ষ্ম হাসির [illegible] পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ, বা যাঁহারা তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল [illegible] মিশিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন [illegible] নলিনীতুল্য নয়ন দুটী, না কবির চক্ষু না [illegible] এক সময়ে তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে বলিয়াছিলেন [illegible] ঈশ্বরেতে থাকে—সর্ব্বদাই [illegible] যায়; যেন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব [illegible]

নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে।" কবির চক্ষু ক্যালকেলে, উদাস, ভাববিহ্বল, আনন্দ বিস্ময়ের উপভোগে কতকটা অন্যমনস্ক। রবীন্দ্রনাথের চক্ষু কখনও অন্যমনস্ক নহে বরং শুদ্ধমনস্ক এবং অন্তরভেদী কতকটা লক্ষ্যানুসরণরত— একাগ্র দৃষ্টি তুল্য, আসন্নকে অতিক্রম করিয়া অবাস্তবের সন্ধানে কখনও যে তাহা যাইয়া থাকে, তাহাতে তাহার আভাষ মাত্রও নাই। কথোপকথন কালে, রবীন্দ্রনাথ নিজের মনোভাব যে ক্ষেত্রে অপরকে জানাইতে অনিচ্ছুক, সে ক্ষেত্রে তিনি মৌনী। কিন্তু যেমন আলোকচিত্রের সুগ্রাহী কাচখণ্ডের নিকট আলোকের কণামাত্রও নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া যায়, সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ অনুভূতি চির অভ্যস্ত সংযমের আবরণ সত্বেও প্রিয় হউক অপ্রিয় হউক তাঁহার চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র ভাববৈলক্ষণ্য আনিলে তাঁহার নয়নে বদনে তাহার সাক্ষ্য দেয়। ইহা সব সময়ে কবির ইচ্ছাকৃতও নহে ... সাধারণের অলক্ষিত থাকিলেও, যে বোঝে সেই জানে।

"কবিতা রসমাধুর্যাং কবির্বেত্তি ন তৎকবি।
ভবানী ভ্রুকুটীভঙ্গীং ভবোবেত্তি ন ভূধর॥"

... নিষেধ, নিবারণ, অনুজ্ঞা, অভিযোগ, ক্ষোভ, অপ্রীতি বা ... তাঁহার নয়নকোনে ধরিতে, কেবল অন্তরঙ্গরাই সক্ষম।

বাঙ্গালীকে ধনে, মানে, যশে, স্মরণে, বিজ্ঞানে উন্নত করিবার আকাঙ্খা রবীন্দ্রনাথ চিরদিন পোষণ করিয়া আসিতেছেন। ভগবান করুন তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হউক। বাঙ্গালীকে কে চিনিত? বাঙ্গলাদেশকে কে জানিত? ... রবীন্দ্রনাথ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের ... আজ চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত ১৭টী বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তি-কৌমুদীর বিস্তার আমাদের মনে সেই "ক্ষৌণিপতি-বিজয়"র, শ্লোকের যথার্থতা স্মরণ করাইয়া দেয়, সবই মনে জাগিয়া হয়,

"শ্রীমন্নাথ তবাননে ভগবতী বাণী নরীনৃত্যতে।
তাং শ্রীশ্চ কমলা সমাগতবতী সোনাদিবক্ষ ত্বৈঃ।"

আর প্রাচীন কবির উচ্চারিত স্বস্তিবাচন যেন স্বার্থক ভবিষ্যত বাণী হইয়া আমাদের যুগের বাঙ্গলার বরেণ্য সন্তানের মূর্ত্তিমন্ত ললাটিকা হইয়াছে!

"কীর্তিশ্চন্দ্র করীন্দ্র কুন্দ কুমুদ ক্ষীরোদ নীরোপমা
ত্রাসাদ্দূর নিধিং বিলঙ্ঘ্য ভবতো নাদ্যাপিবিশ্রাম্যতি ॥"

মহারাজ!

তোমার মুখমণ্ডলে নৃত্যরতা দেবী-সরস্বতীর হ'ল আবির্ভাব। (তাই) দেখতে এলেন চঞ্চলা লক্ষ্মী, আর তোমার গুণে হ'লেন আবদ্ধ। চন্দ্রকিরণ, কুন্দ, কুমুদ বা গজরাজ ঐরাবত এমন কি দুধ-সাগরের জলের মতন অমল ধবল তোমার কীর্ত্তি, বাঁধা-পড়ার ভয়ে, তোমার সান্নিধ্য হ'তে চ'ল্‌লেন দূরে দূরান্তরে। অতিক্রান্ত হ'লেন সাগর, তবু আজও হ'ল না বিশ্রামের ভরসা ॥

ইটালিতে, সুইডেনে, জার্ম্মাণীতে, গ্রীসে, পারস্যে রবীন্দ্রনাথ রাজার অধিক সম্মান পাইয়াছেন। বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের পায়ে কীরিট-শোভিত মস্তক লুণ্ঠিত হইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর গৌরব—বাঙ্গলার গৌরব।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১৯শে ভাদ্র (ইং ১৯২১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবির ষষ্টিতম্ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় দেশের লোক তাঁহার শতায়ু কামনায় যে অনুষ্ঠান করেন, সেই রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে [illegible] সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পঠিত স্বকৃত কবিতা 'নমস্কার' হইতে [illegible] পাঠকদের উপহার দিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি।—

"স্ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যুহারা মৃত্যুঞ্জয় [illegible]
তাহারে মুখর যুগে রাখিল যে [illegible]
করিল যে, করাল যে, [illegible]
তবের নিধরে-লেখা [illegible]
[illegible]"

প্রতিভা-প্রভায় যাঁর ছিন্ন-তমঃ অজ্ঞতার নিশি,
আবেদনে আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি' মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম অরাতি,
শোণিত-নিষেক-শূন্য নৈপুণ্যের নিত্য পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !
রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনায় মৌনী-মগ্ন রাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জন ছাপায়ে
অত্যাচারি ফিরিঙ্গীর খাঁটো-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি রাজরোষ, উপরাজে দিল যে ধিক্কার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !
স্বদেশে যে সর্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
দিগ্বিজয়ী যার গানে সপ্তসিন্ধু আর দশদিক্
বিশ্বকাব্য-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি, বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎ প্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার চিত্ত-চমৎকার,—
নমস্কার ! তারে নমস্কার !
চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তি নিবেদন,
গুরু বলি শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারিযুগে আসন অক্ষয়
প্রাণ দেহে মূর্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে, ধ্যানী যে নিত্য স্ব-সাধনায়—
নমস্কার ! নমস্কার ! বারবার তারে নমস্কার !"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সমাবর্ত্তন ও দীপাচ্ছাদন

হুগলি জেলার কামারপুকুরের সেই সাধুটির * জীবন যেমন কালের দুই খণ্ডে প্রকাশ পায়, প্রথমটি আহরণ ও সঞ্চয়ে ২৫ বৎসর ব্যাপৃত, অপরার্দ্ধ পরমহংস রূপে জনহিতার্থে সেই আধ্যাত্মিক রত্নরাজির বিতরণে আরও ২৫ বৎসর কাটিয়া যায়, তেমনি আমরা বলিতে পারি রবীন্দ্রজীবনও দুই ভাগে সময় হিসাবে বেশ বিভক্ত করিতে পারা যায়,—

(ক) **ভাবের জীবন** কলিকাতা মহানগরীতে প্রথম চল্লিশ বৎসর তখন সৌন্দর্য্য বোধ (æsthetic consciousness) তাঁহার মধ্যে প্রবল।

(খ) **কর্ম্মের জীবন** বোলপুর শান্তিনিকেতনে, উত্তরার্দ্ধ প্রায় চল্লিশ বৎসর, 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' ও 'বিশ্বভারতী' সৃষ্টি, ও তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত। তখন তাঁহার মধ্যে সামাজিক বোধ (social consciousness) ও জনহিতৈষণা বোধ (service to mankind) প্রবল। [illegible] প্রতিষ্ঠানটির অঙ্গীভূত ছিল, রাজসরকারের সহায়তা বা প্রভাব [illegible] দেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার ও পল্লিবাসীদের জীবনযাত্রা পুনর্গঠনের [illegible] উপদেশ দান ও কার্য্যে পরিণত করার জন্য [illegible] বিতরণ। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীনিকেতনের কৃষি ও শিল্প [illegible] উদ্ভব ও স্থাপনা। এগুলি কবিবরের বিশ্ববিজয়ী [illegible] কল্পনার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। যেখানে এগুলি [illegible] ভূমিকে অধিক পুণ্যশালী করিতে তিনি [illegible] আত্মত্যাগ ও প্রাণরসের অভিষিঞ্চনের জন্য [illegible]

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম ১৭।২।১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ, [illegible] খৃষ্টাব্দ।

উৎসবের পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা তথায় এখন সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে তিনি তাঁহার পিতার অনুষ্ঠিত পৌষের মেলাটিকে অধিক মনোরম ও কার্য্যকরী করেন। তাঁহার পিতার দীক্ষা-দিবসটি তিনি কতটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১২৫০ বঙ্গাব্দ ৭ই পৌষ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম' প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেন ও তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন যেন সেই সঙ্কল্পের বিকাশ রূপে প্রস্ফুটিত হয়। তাঁহারও জীবন সমকালিক দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করা যায়। ১৮১৭ খৃঃ হইতে রবীন্দ্র জন্ম পূর্ব্ব ১৮৬১ খৃঃ পর্য্যন্ত পৌত্তলিক পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে যাপিত। তন্মধ্যে শেষার্দ্ধ নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয়ে নিয়োজিত ও ১৮৬১ খৃঃ হইতে দেহত্যাগ ১৯০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত শেষ চুয়াল্লিশ বৎসর অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান স্থাপনে, উৎসবরচনায় ব্রহ্মচিন্তায় ও বেদ-সন্ন্যাসী গৃহস্থের জীবন পালনে ও ঈশ্বরোপলব্ধির সহজ ভূমি নির্দ্ধারণে ভক্তির পথে পরিচালিত। প্রতিজ্ঞা বা সংকল্পের দুই বৎসর পরে তিনি ঐ দিবসের স্মরণার্থ তাঁহাদের গোরুটির বাগানে নব দীক্ষিতগণের মিলনের জন্য এক উৎসবের আয়োজন করেন। ডিসেম্বর মাসের এই উৎসবই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উৎসব। ইহা দেবেন্দ্রনাথের জীবনেই কেবল নবযুগের সূচনা নহে, নবগঠিত সম্প্রদায়েরও নবজীবন লাভের স্মরণীয় তিথি বা তারিখ। কারণ, এক ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের দ্বারা আকৃষ্ট, পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধন মানসে মানুষের একটি দলের সৃষ্টি, বা প্রকৃতপক্ষে একটি 'সমাজ' এই উৎসবেই রূপ ধারণ করিল। এক স্থানে সপ্তাহে দুই ঘণ্টাকাল সমবেত উপাসনায় সে মত হৃদ্যতা হয় না, সকলেই স্বীকার করিয়া লইল। একদিনের জন্য অন্ততঃ সাধারণ হিতার্থে নিজের নিজের কার্য্য, বৃত্তি ও প্রবৃত্তি, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, স্বার্থানুসন্ধান প্রভৃতি জীবের "বাঁচা রক্ষার জন্য ধস্তাধস্তি" (struggle for existence) ব্যাপারের প্রয়োজনীয় গুণাবলী সাত্ত্বিক আনন্দলাভের জন্য সাময়িক

যখন আপনা হইতেই আসে। সদবৃত্তির উৎস উন্মুক্ত করাতেই উৎসবের সার্থকতা—স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, পরস্পরের কষ্ট নিবারণ ও সুখ বৃদ্ধির প্রতি যত্ন, উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বতস্ফূর্ত্ত হইয়া খেলিবার সুযোগ পায়। ১৮৫০ সালে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' পদের সৃষ্টি হইল ও প্রতিজ্ঞা পত্রে স্থান পাইল। মাঘোৎসবের বিজ্ঞাপন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম বাহির হয়, তাহার নিম্নে প্রতিলিপি দিলাম—"বিজ্ঞাপন॥ ব্রাহ্ম্যসমাজ॥ আগামী ১১ই মাঘ মঙ্গলবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম্যসমাজ হইবেক। যাঁহারা তৎকালে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম্যসমাজে আগমন করিবেন। শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা। আচার্য্যঃ।" ১৮৩০ সালে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত Asiatic Journal সেপ্টেম্বর সংখ্যায়, সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের সংশ্রবে ব্যবহৃত দুটি নাম পাওয়া যায়, একটি "ধর্ম্মসভা" ও অপরটি "Brumha Subha"। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর ১০৫ পৃষ্ঠায় দুই দলের কলহের উল্লেখে "ব্রহ্ম সভা" বলিয়াছেন। হয়ত u অক্ষরের দ্বারা অ-কার ও a অক্ষরের দ্বারা আ-কার প্রকাশ করা বোধ হয় তখন রীতি ছিল, যেমন তত্ত্ববোধিনীর বিজ্ঞাপনে "ব্রহ্ম সমাজ" ও "ব্রাহ্ম্য সমাজ" য ফলা যুক্ত ব্যবহৃত হইত। পরবর্ত্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ এই মণ্ডলীর নাম "ব্রাহ্ম সমাজ" চিরদিনের ব্যবহারের জন্য স্থির করিয়া দেন। উত্তরকালে তাঁহার সাধনক্ষেত্র বোলপুরে "শান্তিনিকেতনে" এই সমাজের একটি স্মরণীয় দিন রক্ষাকল্পে, একটি "উৎসব" প্রতি বৎসর করিবার ব্যবস্থা দেবেন্দ্রনাথ করেন। গ্রামের পল্লীবাসীদের নিকট সমাজকে পরিচিত করিবার উদ্দেশে একটি মেলা ও মেলা-সংক্রান্ত জিনিস পত্রের বেচা-কেনারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন এবং তাহার সাফল্যের জন্য চেষ্টিত থাকিতেন। রবীন্দ্রনাথের পরিচালিত 'শান্তিনিকেতনে' ও 'বিশ্বভারতীতে' মহর্ষির দীক্ষার দিনটি বিশেষভাবে প্রতিবৎসর সম্পাদিত করিবার ব্যবস্থা, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তন করেন ও এক বৎসর এই উপলক্ষে

নিম্নোদ্ধৃত অভিভাষণ দেন :—

"শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্ম্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখি, তবে দেখতে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হ'য়ে আছে ; যে বীজ থেকে এই আশ্রম- বনস্পতি জন্মলাভ করেছে, সে হচ্ছে সেই দীক্ষা গ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্য ফল্‌চে, এবং আমাদের আগামীকালের উত্তর বংশীয়দের জন্য ফল্‌তেই চল্‌বে।

• • • •

মহর্ষির জীবনের একটি সাতই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃত পুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ ক'রে গিয়েছেন, তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কি রকম ক'রে প্রকাশ পেয়েছে, তা কারও অগোচর নেই। তার পরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের অবসানে সেই দিনটির শেষ হয় নি। আজও সে বেঁচে আছে ; শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তি ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠ্‌চে।

• • • •

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু চিরপ্রাণ তো তাদের স্পর্শ করে না—তারা ঘটচে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কেউই রাখচে না। কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন মুহূর্ত্তটিকে কখন খুঁজিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান—তার পরে তাকে কেউ না দেখুক না জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক, তাকে আবর্জ্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক—সে দিনকার এবং তার পরে বহুদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোন উল্লেখ না থাকুক—কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে—নিত্যকালের সূর্য্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে—সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান, তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এইজন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনীগৃহের প্রস্তর-কঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের দিকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছে। এই সেই ৭ই পৌষ, এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি ক'রেছে এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি ক'রে তুলচে।"

(অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর" ৮৬-৮৮ পৃঃ)

মহর্ষি তাঁহার প্রাণান্তের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ দিনটি স্মরণে রাখিয়াছিলেন ও সম্মান করিতেন। রুগ্ন শয্যায়, সেই তাঁর শেষ শয্যা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রদ্ধেয় দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোলপুর হইতে আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং ৭ই পৌষের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত হন। ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন। (মহর্ষির স্বরচিত জীবন-চরিতে" পরিশিষ্ট ১৭৮ পৃঃ) "তিনি দেহান্তের পূর্ব্বে কেবল 'বাড়ী যাইব, বাড়ী যাইব' বলিয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে তাঁহার ব্রহ্মধামে যাইবার জন্য ব্যাকুলতা জানাইতেন। ১৮২৬ শকের (খৃঃ ১৯০৫, ১৯ই জানুয়ারী) ৬ই মাঘ তারিখে বেলা ১-৫৫ মিনিটের সময়ে শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। * * * আমার প্রাত্যহিক কর্ম ছিল যে, কোন দিন তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতাম, কোন দিন দেওয়ানা হাফেজ, কোন দিন বা তাঁহার নোটবুক হইতে দুই একটি বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইতাম। সেই নোটবুক হইতে কয়েকটি [illegible] নিয়ে উদ্ধার করিতেছি।

নং ১২—"ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার অন্তরে আত্মীয়-কুটুম্ব [illegible] "অহং ব্রহ্মজ্যোতি" অতএব আমি তাঁহার অক্ষিকত সাক্ষী [illegible] তো আর চিরদিন এই সাক্ষী দিতে বাঁচিয়া থাকিব না, [illegible] নিকেতনে একটি মন্দির স্থাপন করিয়া গেলাম। সেই [illegible]

মন্দিরের চূড়ায় লিখিত ওঁকারই আমার প্রতিনিধি হইয়া চিরদিন সাক্ষী দিবে—"একং ব্রহ্মাদ্বীতি"।

দেবেন্দ্রনাথের এই মন্দির প্রতিষ্ঠা, সেই ভূমিতে যাহা তাঁহার ধ্যানস্থ অধ্যাত্ম বিচরণে পূত হইয়াছিল ও যেখানকার সেই শতপর্ণ (ছাতিম) বৃক্ষতল তাঁহার প্রধান মিলনতীর্থ ছিল, কেবল তাঁহার জনহিতাকাঙ্খার নিদর্শন নহে, বরং তাঁহার অভিপ্রায়ের মূর্ত্ত প্রতীক, যেন তাঁহার mission of life, অন্তরের চিরপোষিত বৃত্তিকে রূপ দিয়াছে, এবং উহা উত্তর কালে পথচারীগণের ভক্তির উদ্রেকে সক্ষম হইবে। উহা দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহাদের মনে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মধ্যে সেই চরম আশার বাণী নিশব্দে অঙ্কিত করিয়া দিবে যে,—তুঙ্গেঁয় পরমব্রহ্মকে ক্রমাম্বয় চিন্তার বিষয় করিলে, তিনি প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দ্বারা সে চিন্তাকে জয়যুক্ত করেন এবং 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম' ভাবে জীবকে আপ্লুত করেন। সে এক আনন্দময়সাফল্যতঃ অনুভবে 'ধন্যোহং কৃত কৃতস্চঃ', 'পূর্ণং পূর্ণমিদং' 'অদ্য মে সফলং জন্ম, তপশ্চঃ সফলং মম' রহস্যময় ভবসাগর কূলে মানবের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনে তৎসৎ ভাবের প্রতীতি জননের সাক্ষী, হৃদয়ঙ্গম, করিতে পারে। এ কার্য্যটিতে মার্কিন কবি লংফেলোর সেই সুন্দর ছত্রগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়,—

"Foot-prints on the sands of time,
Foot-prints, that perhaps another,
Sailing o'er life's solemn main,—
A forlorn and shipwrecked brother,—
Seeing shall take heart again."

দেবেন্দ্রনাথের বংশধরেরা তাই ছাতিমতলাটি বাঁধাইয়া তথায় একটি বেদী করিয়া রাখিয়াছেন ও মর্ম্মর-ফলক দ্বারা তাহার পবিত্রতা জানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহর্ষির দেহান্তে তাঁহার পার্থিব শরীরের ভস্মাবশেষ একটি রৌপ্যনির্ম্মিত আধারে করিয়া কলিকাতা হইতে ভক্তিভরে রবীন্দ্রনাথ লইয়া গিয়া তথায় স্থাপন করিয়াছেন এবং আদেশ দিয়াছিলেন যে,

তাঁহার নিজেরও দেহাবশেষ ভস্ম যেন তৎপার্শ্বে রক্ষিত হয়। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র তাহা পালন করিয়া তাঁহার আত্মার সদ্‌গতির ও তৃপ্তির জন্ম তাঁহার আত্মশ্রাদ্ধ কলিকাতায় না করিয়া সেই ছাতিমতলায় করিয়াছেন। রামমোহনের দলস্থ ও অনুবর্ত্তিগণ এবং 'ব্রাহ্মধর্ম্মের' কিশোর অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের সহযোগীরা হয়ত ইহাতে পৌত্তলিকতার পরিপোষণ ও নরপূজার প্রসার বৃদ্ধি কল্পনা করিয়া অমূর্ত্ত উপাসনার শোচনীয় পরিণাম জানে ক্ষুব্ধ হইতেন। রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে এ সকল রচনাও বুঝিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ সেই স্থানটিকে অধিক প্রাণবন্ত করিতে, আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানের ও চারুকলাসমন্বিত উৎসব ক্রিয়া তথায় প্রবর্ত্তন করেন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বালকদের প্রকৃতির সহিত হৃদয়যোগের সুবিধার্থ প্রত্যেক ঋতুরই আগমন উৎসবে নাট্যকথা, সঙ্গীত ও নৃত্যের দ্বারা একটি করিয়া দিন আনন্দ মুখরিত করা হয়। আবার তাহাদের সহিত [illegible] আনন্দের ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া মিলনের জন্য হলকর্ষণ, বীজবপন, [illegible] ছেদন, বৃক্ষরোপণ, প্রপা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কয়েকটি বার্ষিক উৎসব [illegible] করিয়াছেন। অর্থাৎ, সেই সকল অত্যাবশ্যকীয় গৃহস্থালী ও [illegible] ব্যাপারের সহিত ভগবানের পুণ্যময় নাম ও [illegible] দৈবোদ্দেশে শান্ত সমাহিত সম্ভ্রমযুক্ত [illegible] দ্বারা একটি সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও পরে নৃত্য গীতের [illegible] উৎফুল্লকারী পরস্পরের সম্প্রদানে উৎসবের পরিসমাপ্তি [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনকে সহায়ক [illegible] উপযোগী শ্লোক নির্ব্বাচন ও শ্রীমান নন্দলাল [illegible] অনুষ্ঠানগুলিকে বাহ্যিক সজ্জায় সুন্দর [illegible] কবি সফল হইয়াছিলেন।

দেশে বিদেশে এবং ভারতের [illegible] অপরিমেয় শ্রদ্ধা শুধু যে বাহ্যিক [illegible]

পরিণত হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবের প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কালিম্পং-এ অসুস্থ হওয়ার সংবাদে কলিকাতা হইতে বৃদ্ধ বয়সে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজন চিকিৎসক সমভিব্যাহারে তথায় গমন করেন ও দু'চার দিন দিবারাত্র তাঁহার সেবা করিয়া অতি সন্তর্পণে রেলযোগে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। রেল কোম্পানিও সহৃদয়তা দেখাইয়া অসুস্থ ব্যক্তির আরামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক সংবাদের জন্য এত লোক উদ্গ্রীব হইয়া তাঁহার বাড়িতে দিবারাত্র সকল সময়ে তাঁহার আত্মীয়দের প্রশ্ন করিতে যাইত যে, নিয়মিতরূপে ডাক্তাররা লিখিত বুলেটিন প্রচার করিতে বাধ্য হন। তাহা সংবাদপত্রে দৈনিক প্রকাশিত হইত ও বেতার সংবাদে প্রত্যহ ২।৪ বার করিয়া বিজ্ঞাপিত হইত। আসন্ন রবিহারার বেদনাবেগে বঙ্গভূমি ব্যাপ্ত হইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং পৃথিবীর সকল সুসভ্য দেশের মনীষীবৃন্দ মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল। পাঁচ ছয় মাস লোকে উৎকণ্ঠায় কাটাইয়াছে ও তাঁহার আরোগ্য কামনায় স্বস্ব গৃহে ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা জানাইয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন দিনমণি যেমন লোকের মনকে বিষণ্ণ করে, সেই রকম সকলে কবিকে যেন নিজের ঘরের লোক ভাবিয়া কিছু কাল স্ফূর্তিহীন থাকে ও পরে তাঁহার স্বাস্থ্য লাভে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার রচনাশক্তি অব্যাহত ছিল। অসীম ধৈর্য্যের সহিত শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াও নিত্যই রোগশয্যা হইতে কিছু না কিছু শ্রুতি-লিখনে যাহাকে কাছে পাইয়াছেন তাহাকে দিয়াই লিখাইয়াছেন। এমন কি কবিতা ও গান কত যে সে সময় মুখে মুখে রচনা করিয়াছেন, তাহার কিছু পরিচয় তাঁহার পরে প্রকাশিত 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'প্রান্তিক' পুস্তকে পাওয়া যায়।

পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ না করিলেও, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য অনতিকাল পরেই ৭ই আগষ্ট ১৯৪০ তারিখে

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর এক অনুষ্ঠান সমাবর্ত্তন উৎসবের ব্যবস্থা করিতে, তিনি ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও, কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্বস্থান বোলপুরে গমন করেন। এরূপ উৎসব ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও হয় নাই। আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কবির উপনয়ন সময়ে জোড়াসাঁকো বাড়িতে সমাবর্ত্তন ক্রিয়ার কথা বলিয়াছি। গুরু-গৃহে শিক্ষালাভ করিয়া গৃহী হইবার মানসে নব উপনীত ব্রহ্মচারীর প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া গুরু যে যাগ করিতেন ও গৃহস্থাশ্রম উপযোগী কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিতেন তাহাকে 'সমাবর্ত্তন ক্রিয়া' বলা হইত। আধুনিক কালে বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়া শিক্ষার্থিকে গ্র্যাজুয়েট Graduate স্বীকার করিয়া যে 'উপাধি-বিতরণ' উৎসব করেন—যাহাকে বলে (University Convocation) ইউনিভার্সিটি কন্‌ভোকেসান, তাহার বঙ্গভাষায় 'সমাবর্ত্তন' উৎসব পদ দ্বারা বুঝান হয়। ইহাতে যদিচ ভবিষ্যত জীবন-যাত্রার উপযোগী কিছু উপদেশ Vice Chancellor ডিগ্রিদাতা ছাত্র-গণকে সমবেতভাবে দিয়া থাকেন, কিন্তু প্রতিশব্দ নির্ব্বাচনে কিছু ভাবের পার্থক্য হইয়াছে। Convocation শব্দ পূর্ব্বে পোপের অধীনে ধর্ম্মসংক্রান্ত অপরাধের বিচারকমণ্ডলীকে বুঝাইত, পরে প্রবীণ অধ্যাপক-দের সম্মিলন ও বৈঠককে বুঝায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যাপকের দল এদেশে আসিয়া বৃদ্ধ কবিকে সম্মানিত করিতে ও 'ডাক্তার' উপাধিতে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট গণ্য করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু বিশ্বসংগ্রামের ফলে গমনাগমন বিপজ্জনক হওয়ায় তাঁহাদের আশা পুরিল না। সাধারণতঃ যাহা এরূপ প্রথায় হইয়া থাকে, প্রস্তাবিত গ্র্যাজুয়েটকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ডিপ্লোমা (Diploma) গ্রহণ করিতে হয়, তাহা রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যে [illegible] হওয়ায়, তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে হয়। [illegible] এই পরিবারের আর একজনকে গ্র্যাজুয়েট গণ্য করিবার অভিপ্রায়ে সম্মানসূচক 'ডাক্তার' উপাধি দিতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ

অধিবেশন (Special Convocation) আহূত হয়, কিন্তু তাঁহার কালাপানি পার হইতে ধর্ম্মে বাধে বলিয়া, সে কথা সভাস্থলে উল্লেখ করিয়া তাঁহার ডিপ্লোমা ও নিদর্শন প্রভৃতি এখানে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিলাতের টাইমস্ (Times) পত্রিকায় ইহার বিবরণ ও তদুপলক্ষে বক্তৃতাবলি প্রচার করা হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির জন্য পাথুরিয়াঘাটার বাবু (পরে রাজা) সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় Doctoris in musicus honoris causa বা 'সঙ্গীত-ডাক্তার' উপাধি ও তাহার বিশিষ্ট পরিচ্ছদ গাউন, বর্ণযুক্ত হুড ও টুপি প্রদান করেন। তাহারই কথা আমরা উপরে বলিলাম, কিন্তু এদেশে কোন বিশেষ উৎসব হওয়ার সংবাদ আমরা পাই নাই। একণে ৭ই আগষ্ট ১৯৪০ সালে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কথা কিছু লিপিবদ্ধ করি। ঐ বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট যাঁহারা ভারতে আছেন, সকলের নিমন্ত্রণ হয় ও অনেকেই স্বীয় স্বীয় বিশিষ্ট গাউনে ভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতের ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও গ্র্যাজুয়েট নিজেদের বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট হুড (উত্তরীয়) ও গাউন পরিধান করিয়া সভাস্থল আলোকিত করেন। সমগ্র ভারতের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ দিল্লীস্থিত ফেডারাল কোর্টের (Federal Court) প্রধান বিচারপতি সার্ মরিস্ গায়ার (Sir Maurice Gwyer) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলার ও সিণ্ডিকেট-এর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরূপে শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজেরাও তৎসমভিব্যাহারে ছিলেন। অক্সফোর্ডে এবৎসর সাধারণতঃ বক্তৃতা করিবার ভার যাঁহার উপর অর্পণ করা আছে, সেই পাবলিক্ অরেটার (Public Orator) এর পক্ষে বিচারপতি হেণ্ডার্সন কার্য্য করেন। ডাক্তার সার সর্ব্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন প্রসিদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক উপস্থিত থাকিয়া রবীন্দ্রনাথকে ভাইস্চেন্সেলারের নিকট প্রকাশ্য পরিচয় করিয়া দেন। Public Orator-এর লিখিত ল্যাটিন ভাষায় অভিভাষণ তাঁহার

প্রতিনিধি পাঠ করিলে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণজী ইংরাজি অনুবাদ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন, রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অভিনন্দন দ্বারা উক্ত উপাধি (Doctoris in literis honoris causa) গ্রহণ করেন। ঋগ্‌ বেদোদ্ধৃত মন্ত্র ও এই উপলক্ষে তাঁহার একটি রচিত স্বাগত সঙ্গীত 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে'র ছাত্রছাত্রী কর্তৃক গীত হয় ও পরিশেষে যযুর্ব্বেদীয় শান্তি পাঠে সভার পরিসমাপ্তি হয়। অভিভাষণটি নিম্নে দিলাম—

ভবন্তু উৎকতীর্থ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিভুবঃ।

এষোঽস্মি কশ্চিৎ কবির্ভারতবর্ষস্য

তং মাং সম্ভাবয়ন্তী সা কিল ভবতাং প্রত্নবিদ্যাভূমির্ [illegible] মানবধর্ম্মাম্নায়মেব মহাত্মমাবিষ্কর্তুমীহতে যস্তথর্ব্বঃ সাম্প্রত [illegible] গম্ভীরশ্চানতি পাত্যাশ্চসংবৃত্তঃ। গর্ব্বোত্তানং মে চিত্ত [illegible] বাচিকং প্রতিপত্তিং চৈত্যং প্রতীকমিবানশ্বরং মানবধর্ম্মাত্মনঃ [illegible] ভবতোঽত্র শান্তিনিকেতনে। যদেতদনন্তমুপায়নমানীত [illegible] মদ্দেশার্থঞ্চ চিরং তদবস্থাস্যতেঽস্মদ্‌হৃদয়েষু সম্পৎস্যতে চ [illegible] সাধারণ সংস্কৃতি সম্পত্তয় ইতি প্রতীয়ন্তু ভবন্তঃ॥

সম্প্রত্যয়ং কালঃ প্রবর্দ্ধতে যত্রাতঙ্কঃ। [illegible] নিরঙ্কুশং প্রবর্ত্ততে চ পশুচিত্তাস্পৃহা ভোগেসমুপচীয়মানে [illegible]

অস্মিন্‌ হি ব্যতিকরে কস্যাপি ভুবনস্যা [illegible] মোক্তির্ণাম কদাচিদ্‌ কবিজনোচিতেন প্রতীয়তে।

তথাপি দুঃসংযম্যতে কালপুরুষমপি [illegible] বয়মতীত্যাপোনং জীবামঃ প্রতীমশ্চ যদা [illegible] নিত্যমিতি তৈরস্মাভিঃ সেয়ং প্রতীতিরবশ্যং [illegible]

ক্ষেমং কদেতং নিখিলং [illegible] মতৈষা প্রতিপত্তির্বিহিতোৎকতীর্থ বিশ্ববিদ্যালয়েন [illegible]

মালোকবিস্তৃমেনং প্রতিষ্ঠিতম্। সভাজনীয় স্তবেন তস্য সপ্রণয়ঃ সঙ্কেতঃ সঙ্গর ইব দিবসানাং প্রশস্ততরাণামিতি প্রিবম্।

শান্তিনিকেতনম্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ

শকাব্দাঃ ১৮৬২

বঙ্গানুবাদ :—

হে উক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ! এই আমি ভারতবর্ষের একজন কবি, সেই ভারতীয় কবি আমাকে, সম্মানিত করিয়া আপনাদের প্রাচীন বিদ্যাভূমি নিশ্চয়ই আমার মানবধর্মস্বরূপ মহৎ বেদকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে, যাহার প্রয়োজন বর্ত্তমানে অত্যন্ত গভীর এবং অনতিক্রমণীয় হইয়াছে। এই মানবধর্ম বিশিষ্ট আমার অবিনশ্বর প্রতীকের ন্যায় আপনাদের প্রদত্ত এই বাচিক প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়া আমার পক্ষে চিত্ত স্ফীত হইতেছে। এই শান্তিনিকেতনে আমি আপনাদিগকে সাদিরে অভ্যর্থনা করিতেছি। কারণ আপনারা এই অমূল্য উপঢৌকন আমার ও আমার দেশের নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছেন; ইহা চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিবে, এবং তাহা আমাদের সাধারণ সংস্কৃত লাভের হেতু হইবে, ইহা আপনারা অবগত হউন। যে সময়ে মানবের আতঙ্ক বৃদ্ধি হয় ও গুণ সকল তিরোহিত হইয়া থাকে এবং নিরঙ্কুশভাবে স্বার্থপরতা বর্দ্ধিত হয় ও ভোগ বিষয়ে পশুজনোচিত স্পৃহা হয় বিজ্ঞানের দ্বারা সমুপচিত এই সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এতাদৃশ সময়ে বিশ্বব্যাপী সম্মিলনের কারণ কবিত্ব শক্তি সর্ব্বদাই প্রতীয়মান হয়। তাহা হইলেও কাল নিরন্তর তর্জন করিয়া সংবৃত হইতেছে, কিন্তু আমরা যে এই সময়কে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিব এবং জাত হইব যে আমাদের পরমার্থ লাভের জন্য নিত্যই বর্দ্ধিত হইতেছে সেই আমাদিগের এই প্রতীতি অবশ্যই স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে ইহা কোন অনাগত সময়ের মঙ্গলের হেতু। এই নিমিত্তই উক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই উপাধি আমি গ্রহণ করিতেছি। আমি ইহাকে দুর্ভাগ্যক্রমে দেখিতে নিশ্চয়ই জীবিত থাকিব না। সেই মঙ্গলকর দিন সকলের সম্মিলনের জন্য এই বন্ধুত্ব-সূচক সম্মানকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শান্তিনিকেতন — } ইতি—

২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৭ } রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* চন্দননগর নাগবাগানস্থিত কালিদাস চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন কাব্যব্যাকরণস্মৃতিসাংখ্যবেদান্ত তর্কতীর্থ মহোদয় এই অনুবাদটি করিয়া আমায় দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতি, তাহাও যেমন এই উৎসব দ্বারা সমর্থিত হইল, তেমনি জগতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সহিত পাংক্তেয় হইবার বিশ্বভারতীর দাবী পৃথিবীর একটি প্রাচীন বিদ্যাপীঠের দ্বারা এই উৎসবের সহযোগীতায় স্বীকৃত হইল। শিক্ষার ভিন্ন স্তরের পরীক্ষা, পরস্পরের মধ্যে গ্রাহ্য ও বিনিময়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুষ্ঠানটির গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধন মানসে ঋগ্-বেদের নিয়ে দুইটি প্রদত্ত মন্ত্রে, মণ্ডপে বুধমণ্ডলী সমবেত হইবার পর, সভার উদ্বোধন করা হয়। বৈদিক উচ্চারণে ও স্বরভঙ্গিতে উহা ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলীর দ্বারা সমস্বরে গীত হয়।

"স্বস্তি পন্থামনু চরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সং গমেমহি ॥"

ঋগ্ — ৫।৫১।১৫

বঙ্গানুবাদ—সূর্য্য এবং চন্দ্রের ন্যায় আমরা যেন নিত্যই মঙ্গলকর মার্গে পরিচালিত হই এবং দাতা অহিংসক ও বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত সততই মিলিত হই।

"যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ।"

ঋগ্ [illegible]

যাঁহারা অমর নিত্তিক ও ধার্ম্মিক এবং দেবলোকের ও [illegible] দ্বারা পূজনীয় এবং সম্মানিত, তাঁহারা অদ্য [illegible] প্রদর্শন করুন। এবং সেই সকল ব্যক্তি তাঁহাদের [illegible] দিগকে পালন করুন।

তৎপরে প্রতিনিধিদের সাদর আহ্বান [illegible] দানে, এবং উহা ইংরাজিতে ভাষান্তরিত করিয়া তাঁহাদের [illegible] হয়।

বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ করো মহোজ্জল আজ হে
বরপুত্র সঙ্ঘ বিরাজ হে।
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ করো, লহ জ্যোতির্দীক্ষা,
যাত্রীদল সব সাজ হে,
দিব্যবীণা বাজ হে,
এসো কর্মী, এসো জ্ঞানী,
এসো জনকল্যাণধ্যানী,
এসো তাপস রাজ হে।
এসো হে ধীশক্তি-সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে। রবীন্দ্রনাথ

তাহার পর উক্ষতীর্থ (Oxford) বিদ্যালয়ের বক্তার প্রতিনিধিরূপে হেণ্ডার্সন সাহেব ও ডাক্তার স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ সভাপতি সমীপে রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত করেন ও পরিচয়সূত্রে তথাকার রচিত ল্যাটিন ভাষায় অভিনন্দন পাঠ করেন ও তাহার ইংরাজিতে তর্জ্জমাও পঠিত হয়। কলিকাতা বেতার অধিষ্ঠান সভামণ্ডপে বিশেষ যন্ত্র সমাবেশ করিয়া সমস্ত জনসাধারণের ঘরে ঘরে অনুষ্ঠানের প্রত্যেক কথাটি গানটি ব্রডকাষ্ট (Broad cast) করিয়া পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করেন। সে হিসাবে ইহা একটি বিশ্বব্যাপী উৎসবে পরিণত হয়। ভিন্ন ভাষায় হইলেও বাঙ্গলার ভাই-বোনকে সে বক্তৃতার কিছু মর্ম্ম দিবার লোভ হইতেছে।

"You have before you India's most distinguished son, in whose family no more perfect illustration can be found of that verse of Horace :

"Fortes creantur fortibus et bonis"
A noble line gives proof of noble sires.

The fourth brother who is present before you now has by his life, his genius and his character augmented so greatly the fame of his house that, did his piety and modesty not forbid, none would have a better right to say in Scipio's famous phrase.

"Virtutes generis mieis moribus accumulavi"
My life has crowned the virtues of my line.

Here before you is the poet and writer **Myrionous** (myriad-minded), the musician famous in his art, the philosopher proved both in word and deed, the fervent upholder of Learning and sound Doctrine, the ardent defender of public liberties, one who by the sanctity of his life and character has won for himself the praise of all mankind. With the unanimous approval of the Vice-Chancellor, the Doctors, and the Masters of the University, I present to you a man—**Mousikotaton** Rabindranath Tagore, praemio Nobeliano iam insignitum (already a Nobel prizeman and dear to all the Muses) in order that he may receive the laurel wreath of Oxford also, and be admitted to the Degree of Doctor of Literature honoris causa."

তখন সভাপতি রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করেন,

> Vir venerabilis et doctissime,
> **Musarum sacerdos** dilectissime,
> Venerable and learned Sir,
> Most beloved priest of the muses.

I admit you to the Degree of Doctor of [illegible]

এই উক্তিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়া সম্মানীকৃত [illegible] রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য সংস্কৃত ভাষায় বিজ্ঞাপিত করিলেন [illegible] ইংরাজি ভাষারূপ সমবেত মণ্ডলীকে শুনান হইল [illegible] Maurice Gwyer ইংরাজীতে একটি বক্তৃতা করেন [illegible] কিছু উদ্ধৃত করিয়া পরে দিয়েছি। পরিশেষে [illegible] মন্ত্রগুলি সমস্বরে গীত হয়। মধ্যবেলায় [illegible] লোকেদের অনুরূপ শান্তি কামনায় [illegible] উচ্চারণান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সকল [illegible] "বিশ্বভারতী" ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বিলাতীয় অভিনন্দনে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে ঠিক হয় নাই। বংশাবলীর গুণকীর্ত্তনে তাঁহারা বলেন তাঁহার পিতামহ দ্বারকানাথ সম্বন্ধে—'His grandfather, the member of a new religious faith and a new fraternity who was one of the first of his countrymen to cross the estranging sea and visit the distant land of Britain', এবং তাঁহার ভগ্নি স্বর্ণকুমারী দেবী সম্বন্ধে "his gifted sister the first of her sex in India to attempt a novel of Indian life" এবং তাঁহার সম্বন্ধে "fourth brother" (quartus) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম এক বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোক বিলাত গমন করেন। তাহাকে চাকুরী লইয়া মাঝি মাল্লাদের তথায় গমন ধর্ত্তব্য নহে। ব্যবধান সাগর অতিক্রম ও হিন্দুর নিষিদ্ধ কালাপানি লঙ্ঘন বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় পুত্র ও ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে ১৮৩০ খৃঃ সর্ব্বপ্রথম করেন। তৎপরে দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বিলাত যান। এদেশীয় সকলেই জানেন তাঁহার অন্তিম সময়ে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নাই। এবিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং নবধর্ম্ম বিশ্বাসযুক্ত নব ভ্রাতৃমণ্ডলীভুক্ত তাঁহাকে বলা চলে না। তিনি আজীবন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দন শিলার নিষ্ঠাবান সেবক ও শ্রীশ্রীদুর্গা এবং শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী মাতৃমূর্ত্তির পূজক অধিকন্তু শ্রীপাঠ খড়দহের গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালেও স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া নিভৃতে প্রত্যহ ইষ্ট মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ এবং হোম করিতেন, অন্যন্য এমন কি সম্ভ্রান্ত-বংশীয় মহিলাদের যথা সমারসেটের স্বামীর পত্নী (Duchess of Somerset) কেও বহির্কক্ষে অপেক্ষা করিতে হইত এবং জোড়াসাঁকো-বাড়িতে রামমোহন রায়কেও অপেক্ষা করিতে হয়। রাজার সহিত 'আত্মীয় সভার' উপাসনায় যোগ দিলেও, জোব্বা চাপকান পরিয়া ভগবৎ-আরাধনায় তাঁহার আস্থা

ছিল না এবং ব্রাহ্মণোচিত দ্বিধা বোধ হইত। যদিও তিনি বলিতেন, পোষাক পরিতে আরামের ব্যাঘাত ঘটে, সেটা কেবল সামাজিক ভদ্রতার ভাবণ। তিনি কোনও দিনই রামমোহনের ব্যক্তিত্ব বা মত তাঁহার স্বীয় ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করিতে দেন নাই এবং নিজ বাটীতে দুর্গা প্রতিমা পূজায় বরাবর রামমোহনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন, রাজার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াও। তাঁহাকে ও তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রসন্ন কুমার ও বৈমাত্র ভ্রাতা রমানাথকে রামমোহনের শিষ্য (Disciple) বলিয়া প্রচার করা একটা মস্ত ভ্রম। ইংরাজেরা ও তৎকালীন ইংরাজি শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীরা কতকটা রামমোহনের প্রটেষ্টান্টিস্‌মে (Protestantism) মুগ্ধ হইয়া দায়িত্বহীন এই সকল উক্তি বক্তৃতার আস্ফালনে ব্যবহার করিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেন। তাহার ফলে আমরা দেখি ভবিষ্যতের উদীয়মান তরুণদের উৎসাহিত করিতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' পুস্তকে আনন্দ সহকারে অনায়াসে লিখিলেন যে "মুক্তিকামী রামমোহন" সকল বিষয়েরই অগ্রদূত, এমন কি Landholders' Association ১৮৩৫ খৃঃ ও British India Society ১৮৪৩ খৃঃ নামক যুগল প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং পরে ১৮৫১ সালে British Indian Association রাজনৈতিক সমিতি স্থাপনে, রামমোহনের মৃত্যুর বহুবর্ষ পরে হইলেও, তাহার মূলে যে রামমোহন এই কথা বুঝাইবার জন্য লিখিয়াছেন যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান রামমোহনের [illegible] অনুচর" দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম পরিচ্ছেদে [illegible] ভিত্তির সহিত যে উক্ত "মহৎ ব্যক্তির" [illegible] ঐতিহাসিক সত্য প্রচারিত হইল পাঠকেরা অনুভব করিবেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বাবু রামমোহন রায় রঙ্গপুর হইতে [illegible] আগমন করেন। তাঁহার মানিকতলায় কোঠা [illegible] করা, সুসজ্জিত করা, তাঁহার মূল্যবান [illegible] [illegible] কাটা চুল, অথচ নিধুবাবুর গানের [illegible] [illegible]

দল গঠন ও গাওয়ান, তাঁহাকে তৎকালীন কলিকাতার সৌখীন তরুণদের মধ্যে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ করে। কলিকাতা সমাজে তাঁহার প্রতিপত্তি স্থাপনের ইহাই হেতু। দ্বারিকানাথ ঠাকুর তৎকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী, সমুদ্রগামী জাহাজ নিজে খরিদ করিয়া তাহাতে নীল ও রেশম ইত্যাদি নানাবিধ পণ্য-দ্রব্য বোঝাই দিয়া, তিনি দক্ষিণ এমেরিকায় প্রেরণ, ও রপ্তানি ব্যবসায়ের সূত্রপাত করিয়াছেন। তিনি জমিদার-পুত্র, ইংরাজিতে কৃতবিদ্য, এবং যে বংশে তিনি কনিষ্ঠদের মধ্যে গণ্য সে গোষ্ঠির জ্যেষ্ঠেরা সহরে গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ধনী, সদাচারের জন্য সর্ব্বজন-পূজিত ও সাধারণ হিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানে অগ্রণী এবং রাজসরকারে ও জনমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ প্রতি-পত্তিশালী। ১৮১৬ সালে রামমোহন বেদবেদান্ত শিখাইবার জন্য একটি টোল স্থাপন করেন ও বহু বৎসর পরে একটি ইংরাজি শিক্ষাদানের ইস্কুল খুলেন। স্বর্গীয় গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয় বেদান্ত বিদ্যালয়ে নিয়মিত চাঁদা দিতেন এবং ঠাকুরগোষ্ঠির অনেকেই চাঁদা দিতেন তন্মধ্যে দ্বারকা-নাথও অন্যতম ছিলেন। যতদিন না ইংরাজি বিদ্যালয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণের পরিদর্শন ও প্রশংসা লাভ করে, তিনি দেবেন্দ্র-নাথ প্রভৃতি তাঁহাদের বাটীর বালকদের তথায় শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরণে বিরত ছিলেন। ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্দ্ধমানের রাজা, শোভাবাজারের রাজা, ও ৺গোপীমোহন ঠাকুর তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। গোপীমোহন Founder ও Hereditary Governor পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অন্যান্য ঠাকুর বংশীয়েরাও গভর্ণর-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। রামমোহনের কোন চেষ্টা বা সংস্রবের কোন উল্লেখ আমরা কোথাও পাই নাই। সাধারণ হিন্দুদের তিনি বিরাগভাজন ছিলেন বলিয়া প্রকাশ্যে কিছু করেন নাই, ইহা সম্পূর্ণ myth কল্পনা জাল। কারণ, প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচারের বিরুদ্ধে তাঁহার অপৌত্তলিক ঈশ্বরচিন্তা ও আরাধনা-প্রণালী ও তৎসংক্রান্ত বিচার-পুস্তিকা প্রচার তখন কিছুই হয় নাই। সতীদাহ নিবারণের আন্দোলন তাঁহার কলিকাতা আগমনের

পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং তাহাতেই দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁহাকে রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী হইতে প্রথম দেখা যায়। তিনি ১৮৩০ সালে বিলাত যাত্রা করেন। উক্ত ১৫ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর কোন রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য কোন মণ্ডলী গঠিত হয় নাই, বা কোন কথা পর্য্যন্ত উত্থাপিত হয় নাই, বা 'মুক্তিকামী রামমোহন'কে কোনরূপ সমবেত চেষ্টা করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী দেখা যায় না। হিন্দুস্ত্রীর দায়াধিকার সম্বন্ধে বিচার-পুস্তক প্রকাশ ও লর্ড এমহার্ষ্টকে শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও আদর্শ শিক্ষা কিরূপ হইবে, এই বিষয়ে এক লিখিত মন্তব্য পেস্ করিতে ও পরে উহা মুদ্রণ দ্বারা প্রচার করিতে জানা যায়; তাহাতে তাঁহার বিদ্যাবত্তার ও স্বাধীন চিন্তারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সমাজের উপর কোন প্রভাব বা সংস্কার সাধন কিম্বা জাতিগঠন বা জনমত সৃজন ও নিয়মিত কার্য্যের জন্য একত্র হইয়া কোন প্রতিষ্ঠান চালনার চেষ্টার কোন পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। লর্ড এমহার্ষ্ট [illegible] তাঁহার গভর্ণমেণ্ট উক্ত পত্রের জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধে, [illegible] কলেজ স্থাপন করিয়া রাজার পরামর্শ কার্য্যত অগ্রাহ্য করিলেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে (রাজার মৃত্যুর [illegible]) জর্জ টম্পসান (George Thompson M. P.) পার্লিয়ামেন্টের [illegible] দ্বারকানাথ সঙ্গে লইয়া আসেন ও হিন্দুকলেজের [illegible] British India Society গঠন করেন। [illegible] বিদ্‌কে সঙ্গে আনার উদ্দেশ্য, এদেশের যুবকদের [illegible] পরিচালনায় উপস্থিতমত সৎ পরামর্শ দেওয়া। [illegible] ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও Cobb Hurry সাহেব Landholders' Society ১৮৩৫ সালে স্থাপন করিয়াছিলেন ও পরিচালনা করিতেন। [illegible] পরে উভয় সমিতি মিলিত হইয়া British Indian Association [illegible] শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব প্রথম [illegible] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সম্পাদক ছিলেন। [illegible]

এই নবগঠিত সমিতির প্রাণস্বরূপ হইয়া ধীরতা ও দক্ষতার সহিত প্রায় তাঁহার মৃত্যুকাল (ইং ১৮৭৭ সাল) পর্য্যন্ত ইহার কর্ম্মকর্তা ছিলেন।

সহরে একত্র বাস ও তৎকালীন সাধারণ হিতকর কর্ম্মে সহযোগ ফলে যদি এই সকল প্রভাবশালী মনীষী নেতাদের রাজার পার্শ্বচর বা অনুচর বলিতে হয়, নবাগত রামমোহনকেও ইঁহাদের প্রভাবে বর্দ্ধিত বলা যায়। দ্বারিকানাথ রামমোহনের প্রায় বিশ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে বয়স্কের সম্মান দিতেন, ইংরাজি বক্তৃতায় Friend বলিতেন ও সাধারণতঃ দেওয়ানজী বলিয়া উভয়ে উভয়কে সম্বোধন করিতেন। কিন্তু দ্বারিকানাথের স্বাধীন চিন্তা এত প্রবল ছিল যে, রামমোহনের সহিত নানা রকমে মেলামেশা করিয়াও তাঁহার মতের বা ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিজের কার্য্যকলাপকে বা ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত কিম্বা পরিবর্ত্তিত হইতে দেন নাই। মহর্ষি স্বরচিত জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে, খুড়া প্রসন্নকুমারের সহিত ধর্ম্মালোচনায় কথার প্রসঙ্গে, সদর দেওয়ানীর প্রবীন উকিল "ওহে! দেবেন্দোর কোবলো জবাব দিয়েছে" বলিয়া তাঁহার কথার মীমাংসা না করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন। তাঁহার ভাবধারা দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রসন্নকুমারের পৌত্তলিক অর্চনা সম্বন্ধে চিন্তা কিছুমাত্র রামমোহনীয় প্রভাবে প্রভাবিত হয় নাই। নতুবা, মূলাজোড়ের 'ব্রহ্মময়ীর' সেবা কার্য্যের জন্য একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে ত্যাগ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে সেবাইত ও তাঁহার উত্তরাধিকারী করিতেন না। রাজার সমবেত উপাসনা গৃহের অন্যতম ট্রাষ্টী ছিলেন ঠাকুর প্রসন্নকুমার এবং তাঁহার কার্য্য পরিচালনায় আবশ্যক হইলে অপর ট্রাষ্টী নিয়োগ ক্ষমতা রাজা তাঁহাকেই দিয়া বিলাত যাত্রা করেন। পরে সেইরূপ নিয়োগের ফলে রমাপ্রসাদ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ট্রাষ্টী-পদ প্রাপ্ত হন। টাকীর স্বর্গীয় কালীনাথ মুন্সীর ভবনে এই সাধারণ ভজনালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব হয়, ও চাঁদা তুলিবার ব্যবস্থা করা হয়। রাজার বিলাত যাত্রাকালে মুন্সীদের

দুইজন ঐ গৃহের ট্রাষ্টী ছিলেন। রামমোহনের কলিকাতায় বন্ধু নির্ব্বাচনে দেখা যায় যে, ধনাঢ্য জমিদার শ্রেণীতেই তিনি তাঁহার সখ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। সেটা কতটা স্বীয় প্রভাব বর্দ্ধন মানসে বা কতটা তাঁহার গুণাবলির যথার্থ আকর্ষণের বলে, বলা কঠিন। মোটের উপর, তৎকালের সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা তাঁহার সহিত সমকক্ষ ভাবেই মিশিতেন, অথচ নিজেদের মত ও পথ বদলাইতেন না। জনসাধারণে তাঁহার কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, নতুবা তাঁহার সাহায্য লাভের জন্য এলেকজেণ্ডার ডাফ্ (Alexander Duff) স্কুল চালনায় বাধা পাইয়া তাঁহার স্মরণাপন্ন হইতেন না। তাঁহারই অনুরোধ উপরোধের ফলে মিসনারি ডফ্ সাহেবের ইংরাজি শিক্ষার ইস্কুল স্থায়িত্ব লাভ করে।

দেবেন্দ্রনাথই রামমোহনকে তাঁহার ধর্ম্মের পথপ্রবর্ত্তক বলিয়া প্রথম শ্রদ্ধার আসন অর্পণ করেন। কিন্তু ১৮৭৯ ইং সালের পূর্ব্বে প্রকাশিত Leonard-এর 'History of the Brahmo Somaj'এ দেখিতে পাই—

"The avowed object of the Tatwabodhinie Sabha (established by Debendranath) was not so much to follow in the foot-steps of Rammohan Roy as to make deeper investigations of Divine knowledge from the Shastras than Ram Mohan Roy had done. Rammohan Roy's researches were, however, a help to them."

আমরা অত্যন্ত পরিতাপের সহিত দেখি যে, ঐ সকল [illegible] প্রচলনের জন্য (দ্বারকানাথ ও রমানাথ রামমোহনের শিষ্য ছিলেন। কলিকাতার তদানিন্তন পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট, [illegible] প্যারী চাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর উপনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' [illegible] বলিয়া যিনি অধিক পরিচিত) কনিষ্ঠ [illegible] কিশোরী চাঁদ মিত্র, Indian Field পত্রিকার সম্পাদক, ও [illegible] রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই প্রভৃতি [illegible] [illegible] ১৮৭০ সালে টাউন হলে [illegible] [illegible] [illegible]

স্মৃতিবার্ষিকী অধিবেশনে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করেন ও পরে তাহা বিস্তার করিয়া "Memoir of Dwarka Nath Tagore" ইংরাজি পুস্তক ঐ সালেই প্রকাশ করেন।

তাহাতে (৬ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন :—

"He (Dwarka Nath) also made the acquaintance, while young, of Ram Mohon Roy, under whose inspiration he imbibed liberal sentiments and elevated views on religion. He had been a staunch Hindu, like his grandfather, fond of celebrating the *Homa* (হোম) and performing *Poojahs* (পূজা). But at the school of Ram Mohon Roy he was convinced of the folly of idolatry and the absurdity of the ceremonial part of Hinduism, and he learnt at last to worship God in spirit and in truth. Thus disciplined and liberalized he gave practical proof in his subsequent career that caste should not stand in the way of moral or social reform." ইংরাজের সহিত টেবিলে বসিয়া খানা খাওয়া ও বিলাত যাওয়াই যদি এই শিক্ষার প্রমাণ ও প্রদর্শন বলিয়া মিত্র মহাশয় দ্বারকানাথের পরলোক গমনের চব্বিশ বৎসর পরে সভাস্থলে তাহা স্থির করিয়া থাকেন, ত আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু এক ব্যক্তির নীতিজ্ঞান, চরিত্র ও কার্য্যকলাপ অপরের উপদেশে ও দৃষ্টান্তে যদি অপরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্ববৎ থাকে ত 'practical proof' হিসাবে বৈপরিত্যই প্রমাণিত করে। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে কলিকাতা টাউনহলে যে শোকসভা হয়, তাহার বিবরণ ইংরাজি "হরকরা" পত্রে ৬ই ডিসেম্বর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়, তাহা হইতে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি—

"Dr. Thomas Dealtry, the Archdeacon in moving

the first resolution addressed the meeting to the following effect :—"It may perhaps be asked why I am present on this occasion ; I, a minister of the Gospel, to do honour to the memory of one who was known only as Hindu. My answer is, because I rejoice to recognize good wherever it is to be found, and I believe there were many good qualities in the character of this distinguished individual. It is then, to bear testimony to those *benevolent qualities* in the character of the deceased, which the resolution embodies, that I now stand before you. They were manifest *in the most distinguished liberality to the poor.* That benevolence has been shown again *in his anxiety to diffuse the blessings of secular knowledge among his fellow countrymen.* But I should be much wanting to his memory if I did not mark particularly how these qualities were enhanced in him *by the diffi culties he had to encounter in their exercise.*

এই সকল সহজাত মহানুভবতা কি তিনি [illegible] নৈপুণ্যে পাইয়াছিলেন ? রামমোহনের [illegible] এরূপ বদান্যতার কিম্বদন্তি কিছুই [illegible] উপরোক্ত আর একটি বক্তৃতা হইতে কিছু উদ্ধৃত [illegible] জন্য এখানে সন্নিবিষ্ট করা যাইতেছে, তাহাতেও [illegible] খ্যাতি দানশীলতার জন্য নহে, বিদ্যানুরাগের জন্যই

"Baboo Issur Chunder Chunder [illegible] Revenue Department read a written spe[illegible] ing. The address is here subjoined.

He (D. N. T.) was not, I admit, [illegible] did talents, nor blessed with extraordinary [illegible] that illustrious countryman of ours—that [illegible]

pattern of excellence in learning, the late Rajah Rammohun Roy. He was not possessed of that superior genius which exalted the other to pre-eminence. But Dwarka Nath Tagore was not inferior to him in all the other endowments of the mind—was not less informed, than he, of man as man. Possessed of a mind which procured him the respect and admiration of the world, he cultivated it to better purposes. Benevolent and urbane in his manners towards all with whom he had intercourse he uniformly condescended to men of low estate. He was held in veneration and respect both by the orthodox and unorthodox Hindus." কলিকাতা নগরীর স্বাস্থ্য ও শান্তিরক্ষা কার্য্যে তিনি Justices of the Peaceএর অন্যতম হইয়া সাধারণের হিতকর কার্য্যে নিজের বুদ্ধি, শ্রম, অর্থ ও কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাই যেমন ইংরাজি শিক্ষিত স্বেচ্ছাচার-প্রিয়দের নিকট শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন, তেমনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ আচার-পরায়ণ হিন্দুদের নিকটও সমান শ্রদ্ধা পাইতেন। ইহা রামমোহনের জীবনে পাই নাই।

[illegible] বিষয়ে আর অধিক উল্লেখ না করিয়া, [illegible] দ্বারকানাথের কথা কিছু বলিলেই, তাঁহাদের [illegible] মনোভাবের ও পথের প্রভাব পাঠক সম্যক অবগত হইতে [illegible] সালে দ্বারকানাথের মৃত্যুতে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র [illegible] হিন্দু পেট্রিয়টে) বিয়োগ ব্যথা নিবেদন করেন, [illegible] টাউনহলের বিরাট শোকসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন। কিন্তু [illegible] দ্বারকানাথকে "Follower and disciple of Rammohan Roy" বলিয়া অভিহিত করেন। যদি এ কথার সত্যকার কোন ভিত্তি থাকিত, তিনি জীবনে তাঁহার রক্ষণশীল মনোভাবের নানা ক্ষেত্রে এত পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে দিয়া গিয়াছেন যে, তদ্বারা উহার অলীকত্ব প্রতিপাদন করে।

নতুবা, শুধু অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানে কার্য্য করার জন্য তিনি কখনই তাঁহার বিশেষ স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করিতেন না এবং বৃহৎ ঠাকুর পরিবারে তাঁহার নেতৃত্বে দলাদলির সৃষ্টি হইত না। রামমোহনের প্রভাব কিছু থাকিলে, তিনিও আজীবন হরিনাম ও মালাজপ করিতে বা নিজের স্বতন্ত্র বাস ভবনে ৺শ্রীধর শালগ্রামশীলার নিত্য-সেবার ব্যবস্থা ও প্রতিবৎসর শ্রীশ্রীদুর্গা ও শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়াইয়া সনাতন রীতি অনুযায়ী পূজা করিতে নিশ্চয়ই বিরত থাকিতেন। এমন কি, তাঁহার শেষ চরমপত্রে (উইলে) এই সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক অর্চ্চনার স্থায়িত্ব বিধানের ব্যবস্থা করিতেন না, ও নিজ দীক্ষাগুরু খড়দহের গোস্বামী মহাশয়কে তাঁহার শেষ প্রণামী স্বরূপ থোক্ টাকা দিবার আদেশ দিয়া যাইতেন না।

ইংরাজ মহিলা কুমারী ইডেন যে দ্বারিকানাথকে রামমোহনের বন্ধু বলিয়া তাঁহার পত্রাবলীতে উল্লেখ করিয়াছেন, [illegible] কারণ তাঁহারা বাহ্যিক আচারটাই ধর্ম্মের ও [illegible] লন। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুসমাজে বাস করিয়া পৌত্তলিক হিন্দু [illegible] অপৌত্তলিক নিরাকার ব্রহ্মবাদীদের ভাল করিয়া দেখিয়াছেন, [illegible] বর্ণনায় এতটা অনবধানতা ও শৈথিল্য [illegible] বিশুদ্ধ ভাল ইংরাজি বলা ও ভাল খানা দেওয়া [illegible] করা তৎকালে বিদেশী মহিলার নিকট [illegible] প্রতিপন্ন করে, কিন্তু তিনি যে তাহার কত [illegible] দেশহিতৈষী, এবং সমগ্র বৃটিশ শাসিত [illegible] প্রতিনিধি স্বরূপ ইংলণ্ডবাসীদের নিকট প্রতিপন্ন [illegible] পত্রিকার স্তম্ভে দীপ্যমান। (Vide Englishman [illegible] 1842) কলিকাতা টাউনহলে অনারিবল [illegible] আহুত এক সভায় "for the purpose of offering some testimony of the esteem and regard of this community for Dwarka

nath Tagore and paying him a tribute of respect on the occasion of his quitting India in pursuit of objects so honourable in themselves and so likely to be productive of benefit to his country"—তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি পাই। অন্যান্য উক্তিতেও তাঁহার প্রতি দেশবাসী ও বিদেশীয়গণের আন্তরিক অনুরাগ শুধু তাঁহার ধনঐশ্বর্য্যের জন্য নহে, প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণাবলীর অনুভূতির ফলে অভিব্যক্ত হয় তাহারও নিদর্শন পাই এবং তাহা ৺কিশোরীচাঁদ মিত্রের সঙ্কীর্ণ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদরূপে পরবর্ত্তিগণের নিকট প্রতিপন্ন হইবে।

"Mr. Mansell late of Agra, now Deputy Accountant General, seconded the address, in a speech which we have seldom, if ever, heard surpassed in eloquence in the Town Hall, in which we have heard so admirable orations. He claimed the character of Dwarka Nath as the property, not of Calcutta—of Bengal, but of British India, and spoke of it as widely-known and esteemed throughout the country. We never heard a more confident speaker or one who more deeply impressed on his hearers the conviction that he spoke from the heart. Even in the North-Western Provinces where he has so long resided he had learned to appreciate truly and to honour, as they deserved to be honoured, the merits of a native gentleman of this city, who has stood forward on all occasions of noble example of exalted moral courage, of lofty integrity of intellectual culture, and of a liberality which has never been equalled among his countrymen, and never exceeded anywhere." যে 'liberalisation-এর কথা মিত্র মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার কতটা রামমোহনের সান্নিধ্যে অর্জিত, ও কতটা তাঁহার সৌহার্দ্দ্য

সাহেবের ইংরাজি পাঠশালার শিক্ষার ফল ও কতটা Rev. William Adams, Mr. J. G. Gordon, Mr. James Calder, Mr. Cutler Fergusson, Barrister ও পার্সিশিক্ষক মুনসীর সাহচর্য্যে, স্বভাবজাত লোক চিনিবার ক্ষমতা ও স্বাধীন চিন্তার অভ্যাসের ফল, বা কতটা নিষ্ঠাবান হিন্দুগৃহের প্রভাবে পিতৃগণের আচরণ হইতে গৃহীত, নির্ণয় করা কঠিন। যে উৎসব আয়োজনের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিলাম তৎসময়ে 'Friend of India' কাগজের সম্পাদক লেখেন—

"It is not for the credit of India that Rammohon Roy should be in an unknown grave in England. We could almost wish that at the meeting held this day (7th January 1842) some expression of public feeling on this subject should be recorded. * * * * subscription raised for erecting a tomb * * * and the application of the sum be publicly delegated to his friend. We can answer for Dwarkanath's most cordial concurrence in such an appointment. Taking leave, as we thus do, of one of Rammohon Roy's warmest friends and earliest adherents, when on the eve of following his foot-steps to our own beloved country, may we venture to hope [illegible] Dwarkanath's first efforts in England will be to rescue the grave of that illustrious man from the [illegible] which it has been consigned and to erect [illegible] memorial which shall at least serve [illegible] of future pilgrims from India to England [illegible] where his remains rest.

ইংরাজের লিখিত 'warmest friend and earliest adherent' বলিলে বিশেষ সহযোগী বুঝায়, পশ্চাদনুসারী follower [illegible] বুঝায় না, অধিকন্তু তাঁহারই সাহায্যে যে রামমোহন [illegible] হইয়াছিলেন তাহারই আভাষ দেয়। 'A friend in need is a friend in deed'

ব্রিষ্টল সহরের নিকট ষ্টেপলটনে (Stapleton) রামমোহনের স্মৃতিচিহ্ন দ্বারকানাথের তত্ত্বাবধানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই friendship বিষয়ে দ্বারকানাথের চরিত্রে আলোকপাত করে বলিয়া, Englishman সম্পাদকের (৮ই জানুয়ারী ১৮৪২) মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"One other remark of Mr. Parker's which was a severe but rather well-merited rebuke of his brother-civilians, we must not omit. Mr. Parker observed, that he was sorry to say that he had hundreds of times seen assembled round the social board of Dwarkanath, many more of these gentlemen than were assembled on the present occasion to pay him a tribute of respect. We may add what Mr. Parker did not, that we have reason to believe that many in that service owe their release from the burden of difficulties which would have otherwise overwhelmed them altogether, to the liberality of him whom on this occasion they thus neglected."

৺কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় আমাদের একটি উপকার করিয়াছেন, তাঁহার memoir খানির পরিশিষ্টে কলিকাতা টাউনহলে ৩০ শে নভেম্বর ১৮৪১ বেলা ১১টার সময় যে 'Landholders' Society'র চতুর্থ বৎসরের অধিবেশন বা General meeting হয়, তাহার একটি বিষদ বিবরণ ও বক্তৃতাবলী তিনি ছাপাইয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি হইয়া বাংলায় অভিভাষণ দেন ও ইংরাজিতে যে সকল বক্তৃতা হয়, তাহার সার অংশ রাজা রাধাকান্ত দেব বাংলা ও উর্দ্দুতে সমাবেত জনমণ্ডলী ৮০০।৯০০ লোককে বুঝাইয়া দেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরাজিতে বক্তৃতা করেন ও বহু সম্ভ্রান্ত ইংরাজ এই সভায় সভ্যরূপে বক্তৃতা করেন। কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণনাথ বাংলায় বলেন। রাণী কাত্যায়নী এই সভার সভ্যা ছিলেন ও তাঁহার পক্ষে কোনও মুক্তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতেন। ঢাকা, জামালপুর ও [illegible]

হইতে পত্রাদি আসে, তাহা সম্পাদক W. Cobb Hurry পাঠ করেন। বাবু রামকমল সেন ও বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ রায় ও বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কয়েকটি প্রস্তাব সমর্থন করেন। ৬ষ্ঠ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে,

"That a subscription be opened to establish a permanent parliamentary agency in England, and that each member subscribing annually be bound to continue his subscription for five years, or a payment in lieu thereof.

That the following gentlemen be appointed a Special Committee to carry the above resolution into effect :—Baboo Dwarkanath Tagore, Mr. Leith, Mr. Remfry and Mr. Vint."

সে কালের ইংরাজগণের বহু প্রশংসিত ও আকাঙ্ক্ষিত Tagore Parties এবং Tagore Dinners-এর বিষদ বিবরণ ও জৌলুষের কথা 'Letters of India of the Honble. Emily Eden in 2 Vols.' পুস্তকে পাইবেন। ইনি Lord Ackland-এর ভগ্নী ছিলেন। [illegible] অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ বেলগেছিয়া উদ্যানে উৎসবের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যকে [illegible] সম্বর্দ্ধনার্থে বোলপুরে অনুষ্ঠিত আমাদের বর্ণনীয় এই জাতীয় [illegible] উৎকর্ষ বিদ্যালয়ের ও ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের [illegible] আভিজাত্যে ও ভাবে কতটা অতিক্রম করিল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। Mr. Justice Henderson Oxonian Public Orator-এর [illegible] হইয়া ল্যাটিন ভাষায় লিখিত পরিচয় পত্রটি পাঠ করিলে, [illegible] অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ মহোদয় [illegible] সকলের বোধগম্য প্রচলিত ইংরাজি ভাষায়, [illegible] ছাত্রের উত্তরেই ভাষণ, ভাষান্তরিত করিয়া [illegible] ইঁহাদের সহযোগিতা করিবার জন্য [illegible] অদ্ভুত গাউন পরিহিত [illegible] সাহেবের পার্শ্বে [illegible] Mr. Bottomley, Director of Public Instruction,

Bengal "সিংহসদনের" মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বার্দ্ধক্য বশতঃ তাঁহাকে একটি মঞ্চোপরি স্বতন্ত্র আসন দেওয়া হইয়াছিল। তৎসমীপে মঞ্চাধিষ্ঠিত প্রতিনিধিগণ একে একে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। তিনিও ডক্টর অফ্ লেটার্সের নব পরিচ্ছদে ভূষিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ চৌকা টালির মত কাল টুপি (Slate cap) ও রোমীয়দের ন্যায় আজানুলম্বিত কাল জোব্বা (Gown) ও রঙ্গীন উত্তরীয়ে (Hood) শোভমান তাঁহাকে বাস্তবে কি চিত্রে কেহ দেখেন নাই। তাঁহার দীপ্তবদন ও পোষাক ও পারিপার্শ্বিকে অশীতিপর প্রবীনকে চমৎকার দেখাইতেছিল। Public Orator তাঁহার অভিভাষণে যে তাঁহাকে চতুর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহার খ্যাতোপন্ন অগ্রজদের প্রসঙ্গে তিনি ঐ বংশের চতুর্থ খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসাবে, নতুবা তাঁহার পিতা মহর্ষিদেবের অপত্যশ্রেণীর সংখ্যা হিসাবে নয়।

তাঁহার এক ভগ্নীকে যে মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বলা হয়, তাহা পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়। বিলাতে, আমেরিকায়, ইংরাজি পাঠকের নিকট রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহার Fatal Garland একখানি সমাদৃত গল্পের বই; বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট তাঁহার 'দীপ নির্ব্বাণ', 'ছিন্ন মুকুল', 'স্নেহলতা' প্রভৃতি উপন্যাস অধিক পরিচিত। অনেকে হয়ত জানেন না যে, তাঁহার পূর্ব্বেও বঙ্গ রমণীর রচিত উপন্যাস দুই একখানা ছিল। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (W. C. Bannerjee) ভগ্নীও একজন গল্প লেখিকা ছিলেন,* কিন্তু ঠাকুর বংশের স্বর্ণকুমারী দেবীর ঠাকুরমাদের একজন (শিবনাথ শাস্ত্রী) প্রকৃত প্রস্তাবে এ পথের প্রথম যাত্রী। তাঁহার রচিত উপন্যাস "মনোরমা" মুদ্রিত হইয়া ইং ১৮৬৩ সালে প্রথম বাহির হয়। সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে, সুতরাং বঙ্কিমের "দুর্গেশনন্দিনীর" এক প্রকার

* মোক্ষদা দেবী রচিত "সফল স্বপ্ন" ১৮৭২ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। স্বর্ণকুমারির সময়, জন্মকাল ১৮ আগষ্ট ১৮৫৬ হইতে মৃত্যুকাল ১৯০২ খৃষ্টাব্দ। যে বিদুষী মহিলার কথা আমরা বলিলাম তাঁহার নাম শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী দেবী, এক্ষণে তিনি পরধামে। মাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মানসে, উক্ত পুস্তকের একখানি ইংরাজি অনুবাদ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (Mus. Doctor Phil.) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাঁহার সঙ্গীতশাস্ত্রের বহুমূল্য গ্রন্থাদির সহিত উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তাহা জনসাধারণের নিকট ততটা সুপরিচিত নয়। তখনও তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের পদ প্রাপ্ত হন নাই, তাহা ১৮৯৬ সালে নবেম্বর মাসে তাঁহাকে অর্পণ করা হয়।

উৎসবের সমাপ্তির পূর্ব্বে গায়ার সাহেব সেদিন যে অভিভাষণ ইংরাজিতে উচ্চারিত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, তন্মধ্যে বলেন, "And have not Santi Niketan and my own University this in common, that each bases its education upon recognition of and respect for human personality? Do they not both attribute pre-eminence to the virtue of tolerance, since none can claim respect for his own personality unless he is willing to respect that of others? These indeed are the foundation of true democracy, and its success has been, and will always be, in proportion as those who live under it are conscious of its spiritual and intellectual elements", [illegible] বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমরের তাৎপর্য্য বলিতে বলিয়াছিলেন, [illegible] witnessing an attempt to assassinate reason, to proscribe tolerance, and to crush the human spirit beneath a monstrous materialism" ইহাই [illegible] : "Is not the clamant need of our day fresh intellectual effort and the habit of independent judgment, courage

to face realities, and not to deuy the existence of problems we are too indolent to solve; reverence for the spirit of an ancient culture, without servility to the past or attempts to reverse the evolutionary process?

Such I believe to be the principles which inspire your teaching in this place, and such are those of my own University. May the love of true learning be ever cherished in their place; and may there ever be granted to all their children, 'hope still to find, strength still to climb the spheres.' I deem it a privilege to have taken part in this memorable ceremony in which the University whose representative I am has, in honouring you, done honour to itself."

পুরাতন সংস্কৃতির প্রতি মমত্বপূর্ণ শ্রদ্ধা উক্তৌর্থ বিদ্যাপীঠের একটি চিরন্তন নিদর্শন রূপে, জগত সমক্ষে রক্ষা করে, আজও তথায় সুপ্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় সকল কার্য্য করিতে হয়, তজ্জন্য সকল শিক্ষার্থীর উহা অবশ্য পাঠিতব্যের মধ্যে। তাঁহাদের অধিনায়কদের এ অনুষ্ঠানে বোধগম্য ইংরাজিতে অভিভাষণ একটি ব্যতিক্রম। কালের প্রয়োজন বোধে গত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় হইতে এ প্রথা বহু আন্দোলনের ফলে কিছু পরিবর্তন করা হয়। তাহার সম্মানিত উপাধি বিদেশীকে দিবার জন্য দূর দেশে অভিযানও একটি সনাতন রীতির ব্যতিক্রম। ১৯৪০ সালের প্রারম্ভ হইতে প্রবর্তিত হয়। 'কবি সার্ব্বভৌম' রবীন্দ্রনাথই উপলক্ষ হইয়া দুর্গত বাঙ্গালা দেশের ভাগ্যে এ অভিজাত পদবী আহরণ করেন। সকলই মঙ্গলময়ের করুণা ও ইহাও তাহার একটি রূপ। তাই গায়ার সাহেব বলিতে বাধ্য হন।

"It is my earnest prayer that through, those bonds which have been forged to-day between an ancient foundation and a new there may pass and repass a vital current in which the spiritual forces of the West and the

East may mingle and, if God will, draw strength from one another."

তাঁহার বক্তব্যের একটি বঙ্গানুবাদ নিম্নে দিলাম—

আমি অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি যে, অদ্য একটি নূতন শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে যে একটি সুপ্রাচীন বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থি বন্ধন হইল, তাহার ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক শক্তি উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয় এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পরস্পরের আদানপ্রদানে যেন একটি জীবনী-স্রোত ক্রমাগত প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং যদি ঈশ্বরের শুভেচ্ছা ও অনুগ্রহ হয়, উভয়েরই শক্তি বর্দ্ধিত হইবে এবং পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নব বল লাভ করিবে।

ইহাই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘপোষিত কামনা এবং তাহারই বাহ্যিক রূপ বিশ্বভারতী রচনা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহারই সাফল্য দেখিয়া আমরা অন্তরের সহিত শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ জানাই। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই বিভিন্ন ভাষায় রচিত বহুগ্রন্থ বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে স্থান পাইয়াছে। বহু সহস্র চৈনিক গ্রন্থ সংগ্রহ হওয়ায় একটি "চীনা ভবনে"র প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেইরূপ জৈনদর্শন এবং [illegible] প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের ভাষণ ও তুলসীদাস কবীর দাদূ প্রভৃতি [illegible] গণের উপদেশাবলী চর্চ্চার জন্য একটি 'হিন্দিভবন' স্বতন্ত্র নির্মিত হইয়াছে এবং সকল স্থানেই অধ্যয়নরত গবেষণাকারী ছাত্রছাত্রী আছে, [illegible] পুরাকালের নালন্দা বা তক্ষশীলার ছাত্রগণের [illegible] রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবীরের শতাধিক দোঁহা [illegible] ভাষান্তরিত করিয়া ম্যাকমিলান কোম্পানীর [illegible]

বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] দণ্ডকেও সম্বোধিত ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষের [illegible] করিয়াছেন। সাধারণ ইংরাজ ব্যক্তি-[illegible] রাজকবি টেনিসনের (Tennyson) [illegible] বলেন,

"Too proud to care whence I came,"

(Lady Clare Vere de Vere)।

প্রাচীনপন্থী অধ্যাপকমণ্ডলী বিখ্যাত রোমীয় কবি হরেসের (Horace) ল্যাটিন ভাষায় রচিত একটি পংক্তি ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ নয়, উহার অর্থ এ দেশীয় ভাষায়, "অভিজাত পূর্ব্বপুরুষের প্রমাণ বংশধরদের গুণাবলিতে, আর তাহাতেই বিস্তারিত বংশ সম্ভ্রান্ত বলিয়া প্রখ্যাত হয়।" রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করিতে আর একটি প্রাচীন ল্যাটিন উক্তি দিয়াছেন। ইহা রোমীয় রাজ্যের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি জ্যেষ্ঠ সিপিওর (Scipio) উক্তি—ইতিহাসে এবং ল্যাটিনদের ধারণায় জুলিয়াস্ সিসার অপেক্ষাও সিপিও মহাযোদ্ধা ও বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহারই কোন বক্তৃতা হইতে উচ্চশীর্ষের পণ্ডিতেরা একটি বচন উদ্ধার করিয়া বলেন যে, "দর্প, লোভ, বিনয় ও লজ্জায় যদি রবীন্দ্রনাথকে নিষেধ না করিত, তাহা হইলে পূর্ণ অধিকারে সিপিওর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলিতে পারিতেন যে, 'my life has crowned the virtues of my line', আমার জীবন আমার বংশাবলীর গুণ ও পৌরুষকে মুকুট পরাইয়াছে এবং তাঁহার প্রতিভা ও চরিত্র বলে তিনি সেই সদবংশের ও তাঁহার পূর্বপুরুষদের এতটা বৃদ্ধি করিয়াছেন যে, তাঁহার অপেক্ষা আর কাহারও এরূপ উক্তি করার অধিক যোগ্যতা নাই।" রবীন্দ্রনাথের [illegible] যে দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা গ্রীক্ ভাষা হইতে গ্রহণ করা, একটি মিরিওনস্ (myrionous) অপরটি মুসিকোটা-টোন্ (mousikotaton)। প্রথমটির অর্থ, অযুতমনা কবি ও রচয়িতা, দ্বিতীয়টি কলালক্ষ্মীদের সর্ব্বপ্রিয়তম পাত্র। গ্রীক্ শব্দ মিরিয়াস্ অর্থে দশসহস্র অর্থাৎ তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী এবং মুসা অর্থে কলাধাত্রী, যে শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মৌসিকে টেক্‌নে বা মিউসিক্ বা সঙ্গীত কৌশল। আমাদের যেমন অষ্ট বসু, নব গ্রহ, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আছে, তেমনি গ্রীক্ পুরাণানুযায়ী নয়টি মুসা ইংরাজি মিউসেস

(muses) আছেন তাঁহারা ভাষা ও কাব্যের বিভিন্ন বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী। এ নয় জনার দয়া ত ছিলই নিঃসন্দেহ, তদুপরি গ্রীক্ দেবী নিমেসিসও (Nemesis বা নিয়তি) রবীন্দ্রনাথকে কৃপাকণা দানে বঞ্চিত করেন নাই। ঐ দেবীর জগত নিয়ন্ত্রণে ও ন্যায় বিধানে যে মহাবোধ জীবকে ঘটনা মধ্যে সতত চালনা করে, সে সম্বন্ধে চেতনাও রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রতিফলিত। ইংরাজি নীতিজ্ঞান (ethical ideas) সংমিশ্রণে কবি উহা বাঙালী পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। তাই তাঁহার অনেক গল্পের ও নাটকের পরিসমাপ্তি বা অসমাপ্তিতে যে কারুণ্য ফুটিয়া উঠে তাহা সাধারণের পক্ষে বিস্ময়কর ও অস্বস্তিকর, কিন্তু সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে ও মহিমায় গ্রীক্ ট্র্যাজেডির কাছাকাছি যায়। তাঁহার 'দেবতার গ্রাস', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ কুন্তির কথোপকথন', 'বিচারক', 'মাসী', 'কর্ম্মফল' (গল্প) 'ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট মোহিনী নারীগণের প্রেম' প্রভৃতি ভাল করিয়া দেখিলে এই কার্য্য-পরম্পরা বুঝা যায়। [illegible] দেশে ও পুরাণে এতগুলি বিভাগীয় দেবীর সৃষ্টি না করিয়া,

"কুচভর নমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে
সকল বিভব সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।"

স্মরণ করিয়া, তাঁহাকেই "বাণী বিদ্যাদায়িনী [illegible]" প্রণাম করিলেই, যাবতীয় বিভব, মনস্বিতা, [illegible] হইয়া থাকে। সুতরাং বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে [illegible] মিউসে সেকারভোটা বলিলে, মাননীয় [illegible] তিনি বরপ্রাপ্ত, (অধিনায়িকাদের পূজার [illegible] দেবীদের প্রিয়তমই হউন) এবং তাঁহার [illegible] প্রতিভা ও পারগতা অল্প পরিসরে [illegible] পণ্ডিতেরা বুঝাইয়াছেন। কিন্তু ইহার [illegible] পরাবিদ্যার সাফল্য রূপ বিভূতির [illegible] দেবীর [illegible] কোন ইঙ্গিত আসে না। যাহা হউক জীবন [illegible]

শিখরে তিনি বসিয়া বিদেশাগত জয়দাতাদের সাদর আহ্বানের সাথে অসঙ্কোচেই স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে, যদি তাঁহাদের সেদিনকার কার্য্য তাঁহার নিজের দেশের এবং দেশবাসীর ও আরাধ্য সংস্কৃতির প্রতি 'প্রণয়-সঙ্কেত' বা সৌহার্দ্দ্যের জন্ম হস্ত প্রসারণ (gesture) হয়, তবেই তাঁহাদের প্রদত্ত মান্য ও উপাধি তিনি সচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহারই অন্যথায় এই সহৃদয়তার অভাবটুকু তাঁহাকে রাজদত্ত সম্মানের 'নাইট' উপাধি ঘৃণায় লজ্জায় একদিন রাজ সরকারে প্রত্যর্পণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। দেশবাসীর গৌরবের জন্য এ ত্যাগের কথা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' পাঠকদের জানাইয়াছি। বর্তমান ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সুধীবৃন্দ ও বুধমণ্ডলী যে তাঁহার অনুভূতির ও ঝংকার যথার্থতা অঙ্গীকার করিয়া, তাঁহার মনুষ্যত্বকে মর্য্যাদা অর্পণ করিলেন, সভাধিনায়ক স্যর মরিস গায়ারের অভিভাষণে তাহা প্রমাণিত হয়। তন্মধ্যে কিয়দংশ যাহা উপরিভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ তাহা অনুধাবন করিতে পারিবেন।

শকাব্দ ১৮৬২র শ্রাবণের ত্রয়োবিংশতি দিবসটিকে বিশ্বভারতীর এই দেশের অনুষ্ঠানটি অন্তর্ভুক্ত করায় চিরস্মরণীয় থাকিবে। ইহাতে বঙ্গদেশের তথা বাঙ্গালী জাতীর জন্য ভাবী কল্যাণ অবশ্য শ্রীভগবানের করুণায় নিহিত রহিল। কিন্তু ভারতের ইতিহাসেও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ইতিবৃত্তে সাতই আগষ্টটি স্বর্ণাক্ষরে নির্দেশিত হইবার উপযুক্ত একটি তারিখ চিরদিনের জন্য রহিল।

শ্রীঅরবিন্দের নির্দ্দেশিত তৃতীয়পন্থা, জাতীয়তা ও কৃষ্টিরক্ষার জন্য পূর্ব্বপুরুষের কার্য্যকলাপ ও বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা সমর্পণ কর্ত্তব্য, তাহা রবীন্দ্রনাথ কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়াছেন ও শেষ বয়সে ঐতিহাসিক চেতনার প্রতি যথেষ্ট জোর দিয়াছেন, তবে কৃচ্ছ্রসাধন ও যোগাভ্যাসের তিনি পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার একাশীতিতম বর্ষ প্রবেশে বোলপুরে তাঁহার জন্মতিথি উৎসবে যাহা বলেন, তাহা ১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসী

পত্রিকায় আমরা প্রবন্ধাকারে 'সভ্যতার সঙ্কট' নামে পাই। ইহা ১৯৪০ সালে Crisis in Civilization ইংরাজি প্রবন্ধে অনুদিত হইয়া বিশ্ববাসী সকল জাতির গোচরে আসিয়াছে। তাহার উপসংহারে এই সেজ্‌ ও সিয়ারের (sage and seer) বাণী যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করব। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। এই কথা আজ ব'লে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

"অধর্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যতি।"
ঐ মহামানব আসে
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রি দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।"

উদয়ন
১লা বৈশাখ ১৩৪৮

অশীতি বর্ষের এই স্বীকারোক্তিতে [illegible] কালোপযোগী প্রয়োজনীয়তাবোধ, [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। [illegible] ও আত্মবঞ্চনা পাশ্চাত্যের সব ধারায় [illegible], শিক্ষায় [illegible]

জাতীয়তাপরিপন্থী জীবনের লক্ষ্য ও ভোগ্য বস্তুর মূল্য নিরূপণে আত্ম-তৃপ্ত ধনী সম্প্রদায়ের মনোভাব বা বুরজোয়া সম্ভ্রম ও ভদ্রতা বোধের মধ্যে দাঁড়াইয়া সতেজ ও এমন সরল ভাবে নিজের ভ্রম ও প্রচলিত পন্থার বিষয় ব্যক্ত করায়, শুধুই তাঁহার মহত্ত্ব বা ইউরোপের সভ্যতা সম্পদ দেউলিয়া হইয়া যাওয়া নহে, দেশের উচ্চশিক্ষিতগণের জীবনেতিহাসের ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্দ্ধিত হওয়ার নিদারুণ অসারতা ও বিফলতা বা নৈতিক ও চারিত্রিক বলের শোচনীয় দৈন্যতাও জ্ঞাপিত করিতেছে। এই মর্ম্মকথার মূল্য আজ তাঁহার বিয়োগবিধুর দেশবাসী বা শোকনিরত বিশ্ববাসী হয়ত সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত 'নবারুণের' আবির্ভাব হয় ও তাঁহার মুখ-নিসৃত নব দর্শন, নব ভঙ্গীতে সমাজগঠন, ও চিন্তার বিষয় করিয়া সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান মানবীয় কর্ম্মের নবমূল্য নিরূপিত হয়, তখন হয়ত মানুষের মানব শুধু মনুষ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজের দাবী বুঝিয়া জীবনে ও চিন্তাধারাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। তখন নব সংস্কৃতির রূপ হইবে, যাহাতে মানুষ প্রেমে ও ত্যাগে সুন্দর হইবে, আত্মাহুতি দানে ও পরের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া ধন্য জ্ঞান করিবে। ইহা রবীন্দ্রনাথের চিরপরিচিত Idealism বা আদর্শবাদ, অদমিত অবস্থায় দুঃখের মধ্যে আলোর অনুসন্ধান, ও ভবিষ্যতের প্রতি 'আশাভরা অন্তরে' দৃষ্টি নিক্ষেপের সৎপরামর্শ। যে আশ্বাস বাণীতে (Optimistic note) জাতিকে উজ্জীবিত করিবে, তিনি আমরণ ব্রতস্বরূপ পালন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার যৌবনে রচিত "এবার ফিরাও মোরে" এই শেষ জীবনে অধিকতর জোরের সহিত মন্ত্র স্বরূপ উচ্চারিত হইল।

ব্যাধিতে বিচলিত হওয়া রবীন্দ্রনাথের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই সমাবর্ত্তন উৎসবের পক্ষ মাস যাইতে না যাইতেই, ৪ঠা জুন ১৯৪১ বিশ্বজগত তাঁহার একখানি ইংরাজিতে লিখিত পত্রতে তাঁহার তরুণোচিত ক্রোধ ও নির্ভি-কতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল যে, দেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ তখনও পূর্ণভাবে

জীবত্ব, বার্দ্ধক্য ও রোগ তাঁহার ভাষায় বা যুক্তিতে কিম্বা শ্লেষোক্তিতে কিছু মাত্র দৌর্ব্বল্য আনে নাই। উপলক্ষ হইল সংবাদ পত্রে প্রকাশিত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে উদ্দেশ করিয়া পার্ল্যামেন্টের অনৈকা সভ্যা ইংরাজ মহিলা কুমারী র‍্যাথবোনের এক পত্র। রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে তাঁহার রোগশয্যা হইতে শ্রুতিলিখনে লেখাইয়া দৈনিক সংবাদপত্র-স্তম্ভে প্রচার করেন,—"Through the official British-hannels of education in India have flow ed to our children in schools not the best of English thought but its refuse, which has only deprived them of a wholesome repast at the table of their own culture." (Open letter to Miss Rathbone)

ইহার বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি প্রকারান্তরে ইঙ্গিতে ইহা বলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, 'পয়লা নম্বর' (ছোট গল্প) 'তোতাকাহিনী' (রূপক) প্রভৃতি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। ইহার সূচনা সেই মোহিত সেনের সম্পাদিত ও প্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থাবলীর সংস্করণের যুগেও "কথা কও হে মৌন অতীত" নামক কবিতাতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার রাজনৈতিক চেতনা উদ্বোধনের যুগে, যখন নব্যশিক্ষিত [illegible] সম্প্রদায় জনসাধারণের সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বাধীনতা [illegible] দেন, তখনই রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বাগ্রে সুরেন্দ্রনাথ, [illegible] আভ্যের 'উপরতলা' ছাড়িয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে [illegible] হন, এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের [illegible] প্রদর্শক কি ভাবে হইয়াছিলেন, তাহা [illegible] Nationalism পুস্তকে লিখিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠিক পূর্ব্বতন সংস্কৃতিতে ফিরিয়া [illegible] করেন না। বর্ত্তমানের সহিত সম্পূর্ণ [illegible] প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য হইতে জীবনের মূল [illegible]

আবশ্যক বোধ করেন। এ কথা সুস্পষ্ট না বলিলেও, তাঁহার "অরণ্যকে" কিম্বা Message of the Forest"এ পূর্ব্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা, নিভৃত চিন্তা ও তপস্যা দ্বারা বিশ্বপ্রেম অর্জ্জন, যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও জীবের হিতজনক বাণীলাভের সহায় হয়, তাহার আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে কর্ম্মরচনা ও সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনে তাহার নিয়োগ না করিলে, শুধুই বিলাস বা Intellectual dissipationএ পর্য্যবসিত হয়। তাই তিনি জগত দেখিতে ও বিভিন্ন মনুষ্য কেন্দ্রের নানা দেশে নানা চেষ্টা দেখিতে বাহির হন, কেবল স্বদেশীয়ানা ও স্বরাজস্বপ্ন লইয়া থাকিতে পারেন নাই। জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তার প্রহেলিকা মেটাতে, Paradox of Nationalism and Internationalism solve করিতে, ও তাহা হইতে জাতির সম্বন্ধ একতার গ্রন্থি সূত্রে পরিণত বয়সের অনেকটাই অতিবাহিত করেন, এবং সাফল্যলাভ করিলেও স্বদেশের দৈনন্দিন দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া ইংরাজি শিক্ষার ও সংস্কৃতিতে তাঁহার প্রবঞ্চিত হওয়ার কথা অকপটে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। [illegible] ভাগ্যবিধাতার কৃপাপ্রার্থী হইয়া যুক্ত করপুটে দাঁড়াইয়া থাকিলে হয়ত কিছু ফল কালে আসিবে, কিন্তু যে ক্ষিপ্র গতিতে অন্যান্য জাতীরা নিজেদের জনসাধারণে শিক্ষা, শিল্প, ও বাণিজ্যের বিস্তার করিতেছে তাহার সহিত আত্মচেষ্টা ও সাহসভরে ভারতীয়ের যোগ রাখা ও [illegible] তাই গাহেন,

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীর বৃন্দ আসন তব ঘেরি
ভারত কৈ ভারত কৈ ভারত কৈ ?"

[illegible] না তৎপরবর্তী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মত পশ্চিমের রক্তরাগে রঞ্জিত আকাশে ও পূরবী মূলতানের তানে আর আস্থা রাখিতে পারিলেন না। যদি উচ্চতর মানবতার আবির্ভাব হয়, ত সে পূর্ব্বগগন হইতে হইবে ও জগতবাসী শ্রদ্ধার সহিত সে আলোকে পুলকিত হইবে,

এই স্থির প্রতীতি দেশবাসী আত্মীয়গণকে জানান আবশ্যক বোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের কথাও বলিলেন,

"জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা,
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিন শেষে পরিস্ফুট হয়ে উঠে ছবি।"

ইহার সার্থকতা সেইখানে, যেখানে "নিজেরে চিনিতে পারে রূপকার নিজের স্বাক্ষরে"।

"স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেক ধারা
সে জীবন বাণী দিল দিবস রাত্রিরে,
রচিল অরণ্যকূলে অদৃশ্যের পূজা আয়োজন,
আরতির দীপ দিল জ্বালি নিঃশব্দ প্রহরে
চিত্ত তারে নিবেদিল জন্মের প্রথম ভালোবাসা।"

সকল ধর্মকে সমন্বয় করিয়া তিনি এই জীবনকেই সার ধর্মবোধে নিজেকে চিত্রকরের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া, অনুভূতি পথে অগ্রসর [illegible] গমনেই, সন্তোষলাভের উপায় স্থির করিয়া গিয়াছেন। ইহা পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি বা গুরু উপদেশে সমাবর্তন, যাহাতে প্রতি প্রত্যেক জীবের লক্ষ্য থাকা উচিত।

সেপ্টেম্বর ১৯৪০ হইতে কবিবরের দৈহিক শক্তি [illegible] দিনই দুর্বলতর বোধ করিতে থাকেন ও [illegible] বিকৃতির উপসর্গ দেখা দেয়। জুন ১৯৪১ [illegible] বিধানচন্দ্র রায় অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] লইয়া শান্তিনিকেতনে যান, ও কবিকে [illegible] কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করেন। [illegible] শান্তিনিকেতনে এক রোগী-বহা হালকা গাড়ি [illegible] করিয়া বোলপুর ষ্টেশনে আনা হয়। [illegible]

রাস্তাটিকে খানাখোন্দল বুজাইয়া সুগম করিয়া দেন। এবারেও ই, আই, আরের কর্ত্তৃপক্ষ কবির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত যথাসম্ভব আরামের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার সেবকদের সহযোগীতা করেন। অশ্রুসিক্ত অধিবাসী ছাত্রছাত্রী, ভৃত্যবর্গ এবং গ্রামবাসী জনসাধারণের সভক্তি প্রণাম ও বিষাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ করুণ নয়নে 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের' প্রতি চাহিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটায় কলিকাতা মহানগরীর জোড়াসাঁকোর বাটিতে সমাবর্ত্তন করিলেন। "ঘরোয়ার" পাণ্ডুলিপি পাঠে যে সন্তোষ পাইয়াছিলেন, তাহা স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথকে জানাইলেন ও সকলকে সস্নেহ আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিলেন এবং অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন। অবনীন্দ্র যে একটা জাতির সৌন্দর্য্য চেতনা জাগাইতে সক্ষম হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে 'বাণীর বরপুত্র' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন ও তাঁহার সপ্ততিতম জন্মতিথি স্মরণে একটি জয়ন্তী উৎসব করিতে 'বিশ্বভারতীর' সচিব মণ্ডলীকে আদেশ করেন ও সকল সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে অবনীন্দ্রকে অনুরোধ করেন। ডাক্তাররা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, ৩০শে জুলাই বেলা দশটায় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে স্থির করেন, কিন্তু কবিকে তাহা জানান হয় নাই। তিনি কিন্তু অনুমান করিয়াছিলেন এবং Operation Table-এ [illegible] প্রবেশের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেও মুখে মুখে রচনা করিয়া, নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখাইয়া দেন :—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বহু জালে
হে ছলনাময়ী।"

স্থানীয় অসাড়তা উৎপাদক দ্রব্যের সাহায্যে তাঁহাকে সচেতন অবস্থায় অস্ত্রোপচার করা হয় ও চিকিৎসকরা সুফল আশা করেন। কিন্তু লাগিয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করায়, তিনি Dr. L. M. Bannerjee-কে বলেন "Why force me to a lie?" ১লা আগষ্ট অপরাহ্ণ হইতে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে ও [illegible]

উঠে, ক্রমে প্রবল হিক্কা দেখা দেয় ও ৭ই আগষ্ট বেলা ১২টা ১৩ মিনিটে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস মহাকাশে লীন হয়। শেষের কয় দিন কোমায় (Coma) আচ্ছন্ন ছিলেন, স্বজনগণকে চিনিতে পারেন না। কিন্তু এই চরম মুহূর্তের জন্য তিনি বহু অগ্রে হইতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া কোথায় কিরূপ হইবে, ও তৎপরে তাঁহার ভস্মাবশেষ শান্তিনিকেতনে নীত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কিরূপ সম্পন্ন করা হইবে, এমন কি কোন্ কোন্ মন্ত্র, কি কি গান তাঁহার আত্মার সদ্গতির কামনায় গাওয়া হইবে, তাহাও নির্ব্বাচন করিয়া sealed cover-এ রাখিয়া যান। তাহাতে কেবলই প্রেমময়ের ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন। স্থানাভাবে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না, কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্র-মনের ছবি সুস্পষ্ট। বোলপুরে শ্রাদ্ধবাসরে কার্য্যকালে মৃত্যুর সমাচ্ছন্নতায় তাহা অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জক হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাঁহার মহাসমাবর্ত্তনে মহানগরীর মহোৎসব বর্ণনায় দৈনিকপত্রগুলি কয়দিন অন্য সংবাদ চাপা রাখিয়া রবীন্দ্র কথায় মুখর ছিল, তাহাতে আমরা যে কি রত্ন হারাইলাম তাহা আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হয়। বেলা ৩ টার সময় অভূতপূর্ব্ব বিপুল জনতার এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া নিমতলা ঘাটের শ্মশানে শবদেহ আনীত হয়। ভাগীরথীর গর্ভ হইতে একখণ্ড নূতন ভূমি মিউনিসিপ্যালিটি ও পোর্টট্রাষ্টের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় উত্থিত হইয়া যেন এই পবিত্র শব শিরে বহন করার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, তদুপরি বিশ্বকবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার [illegible] ভ্রাতুষ্পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র সুবীরেন্দ্রনাথ [illegible] আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাঁহার দেহে শেষ অগ্নি-স্পর্শ দান করেন। পথিমধ্যে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি সেনেট হলের সম্মুখে শবাধার রক্ষিত হইলে, ভাইস্-চ্যান্সেলার ও সেনেটের সভ্যগণ সমবেত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে [illegible] বঙ্গমাতার সেই অদ্বিতীয় সেবককে পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুরূপ

ব্যবস্থা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সম্মুখে করা হইয়াছিল, তথায় পূজ্য পেট্রিয়ার্কের ব্রহ্মলোক কামনায় প্রার্থনা ও ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষে শেষ শ্রদ্ধা-মাল্য অর্পণ করা হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতা-প্রযুক্ত শেষ কাজ করিতে অক্ষম হন, কিন্তু পরদিনই তাঁহার দেহাবশেষ বোলপুরে লইয়া যান ও বিধিমত সমাধিস্থ করেন। তাঁহার অন্তিম-শয্যায় তাঁহার স্নেহময়ী পুত্রবধূর শুশ্রূষা ও পঁচিশ বৎসর যে সেবায় তিনি অভ্যস্ত তাহা লাভ করা ঘটে নাই, কারণ তখন পুত্রবধূও পীড়িতা। রবীন্দ্রনাথ আসন্ন মৃত্যুর প্রত্যাশায়, বিশ্বভারতীকে তাঁহার শেষদান, প্রায় লক্ষ মুদ্রা মূল্যের তাঁহার কলিকাতাস্থ সাদের লাল কুঠিটি এবং অন্যান্য আয়বান সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছেন, এবং পুত্রপরিজনের ভরণপোষণের নিমিত্ত একটি ট্রাষ্ট সৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত ন্যাসপত্র (Trust Deed) সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বাঙ্ময় বাক্ জগৎ হইতে ভাষাশব্দহীন অবাক্ জগতে জীবের পুনঃ প্রবেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উপরোল্লিখিত তাঁহার 'জীবন' অভিধাযুক্ত কবিতাটিতে লিখিয়াছেন।

"তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার, রেখা তার,
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে :
কিছুবা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি
ধ্রুব তারকার পাশে জাগে তার
জ্যোতিষ্কের লীলা।"

এই দুই পংক্তিতে মানব জীবনের তাৎপর্য্যের সঙ্কেত করিয়াছেন। এ দেশের চিরন্তন সংস্কার যে, সংস্কারযুক্ত মানবাত্মা অবিনাশী, এবং সুকৃতির ফলে মর্ত্যবাসীর তিমির-যাত্রার পথপ্রদর্শক (guiding star) রূপে তাহার ক্ষীণ জ্যোতির দ্বারা জগতের হিতসাধন করিতে থাকে, পার্থিব কর্ম্মের ভাল মন্দের ফলে তাহার ভবিষ্যত কর্ম্ম ও জীবন নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। জগতকল্যাণ কামনা ও ভগবৎভক্তির পরিণতি যে, লোকোত্তর

জ্যোতির্ম্ময় অবস্থায় অবাধ বিচরণ, ইহারই আভাষ দিয়াছেন। যুগযুগান্তের অনন্ত চৈতন্য প্রবাহে অপরিণত অপরিপুষ্ট মানব সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের শিখরে মাঝে মাঝে এক একটি পরিপূর্ণ মানবের সন্দর্শন ঘটে। কিছুকাল এ মর্ত্তভূমে তাঁহাদের মহৎ চিন্তার প্রতিভা ও হিরকতুল্য জীবদুঃখ-কাতর প্রশস্ত হৃদয়ের নয়নারাম জ্যোতি বিকীরণ করিয়া বুদবুদের মত সেই মহা-বোধের লহরী মধ্যে লয় পায়। কেন হয় বলা যায় না, সকলই চিণ্ময় পুরুষের মঙ্গল ইচ্ছা ও লীলা। কিন্তু, চক্ষুর অন্তরাল হইলেও চিৎ-সরিতের মধ্যে পরবর্ত্তী তরঙ্গদলের কণাগুলিকে শক্তি ও গতি দিতে থাকে। এই-জন্যই জগত-ইতিহাসে, যুগের অচিন্তনীয় প্রয়োজনবোধে, বিপুল মানবরাশি ও স্রোতের মধ্যে একটি সক্রেটিস্, একটি শাক্যসিংহ, একটি মহাবীর তীর্থঙ্কর, একটি জিসু, একটি হজরত মহম্মদ, একটি শ্রীগৌরাঙ্গ ও একটি রবিঠাকুর উত্থিত হইয়া, যুগ-প্রবর্ত্তক রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তেমনি একটা এলিক্জেণ্ডার, একটা চেঙ্গিসখাঁও পৃথিবীর গণসমূহকে চমৎকৃত করিয়া থাকেন। ইহার কারণ নির্দ্দেশে, পাশ্চাত্য দর্শন কোনও সন্তোষ-জনক যুক্তি দিতে পারে না, কিন্তু পিথাগোরাস্, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শ-নিকরা, সম্ভবতঃ প্রাচ্য দর্শন প্রভাবে, কথঞ্চিৎ জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলের পারম্পর্য্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ইংরাজ যুগ-কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth), Pantheism অদ্বৈত মতের [illegible] ও Immortality আত্মার অমরতা স্বীকার করিয়াছেন। [illegible]

"Trailing clouds of glory do we come,
From God who is our home."

সেই পরমেশ্বর আমাদের আরামের বাসস্থান বা গৃহ,—উহার মধ্যে দিয়া হইতে আমরা (অর্থাৎ মানবাত্মা) জ্যোতির্ময় শুভ্র বিন্দু [illegible] বা কিরণ স্বরূপ আসিয়াছি। আমাদের [illegible] স্মৃতির [illegible] ও পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হওয়া, তবু যেটুকু চৈতন্য অবশিষ্ট থাকে [illegible] আমরা বস্তু, ইতিপূর্ব্বে হয়ত অন্য কোন জগতে ছিলাম [illegible]

সুতরাং, মৃত্যুর দ্বার দিয়া আমাদের পূর্ব্বতন গৃহে কবি গ্রে'র মতে, ম্যানসানে (mansion) * গমন বা মহাসমাবর্ত্তন ও অস্ত আকাশে চিন্ময় জ্যোতিতে আত্মার পুনঃপ্রকাশ সম্ভব। 'বাড়ি যাব, বাড়ি যাব' বলিয়া বাহিরে ব্যস্ততা না দেখাইলেও, ইহা যে রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম বাণী ছিল, পার্থিব রহস্য উদ্ঘাটন বা কৌতুকপ্রিয়তা তার বহিরাবরণ ছিল, তাহা তাঁহার শেষ তিন চারি বৎসরের গান কবিতা প্রভৃতির মধ্যে ভাল করিয়া দেখিলে, কিছু কিছু পাওয়া যায়, অন্ততঃ সুরের একটু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে।

সকল উৎসবের অঙ্গ স্বরূপ একটি তৈল বা ঘৃতপূর্ণ প্রদীপে মোটা সলিতা দিয়া হাঁড়ির মধ্যে জ্বালাইয়া রাখা এ দেশের প্রথা। এমন কি, বরকনের অনুঢ়ান্ন বা আইবুড় অবস্থায় শেষ ভাত খাওয়াতেও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ পূজায়, অধিবাস হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত ঘট বা প্রতিমার পার্শ্বে ইহা রক্ষিত হয়, এবং কয়েক দিবস ব্যাপী হইলে, যাহাতে ইতিমধ্যে কোন প্রকারে নির্ব্বাপিত না হয়, তদ্বিষয়ে গৃহস্বামীকে বিশেষ যত্ন লইতে হয়, নতুবা কামা কম্ম অমঙ্গল সূচনা করে। আরতিরও প্রধান অঙ্গ দেবোদ্দেশে দীপদান ও তদ্বারা আরত্রিক সম্পন্ন করা, তাই বরণ-ডালায় মঙ্গল-ভাঁড়ের মধ্যে দীপ জ্বালাইয়া বরকনেকে আপাদমস্তক তাহার আলো ও তাপ দিয়া বরণ করিবার প্রথা। শ্রাদ্ধবাসরে পিণ্ডদান কালে ও পারত্রীয় অন্নব্যঞ্জন সমর্পণের সময়ে একটী দীপ জ্বালাইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। প্রদীপের শিখার ঊর্দ্ধতা ও ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া বুঝা যায় পিতৃপুরুষগণ কিরূপ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। দেবতার ভোগের সময় হোমকুণ্ডে অগ্নি রক্ষা করিতে হয়, ও তাহার প্রজ্জ্বলিত শিখায় কার্য্যের সফলতা জ্ঞাপন করে। ফুৎকার দ্বারা যেমন অগ্নি জ্বালান নিষেধ, তেমনি ফুৎকার দিয়া প্রদীপ নিবান দোষের। সেইরূপ আকস্মিক কার্য্যে

---

* Cf 'Back to its mansion goes the fleeting breath'
(Grey's Elegy written on a country churchyard)

সুফল হয় না, বংশের হানি ঘটে। হোমাগ্নি, 'সমুদ্রং গচ্ছ' বলিয়া, দধি, উদকাঞ্জলী, তাম্বুল ও রম্ভা দ্বারা নির্ব্বাপিত করিতে হয়, পূর্ণাহুতি ও পূর্ণপাত্রস্থিত তণ্ডুলাদি প্রদান পূর্ব্বক তৎপূর্ব্বে কর্ম্মসমাপনের অনুমতি অগ্নিদেবের নিকট যাচ্ঞা করিতে হয়। কাজেই কর্ম্মান্তে দীপ আচ্ছাদন করার ব্যবস্থা আছে, সরা বা অন্য হাঁড়ির দ্বারা উহা সম্পাদিত হয়। তাহাতে উৎসবের সমাপ্তির পরও সকলের মনে মাঙ্গলিক কার্য্যের আরামপ্রদ তাপ ও স্নিগ্ধ জ্যোতির ভাবটা যেন কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখা হয়। উৎসব দীপ, গানের রেসের মত, স্বীয় স্বাভাবিক গতিতে লয় পায়। সুপ্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে যে, যে মানব স্বীয় জন্ম সময়ের গ্রহনক্ষত্র সংস্থান বা তাঁহার ইহ জীবনে তাহার ফলাফল অবগত নহেন, তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ-ব্যাপার বা জীবন, প্রদীপশূন্য কক্ষের মত। গৃহস্থালির এই সামান্য অথচ অত্যাবশ্যকীয় বস্তুটি তাই আমাদের সাহিত্যে অনেকস্থলে উপমেয় হইয়াছে, এবং হিন্দুমাত্রেরই নিকট জীবনের প্রতীক স্বরূপ সমাদৃত। জীবন হইতে তপস্যা, যৌবন, প্রতিভা, বুদ্ধি, ও অধ্যাত্ম-বিভূতি সবগুলিই বোধগম্য করিতে, মানবাধারে রক্ষিত চিন্ময় শিখার অপরাজিত দীপ্তিকে আমাদের নিকট সম্যক পরিস্ফুট করিতে, ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না বাহী 'ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা' ওঁ তৎসংস্পর্শী সর্ব্বকর্ম্মপ্রয়োজক তেজ বা স্ফূর্ত্তিকে যেন মূর্ত্তিমন্ত করিয়াছে। [illegible] তাঁহাকে সর্ব্বান্তকরণে প্রণাম করি। ব্যক্তিত্ব বুঝিতে তাঁহার [illegible] রূপ, যশ, শত্রুপরাভবোপযোগী ধৈর্য্য, বীর্য্য, দক্ষতা ও কল্যাণপ্রাপ্ত [illegible] যেমন করিয়া বিশ্লেষণের অবকাশ পাই না, তাই সর্ব্বত্র [illegible], [illegible] পাত্র কি পাত্রাধার তৈল,' রূপ একটা যুক্তিকে, [illegible] প্রত্যয় না করিয়া বা গোলাপের সৌরভে [illegible] মনে [illegible] রাখিয়া, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে তাঁহার নামরূপের [illegible] [illegible] বলির একটা সাধারণ ধারণা, যাহাতে আমাদের [illegible] [illegible] আনন্দ পায়, তাহাই তাঁহার মনুষ্যত্ব বলিয়া ধরিয়া লই। [illegible]

(Character) ও রেপুটেশান (Reputation) প্রকৃতি বা স্বভাব ও খ্যাতি বা লোকের ধারণা, এদুয়ের মধ্যে তারতম্য ততটা লক্ষ্য করি না। কিন্তু অসাধারণ মানবের প্রভাব, কি প্রকট অবস্থায় কিম্বা আচ্ছাদিত অবস্থায়, যুগধর্ম্ম গঠনের সহায়তা করে। তাঁহাদের জীবন-প্রদীপ আমাদের নিকট অনাবৃত অবস্থায় উত্থানে, কিম্বা দেহান্তে প্রচ্ছন্ন বিলীন অবস্থায়, জাতিকে জ্ঞানে বুদ্ধিতে সম্ভ্রমে ও অন্য দেশবাসীর শ্রদ্ধায় কিছুকাল সমুন্নত রাখে। তাঁহাদের বিবিধ দুঃখ ও দুঃখ জয়ের কাহিনী উত্তর পুরুষের বল ও আশার সঞ্চয় কার্য্যে পুণ্যশ্লোক পঠনের ফলপ্রসূ হয়।

তবে "দেবে তীর্থে দ্বীজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ
যাদৃশি ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

যাহার যেরূপ ভাব ও অধিকার সে ততটুকুই আত্মসাৎ করিতে পারে।

বাঙ্গলা দেশের ভাগ্যে আশী বৎসর ধরিয়া যে "কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলি তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম ছিল যে পুরী", সেই পুরুষের দেহ অবলম্বনে দেব অংশুমালী যে নিত্য পবিত্রতা অর্পণ করিয়া সহস্ররন্ধ্রে হাজার দীপের উৎসব বা 'দেওয়ালী' জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বিগত ৭ই আগষ্ট ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দিবা দ্বিপ্রহরে বঙ্গবাসীর লোচন-পথে চিরতরে আচ্ছাদিত করিলেন।

বাংলা দেশের, তথাকার ভারতের এই দুর্দ্দিনে, বাংলার গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে যে বিষণ্ণতা ব্যাপ্ত হয়, ও তাহা প্রকাশের যে ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যে অননুভূত হৃদয়াবেগ নরনারী নির্বিশেষের স্মৃতিপটে সে দিবসটি অঙ্কন করিয়া গিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। আলো ছায়ার গূঢ় সংমিশ্রণে মুগ্ধ যে প্রেমিক, একদিন 'রাজার প্রেম'কে রূপ দিয়াছিলেন, তিনিই এই বঙ্গাব্দের ১৩৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ মধ্যাহ্নে (১৮৬৩ শকাব্দে, ১৯৯৮ সংবতে), সমাবর্ত্তন উৎসব দিবস হইতে ঠিক এক বৎসর পরে, মহাসমারোহে মানসে চিরতরে

"শান্তিপারাবারে" পাড়ি জমাইলেন, পৌর্ণমাসী সংযোগে একটি সফল কামনা ও সত্যাশ্রিত সফল বাণীর সন্ধান আমরা পাই। তাঁহার পূর্ণ যৌবনে মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে, ১২৯৬ সালে প্রকাশিত "মানসী" পুস্তকে, "ঝুলন পূর্ণিমা" কবিতায় যাহা উচ্চারিত হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার একাশীতিতম বৎসরে এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল। তাঁহার স্মৃতি, বাণী ও কীর্ত্তি জয়যুক্ত হউক,—উত্তোরোত্তর দেশবাসীকে প্রদীপ্ত করিতে থাকুক। তাঁহার স্মরণার্থ কোন "storied urn or animated bust" বা ঐতিহ্যবাহী ধবলপ্রস্তর ফলকের প্রয়োজন নাই। তাঁহার জীবিত কালে উদীয়মান তরুণদের তাঁহাকে অভিনন্দন বা দেহান্তে তাঁহার আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন, সকলই ব্যর্থ জানিব যদি তাঁহারা স্বীয় সন্তানসন্ততিদের সে ভাবের কিঞ্চিন্মাত্রও দিয়া যাইতে না পারে।

রবীন্দ্রনাথ moribund বা morbid sentiment, মৃতপ্রায় কিম্বা বিকৃতপ্রাণ-পরিচায়ক ভাবের প্রশ্রয় দিতে কখনই পক্ষপাতী নহেন, তবে মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনে তাহাকে স্বাভাবিক ও মনোরম রূপে দেখিতে বরাবরই তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। আগম ও নিগমের দ্বারস্বরূপ বৈদান্তিক (Impersonal) ভাবে তাহাকে অবলোকন করেন না—যে আমাদের এক জীবন হইতে অন্য জীবনে উত্তরোত্তর লইয়া যাইতেছে, যে প্রাণী [illegible] তাহাকে রবীন্দ্রনাথ ভিন্নমূর্ত্তি (Personification) দিয়াছেন। '[illegible] over the Stygian waters' বৈতরণী [illegible] স্থাপনে তিনি যত্নবান।

তাঁহার লেখা— '(আমি) পরাণের সাথে খেলিব [illegible]'
অথবা 'প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে [illegible]'
বা 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'

সাধারণ মানবের সাধারণ ভাব বা সাধারণ [illegible] নিবিড় কজ্জল কালিমা দেখিয়া 'মহান্তেব [illegible]' [illegible] না ভাবিলেও, কি [illegible] যে তাঁহার লেখনী [illegible]—

'হৃদয় আমার নাচেরে ময়ূরের মত নাচেরে' অনুভবের বিষয়। এমন কি অন্তিম কালেও মৃত্যু-চিন্তা তাঁহার ছন্দবিলাসে অভিনব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আদর্শবাদী ও স্বাত্বিকভাবাপন্ন মন, সময়ে সময়ে বিচিত্র ও উদ্ভট কল্পনাবিলাসী হইলেও মৃত্যু ও অবসান—বিচ্ছেদ ও বিরহ—ছায়া ও অন্ধকারের মর্মস্থল ভেদ করিতে চায়, অন্তরঙ্গতা প্রয়াসী, তাই তিনি উষার কবি—বর্ষার কবি—বিরহের কবি—মৃত্যুর কবি। ইহা সামান্য মন নহে, ইহা তাঁহার মনের (peculiar) স্বভাবজাত বিশিষ্ট গঠনেরই পরিচয়, চেষ্টাকৃত বা অধীত বিদ্যার ফল বা সংস্কার নহে। এই অসামান্যতা তাঁহার বাস্তব বর্ণনাতেও এমন একটা কল্পনার বিষাদপূর্ণ কমনীয়তা আনয়ন করে, যাহাতে বাস্তবের অনুকরণে বা অনুলেখনে ঠিক হুবহু বাস্তব হয় না, মনে হয় তাহার পিছনে একটা লুকান ইঙ্গিতের আভাস বিদ্যমান, যেন ছায়াচ্ছন্ন, অতীন্দ্রিয় বুদ্ধির সাহায্যে উহার রসগ্রহণ করিতে হয়। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তাঁহার মন চঞ্চল করে, অভিব্যক্তিতে বলিয়া ফেলেন,—

'নীল মৃত্যু মহাক্রোধে শ্বেত হয়ে উঠে।'

কি ভাবে যে ধবল প্রস্তরের সুসজ্জিত সৌন্দর্য্যের আধার তাজমহল ঘনীভূত হইয়া

'এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল'

হইয়া তাঁহার নিকট দেখা দেয়, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। এ উপমায় যেন নশ্বরতার ছায়া লাগিয়া আছে, অথচ সুন্দর। ইহা গভীর অভিজ্ঞতায় প্রেরণা বা Intuition দিয়া বুঝিতে হয়, সাধারণ বাস্তব যুক্তি দ্বারা বোধগম্য হয় না, কারণ ইহা মোটেই যুক্তিমূলক উপমা (যাহাকে বলে intellectual similitude) নহে। তাঁহার লেখায় অধিকাংশ স্থলেই ভাবমূলক উপমার বা emotional similitudes এর ছড়াছড়ি দেখা যায়। এইখানে বঙ্কিমবাবুর মন ও অভিব্যক্তির সহিত তাঁহার পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতেও মানসিকতা প্রবল নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞানাতীত

ভাবুকতা spiritualism বা mysticism এর আমেজ ও সংমিশ্রণ থাকায়, তাহা সাধারণ পাঠকের মনকে কেবল ছুঁইয়াই যায়, তেমন করিয়া নোয়াইয়া দিয়া যাইতে পারে না। অতএব তাঁহার লেখা বেশ ঠাহর করিয়া প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ আবশ্যক। সে তর্জ্জনী উঠাইয়া বলে না—

'মনে কর শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর
অন্যে কথা কবে তুমি রবে নিরুত্তর'

(রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম সঙ্গীত)

কিম্বা 'মহীষের গলঘণ্টা শ্রবণে যখন
অগ্রসর হবে পর পর
যখন হেরিবে তার আরোহি শমন
ভীম কৃষ্ণকায় দণ্ডধর।'

(সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার)

লোকোত্তর স্থানের ও কালের ভাবনা মানবীয় সংস্কৃতির অঙ্গস্বরূপ। যুগে যুগে মানুষের চিন্তাকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে, কিন্তু কালিদাসের ভাষায় বলিতে হয় 'তিরস্করীনো ভবন্তি', পর্ব্বত গুহার দ্বারে প্রলম্বিত মেঘের পর্দার ন্যায় আমাদের দৃষ্টিকে ব্যাহত করে। এই মানব প্রচেষ্টা বুঝাইতে In memoriam'এ Tennyson বলিয়াছেন—

'Behind the veil, behind the veil'

পুরাকাল হইতে অমরতা লাভের জন্যই চিন্তাশীল বা কীমিয়া [illegible] কুশলীয়া বিবিধ প্রণালীর উদ্ভাবনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। দেবতাদের সঞ্জীবনী-প্রদীপ শিখা হইতে অগ্নি চৌর্য্যের অপরাধে হোরা প্রমিথিউসকে (Prometheus) কত না নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। আমাদের পুরাণেও দেখা যায় দেবতারা এ বিষয়ে সতর্ক, তাঁহারা [illegible] রোগ আরোগ্য অপেক্ষা প্রতিরোধ করাই শ্রেয় (Prevention is better than cure), তাই একাগ্র তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদনে অপ্সরীদের নিযুক্ত করিতেন আর গ্রীক্ দেবতাদের মনোভাব স্বতন্ত্র। দেব-ঐশ্বর্য্য [illegible] করে পায়ে শিকল বাঁধিয়া, পর্ব্বতগহ্বরে জীবন [illegible]

প্রবানাত্তে নিক্ষেপ করা হয়, যাহাতে তাহার যন্ত্রণার উপশম বা পরিত্রাণ না হইয়া তরঙ্গের প্রতি আঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকে। ভবেশীয় সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপের প্রান্তভাগে ইংলণ্ডীয় সাহিত্যেও পুরাকাল হইতে উনবিংশ শতাব্দী অবধি এই করুণ কাহিনী অবলম্বনে কত না জ্ঞানগর্ভ মর্মস্পর্শী গাথা ও কাব্যের অবতারণা করা হইয়াছে। এই চির রুগ্নতাই কি জ্ঞানবুদ্ধিসাহসযুক্ত মানবাত্মার পরিণাম? প্রেমানন মৃত্যু তাহা হইলে তাহার চির বান্ধবের কার্য্য করে, জাগতিক সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইবে, মৃত্যুঞ্জয় হওয়ার চেষ্টা করিয়া বা মৃত্যুঞ্জয় হইয়া কোন লাভ নাই।

বৈদিক ঋষিরা প্রকৃত জীবন-প্রদীপের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাই চিরজীবী মার্কণ্ডেয় ঋষির নিকট মৃত্যুঞ্জয় স্বয়ং তত্ত্বকথা শুনিতে আইসেন (শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ দ্রষ্টব্য) ও মানবরা তাঁহার নিকট গুড়তিল সংমিশ্র দুগ্ধের গণ্ডুষ বাৎসরিক জন্মতিথিতে পান করিয়া আয়ু কামনা করিয়া থাকে। অপিচ, প্রতিদিন প্রাতে সংসারযাত্রা ও দিবসের কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে দেবতা স্মরণোদ্দেশে সতুলসী শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত ভক্তেরা পান করিয়া থাকে। কামনা—অকাল মৃত্যু নিরোধ ও সর্ব্বব্যাধি দূরীকরণ, যেন আমার নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছন্ন আয়ু পাপস্পর্শে খণ্ডিত হইয়া কমিয়া না যায়। ইহাই ইহার প্রতীকীয় ও প্রতীতীয় তাৎপর্য্য। কালের অব্যাহত গতি লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি গৌতম ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ অনুবাকে অষ্টম সূক্তে উষার বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরাণী সমানং বর্ণমভিশুম্ভমানা।
শ্বঘ্নীব কৃত্নুর্বিজ আমিনানা মর্ত্তস্য দেবী জরয়ন্ত্যায়ুঃ।"

অর্থাৎ—উষাদেবী চিরন্তনী এবং বারবার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার রূপ একই প্রকার। কর্ত্তনশীলা ব্যাধস্ত্রী যেমন পক্ষাদিচ্ছেদন দ্বারা পক্ষীদিগকে সতত হিংসা করিয়া থাকে, সেইরূপ ইনি সমস্ত প্রাণীর আয়ু নষ্ট করিয়া থাকেন

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ দিবসে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে যে গৌতম-বর্ণিত উষা সমুপস্থিত হইলেন, তিনি খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দির বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের আয়ু হনন করিয়া, ধীরে ধীরে উৎসব-প্রদীপটি আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী (ডাক্তাররা) ঘোষণা করিলেন কবীন্দ্রের পার্থিব দেহস্থিতির আর আশা ভরসা নাই। সেদিন কিন্তু "রাখী" পূর্ণিমার পুণ্যদা তিথির শুভ সংযোগ ছিল। তাই আমাদের মনে হয় যে, 'রাহুপ্রেমে'র রূপকার রাহুকবলিত হইলেও, সর্ব্বপাপঘ্ন শঙ্কা ক্ষোভ দুঃস্বপ্ন রহিত সীমাহীন মহাগগনে, অচিরেই তাঁহার আকাঙ্খার বস্তু—'সুন্দর হৃদিরঞ্জন' অমৃতময় পূর্ণ ইন্দুর সাক্ষাত লাভ পাইয়া থাকিবেন। তাঁহার নশ্বর জীবনের বিগত কাহিনী পাঠে আ[illegible] দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে এমত আশা পোষণ করিতে পারি।

আমরা শুনিয়া গেলাম, অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত 'জিন্দাবাদ রবীন্দ্রনাথ', 'Rabindranath no more', 'Long live Rabindranath for All-India, the land and people he so dearly loved'. ইহাই দেশবাসীর পক্ষে যথেষ্ট।

সমাপ্ত